ভারতের নৃত্যকলা

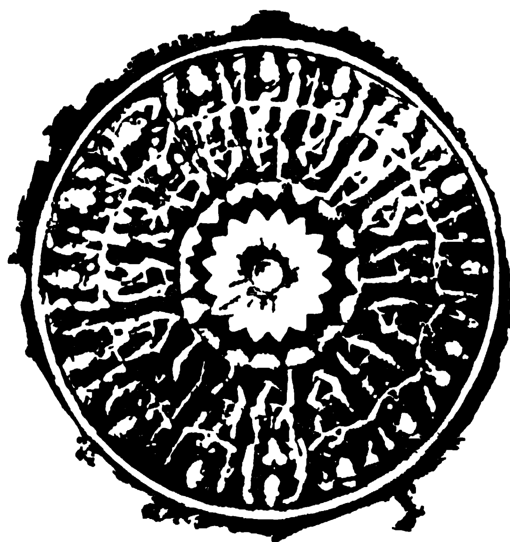
গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়





ভারতের নৃত্যকলা

ভারতের নৃত্যকলা । গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়





নবপত্র প্রকাশন / ৮ পটুয়াটোলা লেন / কলি-৭০০০০৯

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ :
৭ মার্চ, ১৯৫৯

প্রকাশক :
প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ বিচিত্রন
ও স্কেচ :
সুবোধ দাশগুপ্ত

পঞ্চাশ টাকা

BHARATER NRITYAKALA
BY Dr GAYATRI CHATTERJEE

শিল্পীজীবনের প্রেরণা

প্রথম নৃত্যগুরু

রবীন্দ্র নৃত্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পক

রূপকার

প্রিয়তম সাথী

অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়কে

ভূমিকা

আমাদের দেশে নিষ্ঠার সহিত নৃত্যচর্চা বহু প্রাচীন কাল হতে চলে আসছে। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। গ্রন্থখানির রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী। তাতে নৃত্যশিল্পের এমন উচ্চ স্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে সেই প্রাচীনকালেই ভারতে নৃত্যশিল্প রীতিমতো বিকাশ লাভ করেছিল।

ভারতে নৃত্যশিল্পকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততখানি বোধ হয় আর কোথাও দেওয়া হয় না। তারই ফলশ্রুতি হল স্বয়ং বিশ্বের নিয়ামক শক্তিকে নটরাজ শিবরূপে কল্পনা করে তাঁর বিগ্রহ চিদাম্বরমের মন্দিরে স্থাপন। নৃত্যকে এতখানি মর্যাদা কোথাও দেওয়া হয়নি। এই মন্দিরেরই সংলগ্ন গোপুরমের দেয়ালে 'নাট্যশাস্ত্রে' বর্ণিত একশত আটটি করণের চিত্ররূপ খোদিত আছে। ফলে চিদাম্বরমের মন্দির নৃত্যশিল্পীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতে যে সকল নৃত্যরীতি বিকাশলাভ করেছে তাদের ভিত্তি হল ভরত কর্তৃক 'নাট্যশাস্ত্রে' স্থাপিত কয়েকটি মৌলিক নীতি। তাতে নৃত্যকে তিনটি রূপে কল্পিত করা হয়েছে: নৃত্ত, নৃত্য এবং অভিনয়। ভরত মুনি তিনটি রূপেরই উল্লেখ করেছেন। তবে তার সবিস্তার ব্যাখ্যা পাই নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণে'। নৃত্ত বলতে বুঝি শুদ্ধ বিমূর্ত নৃত্য, অর্থাৎ তা দেহভঙ্গিসর্বস্ব এবং তার সঙ্গে ভাবের কোনো সংযোগ নেই। 'ভাবাভিনয় হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে।' আর নৃত্যে পাই মনের ভাবের প্রকাশ। তা বিমূর্ত নয়, তা মানসিক অনুভূতিকে প্রকাশ করে। আর অভিনয় কাহিনী বলে। সেখানে একটি সমগ্র নাট্যকে নৃত্যে রূপ দেওয়া হয়। ভরত নাট্যম্ নৃত্য ও কথক নৃত্য প্রধানত নৃত্ত শ্রেণীর, মণিপুরী নৃত্য, নৃত্য শ্রেণীর এবং কথাকলি নৃত্য অভিনয় শ্রেণীর।

এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি হল ভরতমুনির ভাব রস তত্ত্ব। তিনি বলেন, শিল্পের দুটি দিক আছে: একটি অন্তরের দিক, অন্যটি বাহিরের দিক; একটি প্রেরণা অপরটি তার বহিঃপ্রকাশ। অন্তরের প্রেরণাকে ভাব বলা হয়েছে এবং তার বাহিরের প্রকাশকে রস বলা হয়েছে। সুতরাং ভাবের বিশেষ সম্পর্ক শিল্পীর মনের সহিত। তা শিল্পীর মনে ভাব জাগ্রত করে বলে তা ভাব। 'ভাবয়তি ইতি ভাবঃ'। আর রসের সম্পর্ক শিল্পী ও শিল্পরসিক, উভয়ের সঙ্গে। এখানে শিল্পীর ভূমিকা সক্রিয়; কারণ তিনি ভাবের প্রকাশ দেন। আর রসিকের বা দর্শকের ভূমিকা সক্রিয়; কারণ সেই প্রকাশ দেখে তিনি রসিক হন; অর্থাৎ তাঁর মনে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি বা আনন্দ সঞ্চারিত হয়। এই প্রকাশ দর্শককে রসিত করে বলেই তা রস। 'রসয়তি ইতি রসম'। কাজেই যে প্রকাশ ভাববর্জিত তা নৃত্ত এবং যে প্রকাশ ভাবের বাহন তা নৃত্য এবং অভিনয়।

ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব বলে ভাবকে রসে রূপান্তরিত করতে দুটি জিনিস ক্রিয়া করে: বিভাব ও অনুভাব। বিভাব হল তাই যা মনে ভাবের উদ্রেক করে। তাকে আলম্বন ও

উদ্দীপন এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যাকে অবলম্বন করে ভাব বিকাশলাভ করে তা আলম্বন বিভাব এবং যা তাকে বর্ধিত বা উদ্দীপিত করে, তা উদ্দীপন বিভাব। রতি ভাব উদ্রেক করতে চাই প্রেমাস্পদের রূপ, গুণ প্রভৃতি এবং তাকে বর্ধিত করতে প্রয়োজন মনোরম পরিবেশের। তারা যথাক্রমে আলম্বন এবং উদ্দীপক বিভাবের দৃষ্টান্ত।

বিভাবের সাহায্যে ভাব উদ্রেক হবার পরে আসে অনুভাবের ভূমিকা। যে সমস্ত ক্রিয়া সেই ভাবকে প্রকাশ করে রসে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে তারা সবই অনুভাব। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া, বাচনিক ক্রিয়া, দেহসজ্জা প্রভৃতি সবই তার মধ্যে এসে পড়ে। তাই অভিনয়ের সহায়ক এই ক্রিয়াগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।

আহার্য বা সজ্জা এবং সাত্ত্বিক বা স্বেদ, বেপথু প্রভৃতি শারীরিক প্রতিক্রিয়া গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মুখ্য ভূমিকা নেয় বাচিক এবং আঙ্গিক বিভাব। সাধারণত নাট্য অভিনয়ে বাচিক প্রয়োগ প্রধান এবং নৃত্য অভিনয়ে আঙ্গিক প্রয়োগ মুখ্য ভূমিকা নেয়। তাই নৃত্যে আঙ্গিক ক্রিয়ার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভরতের ব্যাখ্যায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ন্যূনতম দেহভঙ্গিকে করণ বলা হয়েছে। অনেকগুলি করণের সাহায্যে অঙ্গহার এবং অঙ্গহারের নানাভাবে বিন্যাসে পাই অভিনয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাহিনীর ন্যূনতম বিভাগ হল শব্দ বা পদ ; তাদের জড়িয়ে বাক্য এবং বহু বাক্যের বিন্যাসে কাহিনী। সুতরাং নৃত্যের ভাষায় করণ পদের সহিত তুলনীয়, অঙ্গহার বাক্যের সহিত তুলনীয় এবং অভিনয় কাহিনীর সহিত তুলনীয়।

ভারতীয় নৃত্যের আর এক বৈশিষ্ট্য হল হস্তমুদ্রার প্রয়োগ। অভিনয়ের বাচিক অঙ্গের অভাব পূরণের জন্যেই তার প্রয়োগ প্রচলিত হয়েছে। তার সাহায্যে নৃত্যশিল্পী হাত দিয়ে কথা বলতে পারেন। কথাকলি অভিনয় শ্রেণীর নৃত্য হওয়ায় তার মুদ্রার প্রয়োগ অত্যন্ত বেশি। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যনাট্যে নৃত্যের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কণ্ঠসঙ্গীতে পরিবেশিত হবার ব্যবস্থা থাকায় তাতে মুদ্রার অধিক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের বিশিষ্ট ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমার তাঁর নৃত্য-অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। বেশ মনে পড়ে একবার প্রতিমা দেবীর রবীন্দ্রভারতীতে আগমন উপলক্ষ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ তাঁকে নৃত্য-অভিনয় দেখিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। তাতে শ্রীমতী গায়ত্রীর নৃত্যপটুতা দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন কুশলী, শিল্পতত্ত্বেও তেমন তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি করণ ও অঙ্গহার প্রসঙ্গে গবেষণার জন্যে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেছেন এবং নৃত্যবিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত।

সুতরাং বয়সে নবীন হয়েও বাংলা ভাষায় ভারতের নৃত্যশিল্প সম্বন্ধে এমন একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন দেখে আশ্চর্য হই নি। একাধারে শিল্পী এবং তত্ত্ববিৎ হওয়ায়

তাঁর আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। উপরের প্রাথমিক আলোচনায় ভারতীয় নৃত্যের যে মৌলিক বিষয়গুলির উল্লেখ হয়েছে, সেগুলি সবই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এবং নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ' প্রামাণ্য গ্রন্থ হওয়ায় তাদের সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা আছে। ভারতীয় নৃত্যরীতিতে করণ এবং মুদ্রার ভূমিকা মুখ্য। তাই এগুলি এখানে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তত্ত্বের দিক হতে ভাব ও রস ভারতীয় নৃত্যরীতির ভিত্তি। তাই তারও পৃথক আলোচনা হয়েছে, তারপর চারটি প্রধান নৃত্যরীতির পরিচয় তো আছেই; অতিরিক্তভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত অভিনয় নৃত্যরীতির ও পরিচয় গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় নৃত্যরীতিগুলি সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে একত্রে স্থাপিত হয়েছে।

আমার ধারণা, গ্রন্থখানি নিজস্ব উৎকর্ষগুণে শিল্পরসিকদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করবে। যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁদের এই শিল্পটি আয়ত্ত করতে গ্রন্থটি সাহায্য করবে। অতিরিক্ত-ভাবে যিনি ভারতীয় নৃত্যরীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে চান তিনিও প্রথম পরিচয়ের জন্যে গ্রন্থটিতে একটি সামগ্রিক আলোচনা পাবেন। নবীন গ্রন্থকারের এই আয়াসসাধ্য প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তুতি প্রসঙ্গ

"Dance is the mother of all arts. Music and poetry exist in time ; paintig and architecture in space. But the dance lives at once in time and space. The creator and the thing created, the artist and the work are still one and the same thing, Rhythmical patterns of movement, the plastic sense of space, the vivid representation of a world seen and imagined–these things man creates in his own body in the dance before he uses substance and stone and word to give expression to his inner experience."

(Mr. Curt Sachs in his "World History of Dance.")

সকল শিল্পকলার জননী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা বিশ্ব-সংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। নৃত্যালোকে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে ; দেহ-ভঙ্গির বিচিত্র সঙ্গীতে ছন্দিত হয় সিন্ধুতরঙ্গের হিল্লোল ; গ্রীবা-বিভঙ্গে মূর্ত হয় লীলাবিলাস, গর্ব ও আত্মনিবেদন ; আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত হয় প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয় ; ললিতছন্দে শরীরী হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সচল সুষমব্যঞ্জনা। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত একটি অনন্য রূপভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধিত করে। এতগুলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে শরীরী করে তুলে দর্শক মনে আস্বাদ্য করার ক্ষমতা অন্য কোনো শিল্পধারায় বিরল। "ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়া" ঃ–অনন্তকাল ধরে নব নব তরঙ্গে বিশ্বব্যাপী এই ছন্দোলীলা অমৃতসঞ্চার করে মানবমনকে সংস্কৃত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের নৃত্যকলা সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী রচিত 'নৃত্য' ও আরো দু একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার অস্তিত্ব উপেক্ষা না করেও বলা যায় নৃত্যকলার পূর্ণাঙ্গ আলোচনারূপে 'ভারতের নৃত্যকলা' বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রয়াস।

নৃত্যকলার শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বাংলা ভাষায় নৃত্যকলা সম্পর্কে একটি গ্রন্থের অভাব আমাকে অহরহ পীড়িত করতে থাকে। এই বোধ থেকেই গত দশ বৎসর আগে এই গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিপর্বের সূচনা।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও পাঠকসমাজের ঔৎসুক্যের সীমার দিকে দৃষ্টি রেখে, ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক আলোচনার মাধ্যমে নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তররূপের একটি সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট করার প্রয়াস করেছি। অবশ্য এই গ্রন্থের অপূর্ণতা সম্পর্কেও আমি

সম্পূর্ণ সচেতন। নৃত্যছন্দ প্রকরণ ও বিভিন্ন আঙ্গিকের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রসঙ্গে আরো বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু একটিমাত্র গ্রন্থের মধ্যে ভারতের নৃত্যকলার একটি সামগ্রিক পরিচিতি দিতে চেয়েছি, সেজন্যে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়কে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদৃত হলে ভবিষ্যতে শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা সম্পর্কে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখি।

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে জাতির সংস্কার, আচার সমাজজীবন ও শিল্প-সংস্কৃতির পারস্পরিক সাহচর্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বর্তমান গ্রন্থে নৃত্যকলার বিকাশ ও বিস্তৃতি আলোচিত হয়েছে। অপার ও অনন্ত নৃত্যশাস্ত্রের সব তত্ত্বগুলি একটিমাত্র গ্রন্থের পরিসরে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে মূল তত্ত্বগুলি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মূল শ্লোক ও ব্যাখ্যাসহ আলোচিত হয়েছে। সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছি, অনভিজ্ঞতার জন্যে কিছু ত্রুটি থাকাও সম্ভব। লেখিকার প্রথম প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে পাঠকসমাজ ও সমালোচকগণ ত্রুটিগুলিকে ক্ষমার চক্ষে দেখবেন—এ ভরসা আমার আছে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা দেশের যে নবজাগৃতি কাল—সেই উনবিংশ শতকে যখন বিভিন্ন সামাজিক প্রগতি সূচিত হল ; নাট্যশালা ও নাটকের পথ উন্মুক্ত হল, তখনও নৃত্যকলা রইল অবহেলিত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রয়াসে শিক্ষিত সমাজে নৃত্যকলার স্বীকৃতি সূচিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এদেশে নৃত্যচর্চা গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে। ভারতের নৃত্যকলার ইতিহাসে ধর্মের প্রভাব ও রক্ষণশীলতা যতখানি দুর্মরতা দেখিয়েছে তা অন্য শিল্পধারায় বিরল। শিল্পী ও আচার্যেরা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন একথা সত্য ; কিন্তু ইতিহাসের ধারা, নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তররূপের বিশ্লেষণ বা এর নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নি। এজন্যে বিংশশতাব্দীর এই দশকেও বিদগ্ধ সমাজের একটি বৃহৎ অংশ সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রায় নৃত্যকলার পুরোযায়ী ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে দোলাচল চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেন। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে নৃত্যকে যুক্ত করে বুদ্ধিবৃত্তির ভাষার সাথে হৃদয়বৃত্তির ভাষাকেও সম্মানের বিশিষ্ট আসন দেওয়া হয়েছে। নৃত্যকলার বুদ্ধিগত চর্চার এই শুভসূচনায় আমার এই গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের পথ সুগম করুক, এবং নৃত্যশিল্পী ও বিদগ্ধসমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করুক—এই আমার ঐকান্তিক কামনা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি আচার্যদের যাঁদের কাছে আমি শিক্ষালাভ করেছি। প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই আমার শিল্পীজীবনের প্রেরণা ও প্রথম গুরু শ্রীঅসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর নিরলস প্রয়াস ও উৎসাহেই আমি শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর সংকলিত বহু তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। গুরু টি. কে. মরুথাপ্পা পিল্লাই, গুরু নদীয়া সিং, কৃষ্ণাণ নাম্বুদ্রি, কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন, কেলুচরণ মহাপাত্র, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী, এন. কে. শিবশঙ্করণ, এন. পাণ্ডারীনাথন প্রভৃতি আচার্যদের প্রণতি জানাই।

স্মরণ করি নৃত্যলোকের অনন্য প্রতিভা শ্রীউদয়শঙ্করকে। উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের শিল্পীরূপে তাঁর শিক্ষণ ও প্রয়োগপদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি। আমার শিল্পীজীবনের উৎকর্ষ ও অভিজ্ঞতার এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমি মনে করি।

এই গ্রন্থের প্রস্তুতি পরিকল্পনায় অনেকের সাহায্য পেয়েছি। প্রথমেই মনে পড়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নাম। তাঁর স্নেহ, আন্তরিকতা ও নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছি। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার পরিকল্পনায় আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত অসংখ্য তথ্য এই বইয়ে অসংকোচে ব্যবহার করেছি। আমার এই গ্রন্থের জন্যে মূল্যবান ছবির ব্লকও তিনি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের স্নেহেও আমি ধন্য। লোকসংস্কৃতি ও লোকনৃত্য সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা আমার আলোচনার পথ সুগম করেছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও আশীর্বাদ আমাকে উৎসাহিত করেছে। তিনি এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। বর্তমান উপাচার্য শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় করণ ও অঙ্গহার-এর চিত্রাবলী ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীকালীনাথ কাব্যতীর্থ ও ডঃ অমলেন্দু বাগচী বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশদানে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীপ্রহ্লাদ দাস, প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী লক্ষ্মীশঙ্কর, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীকেলুনায়ার, শ্রীমতী কনক বিশ্বাস, শ্রী কে. এম ভার্মা, শ্রীনীহারবিন্দু সেন, শ্রীনেপাল নাগ,—এঁদের শুভেচ্ছা ও প্রেরণার কথাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

কবি মনীন্দ্র রায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর উৎসাহ না পেলে এই গ্রন্থরচনায় হয়তো সাহসী হতাম না। তিনি 'অমৃত' পত্রিকায় নৃত্যকলা সম্পর্কে আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে লেখিকার আত্মবিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে "The Illustrated weekly of India" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী এ. এস. রমণ ও সাপ্তাহিক 'কালান্তর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মণিপুরে অবস্থানকালে গুরু আমুবি সং, গুরু আতম্বা সিং, গুরু বিপিন সিং ও শ্রীহরিচরণ সিং মণিপুরী নৃত্য সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁদেরও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীবিরজু মহারাজ, শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী এই গ্রন্থের জন্যে ছবি তুলে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রখ্যাত

আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথ অংকিত নৃত্যছন্দের ছবি এই গ্রন্থে ব্যবহার করার করার অনুমতি দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য ও শ্রীঅসীমকুমার ঘোষের শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার কথা স্মরণ করি।

ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, ডাঃ অরুণ সেন, ডাঃ গীতা সেন, শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস, শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর বসু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির সেন, দীপককুমার সান্যাল, দিলীপকুমার ঘোষ, সবিতা মুখোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ, সন্ধ্যা সেন, ভূদেব শংকর, রামেন্দু সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, নির্মলচন্দ্র মৈত্র, কণিষ্ক সেন--এদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা প্রীতিমুগ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

প্রণাম জানাই আমার মা শ্রীমতী স্বর্ণলতা চট্টোপাধ্যায় ও দিদি শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়কে। সাংসারিক জীবনে আমার দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করে তাঁরা আমার শিল্পচর্চার পথ সুগম করেছেন।

নৃত্যাচার্য শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন তাঁর "নবরস' –অভিনয়ের আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

প্রকাশক প্রসূন বসু বাংলা সাহিত্যে নৃত্যকলা সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করে শুধুমাত্র লেখিকার নয়, নৃত্যশিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিব্রতী পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত বিশেষ যত্নসহকারে এই গ্রন্থের বিভিন্ন রেখাচিত্র ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন। তাঁকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে স্মরণ করি শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। শিল্পকলা ও সমাজে শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেই আমার শিল্পীমানস জীবনবোধে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর প্রেরণা ও নিরলস সহায়তা না পেলে গ্রন্থরচনা আমার পক্ষে সম্ভবপর হত না। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি আমায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপির রচনাশৈলীর প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরবর্তী সংস্করণে বহু সংযোজনের অনুরোধ আসে। সেই অনুযায়ী চারটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। কয়েকটি অধ্যায় ও তাল প্রকরণ সংশোধিত হয়েছে। এখন বলা যেতে

পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা, প্রয়াগ, চণ্ডীগড় সব পাঠ্যসূচীই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

নৃত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে যে অসংখ্য চিঠিপত্র এসেছে, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই যে এই গ্রন্থের পরিসরে ঐ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। বর্তমান গ্রন্থ মূলত শিক্ষার্থীদের কথা ভেবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে, ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাস এই বিষয়েই একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছি। আশা রাখি সেই গ্রন্থে বিদগ্ধ শুভার্থীদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারব।

এই গ্রন্থ সহৃদয় পাঠক সমাজের ও শিক্ষার্থীদের প্রীতিলাভ করেছে সেজন্যে আমি আনন্দিত, আমি কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র



নটরাজ। অমরাপলী। মাদ্রাজ মিউজিয়াম। দ্বাদশ শতাব্দী।



উপরে ঃ দেবব্রত বিশ্বাস পরিকল্পিত রবীন্দ্র ভাবনা 'বিরহ মিলন' নৃত্যনাট্যে অসিত চট্টোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।

নিচে ঃ সূর্যমন্দির। কোনারক। ত্রয়োদশ শতাব্দী।







উপরে ঃ ভরতনাট্যম্‌-এর অনন্যা শিল্পী শ্রীমতী বালাসরস্বতী ।
নিচে ঃ শ্রীমতী রোশান ভাজিফদার ।



কথাকলি নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য ।



উপরে ঃ মণিপুরী নৃত্যে রাধা চরিত্রে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।
নিচে ঃ কৃষ্ণ চরিত্রে বিনোদিনী দেবী।



উপরে ঃ তামিলনাদের লোকনৃত্য কারগম ।

নিচে ঃ পাঞ্জাবের লোকনৃত্য ভাঙড়া ।

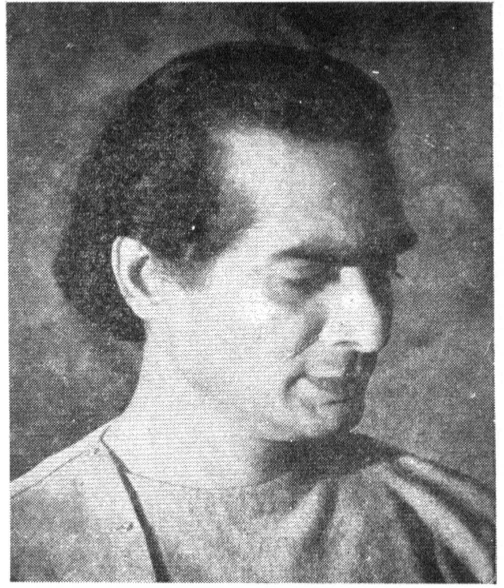


উপরে ঃ ওড়িষী নৃত্যে অনন্যা শ্রীমতী সংযুক্তা পানিগ্রাহী।
নিচে ঃ কুচিপুড়ি নৃত্যে শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি।






কথক নৃত্যে প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীবিরজু মহারাজ ।







উদয়শঙ্কর প্রযোজিত 'লেবার এণ্ড মেসিনারী (উপরে)
ও বিলাস-এর দৃশ্য (নিচে)।



শ্রীমতী সাধনা বসু

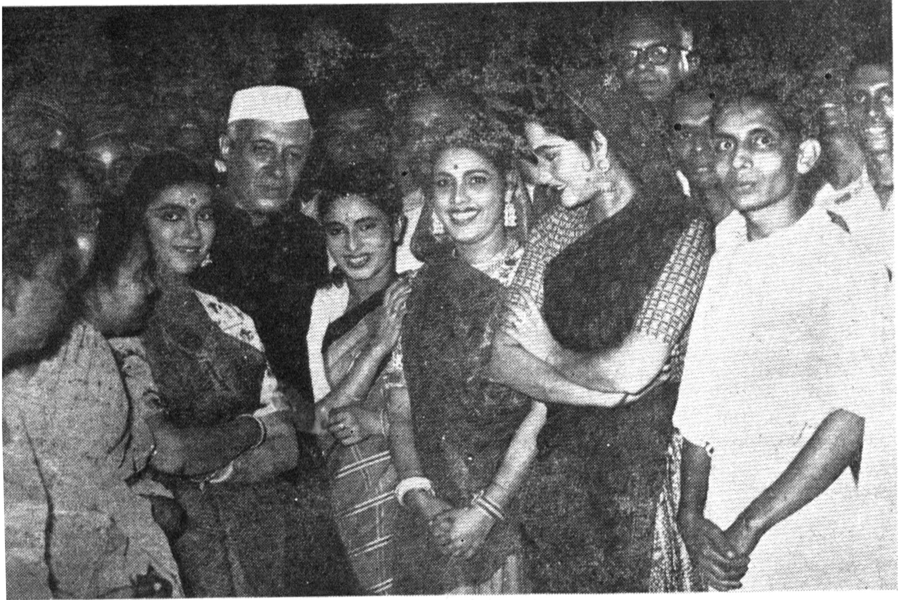






উপরে ঃ চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।
নিচে ঃ অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রতিমা দেবী।





উপরে ঃ ভিয়েতনামের বিপ্লবী নায়ক রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিন-এর সঙ্গে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

নিচে ঃ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সহ-শিল্পীবৃন্দ।



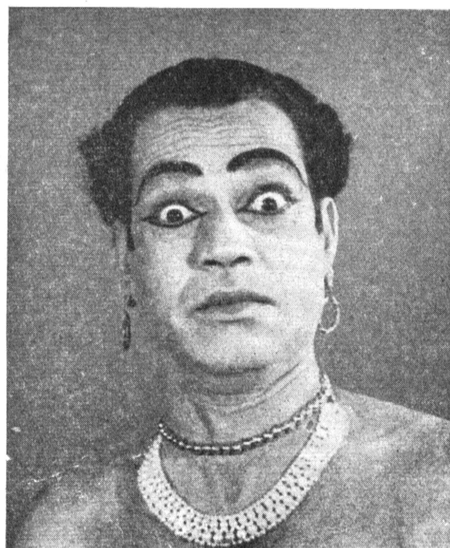
১। শৃঙ্গার



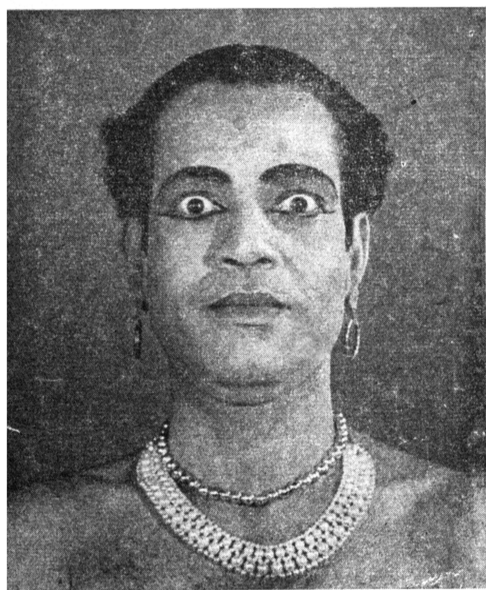
২। হাস্য



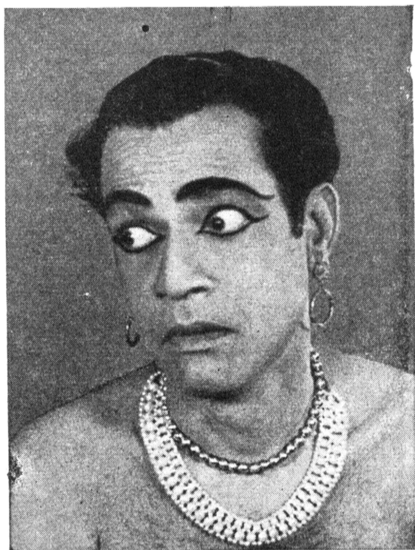
৩। করুণ



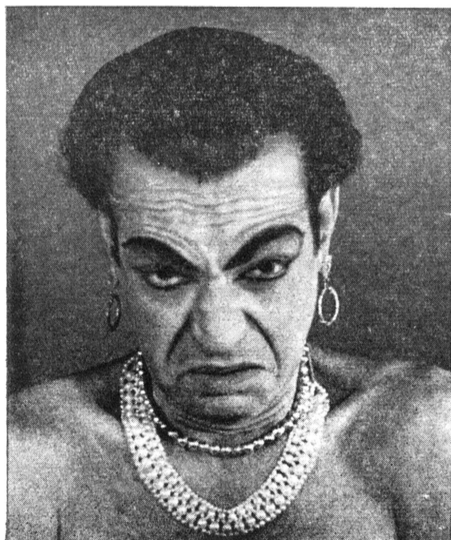
৪। রৌদ্র



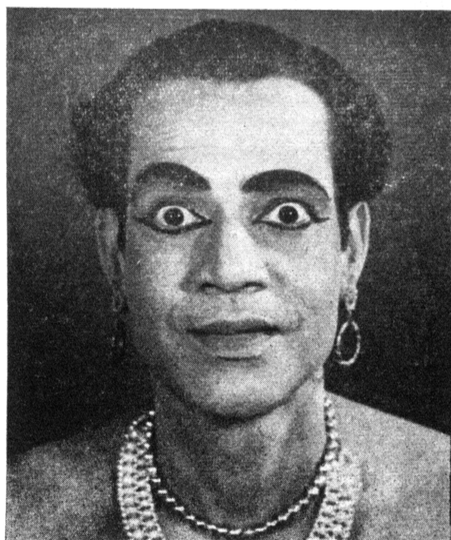
৫। বীর



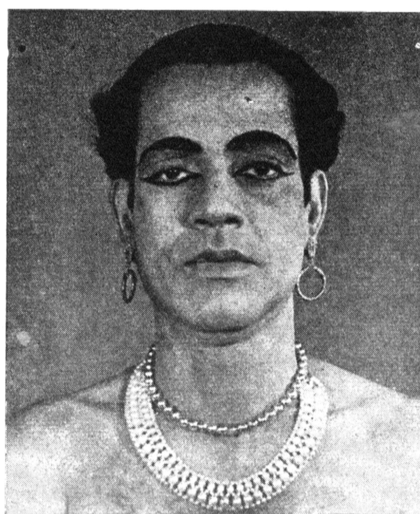
৬। ভয়ানক



৭। বীভৎস

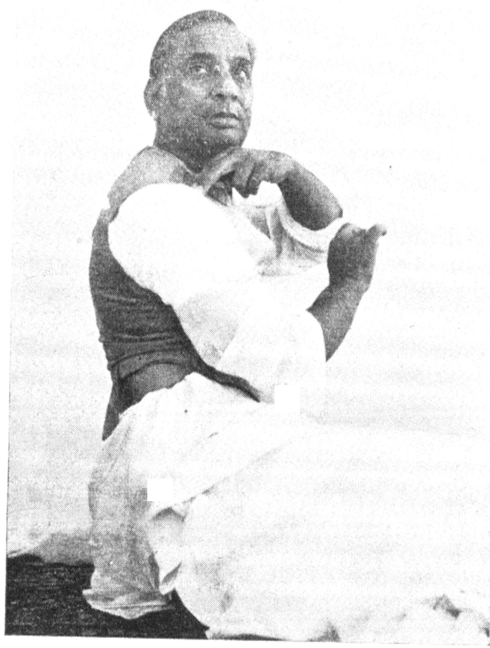


৮। অদ্ভুত



৯। শান্ত

নবরস-এর অভিনয়ে প্রখ্যাত শিল্পী ও নৃত্যাচার্য শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন।



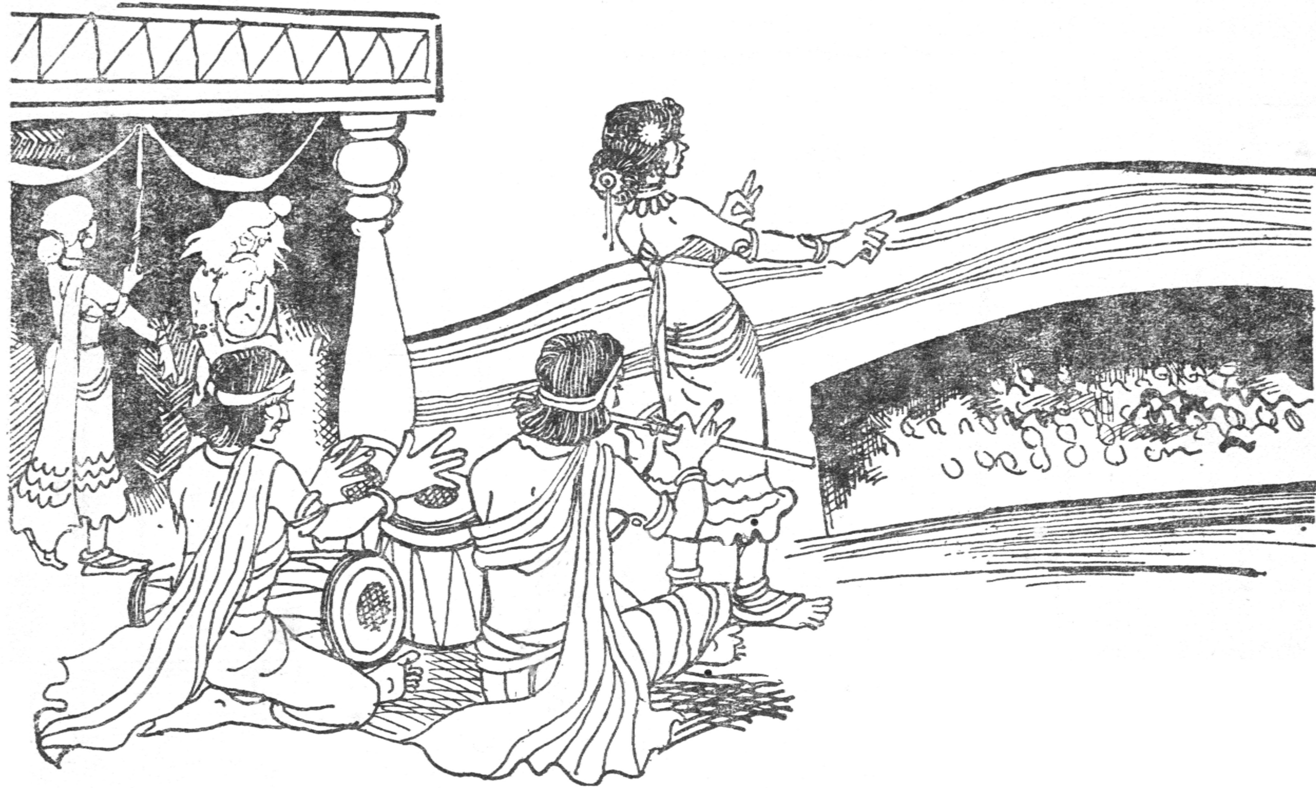
কথক নৃত্য শিক্ষাদানের একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রখ্যাত গুরু শম্ভু মহারাজ।



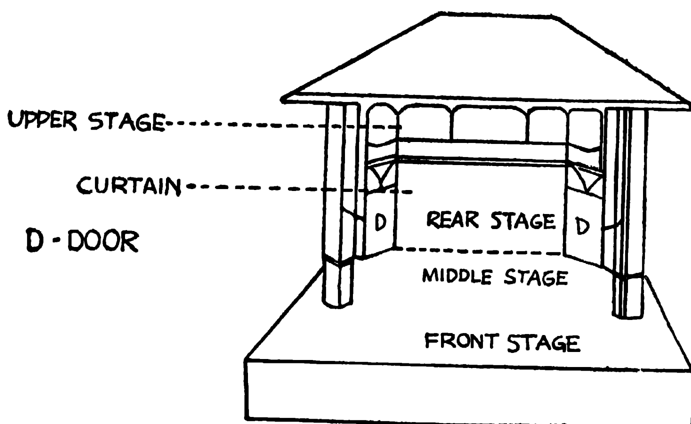
রবীন্দ্রনাথ অংকিত নৃত্যছন্দের এই ছবিটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত।



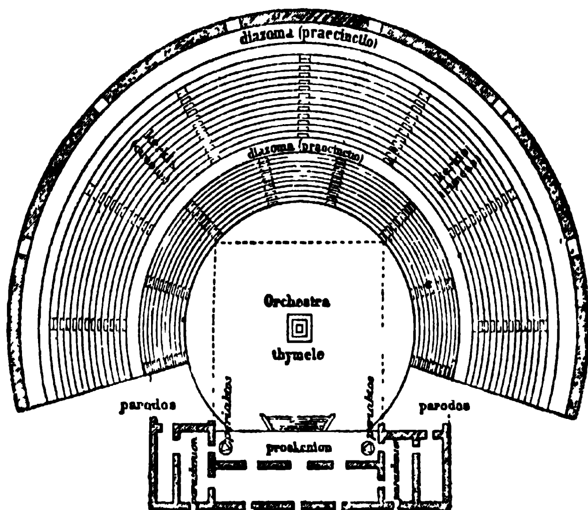
রবি চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের দৃশ্য।



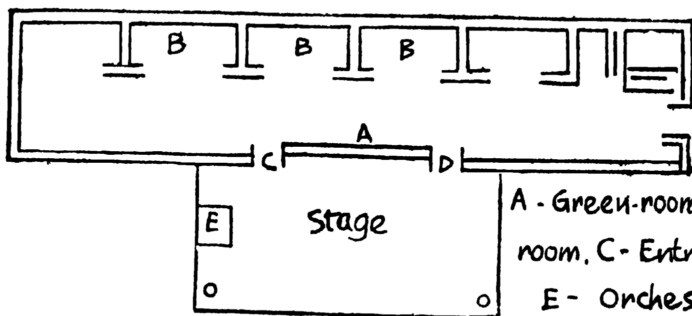
সীতাবেঙ্গা গুহামঞ্চ



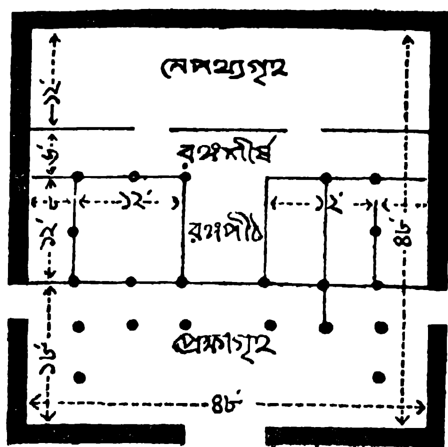
শেক্সপীরীয় রঙ্গমঞ্চ



গ্রীক রঙ্গমঞ্চ

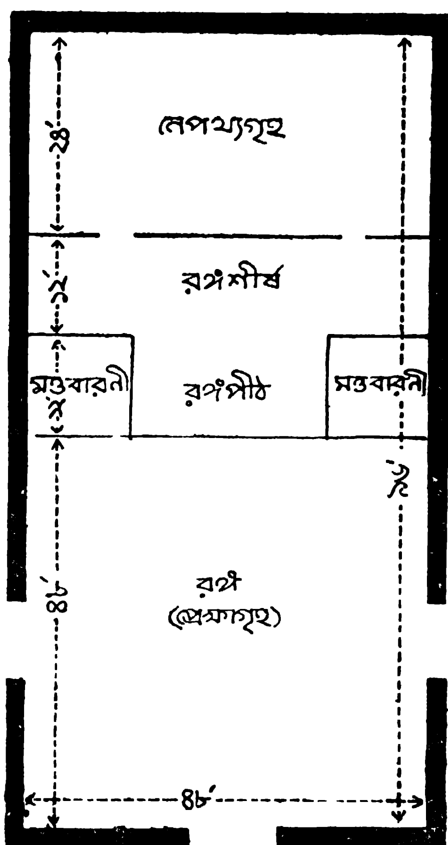


চৈনিক রঙ্গমঞ্চ



চতুরস্র

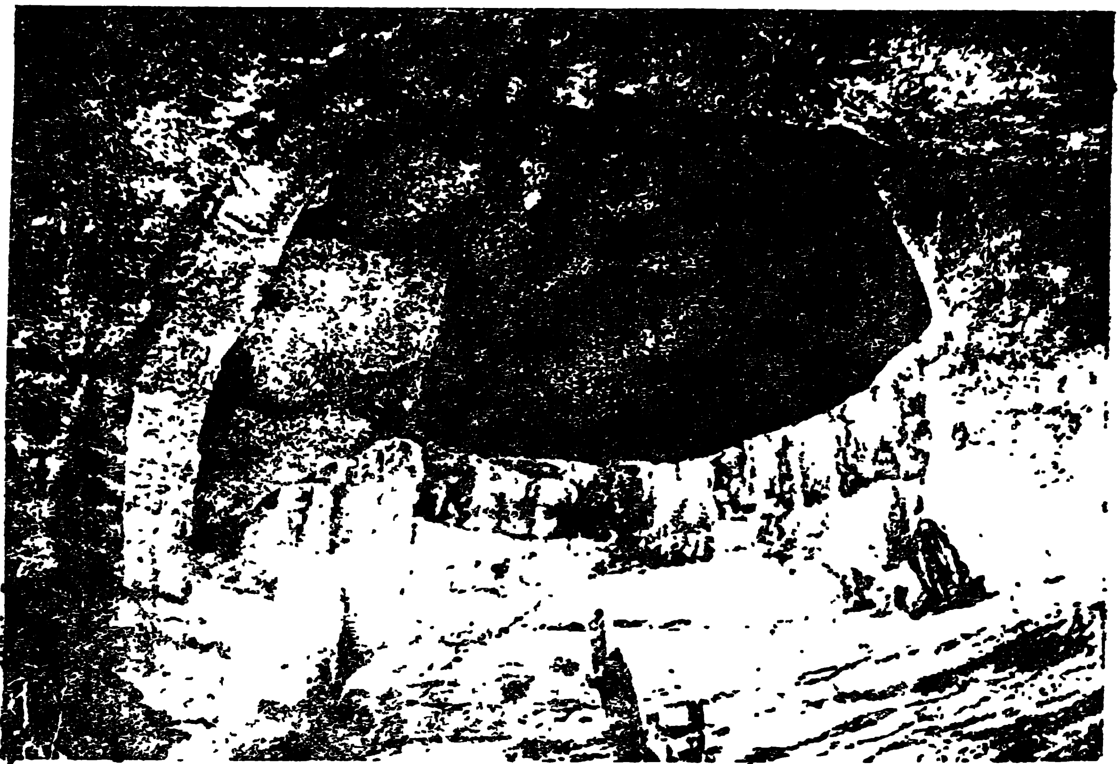
বিকৃষ্ট



ত্র্যস্র



ভরতের মতে নাট্যমণ্ডপ



রামগড়ের নাট্যশালা



১। তলপুষ্পপুট



২। বর্তিত



৩। বলিতোরু



৪। অপবিদ্ধ



৫। সমনখ



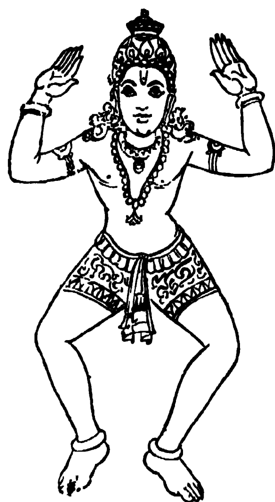
৬। লীন



৭। স্বস্তিকরেচিত



৮। মণ্ডলস্বস্তিক



৯। নিকুট্টক



১০। অর্ধ-নিকুট্টক



১১। কটিচ্ছিন্ন



১২। অর্ধরেচিত



১৩। বক্ষস্বস্তিক



১৪। উন্মত্ত



১৫। স্বস্তিক



১৬। পৃষ্ঠ স্বস্তিক



১৭। দিক্ স্বস্তিক



১৮। অলাত



১৯। কটিসম



২০। আক্ষিপ্তরেচিত



২১। বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক



২২। অধর্ধস্বস্তিক



২৩। অঞ্চিত



২৪। ভুজঙ্গত্রাসিত



২৫। ঊর্ধ্বজানু



২৬। নিকুঞ্চিত



২৭। মত্তল্লি



২৮। অর্ধ-মত্তল্লি



২৯। রেচক নিকুট্টিত



৩০। পাদাপবিদ্ধ



৩১। বলিত



৩২। ঘূর্ণিত



৩৩। ললিত



৩৪। দণ্ডপক্ষ



৩৫। ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত



৩৬। নূপুর



৩৭। বৈশাখরেচিত



৩৮। ভ্রমর



৩৯। চতুর



৪০। ভুজঙ্গাঞ্চিত



৪১। দণ্ডকরেচিত



৪২। বৃশ্চিককুট্টিত



৪৩। কটিভ্রান্ত



৪৪। লতাবৃশ্চিক



৪৫। ছিন্ন



৪৬। বৃশ্চিকরেচিত


৪৭। বৃশ্চিক


৪৮। ব্যংসিত


৪৯। পার্শ্বনিকুট্টিত


৫০। ললাটতিলক


৫১। ক্রান্ত



৫২। কুঞ্চিত



৫৩। চক্রমণ্ডল



৫৪। উরোমণ্ডল



৫৫। আক্ষিপ্ত



৫৬। তলবিলসিত



৫৭। অর্গল



৫৮। বিক্ষিপ্ত



৫৯। আবৃত্ত



৬০। ডোলাপাদ



৬১। বিবৃত্ত



৬২। বিনিবৃত্ত



৬৩। পার্শ্বক্রান্ত



৬৪। নিকুঞ্চিত



৬৫। বিদ্যুদ্ভ্রান্ত



৬৬। অতিক্রান্ত



৬৭। বিবর্তিত



৬৮। গজক্রীড়িতক



৬৯। তলসংস্ফোটিত



৭০। গরুড়প্লুতক



৭১ গণ্ডসূচী



৭২। পরিবৃত্ত



৭৩। পার্শ্বজানু



৭৪। গৃধ্রাবলীনক



৭৫। সন্নত



৭৬। সূচী



৭৭। অর্ধসূচী



৭৮। সূচীবিদ্ধ



৭৯। অপক্রান্তা



৮০। ময়ূরললিত



৮১। সর্পিত



৮২। দণ্ডপাদ



৮৩। হরিণপ্লুতক



৮৪। প্রেংখলিত



৮৫। নিতম্ব



৮৬। স্খলিত



৮৭। করিহস্ত



৮৮। প্রসর্পিত



৮৯। সিংহ-বিক্রীড়িত



৯০। সিংহাকর্ষিত



৯১। উদ্‌বৃত্ত



৯২। উপসৃত



৯৩। তলসংঘট্টিত



৯৪। জনিত



৯৫। অবহিত্থক



৯৬। নিবেশ



৯৭। এড়কাক্রীড়িত



৯৮। উরূদ্‌বৃত্ত



৯৯। মদস্খলিতক



১০০। বিষ্ণুক্রান্ত



১০১। সম্ভ্রান্ত



১০২। বিষ্কম্ভ



১০৩। উদ্‌ঘট্টিত



১০৪। বৃষভক্রীড়িত



১০৫। লোলিত



১০৬। নাগাপসর্পিত



১০৭। শকটাস্য



১০৮। গঙ্গাবতরণ

* একশত আটটি করণ-এর চিত্রাবলী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত

ইতিহাসের ছন্দ ও নৃত্যধারা

ভারতের নৃত্যকলা বিশ্বসংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা, উৎকর্ষে, রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবরসের ঐশ্বর্যে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শনের স্বভাবসুন্দর পরম অভিব্যক্তি।

সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল এবং যুগে যুগে তার রূপান্তর ঘটে। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের যেমন ইতিহাস আছে, তেমনই সংস্কৃতি ও দর্শনেরও ইতিহাস আছে। নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তর-রূপও বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন স্তরে, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়েছে। যেহেতু মানব-সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির শুধুমাত্র অনুবর্তন নয়, রূপান্তরও বটে, সেজন্য ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে, নৃত্যকলার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। আদিমকাল থেকে প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, ক্লাসিকাল, মধ্য ও বর্তমান—ইতিহাসের এই সব স্তর মানব-প্রগতির অভিযাত্রায় ঐতিহাসিক কারণেই প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রত্যেকটি স্তরের ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে সতর্ক ভাবে, কারণ এই সকল স্তরেই শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার চলমান অভিযাত্রায় নৃত্যকলার রূপান্তর ঘটেছে। জাতির ইতিহাস তার সংস্কার, আচার, সমাজ-জীবন ও শিল্প সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। তাই এই সবগুলিরই পারস্পরিক সাহচর্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই নৃত্যকলার ইতিহাস বিচার করতে হবে। সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রায় বিভিন্ন ক্রান্তিকালে সংঘাতগুলিকে লক্ষ্য কবতে হবে যা সংস্কৃতিকে এগিয়ে দিয়েছে; তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সে আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

সংস্কৃতিকে যদি সভ্যতার নির্যাসরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে এই সংস্কৃতির চতুরঙ্গ হচ্ছে সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলা-নৃত্যকলা। এর মধ্যে আবার প্রাচীনতম ধারা নৃত্য। বিশ্বপ্রকৃতির চাঞ্চল্যে যে সৌন্দর্য-নৃত্য—তারই অনুকরণে পশুপক্ষী ও মানুষের দেহে এল নৃত্য; তাই ভাষা, সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠার আগেই নৃত্য হল মানুষের আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম বাহন। মানুষের সেই প্রকৃতির অনুকরণের নৃত্যের ছন্দোবদ্ধ মূর্তি চিত্রকর ও ভাস্করের মনে আনল সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা—পরে ভাষার আবিষ্কারে ঝংকৃত হল কবির নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা—এল কাব্য। সভ্যতা হল উজ্জ্বল। কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ "যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তা মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণমূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।"

সংস্কৃতি স্থাবর নয়, গতিশীলতা তার ধর্ম। সংস্কৃতির ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ করা ও বর্জন করা, আর এই গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়েই তার অভিযাত্রা। সংস্কৃতির

রূপান্তর ও পরিবর্তনে ইতিহাসের ভূমিকা যেমন প্রধান, তেমনি ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশও মানুষের সংস্কৃতি রচনায় অন্যতম সহযোগী। মানুষের আসল পরিচয়ই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, পুরাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম এবং সামাজিক আচার-আচরণ সবই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই সংস্কৃতির উৎস ও মূল প্রেরণা, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ও তাকে আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে।

জগদ্‌বিবর্তনের কোন পর্যায়ে নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে, এই প্রসঙ্গে আলোচনায় কোনোরকম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে একটা কথা বলা যায় যে শিল্পের জন্ম সম্ভব একমাত্র জৈব পর্যায়েই। মনুষ্যেতর প্রাণী, যাদের অনেকটা মানুষের মতো দেখতে যেমন গরিলা, শিম্পাঞ্জি বা অন্যান্য বানর-গোষ্ঠীর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীতের অস্ফুট আভাস পাওয়া যায়,—একথা স্বীকার করলেও তাকে যথার্থ শিল্পের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এককথায় যেহেতু শিল্প মানুষের সজ্ঞান মনের সৃষ্টি, সেহেতু মানুষের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের উৎপত্তির ইতিহাস যুক্ত।

মোটামুটি ভাবে আদিম মানুষের সমাজ-জীবন, যা ছিল গোষ্ঠী-জীবন সেখানে জীবিকা সংগ্রহের লড়াইকে কেন্দ্র করেই তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—(১) আহরণ ও শিকার যুগ (২) পশুপালন যুগ (৩) কৃষি যুগ (৪) শিল্প যুগ। এই সব বিভাগের আবার বিভিন্ন উপবিভাগ আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই বিভাগের কোন পর্বে নৃত্যের প্রেরণা এসেছে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ Ruth Bunzel লিখেছেন: "Among all existing groups, there is none however rude in culture, that dose not have some characteristic form of art. The Andamanese who have been described as not knowing the art of kindling fire, decorate their bodies with elaborate painted designs and wear ornamental head bands, girdles, necklaces, bracelets on their otherwise naked bodies. All people tell tales presumably for the pleasure of telling them, all people sing songs and dance and all people have more or less elaborate patterns of behaviour for public performance." এ থেকে দেখা যাচ্ছে অভিজ্ঞতা ও আবেগকে ব্যক্ত করার প্রবৃত্তি থেকেই নৃত্য-গীত এল প্রাথমিক পর্যায়েই। নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন যে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি অন্য শিল্পের জন্য বাসভূমি এবং যে আয়াস-আয়োজন দরকার হয়, নৃত্য-গীতের জন্য তা আবশ্যক নয়। সেজন্য নৃত্য-গীতই পূর্ববর্তী শিল্প। ফ্রাংক বোয়াস্ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"Stone work, stone architecture and heavy wood work presuppose stability of residence...such restrictions are not present in the art of literature, music and dance, for the hunter watching for the game, or lesiurely attending to his traps, may give free rein to his imagination without interfering with his watchful waiting. Out of the day-dreams of the hunter and of the woman attending to her housework stories, songs and dances may be spun."

এ থেকে আমরা মনে করতে পারি যে আহরণ ও শিকার-যুগের প্রথম দিকেই নৃত্য-গীতের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রম ও জীবন সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবেই সূচনা হয়েছিল নৃত্য-গীতের একটি ধারার যা হচ্ছে "Colletive acts of ritual, fantastic, rhythmical, magical." ক্রিস্টোফার কডওয়েল বলেছেন : "Poetry, combined with dance, ritual and music becomes the great switchboard of the instinctive energy of the tribe, directing it into trains of collective actions...." এখন এই নৃত্যছন্দ বা গীতিবন্ধ কাব্যছন্দ এসেছে জীবনছন্দ থেকেই।

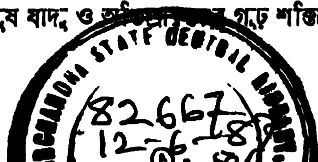
এই জীবনছন্দ শ্রমসম্পৃক্ত। মানুষ যখন চতুষ্পদ থেকে দ্বিপদ হল অর্থাৎ বানর গোষ্ঠীর সঙ্গে তার প্রভেদ সূচিত হল, তখন সে এক সমস্যার সম্মুখীন হল। তা হল দেহের ভার সামলিয়ে চলা। শিশু যখন প্রথম দু হাত দু পায়ের সাহায্যে হামাগুড়ি দেওয়ার স্তর থেকে দাঁড়াতে বা টলমল অবস্থায় অল্প চলতে আরম্ভ করে,—তখন থেকেই তার মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির ক্রিয়া বাড়তে থাকে। এই চলারও একটা ছন্দ আসতে থাকে, সেই ছন্দপতন হলে শিশুও পড়ে যায়। কারণ এই ছন্দ হৃদস্পন্দনযুক্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'Human rhythm originated from the use of tools." অর্থাৎ দুটি হাতের অধিকারী হবার সঙ্গেই এল হাতিয়ার প্রয়োগ প্রয়াস এবং ছন্দ। জর্জ টমসন বলেছেন : "Rhythm may be defined in its broadest sense as a series of sound arranged in regular sequence of pitch and time. Its ultimate origin is no doubt physiological—perhaps connected with the heart beat." এবং এই যে ছন্দের সৃষ্টি হল যা দু পায়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ ঘটাল তা থেকেই এল নৃত্য-গীত-কাব্য। এই ছন্দই উৎস। জর্জ টমসন বলেছেন : "The analytical principles of modern musicology belong to the study of rhythm as such to the common foundation of poetry, music and dancing." এর মধ্যে নৃত্যই আসে প্রথম। এ প্রসঙ্গে জর্জ টমসন বলেছেন : "The three arts of dancing, music and poetry began as one. The source was the rhythmical movement of human bodies engaged in collective labour. This movement had two components, corporal and oral. The first was the germ of dancing, the second of language." এই পথ ধরেই এল সকল শিল্পের জননী নৃত্যকলা। দেহের ভার সামলিয়ে সুষম চলার ছন্দ নিয়ে এল নৃত্যছন্দ।

মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন গড়ে উঠেছে। মানুষ তার প্রাথমিক শক্তি পেয়েছে প্রকৃতির কাছে, আবার সেই ক্ষমতাকে সে প্রয়োগ করেছে প্রকৃতিকে জয় করার জন্যে। পরিবর্তিত হয়েছে শুধু বহিঃপ্রকৃতিই নয় অন্তঃপ্রকৃতিও। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই শ্রমের বন্ধনের মধ্যেই মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলসূত্র খুঁজে পাওয় যায়। আদিমযুগের মানুষের সংস্কৃতি ও নৃত্যকলার মূল্যায়ন করতে গেলে, প্রথমেই সে-যুগের মানুষের চেতনা, জীবনযাত্রার উপকরণ ও সামাজিক রূপকে বুঝতে হবে। আদিম মানুষ বাঁচত তার সমগ্র সত্তায়। তার কাছে যখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য শ্রম ও সুকুমার কলার কোনো প্রভেদ ছিল

না। আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপই ছিল নৃত্য। নৃত্য ছিল তাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আদিম নৃত্য রচিত হয়েছে জীবিকা প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবে এবং এর ফলে তাদের জীবিকা প্রয়াসও সবল ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই ভাবে জীবিকার জন্য বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি একই খাতে পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক হিসাবে প্রেরণা দিয়েছে। তখন এই আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপ হিসাবে নৃত্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, বলিষ্ঠ ও উৎপ্লাবনপূর্ণ। প্রাণিজগৎ থেকে এর ভঙ্গী অনুসরণ করা হত। অপদেবতাকে তুষ্ট করতে, মড়ক নিবারণে, বৃষ্টি আবাহনে, রোগ নিরাময়ে, শিকারে যাবার উম্মাদনা জাগাতে, নৃত্য ছিল আদিম মানুষের গোষ্ঠীজীবনের প্রধান উপকরণ। ভারত সরকার প্রকাশিত 'The Dance in India' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "For them Dance is more than an expression of physical or emotinal exuberance, something more than a form of entertainment. They dance their religion. On the accurate and proper performance of the dance depend their success, in chase and victory in war, firitility in woman and yield from the land, pacification of the elements and elimination of pestilence, protection from evil and fruition of love. Dance is the creator, preserver, steward and guardian."

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আদিম মানুষের নৃত্য, গীত ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। একই ধাঁচের বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার ও রীতিনীতির প্রচলন ছিল। তার কারণ এই যে প্রত্যেক দেশের মানব-সমাজই আদিম কালে সভ্যতা বিকাশের একই স্তরগুলির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এমন কি এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব জনসমষ্টি অনুন্নত স্তরে পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যেও আদিম মনের এই ধারা লক্ষ্য করা যায়।

আদিম যুগে মানুষের জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে যাদু (magic) ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের প্রাধান্য ছিল। তারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করত এবং মৃত্যুর পরে সেই আত্মা অপদেবতারূপে গাছে, পাহাড়ে বা অন্য জীবজন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এই ধারণা প্রবল ছিল। প্রাচীনকালের মানুষ অজ্ঞতা, ভয় ও বিস্ময় থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতা, অপদেবতা মনে করত। এবং তাদের তুষ্ট করার জন্যই এইসব প্রাচীন কৌশল যাদু ও মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত। জীবন-ধারণের প্রয়োজনে নিজের চাহিদা অনুযায়ী মানুষ নাচে-গানে, নানা অনুকৃতিমূলক মাধ্যম গ্রহণ করে অভীষ্ট ফল লাভ করতে চাইত। এই অনুকৃতিমূলক প্রক্রিয়া ও যাদুর নিয়ম, নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়েই, সেযুগের মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা আসত ও তারা জীবনযুদ্ধে অধিকতর কুশলী ও বিচক্ষণ হয়ে উঠত। এই যাদুকে আশ্রয় করেই জীবনচর্চার অন্যতম অঙ্গরূপে নৃত্যকলা গড়ে ওঠে। অতিপ্রাকৃত শক্তি, অপদেবতা তাড়ানো, অসুখ সারানো প্রভৃতির জন্য নৃত্যগীতের মাধ্যমে আদিম মানুষ তাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করত। নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীতে, ভয়ে, ভক্তিতে আদিম মানুষ যাদু ও অ[illegible] গূঢ় শক্তিকে বন্দনা করেছে।



এই প্রসঙ্গে জর্জ টমসন বলেছেন : "A magical act is one in which savages strive to impose their will on their environment by mimicking the nutural process that they desire to bring about. If they want rain, they perform a dance in which they imitate the gathering clouds, the clap of thunder, the falling shower." একথা অনস্বীকার্য যে আজকের উন্নত সংস্কৃতির বিকাশের মূল উৎস হচ্ছে ঐ প্রাচীন অসংস্কৃত নৃত্য-পদ্ধতি। সেই সময়েই তার মধ্যে শিল্পবোধের লক্ষণ সুপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে সিনাইডার বলেছেন : "Nevertheless, even in the oldest cultures we find the preconditions of art; the mastery and more or less conscious shaping of the medium of expression. Where the singer, who is at the same time dancing, tries to achieve a certain regularity of his movements, his singing takes on regular musical forms."

আদিম যুগের নৃত্যকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : সামাজিক ও ভৌতিক বা ধর্মমূলক। সামাজিক নৃত্যের মধ্যে জন্ম, বিবাহ-উৎসব, যুদ্ধ, সংস্কার ও অনুষ্ঠানের নৃত্য এবং ভৌতিক বা অন্যান্য ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবতা, অপদেবতা পূজা, সম্মোহন, শিকার, শস্য উৎপাদন, বৃষ্টি আমন্ত্রণ, রোগ নিরাময়, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, মৃত আত্মার আবাহন প্রভৃতি প্রধান। চামড়ার বাজনার সঙ্গে করতালি দিয়ে, মাথা ও অঙ্গ চালনা করে তারা নাচত। ভাব-ভঙ্গীতে বন্য পশুদের অনুকরণ করা হত। সে যুগের অনুন্নত আদিম নৃত্য প্রসঙ্গে হাম্বলি বলেছেন : "Dances were also performed for sex-attraction, selection of bride or bridegroom, along with songs, which were mostly sung gutturally at first, and then in much higher key. Their dances were mostly in imitation of the movements of the wild animals, and songs were reproduced in imitation of the notes of the birds and animals." বর্তমানেও বিন্ধ্য হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ ও অন্যান্য আদিবাসী ও উপজাতিদের নৃত্য-গীতের মধ্যে এই আদিম অনুন্নত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতির অন্ধ অঙ্গ। তার নিম্নতম স্তর পশু অবস্থা সে অতিক্রম করল সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে। সভ্যতার অগ্রগতির সূচনা হল সেদিন, যেদিন মানুষ হাতিয়ার তৈরি করতে শিখল—এল তার শিকার-জীবন। তখন মানুষের শিল্পকলার বস্তু ছিল শিকার। এরপর এল কৃষি ও পশুপালন পদ্ধতি এবং তার পর থেকে উন্নততর সভ্যতার জয়যাত্রা। আদিমকালের নৃত্যই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতি সম্পদে সমৃদ্ধ হল।

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারে, হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ভারতের সুপ্রাচীন কালের সংস্কৃতির লুপ্ত অধ্যায় আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। কিছু বিতর্ক থাকলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাল সম্পর্কে অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার থেকে খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের মধ্যে ঐ সময় নির্দিষ্ট করা যায়। ভৌগোলিক সীমার

দিক থেকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই সমগ্র অঞ্চলকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বালুচিস্তানের ঊষর পার্বত্য প্রদেশ ও অপর ভাগে সিন্ধুনদ বিধৌত পাঞ্জাব-সিন্ধুর সমতল ভূমি। হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে তৎকালীন ভারতের সমৃদ্ধ নগর-জীবন ও পৌর-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার অলংকৃত পাত্র, শীলমোহর, বিভিন্ন মূর্তি, পোড়া ইটের ঘরবাড়ি, কূপ, স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তখনকার উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন পৌর-জীবন-যাত্রার নিদর্শন। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কোন বিশেষ জাতির সৃষ্টি নয়; বিভিন্ন জাতির অবদানে সমৃদ্ধ। সিন্ধু সভ্যতাই ভারত-সংস্কৃতির প্রাচীনতম রূপ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন অঙ্কিত পাত্রে ও চিত্রিত অনুষ্ঠানে হিন্দু দেবদেবী ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উৎস পাওয়া যায়।

হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর ভগ্নাবশেষ থেকে সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নানা উপকরণ পাওয়া গিয়েছে। এগুলি থেকে তৎকালীন সমাজের নৃত্যের রূপ পাওয়া যায়। কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে ড. লক্ষ্মণস্বরূপ বলেছেন: "One seal has presented a dancing scene. One man is beating a drum and others are dancing to the tune. On one seal from Harappa, a man is playing on a drum before a tiger. On another a woman is dancing. In one case, a male figure has a drum hung round his neck."

এই উপকরণগুলি থেকে তৎকালীন সময়ে গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্যের অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'A short sketch of Indian dance' প্রবন্ধে বলেছেন: "In the pre-historic cities a bronze dancing girl was excavated by Roy Bahadur Dayaram Sahàni, and its exhumation has proved that culture of dancing was prevalent even in that remote past, in all its artistic display and grace. Some ingredients of music like crude type of lute (Veena), pipe (Venu), and drum (Mridanga) were also excavated, that speaks of culturre of music in that pre-historic time." এই নারী-মূর্তির সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাস বালুচিস্তানের অধিবাসীদের অনুরূপ। আবিষ্কৃত আর একটি প্রস্তর মূর্তিতে, শিব-নটরাজ মূর্তির সাদৃশ্য প্রথম দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: 'There are two remarkable statuettes found at Harppa,…and the other of dark gray slate, the figure of a male dancer, standing on his right leg, with the left leg raised high, the ancestor of Siva-Nataraja."

সিন্ধু উপত্যকার এই সব আবিষ্কার নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নৃত্যকলার প্রসারের কথা প্রমাণ করে এবং এই সব উপাদানের মধ্যেই পরবর্তীকালের রূপসমৃদ্ধির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পরিতাপের বিষয় এই যে, নৃত্যের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান এখনও দেশের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ-কেন্দ্রে ও লুপ্তপ্রায় পুঁথিপত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, যা নিয়ে প্রকৃত গবেষণা এখনও আরম্ভ হয় নি।

মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় যে উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রাচীন

ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় রূপের নিদর্শন। সিন্ধু-সভ্যতায় আর্যদের অবদান ছিল কি-না তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বৈদিক যুগের নৃত্যকলা নিঃসন্দেহে সিন্ধু-সভ্যতার ধারাতেই সমৃদ্ধতর হয়েছে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনে এবং আর্য ও আর্যপূর্ব সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগেই নৃত্যকলা মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়েছে। মোটামুটি ভাবে খৃষ্টপূর্ব তিনহাজার থেকে খৃষ্টপূর্ব ছয়শত বছর পর্যন্ত সময়কেই বৈদিক যুগের কাল হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।।

বৈদিক যুগে দর্শন ও ধর্মের অনুশীলনের প্রাধান্য দেখে অনেকে মনে করেন, সে যুগে নৃত্য, প্রভৃতি শিল্পকলার বিশেষ সমাদর ছিল না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নৃত্য, গীত, বাদ্য আর্যরা অনার্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং তার অনুশীলনও করেছেন। শুষ্ক অধ্যাত্মবাদ প্রচারই বৈদিক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, শিল্পকলা ও জীবন-দর্শন সম্পর্কেও সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করে নি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্বোধিত করেছিল—স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে চিত্রে সঙ্গীতে সাহিত্যে। তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে, দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে, নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানব চিত্তবৃত্তিকে নানা দিকে খর্ব করে; এ সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বুদ্ধের বাণী নয়। এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।" বৈদিক সংস্কৃতিতে আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক প্রয়োগ অনুযায়ী নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয়। ঋক্ সংহিতায় "পপৃক্ষেণ্যমিন্দ্রত্বে-হ্যোজোনৃম্নানিচনৃতমানো অমর্তঃ" প্রভৃতি বিভিন্ন শ্লোকে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন সূত্র ও ভাষ্য থেকে সামগানেও নৃত্যের অংশের কথা জানা যায়। অথর্ববেদে "কো বাণম্ কো নৃত্যো দধৌ" এই উদ্ধৃতি বীণা সহযোগে নৃত্যের কথা প্রমাণ করে। সামসংহিতা, শুক্লযজুর্বেদ, কৃষ্ণযজুর্বেদ প্রভৃতিতেও নৃত্য-গীত-বাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদ ভাষ্যে আচার্য সায়ন গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা উল্লেখ করেছেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নিবিড় সম্পর্ক। সংস্কৃতির বিকাশ ও ক্রমোন্নতির অভিযাত্রায় বৈদিক যুগকে শিল্প, সৌন্দর্য ও দর্শনের সুমহান যুগ বলা যায়!

ভারতীয় শিল্প ও ললিতকলার সমৃদ্ধিতে সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ সাহিত্যের অবদান অসামান্য। ইহলোকের জন্যে সংস্কৃতি সাধনা ও অনন্তলোকের জন্যে ধর্মসাধনা—এই উভয় সাধনার সমন্বয়ে মহাতপস্যার কাল বৈদিক যুগ। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেনঃ "শিল্প সম্বন্ধেও ঐতরেয়ের বাণীগুলি অপূর্ব। ঐতরেয় বলেন, শিল্পীরা তাদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করেছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে, শিল্পী আপনাকে ছন্দোময়

করে তোলেন।' শিল্প সম্পর্কে সে যুগের চিন্তা কত মহৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ থেকে জানতে পারা যায়। জীবনদর্শন সম্পর্কে সুস্থ, স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই বৈদিক যুগে শিল্পের পরমতত্ত্ব সংস্কৃতিলোককে আলোকিত করেছে।

ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন : "মহর্ষি ঐতরেয় ছিলেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও মহনীয় সমন্বয়। ঐতরেয় বলেন, অনার্যেরা পৃথিবীর সন্তান। ইতরা তাই মাতা পৃথিবীকে স্মরণ করেছিলেন। আর্য-অনার্য মিলনে তাই যেসব বিদ্যার সম্ভাবনা হল, তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ যে যোগ আছে, তা এই চৌষট্টি কলার তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।"

চৌষট্টি কলার তালিকা : ১) নৃত্য, ২) গীত, ৩) বাদ্য, ৪) উদক বাদ্য, ৫) নাট্য, ৬) সাজসজ্জা ও কুরূপকে সুরূপ করার বিদ্যা বা কৌচুমারযোগ, ৭) নেপথ্য বা বেশরচনা, ৮) বিশেষক ছেদ্য বা তিলকাদি রচনা, ৯) দশন বসন-রঞ্জন, ১০) কেশে পুষ্পবিন্যাস, ১১) কেশবিন্যাস, ১২) পুষ্পাস্তরণ, ১৩) মাল্য রচনার বিদ্যা, ১৪) গন্ধযুক্তি, সুগন্ধ প্রস্তুত বিদ্যা, ১৫) আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, ১৬) প্রতিকৃতি নির্মাণ, ১৭) যুদ্ধ-বিজয় বিদ্যা, ১৮) বৃক্ষায়ুর্বেদ, ১৯) নানাবিধ পাকবিদ্যা, ২০) পানীয় রচনা, ২১ তক্ষণ বা ছুতোরের বিদ্যা, ২২) চরকা কাটা, ২৩) বেত ও তৃণাদির দ্বারা ডালা কুলো প্রভৃতি রচনা, ২৪) শয্যা রচনা, ২৫) সূচীকর্ম, ২৬) খেলনা রচনা, ২৭) ভূষণ অর্থাৎ অলংকার রচনা, ২৮) কর্ণপত্র, কর্ণালংকার প্রস্তুতবিধি, ২৯) তণ্ডুল কুসুমাদি দ্বারা নৈবেদ্য রচনা, ৩০) সম্পাট্য অর্থাৎ হীরা-মণি-রত্নাদি কাটা, ৩১) মণিরত্ন বসানো, ৩২) বাস্তুবিদ্যা, ৩৩) মণিরত্নজ্ঞান, ৩৪) ধাতুরত্নাদি বিচার, ৩৫) খনিবিদ্যা, ৩৬) ধাতুবিদ্যা, ৩৭) ইন্দ্রজাল, ৩৮) বস্ত্রগোপন, ৩৯) হস্তলাঘব, ৪০) চিত্রযোগ, ৪১) সূত্রক্রিয়া, পুতুলনাচ, ৪২) পশুপক্ষী লড়ানো, ৪৩) পাখী পড়ানো, ৪৪) দ্যূতবিদ্যা, ৪৫) আকর্ষণ ক্রীড়া, ৪৬) অভিধান বিদ্যা, ৪৭) বৈনায়িকী বিদ্যা, ৪৮) দেশ ভাষাজ্ঞান, ৪৯) কাব্যসমস্যা পূরণ, ৫০) ম্লেচ্ছিতক বিকল্প, ম্লেচ্ছ ভাষাজ্ঞান, ৫১) অক্ষর মুষ্টিকা, অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা, ৫২) উত্তম-রূপে পড়িবার বিদ্যা, ৫৩) নাটকাখ্যানাদি দর্শন, ৫৪) মানসী কাব্য-ক্রিয়া, ৫৫) প্রহেলিকা, ৫৬) যন্ত্রমাত্রিকা ৫৭) উদকাঘাত, ৫৮) উৎসাদন, ৫৯) দুর্বাচক যোগ, ৬০) পুষ্পশকটিকা, নিমিত্ত জ্ঞান, ৬১) ধারণ মাত্রিকা, ৬২) ক্রিয়াবিকল্প, ৬৩) ছলিতকযোগ, ৬৪) বৈতালিকী বিদ্যা।

উপরি উক্ত তালিকা থেকে শিল্পকলা সম্পর্কে বৈদিক যুগে বাস্তববোধ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল বলেই পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কয়েক শত ও সহস্র বৎসরের সাধনা ও অনুশীলনে গড়ে উঠেছে। নৃত্য, গীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ও দর্শনের চরম উৎকর্ষের লক্ষণ এই যুগেই স্পষ্ট হয়েছে। হ্যাভেল বলেছেন : The Vedic period is all important for the historian, because, except for a very brief period of its history, the Vedic impulse is behind all Indian art."

বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতের সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ললিতকলা, কাব্য-সৌন্দর্য অযুতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এই যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে নৃত্যগীতেরও ভূমিকা ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে : "তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমানাঃ

সংরক্ষাঃ সর্পন্তি, ইত্যেবমাসস্পুঃ তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ।" অর্থাৎ আরব্ধ যজ্ঞ-কর্মে বহিস্পবমান স্তবের দ্বারা স্তুতি করতে উদ্যত উদ্গাত্রীরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে মণ্ডলাকারে যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করতেন। গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যের এটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেনঃ "আবার কর্মফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে নৃত্য ও গীতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্র-লোকেন সংপন্নো মহীয়তে,–অর্থাৎ সাধক যদি গীত ও বাদ্যরূপ লোক (world) কামনা করেন তবে তাঁর সংকল্পমাত্রেই গীত ও বাদ্য নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি সেই গীত ও বাদ্য উপভোগ করে সমৃদ্ধ ও জগতে পূজিত হন এবং নিজেরও মাহাত্ম্য অনুভব করেন। এখানে গন্ধর্বলোকেরও কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণে এ ধারণা আরও প্রবল, কিন্তু ছান্দোগ্যের মতে প্রাচীন উপনিষদে লোকের কল্পনা স্থান পেয়েছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ প্রভৃতি লোকের মতো, উপনিষদে গন্ধর্বলোকের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মানুষ গীতবাদ্যের অনুরাগী হলে মৃত্যুর পর গীতবাদিত্রলোকে অর্থাৎ গন্ধর্বলোকে গমন করে।" কঠ উপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ উপনিষদের যুগে নৃত্যগীতের প্রসার ও অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। বাদ্যের সঙ্গে তাল রেখে যে সামগেরা গান করতেন এবং পুরনারীরা করতালি দিয়ে যজ্ঞবেদী পরিক্রমণ করে নৃত্য করতেন তার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে "অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরি বা,"–অর্থাৎ ঊষা নর্তকীর মতো রূপ প্রকাশ করছে, এই নর্তকী শব্দ থেকে নৃত্যকলার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "Moreover the Rigveda (1. 92. 4.) already knows maidens who decked in splendid raiment, dance and attract lovers and the Atharvaveda (XII. 1. 41) tells how men dance and sing to music." শস্যোৎপাদন ও বৃষ্টি আমন্ত্রণের জন্য মহাব্রত উৎসবে এবং বিবাহ উৎসবে বাদ্যের সঙ্গে পুরনারীরা যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করে নৃত্য করতেন। অধ্যাপক কিথ বলেছেনঃ Thus at the Mahavarata, maidens dance round the fire as a spell to bring down rain for the crops and to secure the prosperity of the herds. Before the marriage ceremony is completed (Shankhyayana-grihyasutra, 1. 11. 5), there is dance of matrons whose husbands are still alive,... and dancers are present who dance to the sound of the lute and flute, dance, music and song fill the whole day of moving." অনেকে বলেন সামগানের যুগে গানের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশ ছিল না, কাজেই সামগানকে সঙ্গীত (নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়) আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। এছাড়াও বিবাহ উৎসব, সীমন্তোন্নয়ন উৎসব, যজ্ঞসমাপ্তিতে অবভৃথস্নান উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য অনুষ্ঠিত হত।

বৈদিক যুগেই সামগানের হস্ত ও অঙ্গুলিসঙ্কেত থেকে মুদ্রার প্রচলন হয়। যজ্ঞানু-ষ্ঠানে, উপাসনায়, মাঙ্গলিক আচরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে, করণ অনুসারে মুদ্রার প্রয়োগ করা হত। অবশ্য উপাসনা-মুদ্রা ও নর্তনমুদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূপভেদ আছে, কিন্তু

মূলে কোনো প্রভেদ নেই। বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে বলে মুদ্রাগুলি সেইযুগেই সাধনার রস ও ভাবের অভিব্যক্তির বাহনরূপে সমাদৃত হয়েছিল।

বৈদিক যুগের শেষভাগে গোষ্ঠীবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বিকাশলাভ করল। পাঞ্চাল দেশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ অব্দে অবন্তী, বৎস, কোশল, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে গোতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পরের শিল্পকলা, নৃত্যগীতের কথা বৌদ্ধজাতক ও কাহিনী-সাহিত্যে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, যদিও শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি বৈদিক সংস্কৃতি নিয়েই সীমাবদ্ধ তবুও তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধযুগের প্রভাবে পরিবর্ধিত হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনী রচিত অষ্টাধ্যায়ীতে "পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" প্রভৃতি সূত্র থেকে তৎকালীন সমাজে নৃত্যগীতের সমাদরের প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নৃত্য ও নর্তকীর উল্লেখ এবং অনুশীলনের কথা আছে। খৃষ্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ শতকে দক্ষিণ ভারতের "শিলপ্পদি-কারম্" গ্রন্থে নৃত্যকলার আলোচনা পাওয়া যায়। "শিলপ্পদিকারম" একটি সুপ্রাচীন তামিল মহাকাব্য,—রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল।

নন্দরাজাদের পূর্বে শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার ও অজাতশত্রু প্রভৃতির রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪ থেকে ৫৬৪ অব্দ পর্যন্ত নৃত্যকলার অনুশীলন ও বিকাশের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। গান্ধার ও পুরুষপুরের (পেশোয়ার) অধিবাসীদের কলানৈপুণ্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও মিলনের যোগসূত্র গ্রথিত হল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের তথ্য থেকে জানা যায় অজাতশত্রুর রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ ভারতের বাহিরেও সম্প্রসারিত হয়। চম্পা, রাজগৃহ, বৈশালী, পাটলিপুত্র, কোশল, কৌশাম্বী প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্পচর্চার বিশেষ সমাদর ছিল। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও নৃত্যগীতের অবাধ অনুশীলনের সুযোগ ছিল। রাজদরবারের সহানুভূতি ও অর্থব্যয়ে ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নাট্যমন্দির ও নৃত্যগৃহ পরিচালিত হত। শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় নিপুণা দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতকে ভগবান ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মা-ভরত আদি নাট্যবেদ প্রণয়ন করেন। ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্রের কাল নির্ণীত হয়েছে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। ভরতমুনি অবশ্য তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে সংগ্রহ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছেন: "নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্" অর্থাৎ ব্রহ্মা রচিত নাট্যশাস্ত্র আলোচনাকে অনুসরণ করেই ভরত পঞ্চমবেদরূপ নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন।

"ব্রহ্মা-ভরতম্" এর পরে "সদাশিব-ভরতম্" নামে আর একটি প্রাচীন নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক ভাষ্যকার সদাশিবকেই আদি ভরত বলে থাকেন। ব্রহ্মা-ভরত, সদাশিব-ভরত ও অন্যান্য আচার্যদের যথার্থ সময় ও অস্তিত্ব নিয়ে মতানৈক্য আছে। সব গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হওয়ায় যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয় নি। সম-

সাময়িক বা পরবর্তীকালের ভাষ্যকারদের তথ্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে।

ক্লাসিকাল যুগের সূচনা থেকে নৃত্যকলার বিকাশের ধারা বেগবতী হতে দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাদি মহাকাব্যের কালকে মোটামুটি ভাবে খৃষ্টপূর্ব ৪০০-২০০ অব্দের মধ্যে গণ্য করা হয়। সন তারিখের ক্রমিকতা রক্ষা করে ইতিহাস রচনার প্রথা সে সময় ছিল না, কিন্তু এই মহাকাব্যগুলির কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রায় ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি বেশি প্রাচীন তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঋষি বাল্মীকি নৃত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ।

... ...

উপনৃত্যন্তং ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥"

এখানে ভরত প্রসঙ্গে সম্ভবত আদি ভরতের কথাই বলা হয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজও নাট্য নৃত্যশাস্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তার গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ভরত নাট্যশাস্ত্রের আচার্য-তালিকায় অন্যান্য ঋষিদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"আত্রেয়োঽথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ।
অঙ্গিরা গৌতমোঽগস্ত্যো মনুরায়ুস্তথাত্মবান্ ॥
বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সংবর্তঃ প্রতিমর্দনঃ।
উশনা বৃহস্পতির্বৎসশ্চ্যবনঃ কাশ্যপো ধ্রুবঃ ॥
দুর্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজোঽথ রৈভ্যশ্চ বাল্মীকির্ভগবাংস্তথা ॥"

এই তালিকা থেকে রামায়ণ মহাভারতের যুগে নাট্য ও নৃত্যকলার উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার রামচন্দ্র আয়োজিত অশ্বমেধযজ্ঞে অন্যান্য গুণীদের সঙ্গে নৃত্যগীতবিশারদদেরও আমন্ত্রণের কথা উত্তরকাণ্ডে আছে।

"চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্।
এতান্ সর্বান্ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥"

এমন কি নৃপতি নির্বাচনে রাজকীয় গুণের মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তিকে বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য করা হত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর যখন অমাত্য ও পারিষদরা ঋষি বশিষ্ঠকে একজন প্রজাবৎসল নৃপতি নির্বাচনের জন্য অনুরোধ জানান, সেই প্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে উল্লেখ আছে ঃ

"নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ ॥"

মহাভারতেও সভাপর্বে উল্লেখ আছে ঃ

"নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি।
রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং শতক্রতুম্॥"

তখন যে নৃত্যগীতিবাদ্যচর্চাহীন কোনো সমৃদ্ধিশালী রাজ্য গণ্য হত না এবং নৃত্যকলার তৎকালীন সমাজে শ্রদ্ধা ও সমাদরের আসন ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

নৃত্যের কথা বহুবার বহু প্রসঙ্গে মহাভারতে পাওয়া গেলেও তার বিশেষ রূপ, পদ্ধতি বা শ্রেণীবিভাগের বিষয় কিছু জানা যায় না। অবশ্য "নৃত্তগীতং চ হাস্যং লাস্যং'' এই উদ্ধৃতি থেকে নৃত্যের উপাদানের কিছু অনুমান করা যেতে পারে। বিভিন্ন কাহিনী অংশে ও চরিত্রে নৃত্যকলার উল্লেখ আছে। কচ ও দেবযানী উভয়েই নৃত্যগীতে কুশলী ছিলেন। যমুনা তীরে খাণ্ডব বনে পরিজন ও পুরনারীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের নৃত্যগীতের কথা পাওয়া যায়। অর্জুন যখন অমরাবতীতে যান তখন তার অভ্যর্থনায় উর্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদের নৃত্যের বর্ণনা আছে। এই অমরাবতীতে অবস্থানের সময়েই অর্জুন বিশ্ববসুর পুত্র চিত্রসেন-এর কাছে নৃত্যগীত-বাদ্য শিক্ষা করেন।

বিরাট রাজপ্রাসাদে বৃহন্নলারূপী অর্জুন নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন।

"স তত্র রাজানমমিত্রহাঽব্রবীদ্।
বৃহন্নলাঽহং নরদেব নর্তকী॥"

এমন কি মহাকাব্যের যুগে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এবং অন্তঃপুরিকাদেরও নৃত্যগীতের অবাধ অনুশীলনের অধিকার ছিল।

হরিবংশের সময়েও হল্লীসক নৃত্য ও ছালিক্য নৃত্যক্রীড়ার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাবতরণ নৃত্যনাট্যের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ A short sketch of Indian Dance প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "It has been mentioned in the Harivansa that the wives of Bhaimas used to sing and dance with gestures and postures, to please Krishna. The Hallisaka dance was also practised during the time of Harivansa, and the commentator Nilakantha has said that Hallisaka was a kind of dance, in which many women dancers took part: ("হল্লীসকং বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ সহনৃত্যম্"). This type of dance was also known as a sportive play, and this dance was in later time known as the Rasa Nritya, which woman dancers dance in circle, in accompaniment with songs and musical instruments. The dance, "Gangavatarana" was also prevalent during periods of the great epics. Nilkantha has said that the 'Gangavatarana" was also known as the dance-drama". স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "হরিবংশকার বলেছেন ছালিক্যগান ছিল যাদবদের অতীব প্রিয়। বিষ্ণুপর্বের

৮৮ ৮৯ অধ্যায় দুটিতে উল্লেখ আছেঃ মহারাজ উগ্রসেন বসুদেবকে রাজ্যভার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবদের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেন। রেবতী, সত্যভামা প্রভৃতি ছাড়া ষোলশো রমণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য যাদবগণ তাঁদের পত্নীদেরও সঙ্গে নিয়েছিলেন। অপ্সরা প্রভৃতি নর্তকীরাও সঙ্গে ছিল। তীর্থে জলক্রীড়ার অবসরে বিভিন্ন নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছিল। অপ্সরারা জলদর্দুরের তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিল। তাদের মনোমুগ্ধকর বেশভূষায় সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। বলদেব রেবতীর সঙ্গে আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিলেন। সত্যভামাও নৃত্যগীতে যোগ দিয়েছিলেন। অর্জুন সমুদ্রযাত্রার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে সুভদ্রার সঙ্গে নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলকে ছালিক্যগীত গান করার জন্য আদেশ করেছিলেন। সঙ্গে ছিল মৃদঙ্গাদি বাদ্য। অপ্সরারা নৃত্য-গীত-বাদ্যে যোগদান করেছিল। আসারিত নৃত্য হবার পর নর্তকী রম্ভা নৃত্য নৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অভিনয়ের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে চারুদর্শনা ও বিশালনেত্রা উর্বশী, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি যোগদান করেছিল। নারদ বীণাযোগে ছ'টি গ্রামরাগ আলাপ করেছিলেন ও সে গ্রামরাগে মূর্ছনা-মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সকলে বিমোহিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে হল্লীসক নৃত্য করেছিলেন।" এই বর্ণনা থেকে প্রথম আমরা নৃত্যের রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই।

হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে হল্লীসক নৃত্য প্রসঙ্গে আছেঃ

"তাস্তু পঙ্‌ক্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তি মনোরমম্।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বশো গোপকন্যকাঃ।
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ॥"

স্ত্রী পুরুষের এটি সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান। অভিনবগুপ্তের মতে মণ্ডলীকৃত নৃত্যই হল্লীসক নৃত্য—"মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকমিতি স্মৃতম্।"

আসারিত নৃত্য হচ্ছে অভিনয়ের সহযোগী নৃত্যক্রিয়াপদ্ধতি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আসারিত নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণনা পাওয়া যায়।

"কৃত্বা কুতপবিন্যাসং যথাবদ্দ্বিজসত্তমাঃ॥
আসারিতঃ প্রয়োগস্তু ততঃ কার্য্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ।
তত্র চোপোহনং কৃত্বা তন্ত্রীভাণ্ডসমন্বিতম্॥
কার্য্যঃ প্রবেশো নর্তক্যা ভাণ্ডবাদ্যসমন্বিতঃ।
বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাদ্যং প্রযোজয়েৎ।
বৈশাখস্থানকেনেহ সর্বরেচকচারিণী॥
পুষ্পাঞ্জলিধরা ভূত্বা প্রবিশেদ্রঙ্গমণ্ডপম্।
পুষ্পাঞ্জলিং বিসৃজ্যাথ রঙ্গপীঠং পরীত্য চ॥

প্রণম্য দেবতাভ্যস্তু ততোঽভিনয়মাচরেৎ।
তত্রাভিনেয়গীতং স্যাৎ তত্র বাদ্যং ন যোজয়েৎ ॥
অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাণ্ডবাদ্যং প্রযোজয়েৎ।
সমং রক্তং বিভক্তং চ স্ফুটং শুদ্ধপ্রহারজম্ ॥”

আসর সজ্জা ও বাদ্যযন্ত্র সমাবেশের পরে নর্তকী সঙ্গীত সহযোগে ভাণ্ডবাদ্যের তালে নৃত্য প্রদর্শন করত। শুদ্ধ চারী, করণ ও অঙ্গহারের প্রয়োগে এই নৃত্যক্রিয়ায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে চিত্রতাণ্ডব বলা হয়েছে। এই বর্ণনা স্বভাবতই নৃত্যকলার দীর্ঘকালের শিক্ষা ও সাধনার পরিচায়ক। হরিবংশে ভাবাভিনয়ের উপযোগী উপাদানগুলিরও সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে।

গঙ্গাবতরণ প্রথম নৃত্যনাট্য। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ দানবরাজ বজ্রনাভকে বধ করার জন্যে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অন্যান্য ভৈমদের নাট্যসম্প্রদায় রূপে পাঠান। ভদ্র ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রধান নট। এরা বজ্রপুরে দৈত্যরাজসভায় গঙ্গাবতরণ অভিনয় করেন এবং এই অভিনয়ে অসুররাজ ও অন্যান্য সকলে মুগ্ধ হন ও উপহার প্রদান করেন। হরিবংশে এই প্রসঙ্গে বর্ণনায় নৃত্যকলার উৎকর্ষের চিত্র পাওয়া যায়। হরিবংশে উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ অভিনয়কে প্রথম প্রযোজিত নৃত্যনাট্য বলা যায়।

মহাকাব্যের যুগে নট ও নটীদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হত। অবশ্য এদের শ্রেণীবিভাগ ছিল। রাজদরবারে তাঁদের সম্মান ও অসম্মান লাভের কথা পাওয়া যায়। অন্ত্যজ নট-নটীদেরও উল্লেখ আছে। আবার অভিজাত নট সম্প্রদায়ের কথাও পাওয়া যায়। একথা অনস্বীকার্য যে মহাকাব্যের যুগে তৎকালীন সমাজে নৃত্যগীতের বিশেষ সমাদর ও উৎকর্ষ ছিল।

মৌর্যযুগে ভারতের সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার মতো নৃত্যকলাও বিশেষ উন্নত ও সংস্কৃত হয়। এই সময় গ্রীস ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার ফলে বহির্জগতেও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারলাভ করে। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, প্রিয়দর্শী অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে ভাস্কর্যে, ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতাভিনয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকমালায় সঙ্গীত ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল।

নৃত্যজাতকে হংসরাজকন্যার কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, হংসরাজকন্যা রত্নোজ্জ্বলগ্রীব সুন্দর পুচ্ছ ময়ূরকে পতিরূপে নির্বাচন করলেও তার নৃত্য অসম ও ছন্দোহীন হওয়ার জন্যে সে রাজকন্যার বরমাল্য লাভ করতে পারে নি। এই উপাখ্যানটি বারহুত স্তূপে খোদিত আছে। এছাড়া ভেরীবাদক-জাতক, শঙ্খজাতক, কাকবতী-জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

মহর্ষি বাৎস্যায়ন রচিত “কামসূত্র” গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৃত্যকলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। নাগরিক জীবনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে নৃত্য-গীত সন্দর্শন ও অংশগ্রহণ অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্ত করণীয় কর্তব্য বলে গণ্য হত। কুশীলবদের সরস্বতী মন্দিরে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন অভিনয়কে ‘প্রেক্ষণক’ বলেছেন। বাৎস্যায়ন যে চৌষট্টি কলার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেও

নৃত্য ও নাট্য অন্যতম। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, কুমারী ও বিবাহিতা নারীদের মধ্যেও নৃত্যগীতের অবাধ অনুশীলনের প্রচলন ছিল।

গুপ্তযুগও ভারত-সংস্কৃতির প্রসারের যুগ। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত নৃত্যগীতের একজন কৃতবিদ্য শিল্পীরূপে পরিচিত। সমুদ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয় এবং অধিবাসীদের মধ্যে নৃত্যগীতিচর্চার বিশেষ প্রসার হয়। শক ও কুষাণরাও চারুকলার অনুশীলনে উৎসাহী ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের নট-নটীদের নর্তনমূর্তি, বিভিন্ন তাম্রফলক ও প্রতিকৃতি, সঙ্গীতশালা, নাট্যগৃহ, নবরত্নসভা সেযুগের সংস্কৃতিচর্চার পরিচয় বহন করে।

এই যুগে রচিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে নৃত্যকলা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও চিত্র পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের স্বর্গের নৃত্যশিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নৃত্যকলায় অধিকার ও শিল্পীর গুণাবলীর কথা নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

"যুষ্মাকমিহ সর্বাসাং রূপৌদার্যগুণাধিকম্।
আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ॥
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্নাট্যস্য নাস্তি বৈ।
চার্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্‌বিড়ম্বনম্॥"

রূপগুণসম্পন্না উদার প্রকৃতির নারীই নৃত্যশিল্পীরূপে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম। সুষম, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত নৃত্যই নৃত্যরূপে গণ্য হতে পারে, অন্যথা তা বিড়ম্বনা মাত্র। মার্কণ্ডেয়পুরাণে নৃত্য প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

"বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্বশ্যথ তিলোত্তমা।
মেনকা সহজন্যা চ রম্ভাশ্চাপ্সরসাং বরাঃ॥
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ।
হাবভাববিলাসাঢ্যান্ কুর্বন্তোঽভিনয়ান বহূন্॥"

বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা মুদ্রা, অঙ্গহার ও ভাব-এর যথাযোগ্য প্রয়োগ সহ নৃত্যগীতের মাধ্যমে অভিনয় করত। রাজসভায় ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণ সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

কথা ও কাহিনী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিষ্ণুশর্মা রচিত "পঞ্চতন্ত্র"-এ তৎকালীন সমাজের নৃত্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন রচনায় নৃত্যগীতের বর্ণনা ও নানা তথ্য পাওয়া যায়। কালিদাসের অভ্যুদয়কাল নিয়ে বহু মতবিতর্ক আছে। খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য আছে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে গীতি, গান, গান্ধর্ব, নৃত্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে কালিদাসের আবির্ভাব।

সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তরাজগণ শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে মহাকবির শৈবধর্মানুরাগের পরিচয় অনুমান করা যায়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন ঃ "কালিদাস গলিতক অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। নন্দ্যাবর্ত, চতুরস্র, খুরক প্রভৃতি নৃত্যেরও তিনি নামোল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে নন্দ্যাবর্ত, চতুরস্র প্রভৃতি নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি একপার্শ্বগত নৃত্যশ্রেণীর অন্তর্গত। নন্দ্যাবর্তের উল্লেখ করে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

অস্থৈব চেচ্চরণয়োরন্তরং স্যাৎ ষড়ঙ্গুলম্।
বিতস্তিমাত্রমথবা নন্দ্যাবর্তং তদোদিতম্॥

নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ' অঙ্গুলির ব্যবধানে থাকে। নন্দ্যাবর্তের সঙ্গে চতুরস্র নৃত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। শার্ঙ্গদেব চতুরস্রের পরিচয় দিয়েছেন,

নন্দ্যাবর্তস্য চেদঙ্ঘ্রি গর্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলম্।
অন্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরস্রং তদোদিতম্॥

কালিদাস যে 'অস্যানন্তরে অর্ধাশ্বিচতুরস্রক'—অর্ধাশ্বিচতুরস্র নৃত্যের উল্লেখ করেছেন তার অপর নাম 'নন্দ্যাবর্তাপর'। কেননা নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে শিল্পীর ছ' অঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে দুটি চরণের স্থিতি থাকে, আর চতুরস্রে তার তিনগুণ বা আঠার অঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে থাকে। সুতরাং যে নৃত্যে দুটি চরণের স্থিতি বারো অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অর্ধাশ্বিচতুরস্র (১৮–৬ = ৯ + ৩ = ১২) বা নন্দ্যাবর্তাপর (৬×২ = ১২) নৃত্য বলে। কালিদাস নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যকলায় পারদর্শী না হলেও চাক্ষুষভাবে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের তত্ত্ব তিনি জানতেন। তাছাড়া নাটকে তিনি শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতের উল্লেখ করেছেন।"

কালিদাস শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এই তথ্যও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ "মহাকবি-কালিদাস ও সঙ্গীত" প্রসঙ্গে রঘুবংশ কাব্য উদ্ধৃতি থেকে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—

"বেণুনা দর্শনপীড়িতাধরা বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।
শিল্পকার্য উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিহ্মনয়না ব্যলোভয়ন্॥
অঙ্গসত্ত্ববচনাশ্রয়ং মিথঃ স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্।
স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ সঞ্জঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধৌ॥"

কালিদাসের বর্ণনা হল ঃ 'রাজা অগ্নিবর্ণ অধর দ্বারা নর্তকীদের অধর দংশন করতেন ও নিজ নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত করে দিতেন। সুতরাং দষ্ট অধর দ্বারা বেণুবাদন ও ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশে বীণাস্থাপন করতে তাদের কষ্টবোধ হলেও তারা কুটিল কটাক্ষ নিয়োগ করে রাজার প্রতি অনুরাগ দেখাত, আর তাতেই অগ্নিবর্ণের চিত্ত অভিভূত হত। রাজা নিভৃতে নর্তকীদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক এই তিন রকমের অভিনয়ে শিক্ষিতা করেছিলেন। যখন তারা বন্ধুজনের সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষা দিত,

প্রয়োগ কলাবিশারদ নাট্যাচার্যদের সঙ্গে রাজার ঘোর তর্ক-বিতর্ক হত।' এ থেকে বোঝা যায় কালিদাস শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।"

নৃত্যনিপুণা মালবিকার বর্ণনা প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি সহ মহাকবির কলাজ্ঞানের যে প্রমাণ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উপস্থিত করেছেন সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"কালিদাস নৃত্যগীত পারদর্শিনী মালবিকার নৃত্যনৈপুণ্যের উল্লেখ করে নিজের সুমার্জিত কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস সুন্দরী নর্তকী মালবিকার দেহভঙ্গি ও নৃত্যছন্দের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,

[১] বামং সন্ধিস্তিমিত বলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে,
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পতিতাক্ষং,
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্দ্ধম্॥

অর্থাৎ দেহ নিশ্চল বলে এর [মালবিকার] মণিবন্ধে বলয় স্থিরভাবে শোভা পাচ্ছে। এর বামহস্ত নিতম্বদেশে স্থাপিত, শ্যামালতাব মত দক্ষিণহস্ত শিথিলভাবে বিলম্বিত। দক্ষিণ-চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্পবিস্তৃত মণিময় নৃত্যমণ্ডপে পতিত কুসুমরাশি অপসারিত হচ্ছে। এর চক্ষু দুটি ভূমির দিকে নিবিষ্ট। চরণ থেকে নাভি পর্যন্ত দেহের অর্ধভাগ সরল ও আয়ত। এভাবে অবস্থান করাতে অতীব চারুদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

[২] অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতং সম্যগর্থঃ,
পাদন্যাসো লয়মুপগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনিমৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ,
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব॥

অর্থাৎ মুখে কোন কথা [শব্দ] উচ্চারিত না হলেও অঙ্গাদির ভঙ্গি [হস্তাদিকরণ] দ্বারা সকল অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে। পদবিক্ষেপ সর্বদা লয়সঙ্গত, রস সম্বন্ধেও তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়, অভিনয় অতিশয় কোমল ও সুকুমার দর্শন, কেননা নৃত্যের সময় হস্তের দ্বারাই তার মান নির্ণীত হচ্ছে। অভিনয়ের সময়ে যে ধরনেব বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন (হাব-ভাব দৃষ্টি প্রভৃতি) সেগুলি সমস্ত যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হচ্ছে। এরূপ (নৃত্য গীতাদি সহ) অভিনয় প্রত্যেক মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যেও উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে নৃত্য-নিপুণা দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"পাদন্যাসৈঃ ক্বণিত-রসনা স্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিত-বলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তত্বো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুন্
আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণী-দীর্ঘান্ কটাক্ষান্।

পদক্ষেপে কাঞ্চী-কৃত দেবদাসী কুশলা নটনে
ক্লান্তহস্তা মণিদ্যুতি লীলায়িত চামর হেলনে।
নখক্ষতে সুখদায়ী বর্ষাবিন্দু লভিয়া তোমার
ভ্রমর-নিকর-দীর্ঘ সুকটাক্ষে চাবে বারবার ॥"

—অনুবাদ ঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

এছাড়া বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক, ভারবি, ভর্তৃহরি, বাণভট্ট, ভবভূতি বিশাখদত্ত, হর্ষবর্ধন প্রভৃতির গ্রন্থেও নৃত্য ও নাট্যের কথা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা না থাকায় তৎকালীন সমাজে নৃত্যকলার রূপ জানবার দুটি পন্থা আছে ঃ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক এবং অপরটি হল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যকলার বর্ণনা ও আলোচনা। ভারতের নৃত্যকলার সর্বত্রগামী সার্বিক রূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে এখনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এইসব উপাদান নিয়ে প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন।

ধর্মের বাহন হয়ে নৃত্যকলা প্রসার লাভ করলেও একমাত্র ধর্মের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে নানা ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছে। এবং বিভিন্ন ধর্মমতের সংঘাতে নৃত্যকলাও বিভিন্ন ভাবাদর্শে রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানবতার ন্যায় ঔদার্যও ভারতীয় ধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য। এই ঔদার্য যখনই সংকীর্ণতার পাঁকে নিমজ্জিত হয়েছে তখনই তা সমাজ শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসারকেও ব্যাহত করেছে। শৈব ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে ও রাজকুলে প্রভাবের উপর তৎকালীন সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতির আত্মসম্প্রসারণের যুগ বলা যায়। পরবর্তী মুসলমান আমলেও সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় ও বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। অবশেষে ঔপনিবেশিক শাসনের বৃত্ত পরিধিতে এসে নৃত্যকলার গতিবেগ হল মন্থর, সংকীর্ণ। এই পরবর্তী যুগের নৃত্যধারার বিকাশ ও গতি-প্রকৃতির ইতিহাস ভারতের শাস্ত্রীয় ও আঞ্চলিক নৃত্যধারাগুলির আলোচনা পর্যায়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিশদভাবে করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণের নৃত্যকলার উপাদান সম্পর্কেও পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতন্ত্র আলোচনা আছে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দ্রাবিড় সভ্যতার সময় থেকেই যে নৃত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষের সূচনা তার অন্যতম প্রমাণ 'শিল্প' ও 'কলা' এই শব্দ দুটি। এই দুটি শব্দই মূল দ্রাবিড় ভাষা থেকে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে। বৈদিক যুগে নৃত্যকলার চর্চা ও বিকাশ সেই ধারাকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে আসে। বৌদ্ধ যুগে প্রথমে ধর্মীয় অনুশাসনে নৃত্য, গীত, বাদ্য দর্শন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই বিধিনিষেধ সংস্কৃতির শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে প্রত্যাহৃত হয়। ভারতীয় নৃত্যের জয়যাত্রা সেই সুদূর অতীতেই শুধুমাত্র ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। দেশ-বিদেশে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া ও থাইল্যান্ড, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলি প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় নৃত্যের প্রভাব ও প্রসারের কথা সর্বজনস্বীকৃত।

যুগে যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনাবেগ যত বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, নৃত্যকলার বিষয় ও রীতিও তত বিচিত্রতর হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বহু জাতি ও সংস্কৃতির ভাব ও ভাবনার নতুন নতুন উপাদান গ্রহণ ও নব নব ভাব-ধারার স্বীকৃতির ফলে ভারতের নৃত্যধারা, দেশের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে মহত্তর হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রস্তুতিকালের দীর্ঘতা ও গতিবেগ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। গৃহীত ভাবধারার স্বীকরণ, পরিপাক ও উৎকর্ষ সাধনে, অপরীক্ষিত সত্য ও সৌন্দর্যের নব পরীক্ষণের ছন্দে জাতির আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় নৃত্যের রূপ ও রেখা রমণীয় লাবণ্যে ও মহিমান্বিত বীর্যে মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়েছে।

নটরাজ

নৃত্যের দেবতা নটরাজ। শিবের তাণ্ডবনৃত্য থেকেই প্রকৃত নৃত্যের সূচনা। নটরাজ মূর্তিকল্পনা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বিভিন্ন রূপকের মধ্যদিয়েই শিল্পকলারও একটা আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টি করার যে প্রবণতা প্রাচীনকালে ছিল তারই সার্থক প্রকাশ দেখা যায় সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের ছন্দে নটরাজ মূর্তির উদাত্ত পরিকল্পনায়।

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ম্।
আহার্য্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥"

পরিদৃশ্যমান নিখিল ভুবন যার আঙ্গিক অভিনয়-সঞ্জাত; সমস্ত শব্দ ও ধ্বনি যার বাচিক অভিনয়-সম্ভূত; চন্দ্রতারাদি জ্যোতির্মণ্ডল যার শোভা-সম্পাদক অলংকার; সেই মহান সর্বগুণময় দেবাদিদেব নটরাজ সর্বকালের শিল্পীদের প্রেরণা।

"নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উর্দ্ধর্তুকামঃ সনকাদি সিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥"

নটরাজ তাণ্ডবনৃত্য সমাপনান্তে চৌদ্দবার যে ডমরুধ্বনি করেছিলেন তা থেকে চৌদ্দ পর্যায়ের বর্ণগুলির সৃষ্টি হয়েছে একথা কাশিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এই তাণ্ডব-নৃত্যের কল্পনা থেকেই নৃত্যকলার বিকাশ ও বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিমা দেবী বলেছেন, "জীবজগতের মধ্যে অহরহ যে নিগূঢ় স্পন্দন চলেছে অণুপরমাণু থেকে আরম্ভ করে প্রাণিজগৎ পর্যন্ত, নিজেকে টিকিয়ে রাখবার যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ঝড়, তাই প্রাণের বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত অফুরন্ত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের চিত্ত সাধনা করেছে সেই অসীম গতিশক্তিকে দেহের সীমার মধ্যে অনুভব করতে। শিবের তাণ্ডব হল সেই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিশক্তির প্রত্যক্ষ রূপ। তার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আবর্ত আমরা দেখি। তাণ্ডবের প্রতি পদক্ষেপের ছন্দে পৃথিবীর ধূলিকণাও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষের কল্পনা যে কত গভীর ভাবে এ্যাবস্ট্রাক্টকে নিরুদ্দেশকে অনুভব করতে পারে শিবের তাণ্ডবে তারই অদ্ভুত প্রকাশ। এথেকে বোঝা যায় ভারতীয় নৃত্য একদিন অনঙ্গদহনের অর্থাৎ স্থূল অঙ্গ সীমানা অতিক্রমণের পথে আধ্যাত্মিক প্রেরণাতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।"

এই নটরাজ পরিকল্পনায় অবশ্য বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন রজোগুণের বিকাশে শিব স্রষ্টা, সত্ত্বগুণের বিকাশে পালনকর্তা এবং তমোগুণের বিকাশে প্রলয়ঙ্কর। অনেকে বলেন পার্বতীকে তুষ্ট করার জন্যে শিব তাণ্ডবনৃত্য করেন। নটরাজমূর্তি কল্পনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই মূর্তি-কল্পনায় বিশেষ বৈচিত্র্যের সমন্বয় দেখা যায়। শিব প্রাক্‌ বৈদিকযুগের দেবতা, আর্য-সভ্যতায়ও তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। নটরাজ মূর্তির পরিকল্পনায় রূপ, ভাব,

লাবণ্য বিভিন্ন মূর্তিতে সমগ্র দেশের মন্দিরে মন্দিরে শুধু যে ভাস্কর্যের শিল্প-শাস্ত্রানুসরণ করেছে তাই নয় নৃত্যকলার বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে এর রূপরচনায় অনুসৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসাবে তৎকালীন এই সব মূর্তিগুলি রচিত হয়েছিল। শুধুমাত্র যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টিই সে যুগের শিল্পাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল না, ঠিক তেমনই এর তাল, মান ও ভঙ্গীতে নৃত্যকলার আঙ্গিক যথার্থরূপে রূপায়িত হয়েছে। ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দিরে নৃত্যরত নটরাজ মূর্তির আটটি হাতে শাস্ত্রানুযায়ী মুদ্রা। বাদামী মন্দিরে শিব নটরাজ মূর্তির ষোলটি হাতেও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় হস্তমুদ্রা। ইলোরা, এলিফাণ্টা ও দাক্ষিণাত্যের চিদাম্বরম মন্দিরের শিব নটরাজের ললিত মূর্তি ও তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত নটরাজের উর্ধ্বতাণ্ডব ভঙ্গীযুক্ত মূর্তি শিল্পকলা ও নৃত্যকলার উৎকর্ষের উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গীতমকরন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে নটরাজের সুন্দর বর্ণনা আছে। "ব্রহ্মা তালধর, শ্রীহরি পটহবাদ্য করিতেছেন, স্বয়ং ভারতী বীণাবাদনরতা ; রবি ও শশী বংশী আলাপনে নিরত ; সিদ্ধ, অপ্সরা ও কিন্নরগণ শ্রুতিধর ; নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি মাদল বাজাইতেছেন ও নারদ গান করিতেছেন ; এরূপ অবস্থায় মঙ্গলময় বিগ্রহ শম্ভু নৃত্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই মাঙ্গল্যনৃত্যেই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ ইহা অনুমান করা কিছু অসঙ্গত হইবে না। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোকে ত্রিপুর বিজয়ী মহাদেবের দুঃখনৃত্য বর্ণিত হইয়াছে :—পাছে তাহার পাদন্যাসে পৃথিবীর অবনতি হয়, পাছে তাহার বাহুবিক্ষেপে সকল লোক পীড়িত হয়, পাছে তার অনলকণাবর্ষী দৃষ্টিপাতে নিখিল দৃশ্যবস্তু ভস্মীভূত হয়, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত সংকোচের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন। আবার অভিনবগুপ্তকৃত নাট্যশাস্ত্রের টীকা "অভিনব ভারতী"তে কল্পাবসানরূপ নিশান্ত সান্ধ্যসময়ে ব্যোম-রঙ্গাঙ্গনে বিচিত্র নৃত্যপরায়ণ আকাশমূর্তিধর বিশ্বরূপ দেবদেব কর্তৃক বিবিধ সৃষ্টির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাই নটরাজের নৃত্যকে শুধু বিশ্বধ্বংসের অগ্রদূত বলা অসঙ্গত ; এই নৃত্যই তাহাকে বিশ্বস্থপতিরূপে প্রকাশ করিয়াছে।" [অশোকনাথ শাস্ত্রী]। প্রখ্যাত শিল্পী হ্যাভেল বলেছেন : "Tandavan, which summed up the threefold processes of creation, preservation and destruction |..."

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ নটরাজ প্রসঙ্গে বলেছেন : "নটরাজের নৃত্য সৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণতঃ নটরাজমূর্তি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণদিকে উপরের হাতে ডমরু অনাহত শব্দের প্রতীক. অখণ্ড মহাকালের বুকে তা যেন ছন্দ বা তাল লয় রক্ষা করছে। ডমরুর শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ পঞ্চভূতের যোগসূত্র জড়িত। বিশ্ববৈচিত্র্যের উপাদান পঞ্চভূত। শব্দও তাই। নৈয়ায়িকেরা 'শব্দগুণমাকাশম' সূত্রে শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন, শব্দ আকাশ বা মহাকাশের প্রকাশক। নটরাজের বামদিকের উপরের হাতে 'অর্ধমুদ্রা', তাতে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ধ্বংসের পরিচায়ক। দক্ষিণদিকে নিচেকার হাতে 'অভয়-মুদ্রা'—শান্তি ও সান্ত্বনার উদ্বোধক। বামদিকের নিচেকার হাত উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত এবং তা চরণের দিকে নমিত, তাতে আছে 'গজহস্তমুদ্রা' এবং তা বিঘ্ননাশক গণপতি

বা বিনায়ককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ হাত সর্ববিঘ্ননাশের প্রতীক। পদতলে বামন 'অপস্মার' পুরুষ বা অসুর ত্রিপুর অজ্ঞানরূপ সংসারচক্রের পরিচায়ক। নটরাজ বামনকে পদদলিত করেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মুক্তি ও শান্তির আলোকদান করছেন। বামন পদ্মপীঠের ওপর শায়িত। নৃত্যে শিবের পাঁচটি শক্তি বা পঞ্চক্রিয়া বিকশিত: সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। পঞ্চক্রিয়ার অধি-দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিব। নটরাজ শিবের হাতে মুদ্রা বা হস্তকরণ-গুলি, নৃত্যে ভাব ও রসের প্রকাশক। নটরাজের চারদিকে প্রভামণ্ডল বা অগ্নিশিখার চক্র বিশ্বের ও বিশ্ববাসীগণের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। অধ্যাপক সিমার একে ওঙ্কারেরও প্রতীক বলেছেন। নটরাজের শিরে জটাজাল নৃত্যের তালে তালে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। জটার বাঁধনে গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে অর্ধচন্দ্র বা অগ্নি জ্ঞানের এবং শিরে সর্প প্রকৃতি বা প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের দক্ষিণ কর্ণে মনুষ্যদেহের এবং বাম কর্ণে নারীদেহের ভূষণ। শিল্পী হ্যাভেল এটিকে বলেছেন পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত রূপ।

হ্যাভেলের মতে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে দুটি ভাব অন্তর্নিহিত: একটি প্রকৃতির বাইরের জড়বিকাশের বিলাস ও অপরটি অধ্যাত্মজগতের লীলার অভিব্যক্তি—যাতে মানুষের সকল কিছু কামনা, অজ্ঞান ও বন্ধনের অবসান হয়। তিনি নটরাজের নৃত্যের একটি পৌরাণিক আখ্যানের পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যানটি আদিমকালের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। গল্পটি হল: একদিন শিব যোগীবেশে অরণ্যে ঋষিদের কাছে গিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন ও ঋষিদের হারিয়ে দিলেন। ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা শিবকে আক্রমণ করার জন্যে যজ্ঞাগ্নিতে ভয়ংকর মূর্তি এক ব্যাঘ্র সৃষ্টি করলেন। শিব কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে ব্যাঘ্রের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে নিজের গায়ে পরিধান করলেন। ঋষিরা বিষধর সর্প সৃষ্টি করলেন। কিন্তু শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নৃত্য করতে লাগলেন। তখন ঋষিদের যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকটাকার এক বামনরূপ অসুর বহির্গত হয়ে শিবকে আক্রমণ করল। শিব অসুরকে পদভারে দলিত করে তার পৃষ্ঠদেশ ভেঙে দিলেন। শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য স্বর্গলোকের দেবতা ঋষিরা প্রত্যক্ষ করলেন। এই নৃত্যের দৃশ্যই এলি-ফেন্টার গুহায় চাক্ষুষভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ জাভাযাত্রীর পত্র রচনায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "শিব-মন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এদেশে গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন; মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল; অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠা পড়া সে তাঁরই নাচের ছন্দে। তিনি ভৈরব, কেননা তার লীলার অঙ্গই হচ্ছে নৃত্য। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর একদিকে তারই মধ্যে কালের ধারা

তার পরিবর্তনপরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে।'

নৃত্যদেবতা নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য থেকেই নৃত্যের সূচনা। শিব তাণ্ডব থেকে নৃত্যের যে জয়যাত্রা শুরু হল তার মূল ভাবধারা আধ্যাত্মিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দু দেবদেবীরা প্রায় সকলেই নৃত্যগীতে পারদর্শী। শিব-তাণ্ডব যেমন নৃত্যের প্রথম প্রকাশ তেমনই কালীতাণ্ডব লাস্য নৃত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন।

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণ

নৃত্যকলা ও নাট্যচিন্তার উৎস-সন্ধানে ভরত-নাট্যশাস্ত্র পর্যালোচনা অপরিহার্য। ত্রেতা-যুগের প্রারম্ভে যখন জনসাধারণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে পড়ে তখন দেবগণ ইন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে লোকগুরু ব্রহ্মাকে জনমানসের উন্নতিকল্পে সর্বসাধারণের উপযোগী এক নতুন বেদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন ঃ

"ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ
তস্মাৎ স্বজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম"

এক ধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য ও সর্ববর্ণের উপযোগী পঞ্চম বেদ তাঁরা প্রার্থনা করলেন। তখন চতুর্বেদ থেকে নাট্যবেদ সৃষ্টি হল।

"নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্
জগ্রাহ পাঠ্যং ঋগ্বেদাৎ সামেভ্যোগীতমেব চ
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি।"

লোকগুরু ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অথর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহ করে নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন। তিনি বললেন ঃ

"ন তদ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন'তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।"

অর্থাৎ এমন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কৌশল বা কর্ম নেই যা এই নাট্যকলায় দেখা যায় না। শিল্পকলা সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। অভিনয়-দর্পণে নাট্য প্রশংসায় উল্লেখ আছে ঃ

"ঋগ্ যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্ব্বণং ক্রমাৎ॥
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মজঃ।
ব্যরীরচচ্ছাস্ত্রমিদং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥
কীর্তিপ্রাগল্‌ভ্যসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যানাং প্রবর্দ্ধনম্।
ঔদার্য্যস্থৈর্য্যধৈর্য্যাণাং বিলাসস্য চ কারণম্॥
দুঃখার্ত্তিশোকনির্ব্বেদখেদবিচ্ছেদকারণম্।
অপি ব্রহ্মপরানন্দাদিদমভ্যধিকং মতম্॥"

চতুর্বেদ-এর অঙ্গ থেকে সংগৃহীত এই নাট্যবেদ ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ প্রদান করে,

এই পঞ্চম বেদ কীর্তি, প্রাগল্‌ভ্য, সৌভাগ্য ও বৈদগ্ধ্যের প্রবর্ধক। ঔদার্য, স্থৈর্য ও বিলাসের কারণ এবং ইহা দুঃখ, আর্তি শোক, নির্বেদ ও খেদ নিবারণ করে। ইহা পরম ব্রহ্মানন্দ থেকেও উৎকৃষ্টতর।

নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল সম্পর্কে বহু মতপার্থক্য আছে। সাধারণ ভাবে খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এর রচনাকাল নিরূপণ করার প্রয়াস হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, নাট্যশাস্ত্রের পূর্বেও নাট্য ও নৃত্যকলার কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। এবং স্বয়ং ভরতও যে পূর্ববতী আচার্যদের কাছ থেকে নাট্য ও নৃত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সেকথা তিনি নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন।

"অহং চ কথয়িষ্যামি নিখিলেন তপোধনাঃ।
সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমম্॥"

৩৬০০ থেকে ৬০০০ পর্যন্ত শ্লোকে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন যে সব সংস্করণ পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচার্যগণ নাট্যশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না এ নিয়েও বহু মত-দ্বৈধতা আছে। অনেকে বলেন "ভরত" শব্দটি উপাধি। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যশাস্ত্রজ্ঞদের "ভরত" উপাধি দেওয়া হত। নন্দিভরত, মতঙ্গভরত, কাশ্যপভরত, কোহলভরত ও তণ্ডুভরত এই নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ পঞ্চভরতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের বিষয়সূচী লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে নৃত্য, নাট্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে যা কিছু আবশ্যকীয় সবই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বিষয় সূচীতে ১) নাট্যোৎপত্তি, ২) মণ্ডপবিধান, ৩) রঙ্গ-দৈবত পূজাবিধান, ৪) তাণ্ডব লক্ষণ, ৫) পূর্বরঙ্গবিধান, ৬) রসাধ্যায়, ৭) ভাবব্যঞ্জন, ৮) উপাঙ্গাভিনয়, ৯) অঙ্গাভিনয়, ১০) চারীবিধান, ১১) মণ্ডলকল্পন, ১২) গতি প্রচার, ১৩, করযুক্তি ধর্মব্যঞ্জক, ১৪) ছন্দোবিধান, ১৫) ছন্দোবৃত্তিবিধি, ১৬) অলঙ্কার লক্ষণ, ১৭) কাকুস্বর বিধান, ১৮ দশরূপ লক্ষণ, ১৯) সন্ধ্যঙ্গ-বিকল্প, ২০) বৃত্তিবিকল্প, ২১) আহার্যাভিনয়, ২২) সামান্যাভিনয়, ২৩) বৈশিক, ২৪) চিত্রাভিনয়, ২৫) প্রকৃতি বিকল্পনা, ২৬) সিদ্ধিব্যঞ্জক, ২৭) জাতি লক্ষণ, ২৮) আতোদ্য জাতিবিধান, ২৯) তালবিধান, ৩০) ধ্রুবাধ্যায়, ৩১) গুণাধ্যায়, ৩২) পুষ্কর বাদ্য, ৩৩) ভূমিবিকল্প, ৩৪) নটশাপ, ৩৫) গুহ্যবিকল্প প্রভৃতি অধ্যায়ে নাট্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য সংক্রান্ত সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

ভারতের দৃশ্যকাব্যগুলিতে অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে সেজন্যেই এর নাম নাট্য। নট ধাতুর অর্থ নৃত্য করা, তাই নৃত্যক্রিয়ার দ্বারা যা করা যায় তাই নাট্য। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত অর্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলিত রূপ বোঝাত। "নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতিত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"—সঙ্গীতরত্নাকরে এই ব্যাখ্যা আছে।

ভারতে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করা হত। নিছক আনন্দপ্রদায়িনী শিল্প সৃষ্টির কথা নাট্যশাস্ত্র বলে নি।

দেবতানাং মুনীনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম্।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে॥

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।

সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥"

শুধু যে আদর্শ কর্মের আচরণের অনুকরণের কথা তারা নির্দেশ করেছেন তাই নয় বিভিন্ন রস, ভাব ও আচরণে সমৃদ্ধ হয়ে অভিনীত নাট্য সকলের পক্ষে শিক্ষণীয় ও উপদেশজনক হবে এই নির্দেশও আছে।

"এতদ্ রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়াসু চ।

সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি ॥"

নন্দিকেশ্বর ও অভিনয়দর্পণ

নৃত্যকলার ইতিহাস, ব্যাকরণ বিজ্ঞান, মূর্তিতত্ত্ব ও দর্শন একটি অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। এর বিকাশ ও ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন মনীষী ও নাট্যসম্প্রদায়ের অবদান অনস্বীকার্য। মুনি ভরতের পূর্বে ব্রহ্মভরত ও সদাশিবভরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভরতের পরে নন্দিকেশ্বর, কোহল, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু প্রভৃতি আচার্যদের আবির্ভাবকাল নিয়ে বহু মতবিতর্ক আছে। সাধারণভাবে একথা অনস্বীকার্য যে ভরতসম্প্রদায়, নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় ও কোহলমতঙ্গ সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে নন্দিকেশ্বরকে ভরতের পূর্ববর্তী ও বলে থাকেন। শারদাতনয়ের মতে নন্দিকেশ্বর ভরতের গুরু ছিলেন। শিবানুচর বলেও নন্দিকেশ্বরকে কল্পনা করা হয়। অবশ্য অভিনয়দর্পণ গ্রন্থে নাট্যোৎপত্তি প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বর ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার বলেন যে নন্দী, নন্দিকেশ্বর ও শিবানুচর তণ্ডু একই ব্যক্তি। এবং অভিয়দর্পণ গ্রন্থটি "নন্দীশ্বর-সংহিতা" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিশিষ্ট। 'Mirror of Gestures' গ্রন্থের ইন্দ্র-নন্দিকেশ্বর সংবাদে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র একদা নন্দিকেশ্বরের নিকট নৃত্যশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ তখন দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যকুলের শ্রেষ্ঠ নর্তক নটশেখরকে নৃত্যের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে নন্দিকেশ্বর চার হাজার শ্লোক-সম্বলিত "ভরতার্ণব" নামক গ্রন্থ রচনা করে নৃত্যকলা শিক্ষার জন্যে ইন্দ্রকে দিলেন। ইন্দ্র গ্রন্থের বিশাল আয়তন দেখে ভীত হয়ে নন্দিকেশ্বরকে কাতর অনুরোধ জানান যে তিনি যেন তাঁর নৃত্যকলা অনুশীলনের জন্যে একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করে দেন। তখন নন্দিকেশ্বর কৃপাভরে ইন্দ্রের জন্যে "অভিনয়দর্পণ" রচনা করেন।

এই সব কাহিনী ও উৎপত্তিকাল সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও এটা অবিসম্বাদিত সত্য যে 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থ ও নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় প্রবর্তিত ধারা অভিনয়কলা, মুদ্রা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গের খুঁটিনাটি খুব বেশী এবং তিনি নাট্যধর্মী অভিনয়কেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। অপর পক্ষে ভরত এই বহিরঙ্গ খুঁটিনাটি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ রসস্ফূর্তির উপরেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং লোকধর্মী অভিনয়কেই শ্রেষ্ঠতর বলে নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন অঙ্গাভিনয়ের প্রকারভেদের নির্দেশ ভরতনাট্যশাস্ত্রে থাকলেও উহাদের পারস্পরিক সংযোজনার মাধ্যমে অনন্ত শিল্পবৈচিত্র্যের কথা নন্দিকেশ্বর বিশদ আলোচনা করেছেন,

সে বিষয়ে ভরত বিশেষ জোর দেন নি। বরং রসাভিনয়ের বিরোধী অতিরিক্ত অঙ্গাভিনয়ের নিন্দা করেছেন। ভরতের মতে সাত্ত্বিক গুণযুক্ত উত্তম পাত্রের পক্ষে শুধুমাত্র আঙ্গিকাভিনয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মধ্যম ও অধম প্রকৃতির পাত্ররা আঙ্গিকাভিনয়ের অধিকারী। অপরদিকে নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় এই বহিরঙ্গের খুঁটিনাটির ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেখিয়েছেন। কোহল ও মতঙ্গ-সম্প্রদায় এই দুই মতের সামঞ্জস্যবিধান করে রস-সৃষ্টিকে অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করে বহিরঙ্গের দিকেও যত্নশীল হবার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভরতনাট্যশাস্ত্রের যে সামগ্রিকতা তা অভিনয়দর্পণে অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন—"অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ভরত—আঙ্গিক বাচিক, আহার্য-সাত্ত্বিক, এই চার প্রকার অভিনয়ের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই ধরণের পরিপাটি আলোচনাই নাট্যশাস্ত্রকে এমন এক সামগ্রিক মহিমায় মণ্ডিত করেছে যা অভিনয়দর্পণের নেই। নাট্যশাস্ত্রের পাশে অভিনয়দর্পণকে দাঁড় করালে এই কথা মনে জাগবেই যে, অভিনয়দর্পণ একখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং অংশের মহিমা থাকলেও সমগ্রের মহিমা তার নেই। কেন অসম্পূর্ণ বলছি তা একটু খুলে বলাই ভালো। গ্রন্থের নাম যেখানে অভিনয়দর্পণ, সেখানে এ প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক যে, গ্রন্থে আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক সব রকম অভিনয়েরই আলোচনা পাওয়া যাবে। বিশেষত, গ্রন্থকার যখন নিজেই চার প্রকার অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা, অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলতে পারি—'আলোচ্য অভিনয়দর্পণ গ্রন্থটিতে নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রচলিত অঙ্গাভিনয় পদ্ধতির কিয়দংশ মাত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে' (অভিনয়দর্পণের ভূমিকা)। যে অভিনয় গ্রন্থে বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক—এই তিন প্রকার অভিনয় সম্পূর্ণ অনালোচিত, সেই গ্রন্থকে অসম্পূর্ণ না বলে উপায় নেই।

অঙ্গাভিনয়ের বিভিন্ন কর্মের লক্ষণে নাট্যশাস্ত্র অভিনয়দর্পণে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তবে একথা সত্য যে রসসৃষ্টি প্রসঙ্গে বিশেষ অবহেলা দেখালেও নাট্যধর্মী অভিনয়ের আলোচনায় অভিনয়দর্পণ বিশেষ মূল্যবান।

নাট্যপ্রয়োগ

তাণ্ডব ও লাস্য

ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ মর্ত্যে প্রয়োগের জন্য ভরতমুনিকে নির্দেশ দিলেন। ভরতমুনি ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে তার শত পুত্রকে ভারতী, সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তিতে শিক্ষা দেন। তারপর ব্রহ্মা 'কৈশিকী বৃত্তিতে এর প্রয়োগ করতে বলায় ভরতমুনি জানান যে নারী ব্যতীত কেবলমাত্র পুরুষের দ্বারা এর প্রয়োগ অসম্ভব। তখন ব্রহ্মার মানসে অপ্সরাদের সৃষ্টি হয়। ভরতমুনি তখন গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মাধ্যমে নাট্যবেদের সাহায্যে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেন। প্রয়োগকালে দেবাদিদেব মহেশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে মহেশ্বর নিজভক্ত তণ্ডুর মাধ্যমে তাণ্ডব নৃত্য ভরতমুনিকে শিক্ষা দেন।

"সৃষ্টা ভগবতা দণ্ডস্তাণ্ডিনে মুনয়ে তথা।
তাণ্ডিনাপি ততঃ সম্যগ্ গানভাণ্ডসমন্বিতঃ॥
নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টা যঃ স তাণ্ডব ইতিস্মৃতঃ।"

গান ও ভাণ্ডবাদ্যের তালে তালে মুনি তণ্ডু "তাণ্ডব" নৃত্য প্রদর্শন করেন। নাট্যশাস্ত্র মতে তাণ্ডব শৃঙ্গার রস থেকে সৃষ্ট এবং প্রয়োগ সুকুমার ও লীলায়িত গতিবিশিষ্ট। অভিনয়দর্পণের মতে যে নর্তন-এর করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত এবং বৃত্তি আরভটী তাই তাণ্ডব।

তাণ্ডব তিন প্রকার—চণ্ড: প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড। সঙ্গীত-রত্নাকরের মতে অঙ্গহারসমূহের উদ্ধত প্রয়োগের নাম তাণ্ডব। সঙ্গীত দামোদরের মতে তাণ্ডব দুই প্রকার—পেবলি ও বহুরূপ। এও উদ্ধত ভাব প্রকাশক। ভরতের মতানুযায়ী তাণ্ডব নৃত্যে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। নাট্যশাস্ত্রের মতে তাণ্ডব শৃঙ্গার রস থেকে সৃষ্ট সুতরাং তাতে স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তী কালে তাণ্ডব ও লাস্যকে পৃথক করে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্যকে স্ত্রীলোকের জন্যে নির্ধারিত করা হয়।

ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব-এর পরিচয়ে বলেছেন ঃ

"যে গীতকাদৌ যুজ্যন্তে সম্যঙ্ নৃত্যবিভাগকাঃ।
দেবেন বাপি সম্প্রোক্তস্তণ্ডুস্তাণ্ডবপূর্বকম্॥
গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্যমেতৎ প্রবর্ত্যতাম্।
প্রায়েণ তাণ্ডববিধিঃ দেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ॥
সুকুমার প্রয়োগশ্চ শৃঙ্গাররসসম্ভবঃ।
তস্য তণ্ডু প্রত্যুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম্॥"

পার্বতী স্বয়ং লাস্য নৃত্য ভরতমুনিকে শিক্ষা দেন। ভরতমুনি এই তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের প্রচলন করেন মর্ত্যে। আবার পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায় যখন শনিরাজের কোপে মহেশ্বর বাণাসুরের দ্বাররক্ষকরূপে ও পার্বতী বাণাসুরকন্যা উষার পরিচারিকা নিযুক্ত হন তখন পার্বতী উষাকে লাস্য নৃত্য শিক্ষা দেন। উষা আবার দ্বারকাবাসিনী গোপীদের এই নৃত্য শিক্ষা দেন এবং সৌরাষ্ট্রের মেয়েদের মাধ্যমেই মর্ত্যে লাস্য নৃত্যের প্রচলন হয়। অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত আছে ঃ

"বুদ্ধাঽথ তাণ্ডবং তণ্ডোর্মর্ত্যেভ্যো মুনয়োঽবদন্।
পার্বতী ত্বণুশাস্তিস্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম্॥
তয়া দ্বারবতী গোপস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ।
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্য্যো নানাজনপদাস্পদাঃ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্।"

সঙ্গীত-রত্নাকরেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যাই হোক ভরতমুনি তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের বিশেষ ভেদস্বীকার না করলেও পরবর্তীকালের আচার্যেরা ভেদ নির্দেশ করেছেন। শারদাতনয়ের মতে নৃত্ত ও নৃত্য উভয়েই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দুই প্রকার। মধুর রূপ লাস্য ও উদ্ধত রূপ তাণ্ডব। তাঁর মতে রসভাবযুক্ত অঙ্গ চালনা যাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) মিশ্রিত এবং যাতে অঙ্গহার ও লয়গুলি ললিত এবং কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির প্রাধান্য তাই লাস্য। লাস্য চার প্রকার—লতা, পিণ্ডী, ভেদ্যক ও শৃঙ্খল। সঙ্গীতরত্নাকরের মতে লাস্যের প্রয়োগ সুকুমার এবং কামবর্ধক। সঙ্গীতদামোদরের মতে লাস্যের প্রয়োগ সুকুমার এবং তা দুই প্রকার—ছুরিত ও যৌবত। ছুরিত হচ্ছে নায়ক-নায়িকার নৃত্যবশতঃ ভাব-রসের বিকাশ ও যৌবত হচ্ছে নর্তকীবৃন্দ কর্তৃক ললিত মনোমুগ্ধকর মধুর নৃত্য।

নটনভেদ

পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস এই চতুর্বেদাঙ্গযুক্ত কলাকে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

"এতচ্চতুর্ব্বিধোপেতং নটনং ত্রিবিধং স্মৃতম্
নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি মুনিভির্ভরতাদিভিঃ।"

নটনকলা সম্পর্কে নির্দেশ এই যে সর্বদা দর্শন সম্ভব না হলে নাট্য ও নৃত্য উৎসবকালে অবশ্য দর্শনীয়। রাজাভিষেক, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, প্রিয়সঙ্গম, নবজাতকের আবির্ভাব প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্ত অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয় কারণ এটা সৌভাগ্য ও মঙ্গল সূচনা করে।

নাট্য ঃ

"নাট্যং তন্নাটকঞ্চৈব পূজ্যং পূর্বকথাযুতম্"

যা নাট্য, তাই নাটক এবং তা পূজার উপযোগী ও পৌরাণিক কথাযুক্ত। নাট্য শব্দটি থেকে প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। নট ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। সুতরাং যা নৃত্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় তাকে নাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত কাহিনী যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করাই হল নাট্য। নাট্য বলতে আমরা বুঝি কথার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের একাত্মতা ; নাট্য রসাশ্রয় সুতরাং মুদ্রা সমন্বিত ভাব সম্মিলিত ছন্দোময় দেহের লীলায়িত ব্যঞ্জনা।

"গীতেষু যত্ন প্রথমং তু কার্য্যঃ
শয্যা হি নাট্যস্য বদন্তি গীতম্।
গীতে চ বাদ্যে চ হি সংপ্রযুক্তে
নাট্যস্য যোগো ন বিপত্তিমেতি ॥"

নাট্যের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দশরূপককারের মতে "অবস্থানুকৃতির্নাট্যং" অর্থাৎ নাট্য দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত পাত্র-পাত্রীর ভাব, ভাষা, অবস্থার অনুকরণ।

নৃত্ত ঃ

"ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে।"

ভাববিহীন, অভিনয়হীন তাল সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপ অর্থাৎ শুধুমাত্র লীলায়িত দেহের ছন্দোময় প্রকাশকে নৃত্ত বলা যায়। ধনঞ্জয় ও শারদাতনয়ের মতে নৃত্ত, বাক্যার্থাভিনয়-প্রধান। দশরূপককারের মতে তাললয়াশ্রয় নৃত্তের নাম দেশী। শার্ঙ্গদেবের মতে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়বর্জিত সাধারণ অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্ত বলা যায়। অর্থাৎ নৃত্ত বলতে বুঝা যায় তাল ও লয়ের দিকে মনোযোগ রেখে অভিনয়হীন সবিলাস অঙ্গচালনা।

নৃত্য ঃ

"রসভাবব্যঞ্জনাদি যুক্তং নৃত্যমিতীর্য্যতে ॥"

যে নাট্যকলা ভাব, অভিনয়যুক্ত ও রসসমৃদ্ধ হয়, তা-ই নৃত্য। ধনঞ্জয় ও শারদাতনয়ের মতে নৃত্য ভাবাশ্রয়, যা ভাবাশ্রয় তাই পদার্থাভিনয়াত্মক এবং মার্গ নামে খ্যাত। শার্ঙ্গদেব বলেন, আহার্যাভিনয় বর্জিত আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্তনের নাম নৃত্য। সঙ্গীত-দামোদর রচয়িতা শুকম্ভরের মতে দেবগণের রুচিসম্মত তালমানরসাশ্রয় সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য।

নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য নৃত্য ও নৃত্ত এই দুই বিভাগের কোনো উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালে এই বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। এরিস্টটলের পোয়েটিকস্-এ নৃত্যের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ "নৃত্যও অনুকরণ। নৃত্য দৈহিক ছন্দে চরিত্র, ভাবাবেগ ও ঘটনাকে অনুকরণ করে থাকে। ছন্দই (rhythm) হচ্ছে এর বিশেষ উপায় (Dancing imitates character, emotion and action

by rhythmical movement) আসল কথা নৃত্য জীবনেরই অনুকরণ—তবে এই অনুকরণের মাধ্যম হচ্ছে দেহের গতিভঙ্গিমা।"

—' এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব)

নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে নাট্য রসাশ্রয়, নৃত্য ভাবাশ্রয় ও নৃত্ত তাললয়াশ্রয়। নাট্যের দ্বারা দর্শকের মনে রস সঞ্চার হয়, নৃত্যের মাধ্যমে হৃদয়-ভাবের উদ্বোধন ঘটে আর নৃত্ত শোভা সম্পাদন করে।

রঙ্গমণ্ডপ

নাট্যশাস্ত্রের মতে প্রাচীন ভারতের নাট্যগৃহ তিন প্রকার—(ক) চতুরস্র (খ) বিকৃষ্ট (গ) ত্র্যস্র। মাপ অনুযায়ী এগুলি আবার ছোট, বড় ও মাঝারি তিন রকমের হয়। অর্থাৎ নয়টি মাপের রঙ্গমণ্ডপের প্রচলন ছিল। বড় মাপ হচ্ছে ১০৮ হাত, মাঝারি ৬৪ হাত আর ছোট ৩২ হাত। চতুরস্র হচ্ছে চারকোণযুক্ত সমক্ষেত্র (Square), বিকৃষ্ট হচ্ছে আয়তক্ষেত্র (rectangular) ও ত্র্যস্র হচ্ছে ত্রিকোণক্ষেত্র (triangular)।

রঙ্গমঞ্চের দুটি প্রধান অংশ। প্রথম অংশে নেপথ্যগৃহ, দ্বিতীয় রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ ও মত্তবারণী। নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে ঃ

"ত্রিবিধঃ সন্নিবেশশ্চ শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিতঃ।
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপ ॥"

এদের মধ্যে আবার গুণভেদে বিকৃষ্ট উত্তম, চতুরস্র মধ্যম ও ত্র্যস্র কনিষ্ঠ, এবং যথাক্রমে দেবতা, মানুষ ও প্রকৃতিদের জন্যে উত্তম, মধম ও কনিষ্ঠ নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণতঃ মধ্যম মাপের প্রেক্ষাগৃহই (৬৪×৩২) নাট্যাভিনয়ের বেশি উপযোগী ছিল।

নাট্যশাস্ত্রে নাটকের জন্যে পাঁচ প্রকার ভূমির নির্দেশ পাওয়া যায়—(১) সমা, ২) স্থিরা, (৩) কঠিনা, (৪) কৃষ্ণা, (৫) গৌরী। প্রেক্ষাগৃহে শাদা, লাল, হলুদ ও কালো এই চার শ্রেণীর স্তম্ভকে কেন্দ্র করে আসন রচনা করা হত। শাদারঙের স্তম্ভকে বলা হত 'ব্রাহ্মণ স্তম্ভ, এই স্তম্ভের নিচে সুবর্ণ দেওয়া থাকত, ব্রাহ্মণেরা এই সীমানায় আসন গ্রহণ করতেন। লালরঙের স্তম্ভকে বলা হত—'ক্ষত্রিয় স্তম্ভ', এর নিচে তামা দেওয়া থাকত, ক্ষত্রিয়েরা এই সীমানায় আসন গ্রহণ করতেন। হলুদরঙের স্তম্ভকে বলা হত—'বৈশ্যস্তম্ভ', এর নিচে রুপা দেওয়া থাকত, বৈশ্যরা এই সীমানায় বসতেন। গাঢ় নীল বা কালো-রঙের স্তম্ভের নাম ছিল 'শূদ্রস্তম্ভ', এর নিচে লোহা দেওয়া থাকত, শূদ্ররা এই সীমানায় আসন গ্রহণ করতেন। আসনগুলি ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। সম্মুখরঙ্গের পাশে চারটি স্তম্ভের উপর একটি বারান্দা মতন স্থান থাকত। সেখানে সম্ভ্রান্ত দর্শকের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। রঙ্গভূমি চিত্র ও বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে সজ্জিত করা হত। রঙ্গশীর্ষে রঙ্গদেবতার পুজোর ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গপীঠের পার্শ্বে মত্তবারণী। নাট্যশাস্ত্র অনুমোদিত রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ কৌশলে অভিনেতার স্বরক্ষেপণ ও বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিকে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হতে সাহায্য করত।

সূত্রধার পাত্র-পাত্রী

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সূত্রধারের ভূমিকা আসলে নাট্যাচার্যের। ভারতীয় নাট্য নৃত্য,

গীত ও অভিনয়কলার সমন্বয় ; কাজেই সূত্রধারকে প্রায় সর্বকলাপারঙ্গম হতে হত। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী সূত্রধারকে নিম্নোক্ত গুণগুলির অধিকারী হতে হবে।

"চতুরাতোদ্যকুশলঃ শাস্ত্রকর্মসুশিক্ষিতঃ।
নানাপাষণ্ডকার্যজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥
বেশোপচারনিপুণঃ কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।
নানাগতিপ্রচারজ্ঞঃ রসভাববিশারদঃ ॥
নাট্যপ্রয়োগকুশলো নানাশিল্পসমন্বিতঃ।
পাদচ্ছন্দোবিধানজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥
গ্রহনক্ষত্রতত্ত্বজ্ঞো দেহব্যাপারপণ্ডিতঃ।
পৃথিবীদ্বীপবর্ষাণাং পর্বতানাং জলস্য চ ॥
প্রমাণচরিতজ্ঞশ্চ রাজবংশপ্রসূতিবিৎ।
শ্রোতাশাস্ত্রার্থকারণাং শ্রুত্বা চৈবাবধারকঃ ॥
অবধার্য প্রবক্তা চ শক্তশ্চৈবোপদেশনে।
এবং গুণস্তথাচার্যঃ সূত্রধারো বিধীয়তে ॥"

চতুর্বাদ্যনিপুণ, নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী বিভিন্ন কর্মে সুশিক্ষিত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচরণে অভিজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রে নিপুণ, বেশোপচারে ও কামশাস্ত্রে বিজ্ঞ, বিভিন্ন নাট্যোক্ত গতি, চারী ও রসভাবোপলব্ধিতে সুদক্ষ, নাট্য প্রয়োগনিপুণ, বিভিন্ন শিল্প, পাদ ও ছন্দবিধানে জ্ঞানবান, জ্যোতির্বিদ্যা শারীরতত্ত্ব, মানবচরিত্র ভৌগোলিক সংস্থান, পুরাণ ও শাস্ত্রার্থে সুপণ্ডিত এবং মত প্রকাশ ও কর্তব্যনির্ধারণে যোগ্যতাসম্পন্ন গুণী ব্যক্তিই সূত্রধার বা নাট্যাচার্য হবার উপযুক্ত।

এই গুণের তালিকা থেকে সেই সময়ের নাট্যচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সূত্রধারকে সহায়তা করতেন পারিপার্শ্বিক বা প্রধান সহকারী। এছাড়া কর্মীদলে বিদূষক, নট, নাট্যকার, মুকুটকার, গায়ক, বাদক, আভরণকার, মালাকার, বেশকার, রজক, চিত্রকর ও কারুশিল্পী এই বারো রকমের লোক থাকত।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যকলার প্রকৃত অধিকারিণী নর্তকীকে বুদ্ধি, সত্ত্ব, সুন্দর অথচ স্বাভাবিক রূপবিশিষ্ট, তাললয়ে দক্ষ, পরিপূর্ণ যৌবন, শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্য, শিক্ষণীয় বস্তুর স্মরণশক্তি, শিক্ষায় উৎসাহ, নৃত্যগীতে নৈপুণ্য, লজ্জা-ভয়-শ্রম-সহিষ্ণুতা, উৎসাহ প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত আছে ঃ

"তন্বী রূপবতী শ্যামা পীনোন্নতপয়োধরা ॥
প্রগল্ভা সরসা কান্তা কুশলা গ্রহমোক্ষয়োঃ
বিশাললোচনা গীতবাদ্যতালানুবর্তিনী।

পরার্ঘ্যভূষাসম্পন্না প্রসন্নমুখপঙ্কজা।
এবংবিধগুণোপেতা নর্তকী সমুদীরিতা॥"

তন্বী, রূপবতী, পীনোন্নতপয়োধরা, প্রগল্‌ভা, রসিকা, বিশালনয়না, গীতবাদ্য ও তাললয়ে দক্ষ, মূল্যবান মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিতা, কমনীয় লাবণ্যযুক্ত ও প্রসন্ন-মুখপঙ্কজবিশিষ্টা গুণযুক্তা নর্তকীই নটনকলার অধিকারী।

সঙ্গীতরত্নাকরের মতে অঙ্গসৌষ্ঠব, রূপসম্পদ অর্থাৎ সুন্দর বদনমণ্ডল, বিম্বাধর, বিশাল নয়ন, কম্বুগ্রীবা, সুচারু দশন, ক্ষীণ কটি, স্থূল নিতম্ব, সঞ্চারিণী পল্লবিনী বাহুলতা, নাতিখর্ব, নাতিদীর্ঘ, নাতিপীন, শিরাপ্রকাশহীন দেহ, শ্যাম অথবা গৌরবর্ণা, লাবণ্য, কান্তি, মাধুর্য, ঔদার্য ও প্রাগল্‌ভ্য প্রভৃতি গুণযুক্তা হলেই সেই নর্তকী নটনকলার শ্রেষ্ঠ পাত্র রূপে বিবেচিত হবে।

সঙ্গীত-মকরন্দ অনুযায়ী রূপের তারতম্য অনুসারে নর্তকী হস্তিনী, শঙ্খিনী, চিত্রিনী ও পদ্মিনী এই চার প্রকারের ও বয়সের তারতম্য অনুসারে বালা, তরুণী ও বিদগ্ধযৌবনা এই তিন প্রকারের। সুলক্ষণযুক্ত দেহ, পদ্মের ন্যায় আরক্ত কোমল করতল পদতল ও বদনমণ্ডল, রম্য কপোলযুগল, বিশাল কুচযুগ, কুসুমসজ্জিত কবরী-রচনা, সলাজ মৃদু মধুর বাণী, মরালীর মত সাবলীল গতি, নৃত্য গীত নিপুণতা, রসলাস্য-মদির তনুভঙ্গিমা, গান্ধর্বশাস্ত্রে দক্ষতা, মনোহাবিত্ব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হলে সেই নর্তকী উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি আদর্শ নর্তকীদের সমতুল্য বলে গণ্য হবে।

নর্তক হবে সুরূপ, মধুরকণ্ঠ, বিদ্বান, দক্ষ, বাগ্মী, অভিজাত, কলা ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিৎ, নৃত্যগীতবাদ্যনিপুণ, আত্মনির্ভরশীল, প্রত্যুৎপন্নমতি ও পরিহাসপ্রিয়।

নর্তক ও নর্তকীর গুণের এই বিবরণ থেকেই নাট্যশাস্ত্রকারদের সৌন্দর্যজ্ঞান, রসবোধ ও নৃত্যকলার প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই গুণগুলি অর্জন করার জন্যে তখনকার শিল্পিদের যে কঠোর সাধনা করতে হত তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

বৃত্তি

আচার্য ভরত ব্রহ্মার আদেশানুযায়ী নাট্যবেদকে ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী এই চারি বৃত্তিতে প্রয়োগ করেন। বৃত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে আছে ঃ

"ভারতী সাত্ত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা।
চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতা যাসু নাট্য-প্রতিষ্ঠিতা॥"

বৃত্তি এক কথায় মনের ধর্ম। চরিত্ররূপায়ণে কাহিনীর রসোদ্‌ভাবন অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীর চিত্তের বিকাশ ও বিস্তারে বৃত্তিই প্রধান সহায়ক। কোমল-প্রৌঢ় ও কোমল অর্থ প্রকাশক বৃত্তি হচ্ছে ভারতী। পুরুষ চরিত্র রূপায়ণে এই বৃত্তি বেশি অনুসৃত হয়। প্রৌঢ় ও কোমলপ্রৌঢ় অর্থ প্রকাশক সাত্ত্বতী বৃত্তি বীর, অদ্ভূত ও রৌদ্ররসানুকূল কর্মে এবং সামান্য করুণ ও শৃঙ্গার রস প্রসঙ্গে অনুসৃত হয়। সুকুমার অর্থ প্রকাশক কৈশিকী বৃত্তি শৃঙ্গার রসের অনুকূল ভাব প্রকাশে অনুসৃত হয়। প্রৌঢ় অর্থ প্রকাশক

আরভটী বৃত্তি দম্ভ, মিথ্যাচার, ইন্দ্রজাল, অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি ভাব প্রকাশে অনুসৃত হয়।

সিদ্ধি

অনুষ্ঠানকালে দর্শকের অভিব্যক্তি থেকেই সিদ্ধির লক্ষণ বোঝা যায়। নাট্যশাস্ত্র মতে সিদ্ধি দুই প্রকার—দৈবী ও মানুষী।

জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ ও অভিভূত দর্শকবৃন্দ যখন স্তব্ধ ভাব প্রকাশ করেন তখন তাকে দৈবী সিদ্ধি বলা যায়। আব যখন দর্শকবৃন্দ অনুষ্ঠানের ঘটনা ও সংস্থাপনের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি উচ্ছ্বাসসহকারে ব্যক্ত করেন, এবং প্রশংসাসূচক ধ্বনি বা করতালি দ্বারা আবেগ প্রকাশ করেন, অথবা উৎসাহ দেবার জন্যে নট-নটীদের পুরস্কার দান করেন, তখন তাকে মানুষী সিদ্ধি বলা যায়।

অভিনয়

"তত্র ত্বভিনয়স্যৈব প্রাধান্যমিতি কথ্যতে।
আঙ্গিকো বাচিকস্তদাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকোঽপরঃ॥
চতুর্ধাভিনয়স্তত্র আঙ্গিকাহঙ্গৈর্নির্দেশিতঃ।
বাচা বিবচিতঃ কাব্যনাটকাদিষু বাচিকঃ॥
আহার্য্যো হারকেয়ূরবেষাদিভিরলঙ্কৃতঃ।
সাত্ত্বিকঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈর্ভাবজ্ঞেন বিভাবিতঃ॥"

অভিনয় চার প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর যে চলন তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। কাব্য, নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস ঋগবেদ, ভাব সঞ্চারী। নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্র অলঙ্করণের অঙ্গসজ্জা, বসনভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আহার্য অভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে ভাবের সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী।

এই অভিনয়ভেদ নৃত্যকলার অন্যতম বিস্তৃত আলোচনাযোগ্য বিষয়। সেজন্যে আলাদা ভাবে শ্রেণী ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

আঙ্গিক অভিনয়

পূর্বেই বলা হয়েছে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর চলনের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। এর উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহের মাধ্যমে এই অভিনয় হয়। শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, কটি, পার্শ্বদ্বয় ও পদদ্বয়—এই ছয়টি প্রধান অঙ্গ। কেউ কেউ গ্রীবাকেও অঙ্গ বলে গণ্য করেন। স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, ঊরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়—এই ছয়টি প্রত্যঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রের মতে নেত্র, ভ্রূ, নাসা, অধর, কপোল ও চিবুক—এই ছয়টি উপাঙ্গ। অভিনয়-দর্পণের মতে—নেত্র, ভ্রূ, অক্ষিপুট, অক্ষিতারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, গণ্ডাস্থি, অধর, দন্তপঙ্ক্তি, জিহ্বা, চিবুক, মুখ। মনে রাখতে হবে অঙ্গগুলির চলনেই প্রত্যক্ষ উপাঙ্গগুলি চালিত হয়।

আঙ্গিক অভিনয় আবার নাট্যশাস্ত্রের মতে তিন প্রকার—ক মুখজ, খ) চেষ্টাকৃত ও গ) শারীর। মুখজ অভিনয় বলতে শির, চক্ষু প্রভৃতির বিভিন্ন সঞ্চালন ও প্রয়োগ বোঝায়। চেষ্টাকৃত অভিনয় বিভাগে হস্তাভিনয় প্রধান। আর বক্ষোদেশ, উদর, পার্শ্ব, কটি, ঊরু, জঙ্ঘা প্রভৃতির সঞ্চালন ও প্রয়োগের মাধ্যমের শারীর অভিনয়। প্রতীকধর্মী অঙ্গাভিনয় ভারতীয় নৃত্যকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শিরকর্ম

"সমমুদ্বাহিতমধোমুখমালোলিতং ধুতম্ ॥
কম্পিতঞ্চ পরাবৃত্তমুৎক্ষিপ্তং পরিবাহিতম্।
নবধা কথিতং শীর্ষং নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥"

অভিনয় দর্পণের মতে সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত—এই নয়টি শিরকর্ম। নাট্যশাস্ত্র মতে শিরকর্ম তের প্রকার, যথা—আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত।

সম : স্বাভাবিক অবস্থায় শির নিশ্চলভাবে থাকিলে তাহা সমশির অবস্থা। নৃত্যের আরম্ভে, জপের সূচনায়, গর্ব, কপটক্রোধ, স্তম্ভন ও নিষ্ক্রিয় ভাব প্রদর্শনে সমশিরের প্রয়োগ হয়।

উদ্বাহিত : ঊর্ধ্বদিকে মুখ উন্নত করলে উদ্বাহিত শির অবস্থা হয়। ধ্বজ, চন্দ্র, আকাশ, পর্বত, আকাশচারী, বস্তু প্রভৃতি দর্শনের ভাব প্রকাশে উদ্বাহিত শিরের প্রয়োগ হয়।

অধোমুখ : নিম্নমুখে স্থিত অবস্থায় অধোমুখ শির হয়।
লজ্জা, খেদ, প্রণাম, দুশ্চিন্তা, মূর্ছা, পদতলে পতিত বস্তু প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অধোমুখ শিরের প্রয়োগ হয়।

আলোলিত : মণ্ডলাকারে চারিদিকে চঞ্চলভাবে শির চালনা করলে আলোলিত শির হয়।

নিদ্রাবেশ, অসহনীয় অবস্থা, মূর্ছা, মত্তাবস্থা, ভূতগ্রস্থ অবস্থা, উন্দামতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশে আলোলিত শিরের প্রয়োগ হয়।

ধূত ঃ বাম ও দক্ষিণ দিকে শির চালনা করলে ধূতশির হয়।
বিস্ময়, বিষাদ, অনিচ্ছা প্রকাশ, শীতার্ত, ভীত, মত্ত, নিষেধ, ক্রোধ ও অসহ্য ভাব প্রকাশে, নিজ অঙ্গ অবলোকন, অপরকে পাশ থেকে ডাকা প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ধূতশিরের প্রয়োগ হয়।

কম্পিত ঃ উপরে ও নিচে দ্রুতভাবে মস্তক সঞ্চালন করলে কম্পিত শির হয়।
ক্রোধে, স্তব্ধ হওয়া, প্রশ্ন, গণনায়, তর্জন, আবাহন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে কম্পিত শিরের প্রয়োগ হয়।

পরাবৃত্ত ঃ মস্তককে পিছন দিকে ফেরালে পরাবৃত্ত শির হয়।
ক্রোধ অথবা লজ্জায় মুখ ফেরানো, অনাদরে, কেশবন্ধনে, শর গ্রহণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পরাবৃত্ত শিরের প্রয়োগ হয়।

উৎক্ষিপ্ত ঃ প্রথমে পার্শ্বে ও পরে ঊর্ধ্বদিকে মস্তক চালনা করলে উৎক্ষিপ্ত শির হয়।
স্বীকৃতি, অঙ্গীকার, এসো, যাও প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে উৎক্ষিপ্ত শিরের প্রয়োগ হয়।

পরিবাহিত ঃ দুই দিকে চামরের মতো মস্তক সঞ্চালন করলে পরিবাহিত শির হয়।
মোহ, বিরহ, স্তুতি, সন্তোষ, অনুমোদন, বিচার, চিন্তা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পরিবাহিত শিরের প্রয়োগ হয়।

আকম্পিত ঃ শির ধীরে ধীরে ঊর্ধ্ব ও অধোদেশে সঞ্চালিত হলে আকম্পিত শির হয়। ইহা সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া, প্রশ্ন করা, সম্বোধন করা, নির্দেশ দেওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

বিধূত ঃ বাম ও দক্ষিণ দিকে দ্রুতগতিতে আন্দোলিত অবস্থায় বিধূত শির হয়।
মদ্যাসক্ত, শীতগ্রস্ত, ভীত ত্রস্তভাব প্রকাশ করে।

অঞ্চিত ঃ গ্রীবাদেশ পার্শ্বদেশে অল্প ঘোরা অবস্থায় নত হলে অঞ্চিত শির হয়।
ব্যাধি, মূর্ছা, উদ্বেগ, মত্ততা, বেদনার্ত ভাব, চিন্তা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

অবধূত ঃ শির নিম্নমুখে আক্ষিপ্ত অবস্থায় অবধূত শির হয়। দেবপ্রণাম, নিকটে আসবার সংকেত, সংবাদজ্ঞাপন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

নিহঞ্চিত ঃ স্কন্ধ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ও গ্রীবা পার্শ্বদেশে আনত অবস্থায় নিহঞ্চিত শির হয়। এ স্ত্রীলোকের পক্ষে আচরণীয়। গর্ব, মান, বিলাস, কৃত্রিম কোপ, নীরব স্নেহাভিব্যক্তি, ঔদাসীন্য ভাব প্রকাশ করে।
এসকল শিরঃকর্ম ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রের মতে লোক-স্বভাব অনুযায়ী শিল্পী বিভিন্ন শিরকর্মের ব্যবহার করতে পারেন।

"সমমালোকিতং সাচী প্রলোকিতনিমীলিতে।
উল্লোকিতানুবৃত্তে চ তথা চৈবাবলোকিতম্॥
ইত্যষ্টৌ দৃষ্টিভেদাঃ স্যুঃ কীর্তিতা পূর্বসূরিভিঃ।"

অভিনয়দর্পণের মতে সম, আলোকিত, সাচী, প্রলোকিত, মীলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত—এই আট প্রকার দৃষ্টিভেদ। নাট্যশাস্ত্রের মতে আট প্রকার রসদৃষ্টি। আট প্রকার স্থায়ী ভাবদৃষ্টি ও কুড়ি প্রকার সঞ্চারী ভাবদৃষ্টি অর্থাৎ মোট ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টিভেদ আছে।

কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুতা, রৌদ্রী, বীরা ও বীভৎসা—আটটি রসদৃষ্টি। স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা, বিস্মিতা—এই আটটি স্থায়ী ভাবদৃষ্টি। শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্বিতা, গ্লানা, শঙ্কিতা, বিষণ্ণা, মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিহ্মা, ললিতা, বিতর্কিতা, অর্ধমুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, আকেকরা, বিকোশা, ত্রস্তা ও মদিরা—এই কুড়ি প্রকার সঞ্চারী ভাবদৃষ্টি।

সমদৃষ্টি ঃ স্বাভাবিক সৌম্যভাবযুক্ত দৃষ্টিকে সমদৃষ্টি বলে।
নৃত্যের সূচনায়, তুলনায়, অন্যের চিন্তা নির্ণয়ে, প্রসন্ন স্মিতভাব, দেব প্রতিমা বর্ণন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে সমদৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

আলোকিত ঃ বিস্ফারিত দর্শন ও চক্ষু তারকার সঞ্চালনে আলোকিত দৃষ্টি হয়।
চক্রের আবর্তন, অনুরোধ, সকল বস্তু প্রদর্শন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে আলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

সাচী ঃ অপাঙ্গে তাকালে সাচীদৃষ্টি হয় অর্থাৎ মাঝখান থেকে চোখের পাশের দিকে টেরচাভাবে দেখা।
কার্যের সূচনা, ইঙ্গিত, বাণের লক্ষ্যস্থির করা, স্মরণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সাচীদৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

প্রলোকিত ঃ উভয় দিকে দৃষ্টি চালনা করলে প্রলোকিত হয়।
উভয় পার্শ্বের বস্তু নির্দেশে, বুদ্ধির জড়তা, তুলনা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

মীলিত ঃ অর্ধবিকশিত দৃষ্টিকে মীলিত দৃষ্টি বলা হয়।
ধ্যান, জপ, সর্প, প্রার্থনা, নমস্কার, উন্মত্ততা, সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে মীলিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

উল্লোকিত ঃ উপর দিকে দৃষ্টিপাত করলে উল্লোকিত দৃষ্টি হয়।
ধ্বজাগ্র-দর্শন, দেবমণ্ডল, উচ্চতা, জ্যোৎস্না, পূর্বজন্ম প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে উল্লোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

অনুবৃত্ত ঃ দ্রুতবেগে উপরে ও নিচে দৃষ্টি চালনা করিলে অনুবৃত্ত দৃষ্টি হয়।
ক্রোধ প্রদর্শন, প্রিয় আবাহন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অনুবৃত্ত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

অবলোকিত ঃ নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অবলোকিত দৃষ্টি হয়। ছায়াদর্শন, চিন্তা, পরামর্শ, পাঠশ্রম, নিজ অঙ্গ অবলোকন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে অবলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

কান্তা ঃ প্রণয়ানুভূতিতে চোখ কুঞ্চিত এবং তির্যকভাবে দর্শন-এর অবস্থাই কান্তা-দৃষ্টি। এটাই রসদৃষ্টি কান্তা ও ভাবদৃষ্টি স্নিগ্ধা।

ভয়ানকা ঃ চোখের পাতা নিশ্চল অবস্থায় কপালের দিকে উঠে থাকবে। চোখের মণি চঞ্চল। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি ভয়ানকা ও ভাবদৃষ্টি ভয়াম্বিতা।

হাস্যা ঃ এই অবস্থায় চোখের পাতা কুঞ্চিত, চোখের মণি গতিশীল ও অল্প দৃশ্যমান, এই অবস্থাই রসদৃষ্টি হাস্যা ও ভাবদৃষ্টি হৃষ্টা।

করুণা ঃ চোখের উপরের পাতা স্থির হয়ে নত অবস্থায় থাকবে, চোখের মণিও অচঞ্চল। দৃষ্টিও স্থির, অশ্রুর আভাস। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি করুণা ও ভাবদৃষ্টি দীনা।

অদ্ভুতা ঃ চোখের বাইরে কোণে পাতা একটু বেঁকে থাকবে। চোখের মণি সম্পূর্ণ দৃশ্যমান এই অবস্থাই রসদৃষ্টি অদ্ভুতা ও ভাবদৃষ্টি বিস্মিতা।

রৌদ্রী ঃ চোখের পাতা নিশ্চল, মণি বিক্ষুব্ধ ও লোহিতবর্ণ। ভ্রূকুঞ্চিত ও দৃষ্টি স্থির। এই অবস্থায় রসদৃষ্টি রৌদ্রী ও ভাবদৃষ্টি ক্রুদ্ধা।

বীরা ঃ চোখ সম্পূর্ণ খোলা থাকবে। চোখের মণি মাঝখানে বিক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করবে ও দৃষ্টি উজ্জ্বল। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি বীরা ও ভাবদৃষ্টি দৃপ্তা।

বীভৎসা ঃ এক চোখের কোণ সংকুচিত, অপর চোখ প্রায় বন্ধ। বিকর্ষণ জাতীয় অনুভূতিতে চোখের মণি অস্থির। চোখের পাতা অচঞ্চল থাকবে। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি বীভৎসা ও ভাবদৃষ্টি জুগুপ্সিতা।

উপরোক্ত এই ষোলটি রসদৃষ্টি ও স্থায়ী ভাবদৃষ্টি। এ ছাড়া বলা হয়েছে সঞ্চারী ভাবদৃষ্টি কুড়িটি।

শূন্যা ঃ চোখের পাতা ও মণি স্বাভাবিক কিন্তু দৃষ্টি দুর্বল, গতিহীন ও প্রাণহীন। বহির্জগতের কোনো কিছুই যেন চোখে পড়ছে না। ইহা মানসিক অসামর্থতা, উদ্বেগ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

মলিনা ঃ চোখের পাতা অচঞ্চল। দীপ্তিহীন অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি। ইহা রক্ত-হীনতা, ক্লান্তি, গভীর বেদনা, অনুৎসাহ, বিবর্ণতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

শ্রান্তা ঃ চোখের মণি গতিহীন। চোখের পাতা যেন অবসাদভারে বুজে আসছে। ইহা চিন্তাক্লিষ্ট, শ্রমক্লান্ত প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

লজ্জান্বিতা ঃ দৃষ্টি নিচের দিকে নিবদ্ধ, চোখের পাতা অল্প অবনত হয়ে যেন নেমে আসছে। ইহা লজ্জাভাব প্রকাশ করে।

গ্লানা ঃ চোখের মণি যেন শ্রান্তিতে কাতর। ভ্রূ ও চোখের পাতা অল্প কাঁপবে। ইহা রোগ, দুর্বলতা, শ্রমজনিত আলস্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

শঙ্কিতা ঃ সতর্ক দৃষ্টি কখনো স্থির কখনো কম্পিত হয়ে চারিদিক দেখছে। চোখের পাতা মাঝে মাঝে তির্যকভাবে ওপরে উঠবে। ইহা আশঙ্কা, শঙ্কিত ভাব প্রকাশ করে।

বিষণ্ণা ঃ চোখের পাতা স্থির, মণি নিচের দিকে নিশ্চল। দৃষ্টি দীপ্তিহীন। ইহা গভীর বেদনা, শোকার্ত ভাব প্রকাশ করে।

মুকুলা ঃ চোখের পাতা অল্প কাঁপবে। দৃষ্টিতে আবেগময় অনুজ্জ্বলতা। ইহা ঘুম, স্বপ্নদর্শন, সুখাবিষ্ট ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে।

কুঞ্চিতা ঃ চোখের পাতা কোণের দিকে বাইরে কুঁচকে থাকবে। দৃষ্টি তির্যক। ইহা ঈর্ষা, অবাঞ্ছিত বস্তু কষ্ট করে দেখা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

অভিতপ্তা ঃ চোখের পাতা ও মণি অল্প অল্প কম্পিত হবে। দৃষ্টি দীপ্তিহীন। ইহা বিপদ, আকস্মিক আঘাত, উৎসাহভঙ্গজনিত দুঃখ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

জিহ্মা ঃ চোখের পাতা কুঁচকে অল্প ঝুলে থাকবে। দৃষ্টি চকিত-তির্যক। ইহা ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

ললিতা ঃ উজ্জ্বল প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি। ভ্রূ অল্প নড়বে। চোখের কোণের শেষাংশ অল্প কুঞ্চিত হয়ে মধুর অনুভূতি প্রকাশ করবে। ইহা আনন্দের উজ্জ্বলতা, ভোগ, প্রীতি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিতর্কিতা ঃ চোখের পাতা সম্পূর্ণভাবে উপরের দিকে উঠবে। চোখের মণি সঞ্চরণশীল ও সম্পূর্ণ দৃশ্যমান। ইহা স্মরণ করা, কল্পনায় কিছু দেখার চেষ্টা করা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

অর্ধমুকুলা ঃ চোখ তৃপ্তির আবেশে অর্ধমুদিত। অল্প সঞ্চরণশীল চোখের মণি। ইহা সুগন্ধের ঘ্রাণ, সুখদ স্পর্শের অনুভূতির আনন্দ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিভ্রান্তা ঃ প্রসারিত দৃষ্টি। চোখের পাতা ও মণি চঞ্চল। ইহা উদ্‌ভ্রান্তি, উত্তেজনা, কী করা কর্তব্য এই চিন্তা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিপ্লুতা ঃ চোখের পাতা প্রথমে কম্পমান অবস্থা থেকে নিশ্চল হয়ে আসবে। পাতা নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের মণি চঞ্চল হয়ে উঠবে। ইহা অপ্রকৃতিস্থতা, বিমূঢ়তা, বিরক্তি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

আকেকরা ঃ অর্ধমুদিত চক্ষু, শেষ প্রান্ত অল্প কুঞ্চিত। চোখের মণি যেন চঞ্চলতা দমন করে স্থির হতে চাইছে। ইহা বস্তুর পৃথকীকরণ, দূরের জিনিসের স্বরূপ নির্ণয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিকোশা ঃ চোখের পাতা ও মণি অচঞ্চল ও স্থির। দৃষ্টি নিথর অথচ উজ্জ্বল। পূর্ণদৃষ্টি, ঘৃণা, গর্ব, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

ত্রস্তা ঃ খোলা চোখ বিস্ফারিত। চোখের মণি কম্পমান। ইহা ভয়, আতঙ্ক প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

মদিরা ঃ মত্তাবস্থায় বিভিন্ন অবস্থায় এর ভাব। কম নেশায় চোখ টেনে তাকানো। নেশা কিছু গাঢ় হলে চোখ ভারী হয়ে আসবে। নেশা আরো তীব্র

হলে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে। চোখের ভিতরের কোণ কুঁচকে থাকবে। চোখের মণি প্রায় দেখা যাবে না।

এই দৃষ্টিগুলি চোখের মণি, পাতা, ভ্রূ প্রভৃতির পরিপূরক সঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবের সার্থক রূপদান করে।

তারাকর্ম

"ভ্রমণং বলনং পাতঃ চলনং সম্প্রবেশনম্।
নিবর্তনং সমুদ্বৃত্তং নিষ্ক্রামং প্রাকৃতং তথা॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে ভ্রমণ, বলন, পাতন, চলন, সম্প্রবেশন, নিবর্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিষ্ক্রামণ ও প্রাকৃত—এই নয় প্রকার তারাকর্ম প্রচলিত।

তারাদ্বয় মণ্ডলাকারে ঘুরলে ভ্রমণ, ত্রিকোণাকারে ঘুরলে বলন, নিচের দিকে তারার বিশ্রান্ত ও ত্রস্ত ভাব হলে পাতন, তারার দ্রুত কম্পন হলে চলন, তারা ভিতরের দিকে আকর্ষিত হলে সম্প্রবেশন। তারা তির্যক কটাক্ষপাত করলে নিবর্তন, তারাদ্বয় বাম হতে দক্ষিণে সমুন্নত অবস্থায় চঞ্চল হলে সমুদ্বৃত্ত, তারাদ্বয় সামনের দিকে দীপ্তভাবে বহির্গত হলে নিষ্ক্রামণ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রাকৃত অবস্থা বলা হয়।

সাধারণভাবে শৌর্য, বীর্য, ক্রোধ প্রকাশে অর্থাৎ বীর ও রৌদ্ররসে ভ্রমণ, চলন, সমুদ্বৃত্ত ও নিষ্ক্রামণ-এর প্রয়োগ হয়। চলন ও নিষ্ক্রামণ ভয় বোঝাতেও প্রয়োগ হয়। হাস্য ও বীভৎস রসে সম্প্রবেশন, শৃঙ্গার রসে নিবর্তন, করুণ রসে পাতন ও অদ্ভুত রসে নিষ্ক্রামণ-এর প্রয়োগ হয়। স্বাভাবিক প্রাকৃত সব রসেই প্রয়োগ হয়ে থাকে।

পুটকর্ম

"উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ প্রসৃতং কুঞ্চিতং সমম্।
বিবর্তিতং চ স্ফুরিতং পিহিতং চ বিলোলিতম্॥"

নাট্যশাস্ত্রমতে উন্মেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিত, সম, বিবর্তিত, স্ফুরিত, পিহিত ও বিলোলিত—এই নয় প্রকার পুটকর্ম প্রচলিত।

পুটদ্বয় বিশ্লিষ্ট অবস্থায় উন্মেষ, সংযুক্ত অবস্থায় নিমেষ, পুটদ্বয়ের মধ্যে বিস্তৃত ব্যবধান থাকলে প্রসৃত, সঙ্কুচিত অবস্থায় কুঞ্চিত, স্বাভাবিক অবস্থায় সম, উদ্বৃত্ত অবস্থায় বিবর্তিত, কম্পমান অবস্থায় স্ফুরিত ও আহত অবস্থায় বিলোলিত ভাব প্রকাশ করে।

উন্মেষ, নিমেষ ও বিবর্তিত ক্রোধ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। ঘ্রাণ গ্রহণ, স্পর্শ বোঝাতে কুঞ্চিত। বিস্ময়, আনন্দ ও বীরভাব প্রকাশে প্রসৃত; রতিভাব প্রকাশে সম, ঈর্ষা প্রকাশে স্ফুরিত; সুপ্তি, মূর্ছা, উষ্ণতা, ঝড়, চক্ষুপীড়া প্রভৃতি প্রকাশে পিহিত ও আহত ভাব প্রকাশে বিলোলিত-এর প্রয়োগ হয়।

ভ্রূ কর্ম

"উৎক্ষেপপাতনং চৈব ভ্রূকুটি চতুরং ভ্রুবাঃ।
কুঞ্চিতং রেচিতং কর্ম সহজং চেতি সপ্তধা॥"

নাট্যশাস্ত্রমতে উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রূকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ–এই সাত প্রকার ভ্রূকর্ম আঙ্গিকাভিনয়ে প্রচলিত।

ভ্রূদ্বয়ের একই সঙ্গে অথবা পর পর সমুন্নত অবস্থাকে উৎক্ষেপ বলা হয়। হাব, হেলা, লীলা, কোপ, বিতর্ক, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বোঝাতে সাধারণতঃ একটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং বিস্ময়, হর্ষ ক্রোধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশে একযোগে দুইটি ভ্রূ-ই উৎক্ষিপ্ত হয়। নিচের দিকে একই সঙ্গে দুটি ভ্রূ নত হলে পাতন হয় এবং হাস্য, ঘ্রাণ, অসূয়া, জুগুপ্সা ভাব রূপায়ণে প্রযুক্ত হয়। মূল থেকে ভ্রূদ্বয় উৎক্ষিপ্ত হলে ভ্রূকুটি হয় এবং ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে। ভ্রূদ্বয় মধুরভাবে সঞ্চালিত হয়ে আয়ত হলে চতুর হয় এবং শৃঙ্গার, লালিত্য, সৌম্য সুখস্পর্শ প্রবোধদান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। একটি অথবা উভয় ভ্রূকে বঙ্কিম করলে কুঞ্চিত ভ্রূ হয় এবং ইহা স্নেহ, স্মিতভাব, গর্ব কৃত্রিম ভাব প্রকাশ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। কুঞ্চিত ভ্রূ মহিলা-শিল্পীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশিত। সৌষ্ঠবযুক্ত ও ললিতভাবে একটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হলে রেচিত হয় এবং নৃত্যে এর প্রয়োগ অধিক প্রচলিত। স্বাভাবিক ভ্রূ-কর্মকে সহজ বলা হয় এবং সকল স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে এর প্রয়োগ হয়।

নাসাকর্ম

"নতা মন্দা বিকৃষ্টা চ সোচ্ছ্বাসানুবিকূণিতা।
স্বাভাবিকী হৃদি বুধৈঃ ষড়বিধা নাসিকাস্মৃতা।"

নাট্যশাস্ত্রমতে নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছ্বাসা, বিকূনিতা ও স্বাভাবিকী–এই ছয় প্রকার নাসাকর্ম প্রচলিত।

নাসাপুট মুহুর্মুহুঃ সংশ্লিষ্ট হলে নতা এবং ইহা বিষাদ ও মৃদু রোদন অর্থ প্রকাশ করে। নাসাপুট স্থির অবস্থায় মন্দা এবং নির্বেদ, চিন্তা ও ঔৎসুক্য ভাব প্রকাশ করে। নাসাপুট স্ফুরিত অবস্থায় বিকৃষ্টা এবং ইহা শ্বাসগ্রহণ, ক্রোধ, ভয়, দুর্গন্ধ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। নাসারন্ধ্র সংকুচিত করে বাতাস গ্রহণকালে সোচ্ছ্বাসা এবং ইহা দীর্ঘনিশ্বাস, সুগন্ধি ঘ্রাণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। নাসা কুঞ্চন করলে বিকূনিতা এবং ইহা কৌতুক, ঈর্ষা, জুগুপ্সা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিকী নাসা এবং ইহা সকল স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে।

গণ্ডকর্ম

"ক্ষামং ফুল্লং চ পূর্ণং চ কম্পিতং কুঞ্চিতং সমম্।
ষড়বিধং গণ্ডমুদ্দিষ্টমস্য লক্ষণমুচ্যতে॥"

নাট্যশাস্ত্রমতে ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম–এই ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম প্রচলিত।

ভারাবনত অবস্থাকে ক্ষাম বলা হয় এবং ইহা বিষাদ ভাব প্রকাশ করে। বিকশিত উৎফুল্ল অবস্থানকে ফুল্ল এবং ইহা আনন্দ প্রকাশ করে। উন্মত অবস্থাকে পূর্ণ ইহা গর্ব ও উৎসাহ ভাব প্রকাশ করে। কম্পমান অবস্থাকে কম্পিত এবং ইহা ক্রোধ ও হর্ষাতিশয্য

ভাব প্রকাশ করে। সংকুচিত অবস্থাকে কুণ্ঠিত এবং ইহা শীতার্ততা, ভয়, জ্বর, উষ্ণ, স্পর্শ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সম গণ্ডের প্রয়োগ।

অধরকর্ম

"বিবর্তনং কম্পনং চ বিসর্গো বিনিগুহণম্।
সংদষ্টকং সমুদ্গশ্চ ষড়কর্মান্যধরস্য তু॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে বিকর্তন, কম্পন, বিসর্গ বিনিগূহণ, সংদষ্ট ও সমুদ্গক—এই ছয় প্রকার অধর কর্ম প্রচলিত।

সংকুচিত অবস্থায় বিকর্তন এবং ইহা বেদনা, অবজ্ঞা, অস্বাচ্ছন্দ্য, অসূয়া প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। কম্পমান অবস্থায় কম্পন এবং ইহা ক্রোধ, ভয়, দুর্বলতা, জয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ললিত সংবন্ধ অবস্থায় বিসর্গ এবং ইহা রমণীর বিলাস, চুম্বন, উপেক্ষা রঞ্জনা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। অধর দষ্ট অবস্থায় সংদষ্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে। গোলাকৃতি অবস্থায় সমুদ্গক এবং ইহা অভিনন্দন জ্ঞাপন, দেহচাঞ্চল্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

দন্তকর্ম

"কুট্টনং খণ্ডনং ছিন্নং চিকিতং লেহনং সমম্।
দষ্টং চ দন্তক্রিয়য়া চিবুকস্যেহ বক্ষ্যতে॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চিকিত, লেহন, সম ও দষ্ট—এই সাত প্রকার দন্তকর্ম প্রচলিত।

দন্ত সংঘর্ষিত অবস্থায় কুট্টন এবং ইহা ভয়, শীত, জ্বর ও ক্রোধগ্রস্ততা ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় পুনঃপুন পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে এবং দন্ত বিযুক্ত অবস্থায় থাকিলে খণ্ডন এবং ইহা প্রার্থনা, বিবাদ, আগমন, অধ্যয়ন, আলাপ, ভক্ষণ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত অবস্থায় ছিন্ন এবং ইহা মৃত্যু, ব্যাধিভয়, শীতার্ততা, ব্যায়াম প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় দূরে বিচ্যুত অবস্থায় চিকিত এবং জৃম্ভণে প্রযুক্ত হয়। জিহ্বার দ্বারা লেহিত অবস্থায় লেহন এবং ইহা লোভ ও বিমূঢ় ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠ দংশিত অবস্থায় দষ্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় অল্প বিবৃত অবস্থায় সম এবং ইহা স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

গ্রীবাকর্ম

"সমা নতোন্নতা ত্রস্রা রেচিতা কুঞ্চিতাঞ্চিতা।
বলিতা চ নিবৃত্তা চ গ্রীবা নববিধার্থতঃ॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে সমা, নতা, উন্নতা, ত্রস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা ও নিবৃত্তা—এই নয় প্রকার গ্রীবাকর্ম প্রচলিত। অভিনয় দর্পণের মতে সুন্দরী, তিরশ্চীনা, পরিবর্তিতা ও প্রকম্পিতা—এই চার প্রকার গ্রীবাকর্ম।

সমা অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থানে গ্রীবা প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। নত

অবস্থানে নতা গ্রীবা অলংকারবন্ধন, ভূমিতে পতিত বস্তুদর্শন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। উন্নত অবস্থানে উন্নতা গ্রীবা হারকেয়ূরাদি বন্ধন, ঊর্ধ্বস্থিত বস্তুদর্শন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। কম্পিত ও আন্দোলিত অবস্থায় রেচিতা গ্রীবা লালিত্য, ভাব উপলব্ধি ও নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। শিরসহ আনত অবস্থায় কুঞ্চিতা গ্রীবা ভারবহন, গ্রীবারক্ষণ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। সম্মুখভাগে প্রসারিত অবস্থায় অঞ্চিতা গ্রীবা ব্যগ্রতা, কেশবিন্যাস প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। পশ্চাৎভাগে অপসারিত অবস্থায় বলিতা গ্রীবা পিছনের বস্তুদর্শন ভাব প্রকাশ করে। যুগপৎ সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে আন্দোলিত অবস্থায় নিবৃত্তা গ্রীবা পক্ষীগ্রীবাভঙ্গী বর্ণনা, বিশেষ দৃষ্টি সংস্থাপন প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

তির্যক ভঙ্গীতে সঞ্চালিত গ্রীবাকে সুন্দরী গ্রীবা বলে। স্নেহ ভাব, যত্ন, বিস্তার, সন্তোষ ও অনুমোদন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ইহার প্রয়োগ। উভয় পার্শ্বে ঊর্ধ্বদিকে সর্পগতিতে সঞ্চালিত গ্রীবাকে তিরশ্চীনা গ্রীবা বলে। সর্পগতি প্রদর্শন এই ভাব ইহা প্রকাশ করে। গ্রীবা অর্ধচন্দ্রাকারে বাম ও ডান দিকে সঞ্চালিত হলে পরিবর্তিত গ্রীবা হয়। শৃঙ্গার রসযুক্ত লাস্য নৃত্যে ও কান্তার গণ্ডদ্বয় চুম্বন বোঝাতে এর প্রয়োগ হয়। সামনে ও পিছনদিকে অল্প সঞ্চালিত কম্পিত গ্রীবাকে প্রকম্পিত গ্রীবা বলা হয়। লোক নৃত্যে ও দোলন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

আস্যকর্ম

নাট্যশাস্ত্রমতে বিনিবৃত্ত, বিধুত নির্ভুগ্ন, ভুগ্ন, বিবৃত ও উদ্বাহিত—এই ছয় প্রকার আস্যকর্ম প্রচলিত। অসূয়া, ঈর্ষা, কোপ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি ভাব প্রকাশে বিনিবৃত্ত প্রযুক্ত হয়। তির্যক ও আয়ত অবস্থায় বিধুত মুখ নিষেধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। নিম্নমুখ অবস্থায় নির্ভুগ্ন মুখ গাম্ভীর্য প্রকাশ করে। কিঞ্চিৎ আয়ত অবস্থায় ভুগ্ন মুখ নির্বেদ, চিন্তা, ঔৎসুক্য, লজ্জিত ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠ বিশ্লিষ্ট অবস্থায় বিবৃত মুখ হাস্য, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। আক্ষিপ্ত অবস্থায় উদ্বাহিত মুখ রমণীগণের লীলা, বিলাস, গর্ব, কপট ক্রোধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

মুখরাগ

"আয়তো মুখরাগস্তু চতুর্ধা স চ কীর্তিতঃ।
স্বাভাবিকঃ প্রসন্নশ্চ রক্তঃ শ্যামোঽর্থসংশ্রয় ॥"

স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত ও শ্যাম এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচলিত। স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে স্বাভাবিক মুখরাগ কোনো বিশেষ ভাব প্রকাশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। প্রসন্ন মুখরাগ আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। শৌর্য, বীর্য, ক্রোধ, অসহ দুঃখ, উন্মত্ত ভাব প্রকাশে রক্তবর্ণ মুখরাগ এবং জুগুপ্সা ও ভয় বোঝাতে শ্যাম মুখরাগ প্রযুক্ত হয়।

স্থান

পাদবিন্যাসের ভেদে স্থানক বা স্থান নির্দিষ্ট হয়। বিবিধ প্রকার দাঁড়ানোর ভঙ্গীকে স্থান বলে। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী পুরুষদের জন্য বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ়,

ও প্রত্যালীঢ়—এই ছয়টি এবং স্ত্রীলোকদের জন্য আয়ত, অবহিথো, অশ্বক্রান্তা ও চতুরস্র—এই চারটি স্থানের নির্দেশ আছে। অভিনয়দর্পণের মতে সমপাদ, একপাদ, নাগবন্ধ, ঐন্দ্র, গারুড় ও ব্রহ্মস্থান—এই ছয় প্রকার স্থান প্রচলিত। নাট্যশাস্ত্রে স্থান নির্দেশে তাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; এক্ষেত্রে তাল অর্থে মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত হলে যে বিস্তৃতি ঘটে সেই পরিমিত স্থান বুঝতে হবে।

বৈষ্ণব : পদদ্বয়ের মধ্যে আড়াই তাল ব্যবধান। জানু নমিত হওয়ায় জঙ্ঘা কিছুটা বক্র অবস্থায় থাকবে। এক পায়ের অবস্থান স্বাভাবিক অপর পায়ের অবস্থান তির্যক। অঙ্গে সৌষ্ঠব। ইহার অধিদেবতা বিষ্ণু। কথাকলি নৃত্যে এই বক্রজানু বৈষ্ণব স্থানের বেশি প্রয়োগ দেখা যায়।

সুদর্শনচক্র ত্যাগ, ধানুকীর ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, তিরস্কার, ভ্রম, দুঃখ, সন্দেহ, ঈর্ষা, নৃশংসতা, অভয়দান প্রভৃতি ভাব প্রকাশে এর প্রয়োগ।

সমপাদ : পদদ্বয় সমভাবে ভূমিতে স্থাপিত। দুইটি পদ সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে, অঙ্গুলিগুলি সম্মুখে। দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান হবে এক তাল। অবস্থান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহার অধিদেবতা ব্রহ্মা।

পুষ্পকরথ চালনা, ব্রাহ্মণ ও দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ, বিবাহোৎসবে বরবধূর আচার অনুষ্ঠানে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে, উৎসবে, যোগদানে, পাখির অনুকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয়।

বৈশাখ : পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সাড়ে-তিন তাল। অঙ্গুলিগুলি দুই পাশে তির্যকভাবে থাকবে। অবস্থান স্থির। এর অধিদেবতা কার্তিকেয়।

ধনুতে জ্যারোপণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, নির্গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই স্থানের ব্যবহার।

মণ্ডল : পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান চারতাল। কটি ও জানু সম। পদদ্বয় ত্রস্র ও পক্ষস্থিত। ইহার অধিদেবতা ইন্দ্র।

বজ্রনিক্ষেপ, শরত্যাগ, গজপৃষ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি রাজসিক আচরণে এই স্থান-এর প্রয়োগ হয়।

আলীঢ় : বাম উরু নিশ্চলভাবে অবস্থান করবে, বাম পদ থেকে পাঁচতাল ব্যবধানে দক্ষিণ পদ স্থাপিত। উভয় পদই ত্রস্র। ইহার অধিদেবতা রুদ্র।

ভয়ানক ও বীররসের ক্ষেত্রে এই স্থানের প্রয়োগ অপরিহার্য। মল্লযুদ্ধ, আক্রমণে, বর্শানিক্ষেপ, প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই স্থানের প্রয়োগ হয়।

প্রত্যালীঢ় : দুই পায়ের ব্যবধান পাঁচতাল। দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বামপদ প্রসারিত। ইহা বিভিন্ন অস্ত্রত্যাগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

স্ত্রীলোকদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারটি অবস্থানেব নির্দেশ আছে।

আয়ত : ডান পা সম অবস্থানে ও বাম পা ত্রস্র বা তির্যক অবস্থান। বামদিকে কোমর প্রসৃত ও প্রকট হবে।

মঞ্চে প্রথম আবির্ভাবের সময় সাধারণতঃ এই স্থানের ব্যবহার হয়। এ

ছাড়া প্রত্যাখান, পর্যবেক্ষণ, অনুমোদন না করা, চিন্তা পরিহার করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেখা যায়। আবার বিভিন্ন ভঙ্গীমাযুক্ত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি, ক্রোধে আঙ্গুল মটকানো, গর্ব প্রকাশ, গাম্ভীর্য, অসন্তোষ, দিগন্ত-পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আয়ত-স্থানের ব্যাপক প্রয়োগ হয়।

অবহিত্থা ঃ বাঁ পা সম অবস্থায় ও ডান পা ত্রস্র অবস্থায় থাকবে। বাঁ দিকের কোমর স্বল্প প্রসৃত ও প্রকট।

স্বাভাবিকভাবে কথোপকথনকালে স্ত্রী চরিত্রের জন্যে নির্দিষ্ট। শৃঙ্গার ও অনুরূপ রস ও ভাবের ক্ষেত্রে এই স্থান বিশেষ প্রযোজ্য। এছাড়া প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা, উদ্বেগ, অনুমান, প্রণয়াসক্তি, প্রমোদ, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দেখা যায়।

অশ্বক্রান্তা ঃ কিছু অবলম্বন করে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গী। এক পা তোলা থাকবে, অন্য পা, পায়ের পাতার সামনের অংশে ভর দিয়ে গোড়ালি উঠে থাকবে। ঊর্ধ্বে উত্থিত পায়ের অঙ্গুলিগুলি মৃত্তিকা অভিমুখে প্রসারিত থাকবে।

কুসুমচয়ন, বৃক্ষশাখা ধরে দাঁড়ানো ও বিভিন্ন শোভাময়ী দেবী ও মানবী চরিত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশে এর প্রয়োগ হয়।

চতুরস্র ঃ অবস্থান বৈষ্ণব স্থান অনুযায়ী। হস্তদ্বয় যথাক্রমে ও যুগপৎ কটি ও নাভিদেশে সঞ্চালিত হবে। বক্ষোদেশ সমুন্নত।

ইহা নারীদেহের লালিত্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে বলে সাধারণভাবে স্ত্রী-চরিত্রের অবলম্বন।

নৃত্যকলায় এই সংস্থানগুলি যথাযথ না হলে সৌন্দর্যহানি হয়। নাট্যশাস্ত্রমতে সৌষ্ঠব বলতে কটি ও কর্ণ সমরেখায়, কূর্পর (কনুই), স্কন্ধ ও মস্তক সমরেখায়; বক্ষোদেশ উন্নত বোঝায়। সঙ্গীতরত্নাকর-এর মতে সৌষ্ঠব অর্থে কটি জানুর সমরেখায়; কনুই, স্কন্ধ ও মস্তক একরেখায়; বক্ষোদেশ উন্নত; গাত্র স্বস্থানে বিশ্রান্ত অর্থাৎ সাবলীলভাবে অবস্থিত বোঝায়। যথার্থ সংস্থানের ওপরেই সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে।

গতিভেদ

অনুষ্ঠানকালে বিশেষ অবস্থা ও গতিবিধির জন্যে বিভিন্ন চারী, মণ্ডল ও স্থান যেমন অবলম্বন করা হত তেমনি বিভিন্ন গতিরও নির্দেশ আছে। নটনটীদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়ে বিশেষ পাদচারণার নিয়ম আছে। এই সব পাদচারণভঙ্গী থেকেই চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝা যেত। বিভিন্ন রস ও ভাব অনুযায়ী গতিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটত। যেমন রৌদ্ররসাত্মক অভিনয়ে অসংযত গতি ও করুণরসে গতিকে সংযত করা হত। নাট্যশাস্ত্রে গতিপ্রচার পর্যায়ে বিশদ আলোচনা আছে তবে অভিনয়দর্পণোক্ত গতিভেদ নৃত্যকলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অভিনয়দর্পণে হংসী, ময়ূরী, মৃগী, গজলীলা, সিংহী, তুরঙ্গিণী, ভুজঙ্গী, মণ্ডূকী, বীরা ও মানবী—এই দশ প্রকার গতিভেদের নির্দেশ পাওয়া যায়।

হংসী ঃ

"পরিবর্ত্য তনুপার্শ্বং বিতস্ত্যন্তরিতং শনৈঃ।
এরকৈকং তৎ পদং ন্যস্য কপিথ্থং করয়োর্বহন॥
হংসবদ্গমনং যত্তু সা হংসী গতিরীরিতা"

এক পা সামনের দিকে এগিয়ে ভূমিতে স্থাপন করতে হবে, সেই দিকের দেহের পার্শ্বদেশ সামনের দিকে অল্প ফেরানো থাকবে। এবং পর্যায়ক্রমে অপর পা ভূমিতে স্থাপন করা এবং তখন সেই দিকের দেহপার্শ্ব সামনে ঘোরাতে হবে, তাহলেই হংসী গতিভঙ্গী রূপায়িত হবে। উভয় হস্তেই কপিত্থ মুদ্রা।

ময়ূরী ঃ

"প্রপদাভ্যাং ভুবি স্থিত্বা কপিথ্থং করয়োর্বহন।
একৈকজাঃ চলনান্ময়ূরী গতিরীরিতা॥"

দুই পায়ের অঙ্গুলিগুলির ওপর ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থায় পর্যায়ক্রমে এক একটি জানু চালনা করলে ময়ূরী গতিভঙ্গী রূপায়িতহবে। উভয় হস্তে কপিত্থ মুদ্রা।

মৃগী ঃ

"মৃগবদ্গমনং বেগাৎ ত্রিপতাককরৌ বহন্।
পুরতঃ পার্শ্বয়োশ্চৈব যানং মৃগগতির্ভবেৎ॥"

সবেগে সামনের দিকে ও উভয় পার্শ্বে হরিণের মতো সঞ্চালন করলে মৃগগতি রূপায়িত হবে। উভয় হস্তে ত্রিপতাক মুদ্রা।

গজলীলা ঃ

"পার্শ্বয়োস্তু পতাকাভ্যাং করাভ্যাং বিচরংস্ততঃ।
সমপাদগতিমন্দং গজলীলেতি বিশ্রুতা॥"

দুই পা সম অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থানে রেখে ধীরে ধীরে বিচরণ করলে গজলীলা গতিভঙ্গী রূপায়িত হবে। দুই পাশে দুই হাতে পতাকা মুদ্রা।

তুরঙ্গিণী ঃ

"উৎক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদমুল্লঙ্ঘ্য চ মুহুর্মুহু।
বামেন শিখরং ধৃত্বা দক্ষিণেন পতাকিকাম্।
তুরঙ্গিণী গতিঃ প্রোক্তা নৃত্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥"

ঘোড়া লাফিয়ে চলার সময় যেমন সামনের পা শূন্যে তুলে রাখে, আবার ভূমিস্পর্শ করে আবার শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে সেইভাবে ডান পা সামনে তুলে চলতে হবে। বাম হস্তে শিখর ও ডান হস্তে পতাকা মুদ্রা।

সিংহী ঃ

"পাদাগ্রাভ্যাং ভুবি স্থিত্বা পুর উৎপ্লুত্য বেগতঃ।
করাভ্যাং শিখরং ধৃত্বা যানং সিংহগতির্ভবেৎ ॥"

দুই পায়ের সামনের দিকে ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে সবেগে সম্মুখে লাফিয়ে লাফিয়ে চললে সিংহী গতিভঙ্গী রূপায়িত হয়। উভয় হস্তে শিখর মুদ্রা।

ভুজঙ্গী ঃ

"ত্রিপতাককরৌ ধৃত্বা পার্শ্বয়োরুভয়োরপি।
পূর্ববদ্‌গমনং যত্তু সা ভুজঙ্গী গতির্ভবেৎ ॥"

সাপের মতো এঁকে বেঁকে ধীরে ও দ্রুতগতিতে চলা। এই চলন দেহেও সঞ্চারিত হবে। উভয় হস্তে দুই পাশের্ব ত্রিপতাক মুদ্রা।

মণ্ডূকী ঃ

"করাভ্যাং শিখরং ধৃত্বা কিঞ্চিৎ সিংহসমা গতিঃ।
মণ্ডুকী গতিরিত্যেষা প্রসিদ্ধা ভরতাগমে ॥"

এই গতির সহিত সিংহী গতির অবস্থান একই রকম। কিন্তু লাফ দেওয়ার তারতম্য আছে। মণ্ডূকী গতিতে অল্প লাফ দিয়ে এগোতে হয়ে। উভয় হস্তে শিখর মুদ্রা।

বীরা ঃ

"বাম্নেন শিখরং ধৃত্বা দক্ষিণেন পতাকিকাম্।
দুরাদাগমনং যত্তু বীরা গতিরুদীরিতা ॥"

এই চলন হবে ধীর, উদ্ধত ও ভারযুক্ত, লঘুক্ষিপ্রপদে নয়। গতি দূর থেকে আনতে হবে। বাম হস্তে শিখর ও দক্ষিণ হস্তে পতাকা মুদ্রা।

মানবী ঃ

"মণ্ডলাকারবদ্ ভ্রান্ত্যা সমাগত্য মুহুর্মুহু।
বামং করং ন্যস্য কটৌ দক্ষিণে কটাকামুখম্ ॥"

এর চলন হচ্ছে চক্রাকারে বার বার ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানোর সময় বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাতে কটকামুখ মুদ্রা ধারণ করতে হবে।

চিবুক কর্ম

জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত কর্ম দ্বারা চিবুক লক্ষণ বোঝা যায়। তবু সাধারণভাবে চিবুক কর্ম আট প্রকার। ব্যাদীর্ণ, শ্বসিত, বক্র, সংহত, চলসংহত, স্ফুরিত, বলিত ও লোল।

এক অঙ্গুলি পরিমাণে অধস্রস্ত চিবুকের নাম বলিত। সবিস্ময় ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। তির্যকভাবে অবনত চিবুককে বক্র বলে। গ্রহাবেশে প্রয়োগ হয়। মুখ বন্ধ অবস্থায় স্থির। সেই চিবুকের নাম সংহত। মৌন ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত। ওষ্ঠ সংলগ্ন এবং চঞ্চল

অবস্থায় চিবুকের নাম চলসংহত। নারীচুম্বন বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। কম্পিত চিবুককে বলা হয় স্ফুরিত। ভয়, শীত ও জ্বর বোঝাতে প্রয়োগ হয়। হনুদ্বয়ের শ্লিষ্টত্ব ও বিশ্লিষ্টত্বের নাম চলিত। এটা স্তব্ধবাক্, উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। বক্রভাবে গমনাগমনকারী চিবুকের নাম লোল। ইহা রোমন্থন, সাধারণ চর্বন বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

জিহ্বা কর্ম

ঋজ্বী, সৃক্কানুগা, বক্রা, উন্নতা, লোলা ও অবলেহিনী—এই ছয় প্রকার জিহ্বা কর্ম প্রচলিত। প্রসারিত মুখে প্রসারিত জিহ্বার নাম ঋজ্বী। ইহা পরিশ্রমে ও জন্তুর পিপাসা বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। জিহ্বা ওষ্ঠ-লেহন করলে তাকে সৃক্কানুগা বলে। ক্রোধ ও সুস্বাদু পদার্থ ভক্ষণে প্রযোজ্য। ব্যাবৃত্ত মুখে থেকে জিহ্বার অগ্রভাগ উন্নত হলে তাকে বক্রা বলে। নরসিংহের অভিনয়ে প্রযোজ্য। ব্যাবৃত্ত মুখে চঞ্চল জিহ্বার নাম লোলা। বেতালের অভিনয়ে প্রযোজ্য। দন্ত ও ওষ্ঠ-লেহনকারী জিহ্বাকে অবলেহিণী বলা হয়।

বক্ষভেদ

সম, আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত—এই পাঁচ প্রকার বক্ষ প্রচলিত।

সৌষ্ঠবযুক্ত ও স্বাভাবিক বক্ষকে সম বলে। এটা স্বভাবাভিনয়ে প্রযোজ্য। নিম্ন ও শিথিল বক্ষের নাম আভুগ্ন। ইহা গর্ব, লজ্জা, শীত, শোক, মূর্ছা, ব্যস্তা, রোগ ও বিষাদে প্রযোজ্য। পৃষ্ঠদেশের নিম্নত্বহেতু উন্নত এবং নিশ্চল বক্ষের নাম নির্ভুগ্ন, সত্যভাষণ, সহর্ষভাষণ, অভিমান, গর্বাতিশয্য প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়। অবিরাম ঊর্ধ্বক্ষেপের দ্বারা কম্পিত বক্ষের নাম প্রকম্পিত। ভয়, হাসি, শ্বাস, কাশি, পরিশ্রম প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়। কম্পহীন বক্ষ সোজাসুজি উচ্চীকৃত হলে তাকে উদ্বাহিত বলে। দীর্ঘশ্বাস, হাই তোলা, উচ্চ পদার্থের দর্শন প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়।

পার্শ্বভেদ

বিবর্তিত, অপসৃত, প্রসারিত, নত ও উন্নত—এই পাঁচ প্রকার পার্শ্ব। বিবর্তনবশতঃ ত্রিকের পরাবৃত্ত হওয়ার নাম বিবর্তিত। সেই বিবর্তনের নিবৃত্তির জন্য অপসৃত। পার্শ্ব-বিবর্তনে প্রযোজ্য। উভয় দিকে বিস্তার হলে প্রসারিত, হর্ষ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। নিতম্ব অবনতমুখ অবস্থার নাম নত। পশ্চাদপসরণ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। নতের বিপরীত পার্শ্বের নাম উন্নত। অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কটিভেদ

কটিভেদ মোটামুটি পাঁচ প্রকার ঃ—কম্পিতা, উদ্বাহিতা, ছিন্না, বিবৃত্তা ও রেচিতা।

দ্রুত গতায়ত পার্শ্বধারণকারী কটিকে কম্পিতা বলে। কুব্জ, বামন, বিকলাঙ্গ ব্যক্তির গমনে প্রয়োগ হয়। পার্শ্বদ্বয়ের দ্বারা ধীরে উচ্চলিতা কটির নাম উদ্বাহিতা। স্ত্রীলোকের সলীল গমনে ও স্থূলকায়া রমণীদের গতিতে প্রযোজ্য। মধ্যভাগের ঘূর্ণনের ফলে পার্শ্বদ্বয় বক্রমুখ হলে ছিন্না কটি হয়। ব্যায়াম, ব্যস্ততা, ফিরে দেখা প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়। পরাঙ্মুখ পার্শ্বদ্বয় দ্বারা অভিমুখে বিবর্তিতা কটির নাম বিবৃত্তা। ইহা বিবর্তনে প্রযোজ্য। সকল দিকে চালন হলে তখন কটি হয় রেচিতা, ইহাও বিবর্তনে প্রযুক্ত হয়।

চরণভেদ

সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচী, অগ্রতলসঞ্চার ও উদ্ঘট্টিত—নাট্যশাস্ত্রে এই ছয় প্রকার চরণের উল্লেখ আছে। এছাড়াও তাড়িত, ঘটিতোৎসেধ, ঘট্টিত, মর্দিত, অগ্রগা, পার্ষ্ণিগা, পার্শ্বগ—এই সাতটি চরণের কথাও অনেকে উল্লেখ করেন। মাটিতে স্বাভাবিকভাবে স্থিত চরণকে সম বলা হয়। এইরূপ চলমান চরণ রেচকে প্রযোজ্য। গোড়ালি মাটিতে রেখে তলদেশের অগ্রভাগ উচ্চে থাকলে এবং অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত হলে তাকে অঞ্চিত চরণ বলে। হস্তভ্রমরকে প্রযোজ্য। চরণের অঙ্গুলিসমূহ সঙ্কুচিত হলে, গোড়ালি ঊর্ধ্বদিকে এবং মধ্যভাগ সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকলে হয় কুঞ্চিত। অতিক্রান্ত গতিতে এবং উচ্চস্থিত বস্তুর গ্রহণে প্রযোজ্য। বামচরণ স্বাভাবিকভাবে রেখে, অপর চরণ যদি মাটিতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের উপর স্থাপিত হয় এবং অন্য অংশ ঊর্ধ্বস্থিত হয় তাহলে সূচী চরণ হয়। এটা নূপুরবন্ধনে প্রযুক্ত। যে চরণে গোড়ালি ঊর্ধ্বস্থিত, অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত এবং অঙ্গুলিসমূহ নিম্নাভিমুখ হয় তাকে অগ্রতলসঞ্চর বলা হয়। ইহা প্রেরণ, গুঁড়া করা, ভূমি তাড়ন, মাটিতে স্থিত কোনো বস্তুর দূরীকরণ, রেচক, ভ্রমণ প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়। পদতলের অগ্রভাগের উপর মাটিতে স্থিত হয়ে গোড়ালি একবার বা বারবার পাতিত করলে তাকে উদ্ঘাটিত চরণ বলা হয়।

স্কন্ধভেদ

একোচ্চ, কর্ণলগ্ন, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত ও লোলিত—এই পাঁচ প্রকার স্কন্ধ। মুষ্টি প্রহারে একোচ্চ স্কন্ধের প্রয়োগ। শীত ও আলিঙ্গনে কর্ণলগ্ন স্কন্ধ। হর্ষ ও গর্ব প্রভৃতিতে উচ্ছ্রিত স্কন্ধ। দুঃখে, পরিশ্রমে, মদে ও মূর্ছায় স্রস্ত স্কন্ধ। বিটের নর্তনে, হাস্যে ও ঢাক বাদ্যে লোলিত প্রযোজ্য।

বাহুভেদ

ঊর্ধ্বস্থ, অধোমুখ, তির্যক, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অঞ্চিত, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, উদ্বেষ্টিত, পৃষ্ঠানুসারী—এই দশ প্রকার ছাড়াও কেউ কেউ আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, নম্র, সরল, আন্দোলিত ও উৎসারিত—এই ছয়টির উল্লেখ করেন। ভূমিস্পর্শী বাহুর নাম অধোমুখ। পার্শ্বস্থ বাহুর নাম তির্যক। মণ্ডলাকারে বক্ষ থেকে নির্গত বাহুর নাম অপবিদ্ধ, অগ্রবর্তী স্থানে ধাবিত বাহুর নাম প্রসারিত। বক্ষ থেকে নির্গত হয়ে আবার বক্ষে ফিরে এলে সেই বাহুকে বলা হয় অঞ্চিত। বাহু সর্বদিকে ভ্রামিত হলে তাকে বলা হয় মণ্ডলগতি। খড়্গ চালনা প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়। সংযুক্ত বাহুদ্বয়ের পার্শ্ব-বিপর্যয় হলে হয় স্বস্তিক। আলিঙ্গন, অভিবাদনে প্রযোজ্য। মণিবন্ধস্থ বর্তস্থানে আশ্রয় করে নির্গত হলে উদ্বেষ্টিত বাহু হয়। এই বাহুই পশ্চাদ্গত হলে তাকে বলা হয় পৃষ্ঠানুসারী। তূণ ও শরাকর্ষণে প্রযোজ্য। যাহা তীক্ষ্ন কনুই সহ বক্রীকৃত হয় সেই বাহু কুঞ্চিত। প্রহার, ভোজন, পান, খড়্গধারণ প্রভৃতিতে প্রয়োগ হয়। কুঞ্চিত বাহু সামান্য বক্র হলে নম্র বাহু হয়। স্তুতি ও মাল্যধারণে প্রযোজ্য। পার্শ্বে ঊর্ধ্বে বা নিম্নে প্রসারিত অবস্থায় বাহুর নাম সরল। ডানা, ভূমিস্থ বস্তুর নির্দেশ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। গমনকালে আন্দোলিত বাহুর নাম আন্দোলিত। অন্যদিক থেকে নিজের পার্শ্বগামী বাহুকে বলে উৎসারিত।

উরুভেদ

কম্পিত, বলিত, স্তব্ধ, উদ্বর্তিত ও নির্বর্তিত—এই পাঁচ প্রকার উরু প্রচলিত।

যাতে পার্শ্বদ্বয় বার বার নত ও উন্নত হয়—তাকে কম্পিত বলে। অধম ব্যক্তির গমনে প্রযোজ্য। হাঁটু ভিতরের দিকে থাকলে উরুকে বলিত বলে। স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছা-গমনে প্রযোজ্য। নিষ্ক্রিয় উরুর নাম স্তব্ধ। বিষাদ ও ভয়ে প্রযুক্ত হয়। গোড়ালি ও পাদাগ্রের তলদেশের বার বার ভিতরে ও বাহিরে উৎক্ষেপ হলে তাকে উদ্বর্তিত বলে। ব্যায়াম ও তাণ্ডবে প্রযোজ্য। গোড়ালি ভিতবের দিকে থাকলে হয় নির্বর্তিত। ব্যস্ততা ও পরিশ্রমে প্রযুক্ত হয়।

জঙ্ঘাভেদ

আবর্তিতা, নতা, আক্ষিপ্তা, উদ্বাহিতা ও পরিবর্তিতা—এই পাঁচটি ছাড়াও নিঃসৃতা, পরাবৃত্তা, তিরশ্চীনা, বহির্গতা ও কম্পিতা নামে আরও পাঁচটি জঙ্ঘার কথা আচার্যেরা উল্লেখ করেছেন।

বার বার বাম চরণ দক্ষিণ দিকে এবং এবং দক্ষিণ চবণ বাম দিকে স্থাপিত হলে আবর্তিতা জঙ্ঘা হয়। বিদূষকের চলনে প্রযোজ্য। হাঁটু অবনমিত অবস্থায় হয় নতা। দাঁড়ানো, বসা প্রভৃতিতে প্রযোজ্য। বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত জঙ্ঘাকে ক্ষিপ্ত বলা হয়। ব্যায়ামে ও তাণ্ডবে প্রয়োগ হয়। উর্ধ্বদিকে নীত জঙ্ঘর নাম উদ্বাহিকা। সক্রোধ গমনে প্রযোজ্য। বিপরীত দিকে গমনকারী ব্যক্তির জঙ্ঘাব নাম পরিবর্তিতা। তাণ্ডবে প্রযোজ্য। অগ্রভাগে প্রসারিত জঙ্ঘাকে নিঃসৃতা বলে। ভূমিলগ্ন জানুদ্বারা উপলক্ষিত পশ্চাদগত জঙ্ঘাকে পরাবৃত্তা বলে। যাহার বাইরের পার্শ্ব ভূমিলগ্ন তাকে তিরশ্চীনা জঙ্ঘা বলে। উপবেশনে প্রযোজ্য। যাহার পার্শ্ব প্রসারিত সেই জঙ্ঘা বহির্গতা। নৃত্তে প্রযুক্ত হয়। কম্পনহেতু জঙ্ঘাকে কম্পিতা বলে। ভয় প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

মণিবন্ধভেদ

নিকুণ্ঠ, আকুণ্ঠিত, চল, ভ্রামিত, সম—এই পাঁচ প্রকার মণিবন্ধ প্রচলিত।

যাহা বাইরের দিকে নিচে তাকে নিকুণ্ঠ বলে। এটা দান, অভয় প্রদান প্রভৃতিতে প্রযোজ্য। ভিতরের দিকে নিচু হলে তাকে আকুণ্ঠিত বলা হয়। অপসরণে প্রযোজ্য। সরলভাবে মণিবন্ধের অবস্থান হলে তাকে সম বলা হয়। পুস্তক ধারণ ও দান গ্রহণে প্রযোজ্য।

জানুভেদ

সংহত, কুঞ্চিত, অর্ধকুঞ্চিত, নত, উন্নত, বিকৃত ও সম—এই সাত প্রকার জানু প্রচলিত।

এক জানু অপর জানুর সঙ্গে সংযুক্ত হলে তাকে সংহত জানু বলা হয়। লজ্জা, ক্রোধ ঈর্ষ্যাতে প্রযোজ্য। উরু ও জঙ্ঘা সংযুক্ত হলে তাকে কুঞ্চিত জানু বলে। উপবেশনে প্রযোজ্য। নিতম্ব অবনমিত অবস্থায় অর্ধকুঞ্চিত জানু বলা হয়। ভূমিলগ্ন জানুর নাম নত। পতন ও নমস্কারে প্রযোজ্য। স্তনদেশে স্থিত জানুর নাম উন্নত। পর্বতারোহণে প্রযোজ্য। স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত জানুর নাম সম।

হস্ত প্রচার

উত্তান, অধোমুখ ও পার্শ্বগত—নাট্যশাস্ত্রে এই তিন প্রকার হস্তের উল্লেখ আছে। অনেকে অগ্রগ ও অধস্তন—এ দুটির কথাও বলেন। সঙ্গীতরত্নাকরের মতে পঞ্চদশ হস্ত প্রচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তান, অধস্তল, পার্শ্বগত, অগ্রতস্তল, ঊর্ধ্বমুখ অধোবদন, পরাঙ্মুখ, সম্মুখ, পার্শ্বতোমুখ, ঊর্ধ্বগ, অধোগত, পার্শ্বগত, অগ্রগত, সম্মুগগত।

হস্তকরণ

আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যবর্তিত ও পরিবর্তিত—এই চার প্রকার হস্তকরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তর্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলির একটির-পর-একটির আবেষ্টনকালে যদি হস্ত পার্শ্ব থেকে করতলের সামনে দিয়ে বক্ষ পর্যন্ত আসে তাহলে তাকে আবেষ্টিত বলে। যখন অঙ্গুলিগুলি করতল থেকে বহির্মুখে যায় এবং হস্ত বক্ষ থেকে বাইরের দিকে যায় তখন তাকে উদ্বেষ্টিত বলা হয়। আবেষ্টিতের প্রক্রিয়াই হস্তে ব্যবর্তিত করণীয় এবং উদ্বেষ্টিতের দ্বারাই পরিবর্তিত করা হয়। এই দুটি করণ কনিষ্ঠা প্রভৃতি অঙ্গুলির দ্বারাও করা হয়।

করকর্ম

ধুনন, শ্লেষ, বিশ্লেষ, কম্প, রক্ষণ, মোক্ষণ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, উৎকর্ষ, আকৃষ্টি, বিকৃষ্টি, তাড়ন, লোলন, ছেদ, ভেদ, স্ফোটন, মোটন, বিসর্জন, আহ্বান ও তর্জন—এই বিশ প্রকার করকর্মের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

হস্তক্ষেত্র

পুরঃপার্শ্ব, পশ্চাৎপার্শ্ব, ঊর্ধ্ব মস্তক, অধোমস্তক, ললাট, কর্ণদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, বক্ষ, নাভি, কটিশীর্ষ ও উরুদ্বয় এই—চৌদ্দটি হস্তের স্থান।

অঙ্গুলিভেদ

উৎক্ষিপ্তা, পতিতা, উৎক্ষিপ্ত পতিতা, অন্তর্গতা, বহির্গতা, মিথোযুক্তা, বিযুক্তা ও অঙ্গুলি-সংগতা—এই আট প্রকার পার্ষ্ণি চারিত্র স্থানে প্রযুক্ত হয়। অঙ্গুষ্ঠ সংশ্লিষ্ট, অন্তর্যাতি, বহির্মুখি, মিথোযুক্ত ও বিযুক্ত—এই পাঁচটি গুল্ফ স্থানে ব্যবহৃত হয়। সংযুতা, বিযুতা, বক্রা, বলিতা, পতিতা, কুঞ্চমুলা-করাঙ্গুলি ও প্রসৃতা—এই সাত প্রকার।

অধঃক্ষিপ্তা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, প্রসারিতা ও সংলগ্না, চরণাঙ্গুলি—এই পাঁচ প্রকার। বার বার অধোমুখে পাতিত হলে অধঃক্ষিপ্তা হয়। এটা বিব্বোক ও কিলকিঞ্চিতে প্রযুক্ত হয়। বার বার উৎক্ষেপ হলে হয় উৎক্ষিপ্তা। এটা নববধূর লজ্জাতিশয্যে প্রযোজ্য। সংকোচনে হয় সংকুচিত। শীত, মূর্ছা, ভয় ও গ্রহপীড়ায় প্রযুক্ত হয়। সরল ও স্থির অবস্থায় হয় প্রসারিত। স্তম্ভ, নিদ্রা ও অঙ্গমোটনে প্রযোজ্য। নিজ অঙ্গুষ্ঠে পরস্পর সংলগ্ন অঙ্গুলিকে সংলগ্না বলে। এটা ঘর্ষণে প্রযুক্ত হয়।

চারী

জঙ্ঘা, উরু, কটি ও পদের যুগপৎ সঞ্চালনের বিচিত্র ক্রিয়া দ্বারা চারী হয়। চারী, করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগুলি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। হস্তকর্মের সঙ্গে গতির

অনুকরণাত্মক অভিনয়ে বিভিন্ন পাদভেদে বিভিন্ন চরণ-কর্মের রূপায়ণে এগুলির প্রয়োগ অপরিহার্য। একপাদের প্রচারে চারী, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ, আবার করণসমূহের সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংক্ষেপে হয় মণ্ডল।
নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত ঃ

"একপাদে প্রচারো যঃ সঞ্চারীত্যভিধীয়তে।
দ্বিপাদ-প্রবণং যত্তু করণং নাম তদ্‌ভবেৎ॥
করণানাং সমাযোগঃ খণ্ড ইত্যাভিধীয়তে।
খণ্ডৈ স্ত্রিভিঃ চুতুর্ভির্বা সংযুক্তং মণ্ডলং ভবেৎ॥"

যেহেতু এই সকল ক্রিয়াই চারীর সহায়তায় নিষ্পন্ন হয় সেহেতু সর্ব ক্ষেত্রেই চারীর প্রভাব সুস্পষ্ট। পরস্পরেয় উপর এই নির্ভরশীলতার জন্য চারীই ব্যায়াম নামে অভিহিত হয়।
নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত ঃ

"বিধানোপগতাশ্চার্যো ব্যায়ামো যঃ পরস্পরম।
যস্মাদঙ্গ-সমাযুক্তস্তস্মাদ ব্যায়াম উচ্যতে॥"

আবার নৃত্যে চারীর বিশেষ উপযোগিতা প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে ঃ

"চারীভিঃ প্রসৃতং নৃত্যং চারীভিশ্চেষ্টিতং যথা।
চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্যো যুদ্ধেষু কীর্তিতাঃ॥"

আবার অভিনয়ে চারীর অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে ঃ

"যদেতৎ প্রস্তুতং নাট্যং তচ্চারীষ্বেব সংস্থিতম্।
ন হি চার্যা বিনা কিঞ্চিন্ নাট্যেহঙ্গং সম্প্রবর্ত্ততে॥"

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী চারী দুই প্রকার—ভৌম ও আকাশিকী, ভৌম ষোলটি—সমপাদা, স্থিতাবর্তা, শকটাস্যা, বিচ্যবা, অধ্যর্ধিকা, চাষগতি, এড়কাক্রীড়িতা, সমৎসারিতমত্তল্লী, মত্তল্লী, উৎস্পন্দিতা, অড্ডিতা, স্পন্দিতা, অবস্পন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা ও উরুদ্বৃত্তা।

আকাশিকী ষোলটি—অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, মৃগপ্লুতা, ঊর্ধ্বজানু, অলাতা, সূচী, নূপুরপাদিকা, ডোলাপাদা, দণ্ডপাদা, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা, ভ্রমরী, ভুজঙ্গ-ত্রাসিতা, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, ও উদ্বৃত্তা।

১ সমপাদা—দুটি চরণ পরস্পরের অতি সন্নিকটে রেখে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে পাদাঙ্গুলি সমূহের নখরাজি সমভাবে থাকে। ইহাই সমপাদা চারী।
২. স্থিতাবর্তা—একটি চরণ অগ্রতলসঞ্চর ভঙ্গিতে অপর চরণের দিকে, অন্তর্মুখ জানু সহ স্বস্তিক গঠনের জন্যে আনতে হবে। স্বস্তিক গঠনের পরে অনুরূপ-ভাবে অপর চরণ নিজের দিকে আনতে হবে। তখন স্থিতাবর্তা হয়।
৩. শকটাস্যা—দেহের উপরিভাগ যত্নসহকারে ধারণ করে, উদ্বাহিতাকার বক্ষস্থল প্রসারিত

করে একটি একটি চরণকে অগ্রতলসঞ্চর করতে হবে। ইহাই শকটাস্যা।

৪. বিচ্যবা– যখন সমপাদ্য অবস্থা থেকে পদদ্বয় উত্তোলিত হয় এবং চরণের তলাগ্রদ্বারা ভূমি নিকুট্টিত হয়, সেই অবস্থাই বিচ্যবা।

৫. অধ্যর্ধিকা–দক্ষিণ চরণের গুল্ফদেশে বামপাদ স্থাপিত হবে, দক্ষিণ চরণ অপসৃত হয়ে দেড় তাল অন্তরে ত্র্যস্রাকারে থাকবে, তারপর অনুরূপভাবে বাম চরণের গুল্ফদেশে দক্ষিণ চরণ স্থাপিত হবে এবং তাকে সরিয়ে নিয়ে তির্যক ভাবে স্থাপন করতে হবে।

৬ চাষগতি– দক্ষিণ চরণকে একতাল মাত্র সম্মুখে স্থাপন করে দুই তাল পশ্চাৎ দিকে আনতে হবে। তারপর যুগপৎ উতপ্লুতিপূর্বক পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে অপসৃত হবে, আবার অপসৃত থেকে নিকটবর্তী হবে। ইহাই চাষগতি। সভয় গতি প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়।

৭. এড়কাক্রীড়িতা–অল্প উল্লম্ফনের পরে অগ্রতলসঞ্চর আকারযুক্ত চরণদ্বয়ের একটির-পর-একটি নিম্নে পতিত হলে তাকে এড়কাক্রীড়িতা বলে।

৮. সমংসারিতমত্তল্লী–একটি চরণ অগ্রতলসঞ্চর আকারে অপর চরণের পশ্চাতে স্থাপিত হয়ে জঙ্ঘার কাছে স্বস্তিক গঠন করবে। তারপর অপর চরণকে অগ্রতলসঞ্চর করতে হবে এবং চরণদ্বয় অপসৃত ও মিলিত হয়ে ঘূর্ণিত হবে। ইহাই সমংসারিতমত্তল্লী। মধ্যম ধরণের মত্ততায় প্রযুক্ত হয়।

৯. মত্তল্লী– চরণদ্বয়ের সম্পূর্ণ তলদেশ ভূমিশ্লিষ্ট জঙ্ঘাস্বস্তিক গঠন করে অর্ধত্র্যস্যাকারে থাকবে এবং ঘূর্ণায়মান হয়ে পরস্পর মিলিত বা অপসৃত হবে। ইহাই মত্তল্লী। অল্প মত্ততায় প্রযুক্ত হয়।

১০. উৎস্পন্দিতা–কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ভূমিস্পর্শ করে চরণ ধীরে ধীরে রেচক মতো গমনাগমন করবে। ইহাই উৎস্পন্দিতা।

১১. অড্ডিতা–সম অবস্থায় রক্ষিত এক চরণের অগ্র ও পশ্চাৎভাগে অগ্রতলসঞ্চর আকার, অপর চরণ ক্রমশঃ ঘর্ষিত হবে। ইহা অড্ডিতা।

১২. স্পন্দিতা–উরু নিশ্চল, বামপদ সমতাবস্থায় স্থাপিত এবং দক্ষিণপদ পাঁচতাল অন্তরে তির্যকভাবে প্রসারিত ইহাই স্পন্দিতা।

১৩. অবস্পন্দিতা–উরু নিশ্চল, দক্ষিণপদ সম অবস্থায় স্থাপিত ও বামপদ পাঁচতাল অন্তরে তির্যকভাবে প্রসারিত ইহাই অবস্পন্দিতা।

১৪. বদ্ধা– উরুদ্বয়ের বলন ক্রিয়া করতে হবে, জঙ্ঘা স্বস্তিকাকারে থাকবে। এই অবস্থা বদ্ধা। স্বস্তিক অবস্থা ভাঙিয়া চরণদ্বয়ের অগ্রভাগ মণ্ডলাকারে ঘূর্ণনের পর স্ব স্ব পার্শ্বে আনিত হলে যে অবস্থা তাহাই বদ্ধা।

১৫. জনিতা– একচরণ অগ্রতল-সঞ্চর, একহস্ত মুষ্টি আকারে বক্ষে স্থাপিত এবং অপর হস্ত সুন্দরভাবে চালিত হলে জনিতা চারী হয়।

১৬. উরুদ্বৃত্তা–অগ্রতলসঞ্চর আকারে একটি চরণের গুল্ফ অপর চরণের পশ্চাদ-ভিমুখী হবে এবং একটি জঙ্ঘা নতজানু হয়ে অপর জঙ্ঘাভিমুখে বলিত হবে ইহাই উরুদ্বৃত্তা। ঈর্ষা, লজ্জা প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়।

১৭. অতিক্রান্তা–একটি কুঞ্চিত চরণ অন্য চরণের গুল্ফ দেশে উত্তোলিত হয়ে

সম্মুখে অল্প প্রসারিত হবে, তারপর স্বাভাবিকভাবে চার তাল দূরে দূরে ভূমিতে নিপাতিত হবে।

১৮ অপক্রান্তা—বন্ধা চারী করবার পর কুঞ্চিত চরণ উৎক্ষিপ্ত হয়ে পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হলে অপক্রান্তা হয়।

১৯ পার্শ্বক্রান্তা—একটি কুঞ্চিত চরণ নিজপার্শ্বে উত্তোলিত হয়ে পার্ষ্ণি দ্বারা ভূপাতিত হলে পার্শ্বক্রান্তা হয়।

২০. মৃগপ্লুতা—একটি চরণ উৎক্ষিপ্ত হবার পর উৎপ্লুতি পূর্বক ভূমিতে নিপাতিত হবে এবং অঞ্চিতাকারে অপর চরণের জঙ্ঘা পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হবে। ইহাই মৃগপ্লুতা, বিদূষক অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

২১. ঊর্ধ্বজানু—যখন একটি কুঞ্চিত চরণ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উহার জানু বক্ষের সমসূত্রে রক্ষিত হয় এবং অন্য চরণ নিশ্চলভাবে স্থাপিত হয় তখন হয় ঊর্ধ্বজানু।

২২. অলাতা— পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত একটি চরণের তলদেশ অপর ঊরুর অভিমুখী হবে এবং উহার গুল্ফ নিজপার্শ্বে ভূমিতে স্থাপিত হবে।

২৩. সূচী— একটি কুঞ্চিত চরণ উৎক্ষিপ্ত হবার পর ঊরু পর্যন্ত প্রসারিত হবে এবং নত অগ্রভাগ সহ চরণ ভূপাতিত হবে।

২৪. নূপুরপাদিকা—একটি অঞ্চিত চরণ পশ্চাৎ দিকে নীত হবার পর উহার গুল্ফ দ্বারা কটিদেশ স্পর্শিত হবে এবং তারপর অঞ্চিত জঙ্ঘাযুক্ত ঐ চরণ ভূপাতিত হবে।

২৫. ডোলাপাদা—একটি কুঞ্চিত চরণকে উত্তোলিত করে উভয় পার্শ্বে দোলায়িত করে স্বপার্শ্বে গুল্ফোপরি স্থাপন করতে হবে।

২৬. দণ্ডপাদা—একটি চরণ নূপুর আকারে অপর চরণের গুল্ফদেশে স্থাপিত হয়ে জানুর অগ্রভাগ দেহাভিমুখী অবস্থায় দ্রুত প্রসারিত হবে।

২৭. বিদ্যুদ্ভ্রান্তা—একটি চরণ পশ্চাৎ দিকে বলিত শির স্পর্শ করে সর্বদিকে ঘূর্ণিত হয়ে প্রসারিত হবে।

২৮. ভ্রমরী— চরণ অতিক্রান্তাচারীর আকারে থাকবে, ত্রস্রাকার ঊরু বিবর্তিত হবে এবং অপর চরণের তলভাগের ঘূর্ণন সহ সমস্ত দেহ ঘূর্ণিত হবে।

২৯. ভুজঙ্গত্রাসিতা- একটি কুঞ্চিত চরণ অপর ঊরুর মূলদেশ পর্যন্ত উত্তোলিত হবার পর গুল্ফ নিতম্ব অভিমুখী হবে। তারপর জানু স্বপার্শ্বে আনীত হবে এবং কটি ও জানুর বিবর্তনে ঐ চরণের তলদেশ ঊর্ধ্বমুখী হবে।

৩০, আক্ষিপ্তা—একটি কুঞ্চিত চরণ তিনতাল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অপর পার্শ্বে আসবে। তারপর উহার জঙ্ঘা অপর জঙ্ঘা সহ স্বস্তিকাকারে স্থাপিত হয়ে গুল্ফোপরি ভূপাতিত হবে।

৩১. আবিদ্ধা—পরস্পর স্পর্শ না করে জঙ্ঘাদ্বয় স্বস্তিকাকারে থাকবার পর একটি কুঞ্চিত চরণ বক্রভাবে প্রসারিত হয়ে স্বপার্শ্বে আনীত হবে এবং অপর গুল্ফদেশে পতিত হবে।

৩২. উদ্বৃত্তা—একটি চরণ আবিদ্ধাচারীর মতো স্থাপিত। ইহার গুল্ফ অপর ঊরুদেশে রক্ষিত। তারপর উৎপ্লুতি এবং ঘূর্ণন-এর পর চরণ ভূপাতিত

হবে। এর পরে অপর চরণও অনুরূপভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একই ক্রিয়া করবে।

রেচক

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী রেচক ভেদ চার প্রকার। পাদরেচক, কররেচক, কটিরেচক ও গ্রীবারেচক।

গুল্ফ ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যবর্তী চরণাংশের অবিরাম গতি ও নমন উন্নমন সহ বাহিরের দিকে গতিকে পাদরেচক বলা হয়। "হস্তয়োয়েব চলনং হংস দক্ষয়োঃ পর্যায়েন দ্রুতভ্রমণম্।" অর্থাৎ হংসপক্ষাকার হস্তদ্বয়ের চতুর্দিকে পর্যায়ক্রমে দ্রুত ঘূর্ণনকে কররেচক বলে। ঈষৎ বিস্তারিত অঙ্গুষ্ঠের তির্যক ঘূর্ণন সহ কটিদেশের চতুর্দিকে ঘূর্ণনকে কটিরেচক বলা হয়। গ্রীবার কম্পন সহ ঘূর্ণনকেই গ্রীবারেচক বলা হয়।

মণ্ডল

পূর্বেই বলা হয়েছে এক পায়ের প্রচারে চারী, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ, আবার করণসমূহের সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংযোগে হয় মণ্ডল। অভিনয় দর্পণের মতে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে শরীর সংস্থাপনের নাম মণ্ডল। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে– "খণ্ডৈস্ত্রিভিঃ চতুর্ভির্বা সংযুক্তং মণ্ডলং ভবেৎ।"

শাস্ত্রমতে দশটি ভৌম মণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবর্ত, শকটাস্য, অড্ডিত, সমোৎসারিত, অধ্যর্ধক, এড়কাক্রীড়িত, পিষ্টকুট ও চাষগত–এই দশটি ভৌম মণ্ডল।

অতিক্রান্ত, দণ্ডপাদ, ক্রান্ত, ললিতসঞ্চর, সূচীবিদ্ধ, বামবিদ্ধ, বিচিত্র, বিহৃত, অলাত ও ললিত–এই দশটি ব্যোমজ মণ্ডল। ভৌম বা ব্যোমজ চারীর প্রাধান্য অনুসারেই এই ভেদ নির্দিষ্ট।

১. ভ্রমর– দক্ষিণচরণ জনিত হবে, বামচরণ স্পন্দিত। আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা ও বামচরণ অবস্পন্দিত। অথবা দক্ষিণচরণ ভ্রমর এবং বামচরণ স্পন্দিত, আবার দক্ষিণচরণ ভ্রমর এবং বামচরণ চাষগতি। আবার দক্ষিণচরণ ভ্রমর এবং শেষে বামচরণ স্পন্দিত।

২. আস্কন্দিত–দক্ষিণচরণ ভ্রমর, বামচরণ অড্ডিতা ও পরে ভ্রমর। আবার দক্ষিণচরণ ঊরূদ্বৃত্ত এবং বামচরণ অপক্রান্তা ও ভ্রমর। দক্ষিণচরণ স্পন্দিত এবং বামচরণ শকটাস্যা এবং ঐ পদ ভূমিতে সবেগে আঘাত করবে।

৩. আবর্ত– দক্ষিণচরণ জনিতা, বামচরণ তলসঞ্চর। আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা ও ঊরূদ্বৃত্তা। আবার দক্ষিণচরণ অতিক্রান্তচারী সহ পশ্চাৎ দিকে চাষগতি, আবার দক্ষিণচরণ স্পন্দিতা এবং বামচরণ শকটাস্যা। আবার দক্ষিণচরণ ভ্রমর (ত্রিক সহ ঘূর্ণিত) এবং বামচরণ অপক্রান্ত।

৪. শকটাস্য–দক্ষিণচরণ জনিত এবং বামচরণ তলসঞ্চর। আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা, বামচরণ স্পন্দিত–এভাবে মণ্ডল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চরণ হবে শকটাস্যা। যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়।

৫. অড্ডিত– দক্ষিণচরণ উদ্ঘটিত হবে ও মণ্ডলাকারে ভ্রামিত হয়ে স্পন্দিত হবে।

বামচরণ শকটাস্যা। তারপর দক্ষিণচরণ পশ্চাৎ দিকে এসে অপক্রান্তা ও চাষগতি আশ্রয় করবে। বামচরণ অঞ্চিতা। আবার দক্ষিণচরণ অপক্রান্তা এবং বামপদ ভ্রমর, শেষে দক্ষিণচরণ স্পন্দিত অবস্থায় ভূমিতে সবেগে আঘাত করবে।

৬. সমোৎসরিত–সমপাদ অবস্থায় থেকে করদ্বয়কে পরস্পরের নিকটে রেখে উর্ধ্বদিকে প্রসারিত করতে হবে। তারপর আবেষ্টন ও উদ্বেষ্টন সহ বামহস্ত কটিতে স্থাপিত হবে। পরে দক্ষিণহস্তও আবর্তিত হয়ে কটিদেশে আসবে। তারপর প্রথমে দক্ষিণ ও পরে বামপদ ঘূর্ণিত করে শেষে বামপদ প্রসারিত করতে হবে।

৭ অধ্যর্ধক–দক্ষিণচরণ প্রথমে জনিত, পরে স্পন্দিত (এরূপ কয়েকবার করতে হবে)। বামচরণ অপক্রান্তা, দক্ষিণচরণ শকটাস্যা। চারিদিকেই ক্রমানুসারে মণ্ডলকারে ঘুরতে হবে। মল্লযুদ্ধে প্রযুক্ত।

৮. এড়কাক্রীড়িতা–সূচীবিদ্ধ অনুযায়ী দুই পদ ভূমিতে স্থাপন করে সূচী ও বিদ্ধ্যা চারী করতে হবে। তারপর এড়কাক্রীড়িতা ও ভ্রমরী করতে হবে। শেষে আবার সূচীবিদ্ধকার চরণে আক্ষিপ্তা চারী করতে হবে। মণ্ডলাকারে ঘুরতে হবে। তখন এড়কাক্রীড়িত খণ্ডমণ্ডল হবে।

৯. পিষ্টকুট–দক্ষিণপদ সূচী এবং বামপদ অপক্রান্তা। তারপর ক্রমে দক্ষিণ ও বামচরণ পরপর ভুজঙ্গত্রাসিত হবে। শেষে চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ঘূর্ণন।

১০. চাষগত– চরণ চাষগতি আকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং অবশেষে মণ্ডলাকারে ঘূর্ণন।

১১ অতিক্রান্তা–দক্ষিণচরণ জনিত, পরে শকটাস্য এবং বামচরণ অলাত। তারপর দক্ষিণচরণ পার্শ্বক্রান্ত। বামচরণ সূচী ও পরে ভ্রমর। আবার দক্ষিণ-চরণ উরূদ্বৃত্ত এবং বাম অলাতক। শেষে বামচরণ অতিক্রান্ত ও দক্ষিণ-চরণ দণ্ডপাদ। বাহ্যভ্রমরী করে মণ্ডল রচিত হবে।

১২. দণ্ডপাদ–দক্ষিণচরণ প্রথমে জনিত ও পরে দণ্ডপাদ হবে। তারপরে বামচরণ হবে সূচী ও ভ্রমর। তারপর দক্ষিণপদ উরূদ্বৃত্ত, বামপদ হবে অলাত। এবার দক্ষিণচরণ হবে পার্শ্বক্রান্ত এবং বামপদ হবে ভুজঙ্গত্রাসিত ও অতিক্রান্ত। আবার দক্ষিণপদ দণ্ডপদ ও বামপদ হবে সূচী ও ভ্রমর।

১৩. ক্রান্ত– দক্ষিণচরণ সূচী ও বামচরণ অপক্রান্ত। তারপর দক্ষিণচরণ পার্শ্বক্রান্ত এবং বামপদ পার্শ্বক্রান্তের মতো চারিদিকে ঘূর্ণিত হবে। এবার বামচরণ হবে সূচী এবং দক্ষিণচরণ হবে অতিক্রান্ত। ইহা স্বাভাবিক গতি সূচনা করে।

১৪. ললিতসঞ্চর–দক্ষিণপদ উর্ধ্বজানু অবস্থায় সূচী, বামচরণ অপক্রান্ত হবে এবং দক্ষিণ হবে আবার পাশ্বক্রান্ত। তারপর বামপদ অতিক্রান্ত, দক্ষিণ হবে সূচী। এরপর বামপদ অতিক্রান্ত, দক্ষিণ পার্শ্বক্রান্ত, তারপর বামপদ হবে অতিক্রান্ত। এবার উভয় চরণকে ছিন্ন করণাবস্থায় বামপদের সাহায্যে বাহ্যভ্রমরী করতে হবে।

১৫ সূচীবিদ্ধ–দক্ষিণচরণ প্রথমে সূচী পরে ভ্রমর। তারপর বামচরণ হবে যথাক্রমে পার্শ্বক্রান্ত ও অপক্রান্ত এবং দক্ষিণচরণ সূচী। এবার বামপদ অপক্রান্ত, দক্ষিণ পার্শ্বক্রান্ত।

১৬. বামবিদ্ধ–দক্ষিণচরণ সূচী, বামপদ অপক্রান্ত, তারপর দক্ষিণচরণ হবে দণ্ডপাদ এবং বাম হবে সূচী ও ভ্রমর। এবার দক্ষিণচরণ পার্শ্বক্রান্ত, বামপদ আক্ষিপ্ত। তারপর দক্ষিণপদ দণ্ডপাদ ও উরূদ্‌বৃত্ত এবং বামপদ ক্রমানুসারে সূচী, ভ্রমর ও অলাত। সর্বশেষে দক্ষিণচরণ পার্শ্বক্রান্ত ও বামচরণ অতিক্রান্ত।

১৭. বিচিত্র– দক্ষিণচরণ ক্রমানুসারে জনিত, তলসঞ্চর, বামচরণ স্পন্দিত। তারপর দক্ষিণপদ পার্শ্বক্রান্ত, বামপদ ভুজঙ্গত্রাসিতা। এবার দক্ষিণপদ প্রথমে অতিক্রান্ত পরে উরূদ্‌বৃত্ত, বামপদ সূচী অবশেষে দক্ষিণপদ বিক্ষিপ্ত এবং বামপদ অপক্রান্তা।

১৮. বিহৃত– দক্ষিণচরণ জনিত ও নিকুট্টিত, বামপদ স্পন্দিত। আবার দক্ষিণচরণ উরূদ্‌বৃত্ত, বামপদ অলাত। দক্ষিণপদ সূচী, বামপদ পার্শ্বক্রান্তা। এবার দক্ষিণপদ ত্রিকের সহায়তায় আক্ষিপ্ত ও ভ্রমরী করে দণ্ডপাদ হবে। বামপদ ত্রিকের সহায়তায় সূচী ও ভ্রমরী করবে। অবশেষে দক্ষিণপদ ভুজঙ্গত্রাসিত, বামপদ অতিক্রান্ত।

১৯. অলাত– দক্ষিণচরণ সূচী, বামপদ অপক্রান্ত। আবার দক্ষিণচরণ পার্শ্বক্রান্ত, বামপদ হবে অলাত। এই ক্রিয়া ছয় থেকে সাতবার করার পর দক্ষিণ হবে অপক্রান্ত এবং বামপদ ক্রমানুসারে অতিক্রান্ত ও ভ্রমরী।

২০. ললিত– দক্ষিণচরণ সূচী ও বামচরণ অপক্রান্ত। তারপর দক্ষিণপদ পার্শ্বক্রান্ত ও ভুজঙ্গত্রাসিত। এবার বামপদ অতিক্রান্ত ও দক্ষিণপদ আক্ষিপ্ত। এর পরে বামচরণ ক্রমে অতিক্রান্ত, উরূদ্‌বৃত্ত ও অলাত। তারপর দক্ষিণচরণ পুনরায় অপক্রান্ত ও বামচরণ অতিক্রান্ত হয়ে মৃদুভাবে সঞ্চারণ করবে।

নৃত্যভাষা : মুদ্রা

হোমার-এর কাব্য আস্বাদন করতে হলে গ্রীক জানা দরকার, কালিদাসের রসাস্বাদনে সংস্কৃত জানা দরকার, শেকস্‌পীয়রের মূল্যায়নে ইংরাজীর প্রয়োজন। কিন্তু রাশিয়ার Swan Dance বা আমাদের কথাকলি, ভরতনাট্যম–ভাষা না জানলেও উপভোগ ও অর্থবোধ করা যায়। সংস্কৃতিগত বৈষম্য এখানে গৌণ বিষয়। তামিল, তেলেগু বা মালয়ালম্‌ না জেনেও কথাকলি, কুচিপুড়ি বা ভরতনাট্যম্‌ থেকে আনন্দলাভ করা যে কোনো ভাষাভাষী লোকের পক্ষে অনেক সহজ। ভাষার বেড়া ভেদ করে এই সব শিল্পমাধ্যমে এমন এক সার্বিক রূপ প্রকাশ পায় যা সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে উপভোগ্য। এখানে এম্‌প্যাথির সৃষ্টি সহজ, ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনুবাদের মাধ্যমে এই এম্‌প্যাথি সৃষ্টি করা খুব কঠিন।

ভাষা, সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠার আগেই নৃত্য হল মানুষের আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম বাহন। শিল্প যেহেতু মানুষের সজ্ঞান মনের সৃষ্টি, সেহেতু মানুষের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের উৎপত্তির ইতিহাস যুক্ত।

"Dance is the mother of all arts. Music and poetry exist in time ; Painting and architecture in space. But the dance lives at once in time and space. The creator and the thing created, the artiste and the work are still one and the same thing. Rhythmical patterns of movement, the plastic sense of space, the vivid representation of a world seen and imagined–these things man creates in his own body in the dance before he uses substance and stone and word to give expression to his inner experience." (Curt Sachs : World History of Dance).

এই হচ্ছে প্রাচীনতম ভাষা। হস্তমুদ্রায় ভাবপ্রকাশক অর্থ, দেহভঙ্গির বিচিত্র সঙ্গীতে সিন্ধুতরঙ্গের হিল্লোল, গ্রীবাবিভঙ্গে লীলাবিলাস, গর্ব বা আত্মনিবেদন, আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রেম, প্রতীক্ষা বা সংশয়। ললিতছন্দে শরীরী এক অনন্য রূপ-ভাবনা।

পৃথিবীর সর্বত্রই আদিম মানুষের নৃত্য, গীত ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। করতালি দিয়ে, মাথা ও অঙ্গচালনা করে, বন্যপশু ও প্রকৃতির অনুকরণ করে ভাষাসৃষ্টির আগেই আগেই আদিম মানুষ নাচগানের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ করত। হাম্বলি বলেছেন :

"Dance were also performed for sex-attraction, selecton of bride or bridegroom, along with songs which were mostly sung gutturally at first, and then in much higher key. These dances were mostly in imitation of the movements of the wild animals, and songs were

reproduced in imitation of the notes of the birds and animals."

(W. D. Humbly : The Tribal Dance)

ভাবপ্রকাশের এই আদিম রূপটিকে অনুসরণ করে এবার নন্দিকেশ্বর-এর একটি শ্লোক বিচার করা যাক।

"আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রস॥

(অভিনয়দর্পণ : ৩৫-৩৭)

অর্থাৎ মুখের দ্বারা গান অবলম্বন করা উচিত, হস্তের দ্বারা অর্থ প্রদর্শন, চক্ষুর দ্বারা ভাব প্রকাশ এবং পদদ্বয়ে তাল রক্ষা করা উচিত। যেখানে হস্ত সেখানেই দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি; যেখানে মন সেখানেই ভাব, আর যেখানে ভাব সেখানেই রসোৎপত্তি।

আদিম নৃত্যের রূপ এবং পরবর্তীকালের উন্নত সংস্কৃতির যুগের শাস্ত্রকার-এর এই ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে হস্তমুদ্রা ও অঙ্গকর্ম-এর ভাষার ভূমিকা গ্রহণ করার সূচনা আদিম মানুষেব আচরণের মধ্যেই নিহিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নৃত্য-পদ্ধতিতে আঙ্গিক পাথক্য থাকলেও তার একটা সার্বজনীন রূপ আছে। পার্থক্য যতই থাক তা ভাষার মতো দুর্বোধ্য নয়। মূল ভাবটিকে সহজেই চেনা যায়, বোঝা যায়।

মুদ্রা শব্দের সাধারণ অর্থ শীলমোহর। হিন্দী ভাষায় মুন্দ্রা ও মুদ্রা, খস্ ভাষায় মুনুরো, সিন্ধি ভাষায় মুন্দ্রী, পালি ভাষায় মুদ্দা প্রচলিত। কেউ কেউ বলেন অসিরিয় ভাষা মুসরু থেকে মুদ্রা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। অশোকনাথ শাস্ত্রী বলেছেন: 'নর্তনকলায় যেসকল হস্তভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়া থাকে সাধারণতঃ সেগুলিকে মুদ্রা নামে অভিহিত করা হয়। কেবল নর্তন ও নাট্যাভিনয় কেন—পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনায়ও এই প্রকার দেবপ্রীতিকর নানারূপ হস্তভঙ্গী (মুদ্রা) ও দেহভঙ্গী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নর্তনমুদ্রা ও উপাসনামুদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূপভেদ থাকিলেও উভয়ের মূলস্বরূপে কোন পার্থক্য নাই। মূলতঃ এই উভয়শ্রেণীর মুদ্রাই সাঙ্কেতিক মূক ভাষা মাত্র।'

(অভিনয়দর্পণ : অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত—ভূমিকা)

নৃত্যের ভাষা বা হস্তমুদ্রা সম্পর্কে শাস্ত্রকারগণ বিশদ আলোচনা করেছেন। ভাষার মতো মুদ্রাপদ্ধতিতেও এসেছে ব্যাকরণের বন্ধন। Dr. Jean Przyluski তাঁর আলোচনায় (Mudra–Indian Culture, vol. II, April 1936) এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মাঙ্গলিক ধর্মানুষ্ঠানে ও আভিচারিক কর্মে মুদ্রা শব্দে হস্তভঙ্গী বোঝায়। 'নারদ পঞ্চরাত্র' গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ে চব্বিশটি বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগে ও বৈদিকোত্তর সাহিত্যে মুদ্রা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বাজসনেয়

প্রাতিশাখ্য (১।১।২১) পাণিনীয় শিক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : "Going back to the vedic times, however, one finds the word and the gesture on one plane, and being giving the same magical or religious importance." যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যেও মুদ্রার বিবরণ পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেই মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ আছে। ডঃ পুজিলাস্কি বলেছেন : "The study of the word Mudra, in fact, show the premanence of the tendencies which have ruled the first manifestation of Buddhist art, and through it very different of the political and economical and religious life of India may be linked together "

Dr. L. Finet-এর মতে মুদ্রা অর্থে তন্ত্রে দেবতাপত্নী বা দেবীকেও বোঝায়। তিনি বলেছেন : "Mudra or more usually Mahamudra has in the Tantras, besides the ordinary sense, that of woman when a woman in associated to the rites. For instance, in the abhiseka, the master and desciple both have their mudra, and however discreet the expression may voluntarily be, the context does not leave any doubt upon the part which these feminine assistance play. Vajravarahi is given the name of maha-mudra, in quality of Heruka's first wife (agra-mahisi)."

মুদ্রার উৎপত্তিকাল প্রসঙ্গে পুজিলাস্কি বিশেষ আলোকপাত করেন নি। এ প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন : "সঙ্গীতে, নৃত্যে ও নাট্যে বা অভিনয়ে মুদ্রার ব্যবহার হয়। 'মুদ্রা' শব্দের অর্থ যা আনন্দদান করে ('মুদম্ আনন্দং রাতি দাতি')। মুদ্রা রস ও ভাবের প্রকাশক। তবে নৃত্যে বা নর্তনে অঙ্গাভিনয়েব ভিতর দিয়ে ভাব ও রসের পরিবেশন করা হয়। নাট্যে বাচিক অভিনয়ই প্রধান। আঙ্গিক তার সহকারী। হস্তাঙ্গুলির বিভিন্ন সন্নিবেশ মুদ্রার বাহ্যিক রূপ। দেবদেবীর পূজায়ও ভাবের প্রকাশ হিসাবে মুদ্রার প্রচলন আছে। নৃত্যে, নাট্যে, সঙ্গীতে এবং দেবার্চনায় মুদ্রা ভাবের উদ্বোধক। ভাবের উৎস রস। হস্তের সঙ্গে পরম্পরাসম্বন্ধ রস ও ভাবের যে সম্পর্ক তা নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে। রাগ যখন সাহিত্যের সঙ্গে মিতালি পাকিয়ে রূপায়িত হয় তখনই শিল্পী তার আন্তর রস ও রসজনিত ভাবের প্রকাশ করে মুখ, ভ্রূ ও হস্ত অথবা অঙ্গসঞ্চালন বা অঙ্গবিকৃতির দ্বারা। এই ভঙ্গী সঙ্গীতে মুদ্রা। মোটকথা রসকে পরিবেশন করার জন্য ভাবের, ভাবকে রূপায়িত করার জন্যে মনের, মনকে ক্রিয়াশীল করার জন্যে চক্ষু বা দৃষ্টির এবং দৃষ্টিকে প্রাণবান করার জন্যে হস্তের তথা হস্তসঞ্চালনের প্রয়োজন। 'মুদ্রা' প্রতীক (Symbol) হিসাবে মানুষের অন্তরের ভাব ও রসকে বাস্তব জগতে প্রকাশ করে। মুদ্রার উদ্ভাবন বা সৃষ্টি হয় সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে। সামগ-ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যুগে যখন বিভিন্ন স্বরসন্নিবেশ করে যজ্ঞবেদীর সম্মুখে সামগান করতেন তখন মুদ্রার প্রয়োগ হত গানে ছন্দ বা তাল এবং ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার জন্যে। নারদী-শিক্ষার ইঙ্গিত এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে 'অঙ্গুষ্ঠোত্তমে ক্রুষ্টো' প্রভৃতি শ্লোকে বৈদিক ক্রুষ্ট বা লৌকিক পঞ্চমস্বর

অংগুষ্ঠের মধ্যপ্রদেশ, প্রথমস্বর তথা মধ্যমস্বর অংগুষ্ঠে, দ্বিতীয় বা গান্ধার প্রাদেশে তথা তর্জনীতে ('প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারঃ'), মধ্যমায় দ্বিতীয়স্বর অথবা ঋষভ, অনামিকায় চতুর্থস্বর বা ষড়্ এবং কনিষ্ঠাংগুলিতে অতিস্বার্য বা নিষাদের সন্নিবেশ। যাই হোক একথা কিন্তু সত্য যে কোহল, নন্দিকেশ্বর, ভরত প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যেরা বৈদিক সামগদের হস্ত বা অংগুলি সন্নিবেশের তথা মুদ্রার নিদর্শন অনুসরণ করেই তাঁদের গ্রন্থে নৃত্য ও নাট্যের বিচিত্র আঙ্গিক বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন। সামস্বরের সন্নিবেশক দ্বিতীয় নম্বর চিত্রের মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ হস্তকরণ দুটি পরবর্তীকালের পতাক, অর্ধচন্দ্র ও অনেকটা হংসপক্ষ মুদ্রার সংগে সাদৃশ্যে মেলে। বৈদিক যুগে সুনির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি অনুসাবে সামগসম্প্রদায়ের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং সে মুদ্রা ভাষায় বা লিখনে আবিষ্কার না করে তাঁরা কেবল করণ অনুসারে প্রয়োগ করেছিলেন।" (ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস—১ম খণ্ড—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)। অশোক-নাথ শাস্ত্রীও বলেছেন ঃ 'বেদমন্ত্রের সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাম্য আছে' (অভিনয়দর্পণ ঃ পৃঃ ৪৩)।

দেবতাদের পূজাপদ্ধতিতে অথবা শিল্পচর্চায় সাধক ও শিল্পীদের মনের বিচিত্রভাব প্রতীকরূপ মুদ্রার সাহায্যে প্রকাশিত হয়। হস্তলক্ষণগুলির ঋষি, বংশ এবং বর্ণও কল্পিত হয়েছে। তাই মুদ্রা ও হস্তলক্ষণ-এর পিছনে শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে অধ্যাত্মভাবও যুক্ত। ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী 'The Relations of Art and Religion in India' প্রবন্ধে প্রতীক ও মুদ্রা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "Religious symbolism in Indian arts is of two kinds, the concrete Symbolism of attributes and the Symbolism of gesture, sex, and physical peculiarities. The Symbolism of gesture includes the various positions of the hand known as mudras ; of physical peculiaritis, the third eye of Siva or the elephant head of Ganesa are instances. The subject of sex-symbolism is generally misinterpreted, but, in fact this imagery drawn from the deepest emotional experience is a proof both of the power and truth of the art and the religion. India had not feared either to use sex symbols in its religious art, or to see in sex itself on intimation of the Infinite. (of Brihadaranyka Upnishada 4,3 21, also 1.3-4.)"

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের মুদ্রা প্রকরণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা ও বিপুল প্রকাশক্ষম ভাষা হিসাবে সম্ভাবনা প্রসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে প্রখ্যাত নাট্যবিদ্ Gordon Craig আনন্দ কুমারস্বামীকে এক পত্রে লেখেন ; 'If there are books of technical instruction', writes Mr. Gordon Craig, 'tell them to me I pray you. The day may come when I could afford to have one or two translated for my own private study and assistance' (The Mirror of Gesture : Introductoin p-1)

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গর্ডন ক্রেগের লিখিত এই পত্রই আনন্দ কুমারস্বামীকে The Mirror of Gesture নামে 'অভিনয়দর্পণ'-এর ভাষান্তর ও সম্পাদনায় উৎসাহিত করে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

ভাব প্রকাশের এই ভাষারীতি পরবর্তীকালে বহু পাশ্চাত্য নাট্যবিদদের প্রভাবিত করে। Bertolt Brecht, Raymond Williams, Henry W. Wells প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গীত-বাদ্য সমন্বিত এই অঙ্গাভিনয় প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত ; "Mr. Raymod Williams says regarding (cf. Drama in performance : Raymond Williams p 116-23) the text and performance that a far greater variety of rhythm should be used. In performing such arrangement of rhythms, use can be made of the various degrees of formality in speech itself and also of recitive and song. A song for example can be used not as a separate piece of atmosphere nor as an interlude but as a means of creating a certain kind of feeling. The extension to more than one voice is also possible. A dramatist who wants to use a singing chorus can draw at once on a rich and available skill. The rhythm made by the dramatist must be communicated by the performer not only with his voice but also with his body. A rich expressive means of communicating dramatic emotion in physical movement is found in the ballet. Dance, in itself can be openly used at certain points. He finally says that the greatness of drama lies in its capacity to unite the rhythms of the human voice, of the human body and of instruments in a moving form and so to embody the deepest and farthest reaches of human feeling.

Mr. Henry W. Wells says, (Eastern Drama and the Western stage —1962) that the main influence of the east on the west in the dramatic fields springs from the ancient texts and the theatrical traditions which these represent." (G. H. Tarlekar : Studies in the Natyasastra—p 280).

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেখ্‌ট 'অর্গেনাম'-এ গদ্য ও কবিতা, লিরিক ও এপিক, প্যান্টোমাইম, সঙ্গীত ও নৃত্যসমন্বয়ে থিয়েটারের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই যে ছন্দ, নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাণবন্ত ভূমিকা, যা নাট্যের অন্তর-কেন্দ্র থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়ে এক অবিস্মরণীয় ছবি সৃষ্টি করে, এর প্রভাব জাপানের নাট্যকলাতেও দেখা যায়। কাবুকি শব্দটিকে ভাঙলে অর্থ দাঁড়ায় কা (সঙ্গীত), বু (নৃত্য) এবং কি (অভিনয়)। 'নো' নাটকেও অঙ্গাভিনয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট।

১৯৬৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইস্ট-ওয়েস্ট থিয়েটার সেমিনারে চেকোশ্লাভাকিয়ার নাট্যবিদ্‌ মিলান লিউকেস এর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"গ্যায়টে কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, তাই বোধ হয় প্রাচ্য নাট্যকলার সামগ্রিকতার সর্বপ্রথম স্বীকৃতি। তবু ইউরোপের নাট্যকলা প্রাচ্যের নাট্যকলা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হয়েছে। এই শতকের গোড়া থেকে অবশ্য প্রাচ্যের

সুদূর নাট্যশিল্পের কোনো কোনো রীতি প্রতীচ্যের নাটকে গৃহীত হতে শুরু করেছে। বাস্তবের স্তূপীকরণ বর্জন করে একটি শুদ্ধ নাট্যবর্ণমালা নতুন শেখার চেষ্টা চলছে।

গর্ডন ক্রেগ প্রথম ব্যাপারটা শুরু করেন। ভারতীয় নাটক ভারতীয়দের দিয়ে অভিনয় করানোর স্বপ্ন ছিল তাঁর। মস্কোর শাবির-থিয়েটারের আলেকজান্দার তাইরভ্ ১৯২৪-তে শকুন্তলার অভিনয় করান। মস্কোর আর একজন প্রযোজক ভাদ্র-ভালোদ মায়ারহোল্ড ভারত-চীন-জাপানের নাট্যধারা থেকে শিক্ষাগ্রহণের কথা বারবার বলেছেন। ফ্রান্সের বেহিসাবী প্রতিভা আঁতোন্যা আর্তো বালিন্বীপের থিয়েটার থেকে (যা একান্ত-ভাবেই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অনুসারী) বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। ব্রেখ্‌ট-এর সঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত চীনা অভিনেতা মে ল্যাং ফ্যাং-এর সাক্ষাৎ ব্রেখ্‌টের নাট্যাদর্শের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য-থিয়েটারের এই লক্ষণগুলি বিশেষ মূল্যবান মনে হয়েছিল ঃ

১) প্রাচ্য থিয়েটারের বাস্তবের অলীক মায়া সৃষ্টিকে সযত্নে পরিহার করা হয়। ২) অ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদের লোহার শেকলে এ থিয়েটারের আত্মা বাঁধা নয়। ৩) থিয়েটারের প্রধান উপাদান—অভিনেতার শরীরের ওপর যে সম্পূর্ণ দখল থাকা দরকার, প্রাচ্য থিয়েটারের অঙ্গাভিনয়ে তা সর্বপ্রথম উদাহৃত। ৪) মঞ্চ ও দর্শকের মানসিক দূরবর্তিতা এখানে প্রায় অনুপস্থিত—পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা-গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের সূত্রে মিলন এখানে আছে।

(পঠিত প্রস্তাবসমূহ ঃ পবিত্র সরকার ঃ থিয়েটার / দশম সংখ্যা—১৯৬৬)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অঙ্গাভিনয়-এর এই ভাষা গর্ডন ক্রেগ-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য নাট্যচিন্তাকে প্রভাবিত করছে। কারণ এর যে কাব্যিক সুষমা—তা পাশ্চাত্যের নিছক অনুকরণাত্মক ক্রিয়ায় নেই। "Indian acting is a poetic art, an interpretation of life, while modern European acting, apart from any question of the words. is prose or imitation." (The Mirror of Gesture—p 5) এবং অভিনয়ের এই রীতি দীর্ঘদিনের সাধনা ও অনুশীলনের ফসল। এ শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন নয়, ধ্যানের ধন। "The perfect actor has the same complete and calm command of gesture that the puppet-showman has over the movements of his puppets ; the exhibition of his art is altogether independent of his own emotional condition, and if he is moved by what he represents, he is moved as a spectator, and not as an actor (Sahitya Darpana—p 50). Excellent acting wears the air of perfect spontaneity, but that is the art which conceals art. *It is exactly the same with painting. The Ajanta frescos seem to show unstudied gesture and spontaneous pose, but actually there is hardly a position of the hands or of the body which has not a recognized name and a precise significance. The more deeply we penetrate the technique of any typical oriental art, the more we find that what appears to be individual, impulsive and natural, is actually long—inherited,*

well considered, and well-bred." (The Mirror of Gesture—p 4).

বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে রয়েছে ছন্দের ক্রমিক শৃঙ্খলা, একটি সার্থক সমন্বয়। অঙ্গাভিনয়ের এই যে ভাষা তা দৃষ্টিগ্রাহ্য অন্যান্য শিল্পের আদর্শ। কারণ মানুষের সকল কলাসৃষ্টির মধ্যে নৃত্যই আদিম এবং নৃত্ত অথবা নৃত্যেই ছন্দের বিশুদ্ধ রূপ ও সর্বময় প্রভুত্ব সব থেকে বেশি। তাই নৃত্যভাষাই শুদ্ধ বর্ণলিপি। এজন্যেই নৃত্যশাস্ত্র সহায় না হলে অন্যান্য শিল্পে দক্ষতার অভাব ঘটে।

"বিনা তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুরবিদম্।"

(বিষ্ণু ধর্মোত্তর-বেঙ্কটেশ্বর সম্পাদিত—৩য় খণ্ড ২/৪)

প্রসঙ্গটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ডঃ মনোমোহন ঘোষ :

'In the vishnu-dharmottara, it has been said that the canons of painting are difficult to understand without an acquaintance with the canons of dancing. This remark is not intelligible to one who is not aware of the fact that dancing includes abhinaya, and was to a great extent responsible for its origin, although in later times it came to be associated more or less exclusively with the performance of natyas. An acquaintance with abhinaya, in fact, gives the student of painting a more or less definite idea about the postures of men according to changes (physical, mental and spiritual) to which they are subjected by the different objects surrounding them. The value of a treatise on abhinaya lies in the fact that it presents to us a more or less systematic and elaborate study of the possible artistic gestures which, when reproduced on stage by natas, may evoke rasa in the spectators Any one who has some idea about the technique of painting will uderstand how the descriptions of varying gestures by head, hands, eyes, lips and feet etc., would help a student of painting to acquire skill in depicting the human form in its endless variety of poses."

(Abhinaya Darpanam Edited by Dr. Manomohan Ghosh—p. 15)

তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাব প্রকাশের এই রীতিটিকেই 'ক্লাসিক' বলা যেতেপারে, কারণ এর মধ্যে একটি সার্বভৌমত্ব আছে—যা আঙ্গিকগত পার্থক্য ও সংকীর্ণ জাতীয় সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে যায়। এর ভাষা কেমন করে চিত্রভাষায় রূপ গ্রহণ করে আনন্দ কুমারস্বামী দৃশ্যকাব্য পরিকল্পনার এক আলোচনায় তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন : "Let us take a few episodes from the 'Sakuntala' of Kalidasa and see how they are presen ted. The 'watering of a tree' is to be acted according to the following direction.—'First show Nalini-padmakosa hands palms downwards, then raise them to the shoulder, incline the head, somewhat bending the slender body, and pour out. Naline-padmakosa hands are as

follows. Sukatunda hands are crossed palms down, but not touching, turned a little backward, and made padmakosa. To move the Nalini-padmakosa hands down-wards is said to be pouring out." The action indicated is practically that of the extreme left-hand figure in plate XII of the India Society's 'Ajanta Frescos' (Oxford 1915), but the actress, of course, only makes believe to lift and pour, she does not make use of an actual vessel." (The Mirror of Gesture—Page 4-5)

এই অংগাভিনয় বা ভাষাপ্রকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে। নাট্যশাস্ত্রকে মূলগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করে পরবর্তীকালে বহু শাস্ত্র রচিত হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে পরবর্তীকালে বহু অংগকর্ম যা নাট্যশাস্ত্রে নেই, শিল্পের প্রয়োজনে সংযোজিত হয়েছে। এর ফলে ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে চব্বিশটি অংসযুক্ত হস্তমুদ্রা, তেরটি সংযুক্ত হস্তমুদ্রা এবং একত্রিশটি নৃত্যহস্ত—মোট চৌষট্টি হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় (নাট্যশাস্ত্র ৯।১-২০০)। সংগীতরত্নাকরে চব্বিশটি অসংযুক্ত, তেরটি সংযুক্ত এবং ত্রিশটি নৃত্যহস্তের উল্লেখ আছে। (সংগীত-রত্নাকর/নর্তনাধ্যায়/৫৮ শ–২৮২)। এছাড়া নিকুঞ্চক, দ্বিশিখর ও বরদাভয় এই তিনটি নৃত্তহস্তের উল্লেখও সংগীতরত্নাকরে আছে। অভিনয়দর্পণে আটাশটি অসংযুক্ত, তেইশটি সংযুক্ত ও পাঁচটি নৃত্যহস্তের উল্লেখ আছে। এছাড়া দেবহস্ত, অবতার হস্ত, গ্রহ-তারা হস্ত, বান্ধব হস্ত প্রভৃতি পাওয়া যায় (অভিনয়দর্পণ—সম্পাদনা : মনোমোহন ঘোষ ৮৭-২৫৮)। The Mirror of Gesture গ্রন্থে আটাশটি অসংযুক্ত, চব্বিশটি সংযুক্ত (আর একটি পুঁথি অনুসারে সাতাশ), এবং জলজ প্রাণী, নদী, সাগর, বন্য পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, সপ্তলোক, দেবতা, বান্ধব প্রভৃতির অভিজ্ঞান সূচক মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় (The Mirror of Gesture : Ananda Coomaraswamy p. 27-51)।

নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ, সংগীত রত্নাকর, সংগীত দামোদর, হস্তরত্নাবলী, হস্তলক্ষণ দীপিকা, নাট্যশাস্ত্রসংগ্রহ, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, The Mirror of Gesture, নর্তন নির্ণয়, নাট্যলক্ষণ রত্নকোষ, নাট্যদর্পন, অগ্নিপুরাণ, মানসোল্লাস, নৃত্য রত্নকোষ, নাট্য মনোরমা, সংগীত নারায়ণ, সংগীত মুক্তাবলী, অভিনয় দর্পণ প্রকাশ, সংগীত কৌমুদী, সংগীত কল্পলতা, নৃত্য রত্নাবলী, সংগীত সার সংগ্রহ, সংগীত সময়সার, সংগীত মকরন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশের সম্পূর্ণতা ও সৌকর্য সাধনের জন্যে মুদ্রাগুলির বিভিন্ন প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত নাট্যগ্রন্থগুলির পর্যালোচনা করে একটি পূর্ণাংগ মুদ্রা-অভিধান সংকলন করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী অনুসারে মুদ্রাগুলির একটি মোটামুটি পূর্ণাংগ তালিকা দেওয়া হল।

অসংযুক্ত হস্ত

(১) অংকুশ (২) অর্ধচন্দ্র (৩) অর্ধপতাকা (৪) অর্ধসূচী (৫) অরাল (৬) অলপদ্ম (৭) অলপল্লব (৮) উৎকরাল (৯) উর্ণনাভ (১০) কটক (১১) কপিত্থ (১২) কদম্ব (১৩) কর্তরীমুখ (১৪) কাকতুণ্ড (১৫) কাঙগুল (১৬) কামুলক (১৭) কুবল (১৮) কৃষ্ণসারমুখ (১৯) কটকামুখ (২০) খড়্গাস্য (২১) গোমুখ (২২) চতুর্মুখ (২৩) চতুর

(২৪) চন্দ্রকলা (২৫) তন্ত্রীমুখ (২৬) তাম্রচূড় (২৭) ত্রিপতাকা (২৮) ত্রিমুখ (২৯) ত্রিশূল (৩০) দ্বিমুখ (৩১) ধৃতহস্তক (৩২) নিকুঞ্চক (৩৩) পক্ষীরূত (৩৪) পঞ্চাশ্য (৩৫) পতাকা (৩৬) পদ্মকোষ (৩৭) পরিক্রমা (৩৮) পল্লি (৩৯) পণিকা (৪০) ভ্রমর (৪১) মনূরণ ৪২) ময়ূর (৪৩ মুকুল (৪৪) মুষ্টি (৪৫) মৃগশীর্ষ ৪৬) রঙ্গাধ'ক (৪৭) ভঙ্গুল (৪৮) বরাহমুখ (৪৯) ভালচন্দ্র (৫০) বিগ্রহ (৫১) শিখর (৫২) শুকতুণ্ড (৫৩) সন্দংশ (৫৪) সর্পশীর্ষ ৫৫) সিংহাস্য (৫৬) সূচীমুখ (৫৭ হংসপক্ষ (৫৮) হংসাস্য।

সংযুক্ত হস্ত

(১) অঞ্জলি (২) অরেখা (৩) অবহিত্থা (৪) আসঙ্গ (৫) উৎসঙ্গ (৬) কটকাবর্ধন (৭) কপোত (৮) কর্কট (৯) কর্তরীস্বস্তিক (১০) কলস (১১) কীলক ১২) কূর্ম (১৩) কৈবল (১৪) কটকাবর্ধমানক (১৫) খট্টিকাসন (১৬) খট্বা (১৭) গজদন্ত (১৮) গরুড় (১৯) চক্র (২০) তিলক (২১) দদ্দুর (২২) ডোল (২৩) দ্বিশিখর (২৪) নাগবন্ধ (২৫) নিষেধ (২৬) পতাক স্বস্তিক (২৭) পাশা (২৮) পুষ্পপুট (২৯) ভেরুণ্ড (৩০) মকর (৩১) মৎস (৩২) মরাল (৩৩) যোগমুষ্টিক (৩৪) বহিস্তম্ভ (৩৫ বর্ধমানক (৩৬) বরাহ (৩৭) বৈষ্ণব (৩৮) শকট (৩৯) শঙ্খ (৪০) শিবলিঙ্গ (৪১) শৃঙ্খল (৪২) সম্পুট (৪৩) সম্প্রসাবী ৪৪) সংজ্ঞায়িকা (৪৫) সারিণী (৪৬) সুনন্দ (৪৭) স্বস্তিক।

নৃত্ত হস্ত

(১) অর্ধরেচিত (২) অবাল খটকামুখ (৩) অলপদ্ম (৪) অলপল্লব (৫) অবহিত্থ (৬) আবিদ্ধচক্র (৭) উত্তানবাংসিত (৮) উদ্বৃত্ত (৯) উন্নত (১০) উরোমণ্ডল (১১) উরোপার্শ্বভেদমণ্ডল (১২) উদ্বন (১৩) উর্ধ্বমণ্ডল (১৪) উর্ধ্বপার্শ্বমণ্ডল (১৫) করি-হস্ত (১৬) কেশবন্ধ (১৭) কুঞ্চিত (১৮) গরুড়পক্ষ (১৯) চতুরস্র, (২০) জ্ঞানহস্ত (২১) তলমুখ (২২) দণ্ডপক্ষ (২৩) দ্বিশিখর (২৪) নলিনী পদ্মকোশ (২৫) নিতম্ব (২৬) নিকুঞ্চক (২৭) পক্ষ প্রদ্যোতক (২৮ পক্ষব্যাংসিতক (২৯) পল্লব (৩০) পার্শ্বমণ্ডল (৩১) পার্শ্বার্ধমণ্ডল (৩২) প্রকীর্ণ (৩৩) মুদ্রা (৩৪) মুষ্টিকস্বস্তিক (৩৫) রেচিত (৩৬) লঘু-মুখ (৩৭) লতা (৩৮) লতাননা (৩৯) লতাননামুখ (৪০) ললিত (৪১) বরদাভয় (৪২) বলিত (৪৩) বিপ্রকীর্ণ (৪৪) শীর্ষাণুবলিত (৪৫) সূচীমুখ (৪৬) সূচীবিদ্ধ (৪৭) স্বস্তিক।

দেব হস্ত

(১) ব্রহ্মা (২) ঈশ্বর (৩) বিষ্ণু (৪) সরস্বতী (৫) পার্বতী (৬) লক্ষ্মী (৭) বিনায়ক (৮) সম্মুখ (৯) মন্মথ (১০) ইন্দ্র (১১) অগ্নি (১২) যম (১৩) নিঋতি (১৪) বরুণ (১৫) বায়ু (১৬) কুবের।

দশাবতার হস্ত

(১) মৎস্য (২) কূর্ম (৩) বরাহ (৪) নৃসিংহ (৫) বামন (৬) পরশুরাম (৭) রামচন্দ্র (৮) বলরাম (৯) কৃষ্ণ (১০) কল্কি।

জাতি হস্ত

(১) রাক্ষস (২) ব্রাহ্মণ (৩) ক্ষত্রিয় (৪) বৈশ্য (৫) শূদ্র।

বান্ধব হস্ত

(১) দম্পতি (২) মাতৃ (৩) পিতৃ ৪) শ্বশুর (৫) শ্বশ্রূ (৬) দেবর (৭) ননদ (৮) জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা (৯) পুত্র (১০) পুত্রবধূ (১১) সপত্নী (১২) জামাতা।

নবগ্রহ হস্ত

(১) সূর্য (২) চন্দ্র (৩) মঙ্গল (৪) বুধ (৫) বৃহস্পতি (৬) শুক্র (৭) শনি (৮) রাহু (৯) কেতু।

সাগর হস্ত

(১) লবণ (২) ইক্ষু (৩) সুরা (৪) সর্পি (৫) দধি (৬) ক্ষীর (৭) শুদ্ধোদক।

নদী হস্ত

(১) গঙ্গা (২) যমুনা (৩ কৃষ্ণা (৪) কাবেরী (৫) নর্মদা (৬) সরস্বতী (৭) তুঙ্গভদ্রা (৮) বেত্রবতী (৯) চন্দ্রভাগা (১০) সরযূ (১১) সুবর্ণমুখী (১২) পাপনাশিনী।

সপ্তলোক হস্ত

(১) অতল (২) বিতল (৩) সুতল (৪) তলাতল (৫) মহাতল (৬) রসাতল (৭) পাতাল।

বৃক্ষ হস্ত

(১) অশ্বথ (২) কদলী (৩) নারঙ্গী (৪) পনস (৫) বিল্ব (৬) বকুল (৭) বট (৮) অর্জুন (৯) হিন্তাল (১০) পুগ (১১) চম্পক (১২) খদির (১৩) অশোক (১৪) শমী (১৫) আমলক (১৬) কুরুবক (১৭) কপিত্থ (১৮) কেতকী (১৯) শিংশপ (২০) নিম্ব (২১) পারিজাত (২২) তিন্তিনি (২৩) জম্বু (২৪) পলাশ (২৫) রসাল।

প্রাণী হস্ত

(১) সিংহ (২) ব্যাঘ্র (৩) বানর (৪) ভল্লুক (৫) মার্জার (৬) শশক (৭) কৃষ্ণসার মৃগ (৮) গিরিকা (৯) কর্কট (১০) সারমেয় (১১) উষ্ট্র (১২) অজ (১৩) গর্দভ (১৪) ষণ্ড (১৫) গাভী (১৬) শুক (১৭) সারী (১৮) পারাবত (১৯) পেচক (২০) চাতক (২১) কোকিল (২২) বায়স (২৩) সারস (২৪) বক (২৫) হংস (২৬) ভ্রমর (২৭) মণ্ডূক (২৮) চক্রবাক।

নৃপ ও বীর হস্ত

(১) হরিশ্চন্দ্র (২) নল (৩) সগর (৪) পুরূরবা (৫) দিলীপ (৬) অম্বরীষ (৭) কার্ত্তবীর্য (৮) রাবণ (৯) ধর্মরাজ (১০) অর্জুন (১১) ভীম (১২) নকুল (১৩) শিবি (১৪) যযাতি (১৫) সহদেব (১৬) ভগীরথ (১৭) নহুষ (১৮) রঘু (১৯) দশরথ (২০) রামচন্দ্র (২১) ভরত (২২) লক্ষ্মণ (২৩) শত্রুঘ্ন (২৪) অজ।

হস্তকরণ

(১) আবেষ্টিত (২) উদ্বেষ্টিত (৩) পরিবর্তিত (৪) ব্যবর্তিত।

হস্তকরণ-এর ক্ষেত্রে ভরত-নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে অন্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলির কোনো পার্থক্য নেই।

হস্তকর্ম

নাট্যশাস্ত্র অনুসারে কুড়িটি হস্তকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থ অনুযায়ী মোট সংখ্যা ত্রিশ।

(১) আহ্বান (২) উৎকর্ষণ (৩) উদ্বৃত্তি (৪) ছেদন (৫) তর্জন (৬) তাড়ন (৭) বোলন (৮) দোলন (৯) ধ্রুব (১০) ধুনন (১১) নিগ্রহ (১২) পরিগ্রহ (১৩) প্রবৃত্তি (১৪) ভেদ (১৫) ভ্রম (১৬) শেক্ষণ (১৭) মোটন (১৮) যান (১৯' রক্ষণ (২০) বিকর্ষণ (২১) বিক্ষেপ (২২) বিরাতি (২৩) বিয়োগ (২৪) বিসর্গ (২৫ বৃত্তি (২৬) ব্যাকর্ষণ (২৭) সংশ্লেষ (২৮) স্ফোটন (২৯) নোদন (৩০) লোলন।

হস্তক্ষেত্র

(১) পার্শ্ব (২) পুর (৩) উর্ধ্বশির (৪) পশ্চাৎশির (৫) অধোশির (৬) ললাট (৭) কর্ণ (৮) বক্ষ (৯) নাভি (১০' কটীশীর্ষ (১১) উরুদ্বয় (১২) স্কন্ধ (১৩) পশ্চাৎপার্শ্ব (১৪) পুরঃশির

হস্তপ্রচার

(১) অধোগত (২) অগ্রগ (৩) অধোমুখ (৪) অগ্রতস্তল (৫) অধস্তল (৬) উরোগ (৭) উর্ধ্বগ (৮) উর্ধ্বমুখ (৯) উত্তান (১০) ত্রস্র (১১) পরাঙ্‌মুখ (১২) পার্শ্বগত (১৩ প্রস্তুগ (১৪) বর্তুল (১৫) সম্মুখ (১৬) স্ব-সম্মুখতল।

এছাড়া নৃত্যরত্নকোষ গ্রন্থে উপাধান, কদম্ব, আলিঙ্গন, কলাপ, লেখন, অঞ্জনা, চন্দ্রকান্ত, জয়ন্ত প্রভৃতি সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শরীরাভিনয়-এর অন্যান্য অঙ্গকর্মগুলিরও সম্পূর্ণ তথ্য বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

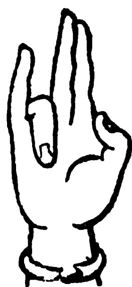
"অঙ্গুল্যঃ কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠঃ সংশ্লিষ্টাঃ প্রসৃতা যদি।
স পতাককরঃ প্রোক্তো নৃত্যকর্মবিশারদৈঃ॥"



পতাক

(অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় প্রসারিত হলে এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে পতাক হস্ত হয়।)

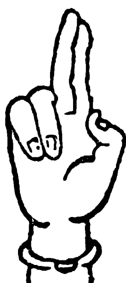
নাট্যারম্ভে, মেঘ ও বন বোঝাতে, বস্তুনিষেধে, কুচ, রাত্রি, নদী, অমরমণ্ডল, তুরঙ্গ, পবন, শয্যা, যাত্রার উদ্যোগ, প্রতাপ, প্রসাদ, জ্যোৎস্না, প্রখর সূর্যকিরণ, সমভাব, অঙ্গরাগ, তালপত্র, আশীর্বাদ, নৃপতিশ্রেষ্ঠ, সমুদ্র, বৎসর, বৃষ্টির দিন, গাঢ় আলিঙ্গন, প্রলাপ, মণ্ড, জল, বামন, কামার্তভাবে নারীর নাভিস্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থ বোঝাবার জন্যে পতাক হস্ত প্রয়োগ হয়।



ত্রিপতাক

"স এব ত্রিপতাকঃ স্যাদ্ বক্রিতানামিকাঙ্গুলিঃ ॥"

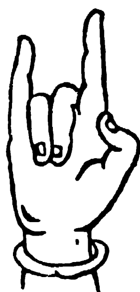
(পতাক হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র হলে ত্রিপতাক হস্ত হয়।
মুকুট, বৃক্ষ, বাসব, বজ্র, কেতকীফুল, দীপ, বহ্নিশিখা, পারাবত, পত্রলেখা, পরিবর্তন, ইক্ষুদণ্ড, মাঙ্গল্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ত্রিপতাক হস্ত প্রয়োগ হয়।)



অর্ধপতাক

"ত্রিপতাকে কনিষ্ঠা চেদ্ বক্রিতার্ধপতাকিকা" ॥

(ত্রিপতাক হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠাকে বক্র করলে অর্ধপতাক হস্ত হয়।
পত্র, ফলক, তীর, করাত, ছুরিকা, ধ্বজ, শৃঙ্গ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধপতাক হস্ত প্রয়োগ হয়। নাট্যশাস্ত্রে এই মুদ্রার উল্লেখ নেই।



কর্তরীমুখ

"অস্যৈব চাপি হস্তস্য তর্জনী চ কনিষ্ঠিকা।
বহিঃ প্রসারিতে দ্বে চ স করঃ কর্তরীমুখ" ॥

(অর্ধপতাক হস্ত অবস্থায় তর্জনী ও কনিষ্ঠা বাইরের দিকে প্রসারিত হলে কর্তরীমুখ হস্ত হয়।)
মৃত্যু, বিদ্যুৎ, পতন, লতা, স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ, লুণ্ঠন, বিপর্যস্ত অবস্থা, বিরহশয্যায় শয়ন ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে কর্তরীমুখ হস্তের প্রয়োগ হয়। (নাট্যশাস্ত্রে পাঠভেদে ত্রিপতাক হস্ত অবস্থায় মধ্যমার পৃষ্ঠে তর্জনী রাখলে কর্তরীমুখ হস্ত হয় এইরূপ বর্ণিত আছে। কথাকলি নৃত্যে সাধারণত এই আকারে প্রযুক্ত হয়।


মযূর

"অস্মিন্ননামিকাঙ্গুষ্ঠৌঃ শ্লিষ্টৌঃ চান্যাঃ প্রসারিতাঃ।
ময়ূরহস্তঃ কথিতঃ করটীকাবিচক্ষণৈঃ" ॥

কর্তরীমুখ হস্ত অবস্থায় অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত ও অন্য অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করলে ময়ূর হস্ত হয়।
ময়ূরের মুখ, পক্ষী, ললাটতিলক, বিখ্যাত বস্তু, শাস্ত্রের অর্থবিচার, বমন, লতা, নদীর জল নিক্ষেপ, অলকগুচ্ছ সরানো প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ময়ূর হস্ত ব্যবহার হয়।


অর্ধচন্দ্র

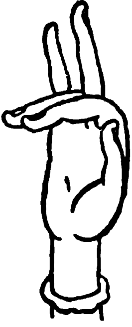
"অর্ধচন্দ্রকরঃ সোঽয়ং পতাকেঽঙ্গুষ্ঠসারণাৎ।"

পতাক হস্ত অবস্থায় কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠটি প্রসারিত করলে অর্ধচন্দ্র হস্ত হয়।
ধ্যান, প্রার্থনা, অঙ্গস্পর্শ, নমস্কার, কটিদেশ, গলাধাক্কা দেওয়া, দেবাভিষেকক্রিয়া, ভল্ল, কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্র, ভোজনপাত্র প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধচন্দ্র হস্তের প্রয়োগ হয়।


অরাল

"পতাকে তর্জনী বক্রা নাম্না সোঽয়মরালকঃ।"

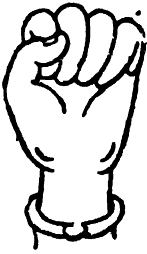
পতাক হস্ত অবস্থায় তর্জনী বক্র করলে অরাল হস্ত হয়।
বিষপান, অমৃতপান, প্রচণ্ড বড় প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অরাল হস্ত প্রয়োগ হয়।



শুকতুণ্ড

"অস্মিন্ননামিকা বক্রা শুকতুণ্ডকরো ভবেৎ।"

অরাল হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র করলে শুকতুণ্ড হস্ত হয়। বাণ প্রয়োগে, বর্শা, ভল্ল ব্যবহারে, উগ্রভাব প্রকাশে শুকতুণ্ড হস্ত প্রয়োগ হয়।



মুষ্টি

"মেলনাদঙ্গুলীনাঞ্চ কুঞ্চিতানাং তলান্তরে।
অঙ্গুষ্ঠশ্চোপরিযুতো মুষ্টিহস্তোহয়মীর্যতে॥"

করতলের মধ্যে অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত অবস্থায় পরস্পর মিলিত হবার পর তার উপর অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করলে মুষ্টি হস্তের প্রযোগ হয়।

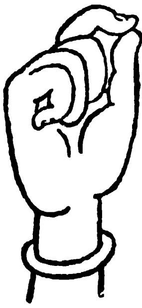


শিখর

"চেন্মুষ্টিরুন্নতাঙ্গুষ্ঠঃ স এব শিখরঃ করঃ॥

মুষ্টিহস্ত অবস্থায় অংগুষ্ঠ উন্নত করলে শিখর হস্ত হয়।

ধনু, স্তম্ভ, শ্রাদ্ধ, কামভাব, মদনদেব, নিশ্চয়তা, দন্ত, লিংগ, স্মরণ, অভিনয়, ঘন্টাধ্বনি, ওষ্ঠ, কটিবন্ধের আকর্ষণ প্রভৃতি অর্থপ্রকাশে শিখর হস্তের প্রয়োগ হয়।



কপিত্থ

"অঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধনি শিখরে বক্রিতা যদি তর্জনী ॥
কপিত্থাখ্যঃ করঃ সোঽয়ং কীর্তিতো নৃত্যকোবিদৈঃ ॥"

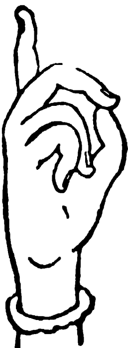
শিখর হস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠের মস্তকে তর্জনী বক্রভাবে স্থাপন করলে কপিত্থ হস্ত হয়।
লক্ষ্মী, সরস্বতী, নটগণের তালধারণ, গো-দোহন, অঞ্জন, অবলম্বন, ধূপ দীপ দ্বারা আরতি, বসনাঞ্চল ধারণ, লীলাকুসুম ধারণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কপিত্থ হস্ত প্রয়োগ হয়।



কটকামুখ

"কপিত্থে তর্জনী চোর্ধমুচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমধ্যমা ॥
কটকামুখহস্তোঽয়ং কীর্তিতো ভরতাগমৈঃ।"

কপিত্থ হস্ত অবস্থায় তর্জনীর সঙ্গে ঊর্ধোত্থিত অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা মিলিত হলে কটকামুখ হস্ত হয়। কুসুমচয়ন, সুগন্ধীকরণ, বচন, দৃষ্টিনিক্ষেপ, মুক্তামালা বা পুষ্পমালা ধারণ, তাম্বুল প্রদান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কটকামুখ হস্তের প্রয়োগ হয়।



সূচী

"ঊর্ধ্ব-প্রসারিতা যত্র কটকামুখতর্জনী ॥
সূচীহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো ভরতাগমকোবিদৈঃ।"

কটকামুখ হস্ত অবস্থায় তর্জনী ঊর্ধ্বে প্রসারিত করলে সূচী হস্ত হয়।

শত, রবি, নগরী, লোক, যে, যাহা, যাহাতে, যেরূপে, সে, তাহা, তাহাতে, সেইরূপে, বিজন, কৃশতা, শলাকা, দেহ, বিস্ময়, বেণীরচনা, ছত্র, সামর্থ, ভেরীবাদন, কুমোরের চাকীর ঘূর্ণন, বিবেচনা, দিনান্ত প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সূচী হস্তের প্রয়োগ হয়।



চন্দ্রকলা

"সূচ্যামঙ্গুষ্ঠমোক্ষে তু করশ্চন্দ্রকলা ভবেৎ।"

সূচী হস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠটি মুক্ত করলে চন্দ্রকলা হস্ত হয়।
চন্দ্র, মুখ, পরিমাণ, শিবের মুকুট, গঙ্গা, লাঠি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে চন্দ্রকলা হস্ত প্রয়োগ হয়।

"অঙ্গুল্যো বিরলাঃ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতাস্তলনিম্নগাঃ।
পদ্মকোশাবিধো হস্তো তন্নিরূপণমুচ্যতে॥"



পদ্মকোশ

করতল সমভাবে না থেকে কুঞ্চিত হবে, অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক অবস্থায় সামান্য বক্রভাবে নিম্নমুখী অবস্থায় থাকলে পদ্মকোশ হস্ত হয়।
বিল্বফুল, কপিত্থ ফল, রমণীর কুচকুম্ভ, ঘূর্ণীপাক, কন্দুক, ভোজন, রন্ধনপাত্র, পুষ্পকোরক, আম্রফল, পুষ্পবর্ষণ, পুষ্পমঞ্জরী, পদ্ম, বল্মীক, দর্পণ, ডিম্ব, প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পদ্মকোশ হস্তের প্রয়োগ হয়।



সর্পশীর্ষ

"পতাকা নমিতাগ্রা চেৎ সর্পশীর্ষকরো ভবেৎ॥"

পতাকা হস্ত অবস্থায় অগ্রভাগ নমিত করলে সর্পশীর্ষ হস্ত হয়।
চন্দন, সর্প, মন্দ্রধ্বনি, পোষণ, দেবপ্রণাম, বাহন, বামন, আস্ফালন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সর্পশীর্ষ হস্তের প্রয়োগ হয়।



মৃগশীর্ষ

"অস্মিন্ কনিষ্ঠিকাঙ্গুষ্ঠে প্রসৃতে মৃগশীর্ষকঃ ॥"

সর্পশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করলে মৃগশীর্ষ হস্ত হয়।
ভীতি, বিবাদ, নেপথ্য, আহ্বান, মিলন, বীণা, গতি, আবাস, নৈবেদ্য, বসন, যোনিদেশ, ছত্রধারণ, পাদসংবাহন, সমর, শমন, সময়, দেহ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে মৃগশীর্ষ হস্তের প্রয়োগ হয়।



সিংহমুখ

"মধ্যমানামিকাগ্রাভ্যামঙ্গুষ্ঠো মিশ্রিতো যদি ॥
শেষৌ প্রসারিতৌ যত্র স সিংহাস্যকরো ভবেৎ।"

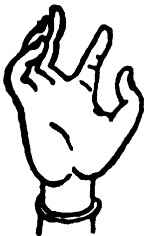
মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগের সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ মিলিত হলে এবং তর্জনী ও কনিষ্ঠা প্রসারিত অবস্থায় থাকলে সিংহমুখ হস্ত হয়।
হোম, গজ, পদ্মমালা, সিংহমুখ, শশক, স্মিত, সিংহাসন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে, সিংহমুখ হস্তের প্রয়োগ হয়।



কাঙ্গুল

"পদ্মকোশেহনামিকা চেন্নম্রা কাঙ্গুলহস্তকঃ ॥"

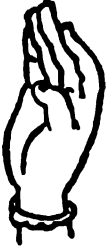
পদ্মকোশ হস্ত অবস্থায় অনামিকা নমিত করলে কাঙ্গুল হস্ত হয়। নাট্যশাস্ত্রে পাঠান্তরে লাঙ্গুল হস্তও বলা হয়।
নূপুর, চকোর, চাতক, কহ্লার, সুপারি গাছ, নারিকেল, বালিকা স্ত্রীর কুচমণ্ডল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কাঙ্গুল হস্তের প্রয়োগ হয়।



অলপদ্ম

"কনিষ্ঠাদ্যা বক্রিতাশ্চ বিরলাশ্চালপদ্মকঃ ॥"

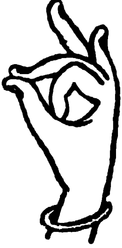
কনিষ্ঠা ও অন্যান্য অঙ্গুলিগুলিকে ফাঁক ফাঁক অবস্থায় বক্র করলে অলপদ্ম হস্ত হয়।
পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্ম, পূর্ণচন্দ্র, বিরহ, দর্পণ, আবর্ত, কুচমণ্ডল, উর্ধ্বচূড়া কবরী, শ্লাঘা, সৌন্দর্য, শকট, চক্রবাক, কোপ, কলকল ধ্বনি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অলপদ্ম হস্তের প্রয়োগ হয়।



চতুর

"তর্জন্যাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্লিষ্টাঃ কনিষ্ঠা প্রসৃতা যদি।
অঙ্গুষ্ঠোঽনামিকামূলে তির্যক্ চেচ্চতুর করঃ॥"

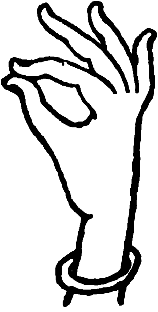
তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা পরস্পরসংশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকবে, কনিষ্ঠা প্রসারিত হবে ও অংগুষ্ঠ অনামিকা তির্যক-ভাবে স্থাপিত হলে চতুর হস্ত হয়।
স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, নয়ন, প্রমাণ, ঘৃত, তৈল, সরস বস্তু, আর্দ্রা খেদ, রসাস্বাদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে চতুর হস্তের প্রয়োগ হয়।



ভ্রমর

"মধ্যমাঙ্গুষ্ঠসংযোগে তর্জনী বক্রিতাকৃতিঃ।
শেষাঃ প্রসারিতাশ্চাসৌ ভ্রমরাভিধহস্তকঃ॥"

মধ্যমা ও অংগুষ্ঠ সংযুক্ত অবস্থায়, তর্জনী বক্রাকৃতি, কনিষ্ঠা ও অনামিকা প্রসারিত অবস্থায় থাকলে ভ্রমর হস্ত হয়।
ভ্রমর, পক্ষ, শুক, সারস, কোকিল, যোগ, মৌনভাব প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ভ্রমর হস্তের প্রয়োগ হয়।



হংস্যাস্য

"মধ্যমাদ্যাস্ত্রয়োঽঙ্গুল্যঃ প্রসৃতা বিরলা যদি।
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠসংশ্লেষাৎ করো হংসাস্যকো ভবেৎ॥"

তর্জনী ও অংগুষ্ঠ সংশ্লিষ্ট থাকলে এবং মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা ফাঁক ফাঁক ভাবে প্রসারিত হলে হংসাস্য হস্ত হয়।
এই মুদ্রার অন্য আকৃতিও আছে।
দংশন, মাছি, বাঁধ, কষ্টিপাথর, কর্তব্য, চিত্রাংকন, শোভা, রেখাবিচার, মুক্তা, সূত্রবন্ধন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে হংসাস্য প্রয়োগ হয়।



হংসপক্ষ

"সর্পশীর্ষকরে সম্যক্ কনিষ্ঠা প্রসৃতা যদি।
হংসপক্ষকরঃ সোঽয়ং তন্নিরূপণমুচ্যতে॥"

সর্পশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা সম্পূর্ণ প্রসারিত করলে হংসপক্ষ হস্ত হয়।
সেতুবন্ধন, আবরণ, আচ্ছাদন, আচমন, চন্দনলেপন, ষট্ সংখ্যা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে হংসপক্ষ হস্তের প্রয়োগ হয়।

"পুনঃ পুনঃ পদ্মকোশঃ সংশ্লিষ্টো বিরলো যদি।
সন্দংশাভিধহস্তোহয়ং কীর্তিতো নৃত্যকোবিদৈঃ ॥"



সন্দংশ

পদ্মকোশ হস্ত অবস্থায় অংগুলিসমূহ ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট ও ফাঁক ফাঁক করলে সন্দংশ হস্ত হয়। এর আর একটি রূপও প্রচলিত যেমন, অরাল হস্ত অবস্থায় তর্জনী ও অংগুষ্ঠ সাঁড়াশীর মতো যুক্ত করলে ও করতল নামালে সন্দংশ হস্ত হয়। অগ্রজ, মুখজ ও পার্শ্বজ—এই তিন প্রকার সন্দংশ হস্তের কথা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ব্রণ, কীট, উদর, মহাভয়, পূজা, প্রবাল ও সংখ্যা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সন্দংশ হস্তের প্রয়োগ হয়।

"অঙ্গুলীপঞ্চকঞ্চৈব মেলয়িত্বা প্রদর্শনে।
মুকুলাভিধহস্তোহয়ং কীর্ত্যতে ভরতাগমে ॥"



মুকুল

পঞ্চাংগুলির অগ্রভাব একত্রে মিলিত অবস্থায় সমভাবে ঊর্ধ্বে প্রসারিত করলে মুকুল হস্ত হয়।

মুকুলীকৃত পদ্ম, ভোজন, জপ, পঞ্চশর, নাভি, কদলীপুষ্প, চুম্বন, কামোদ্দীপক নখবিলেখন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ মুকুল হস্তের প্রয়োগ হয়।

"মুকুলে তাম্রচূড়ঃ স্যাৎ তর্জনী বক্রিতা যদি ॥"



তাম্রচূড়

মুকুল হস্ত অবস্থায় তর্জনী বক্র করলে তাম্রচূড় হস্ত হয়। নাট্যশাস্ত্রে অন্য দুই রকমের তাম্রচূড় হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটিতে মধ্যমা ও অংগুষ্ঠ সাঁড়াশীর মতো যুক্ত, তর্জনী বক্র অবস্থায় এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা করতলে থাকে। ইহা ভর্ৎসনা, তাল দেওয়া প্রভৃতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টিতে মুষ্টি হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকে। ইহা শত সহস্র লক্ষ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করে।

কুক্কুট, বক, কাক, উট, গোবৎস, তালপত্র প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে তাম্রচূড় হস্তের প্রয়োগ হয়।



"নিকুঞ্চনযুতাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠস্তু ত্রিশূলকঃ ॥"

কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে ও অন্যান্য অঙ্গুলি সমভাবে ঊর্ধ্বে প্রসারিত থাকলে ত্রিশূল হস্ত হয়।

ব্যাঘ্র হস্ত, অর্ধসূচী হস্ত, কটক হস্ত, ও পল্লি হস্ত প্রচলিত কিন্তু নাট্যশাস্ত্র বা অভিনযদর্পণে অসংযুক্ত মুদ্রা তালিকায় এদের উল্লেখ নেই।



ব্যাঘ্র

"কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠনমনে মৃগশীর্ষকরে তথা।
ব্যাঘ্রহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো ভরতাগমকোবিদৈঃ ॥"

মৃগশীর্ষ হস্ত অবস্থায কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ নমিত করলে ব্যাঘ্র হস্ত হয়।

ব্যাঘ্র, ভেক, মর্কট, শুক্তি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ব্যাঘ্র হস্তের প্রয়োগ হয়।



অর্ধসূচী

"কপিত্থে তর্জনী ঊর্ধ্বসারণে ত্বর্ধ্বসূচিকঃ ॥"

কপিত্থ হস্ত অবস্থায় তর্জনী ঊর্ধ্বে প্রসারিত করলে অর্ধসূচী হস্ত হয়।

অঙ্কুর, পক্ষীশাবক, বৃহৎ কীট প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধ-সূচী হস্তেব প্রয়োগ হয়।



কটক

"সন্দংশেহপ্যূর্ধ্বভাগে তু মধ্যমানামিকান্বয়া ॥"

সন্দংশ হস্ত অবস্থায় মধ্যমা ও অনামিকা মিলিত হলে কটক হস্ত হয়।

আহ্বানের ভাব ও চলন বোঝাতে কটক হস্তের প্রয়োগ হয়। এই মুদ্রাব শ্লোকের পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায় নি।

"ময়ূরে তর্জনীপৃষ্ঠৌ মধ্যমেন যুতো যদি ॥"

ময়ূর হস্ত অবস্থায় তর্জনীর পৃষ্ঠদেশ মধ্যমার সহিত যুক্ত হলে পল্লি হস্ত হয়।



পল্লী

অসংযুক্ত হস্তগুলি থেকেই সংযুক্ত হস্তের উৎপত্তি হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, কটকাবর্ধমান, উৎসঙ্গ, নিষেধ, ডোল, পুষ্পপুট, মকর, গজদন্ত, অবহিত্থ ও বর্ধমান—এই তেরটি সংযুক্ত হস্ত। অভিনয়দর্পণে সংযুক্ত হস্ত-তালিকায় অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, ডোলা, পুষ্পপুট, উৎসঙ্গ, শিবলিঙ্গ, কটকাবর্ধন, কর্তরীস্বস্তিক, শকট, শঙ্খ, চক্র, সম্পুট, পাশ, কীলক, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, গরুড়, নাগবন্ধ, খট্বা ও ভেরুণ্ড—এই তেইশটি মুদ্রার উল্লেখ আছে। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রে এছাড়াও আরো বিভিন্ন নৃত্যহস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার নাট্যশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি হস্তের উল্লেখ দেখা যায়। এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করে মুদ্রার একটি অভিধান সংকলন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য এ কাজ বিশেষ দুরূহ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ।

"পতাকাতলয়োর্যোগাদঞ্জলিঃ কর ঈরিতঃ ॥"

দুই পতাকা হস্ত অবস্থায় তলদেশ যুক্ত হলে অঞ্জলি হস্ত হয়।

দেবতা, গুরু ও বিপ্র প্রণাম অর্থ প্রকাশে অঞ্জলি হস্তের প্রয়োগ হয়।



অঞ্জলি

"কপোতোঽসৌ করো যত্র শ্লিষ্টমূলাগ্রপার্শ্বকঃ ॥"

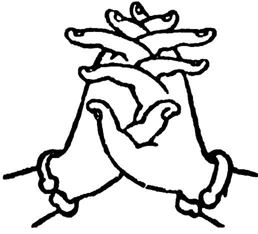
অঞ্জলি হস্ত অবস্থায় মণিবন্ধ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ মিলিত হলে ও করতলে অপর দিক উন্মুক্ত হলে কপোত হস্ত হয়।

প্রণাম, গুরু-সম্ভাষণ, সবিনয় স্বীকৃতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কপোত হস্তের প্রয়োগ হয়।



কপোত

"অন্যোঽন্যস্যান্তরে যত্রাঙ্গুল্যো নিঃসৃত্য হস্তয়োঃ
অন্তর্বহির্বা বর্তন্তে কর্কটঃ সোঽভিধীয়তে।"

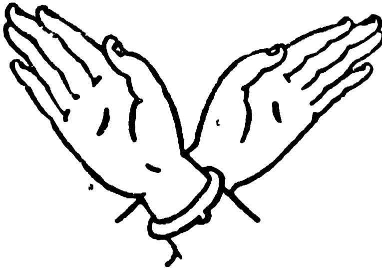


কর্কট

এক হাতের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলি এক এক করে প্রবিষ্ট করতে হবে এবং উহা হাতের তলায় অথবা উপরের দিকে থাকলে কর্কট হস্ত হয়।

জনসমাগম, শাখা উন্নয়ন, শঙ্খবাদন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কর্কট হস্তের প্রয়োগ হয়।

"পতাকয়োঃ সন্নিযুক্ত করয়োর্মণিবন্ধয়োঃ॥
সংযোগেন স্বস্তিকাখ্যো মকরে বিনিযুজ্যতে॥"



স্বস্তিক

দুইটি পতাকা হস্ত মণিবন্ধে পরস্পর সংযুক্ত হলে স্বস্তিক হস্ত হয়।

আকাশ, দিক, মেঘ, সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অসীম পদার্থের অর্থ প্রকাশে স্বস্তিক হস্তের প্রয়োগ হয়।

"পতাক উরুদেশস্থে ডোলাহস্তোঽয়মিষ্যতে॥"

পতাক হস্ত দুটি লম্বমান অবস্থায় উরুদেশে স্থাপন করলে ডোলা হস্ত হয়।

বিষাদ, সম্ভ্রম, মূর্ছা, আবেগ, ক্ষতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ডোলাহস্তের প্রয়োগ হয়।

"সংশ্লিষ্টকরয়োঃ সর্পশীর্ষঃ পুষ্পপুটঃ করঃ॥"



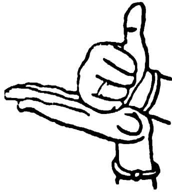
পুষ্পপুট

দুইটি সর্পশীর্ষ হস্তকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় রাখলে পুষ্পপুট হস্ত হয়।

সান্ধ্য উপাসনা, অর্ঘ্যদান, আরতি, মন্ত্রপুষ্প প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পুষ্পপুট হস্তের প্রয়োগ হয়।

"অন্যোন্যবাহুদেশস্থৌ মৃগশীর্ষকরৌ যদি।
উৎসঙ্গহস্তঃ স জ্ঞেয়ো ভরতাগমবেদিভিঃ॥"

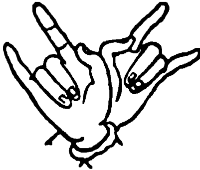
মৃগশীর্ষ অবস্থায় দুইটি হাত পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বাহুদেশে স্থাপন করলে উৎসঙ্গ হস্ত হয়। আলিঙ্গন, লজ্জা, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে উৎসঙ্গ হস্তের প্রয়োগ হয়।



শিবলিঙ্গ

"বামেঽর্ধচন্দ্রে বিন্যস্তঃ শিখরঃ শিবলিঙ্গকঃ।"

বাম হাতে অর্ধচন্দ্র ও ডান হাত শিখর হস্ত অবস্থায় তাহার উপর রাখলে শিবলিঙ্গ হস্ত হয়।
শিবলিঙ্গ অর্থ প্রকাশে শিবলিঙ্গ হস্তের প্রয়োগ হয়।

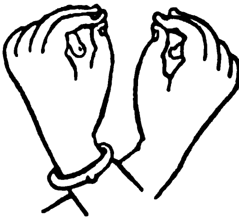


কটকাবর্ধন

"কটকামুখয়োঃ পাণ্যোঃ স্বস্তিকো মণিবন্ধয়োঃ।
কটকাবর্ধনাখ্যঃ স্যাদিতি নাট্যবিদো বিদুঃ॥"

দুটি কটকামুখ হস্ত পরস্পরের মণিবন্ধে সংযুক্ত করলে কটকাবর্ধন হস্ত হয়।
পূজা, বিবাহ, অভিষেক প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কটকাবর্ধন হস্তের প্রয়োগ হয়।

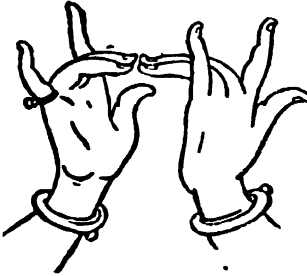
"কর্তরী স্বস্তিকাকারা কর্তরীস্বস্তিকো ভবেৎ॥"



কর্তরীস্বস্তিক

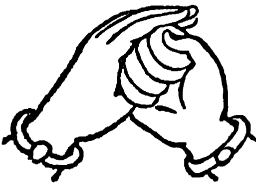
কর্তরীমুখ অবস্থায় দুইটি হস্ত স্বস্তিকাকারে সংযুক্ত হলে কর্তরীস্বস্তিক হস্ত হয়।
শাখা, গিরিশিখর, বৃক্ষ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কর্তরীস্বস্তিক হস্তের প্রয়োগ হয়।

"ভ্রমরে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠপ্রসারাচ্ছকটো ভবেৎ ॥"


শকট

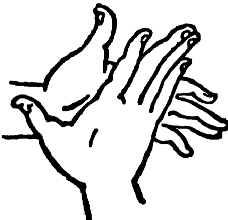
দুই ভ্রমর হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত করলে শকট হস্ত হয়।
রাক্ষস ভূমিকাভিনয়ে শকট হস্তের প্রয়োগ হয়।

"শিখরান্তর্গতাঙ্গুষ্ঠ ইতরাঙ্গুষ্ঠসঙ্গতঃ।
তর্জন্যা যুত আশ্লিষ্টঃ শঙ্খহস্তঃ প্রকীর্তিতঃ ॥"


শঙ্খ

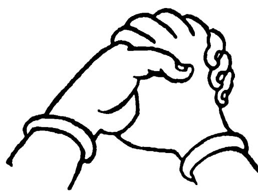
এক হাতের শিখরহস্ত অবস্থায় অপর হাতের অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট করলে এবং শিখর হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত অপর হস্তের তর্জনী দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করলে শঙ্খ হস্ত হয়। নাট্যশাস্ত্রে এই হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় না।
শঙ্খ, শঙ্খবাদন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে শঙ্খমুদ্রা প্রয়োগ হয়।

"যত্রার্ধচন্দ্রৌ তির্যঞ্চাবন্যোন্যতলসংস্পৃশৌ।
চক্রহস্তঃ সঃ বিজ্ঞেয়শ্চক্রার্থে বিনিযুজ্যতে ॥"


চক্র

অর্ধচন্দ্র হস্ত অবস্থায় দুইটি হাত যখন টেরচাভাবে পরস্পর তলদেশ স্পর্শ করে তখন চক্র হস্ত হয়।
চক্র বোঝাতে চক্র হস্তের প্রয়োগ হয়। এই মুদ্রা বৃহস্পতি, বিষ্ণু ও শিবের প্রিয়।

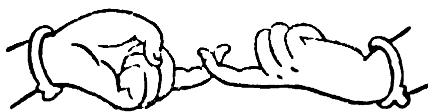
"কুঞ্চিতাঙ্গুলয়শ্চক্রে প্রোক্তঃ সম্পুটহস্তকঃ।"



সংপুট

চক্র হস্ত অবস্থায় অংগুলিগুলি কুণ্ঠিত হলে সংপুট হস্ত হয়। অর্থাৎ এক হস্তের অংগুলিগুলি দিয়া অপর হস্তের অংগুলিগুলি চাপিয়া ধরিতে হয়। বস্তুর আচ্ছাদন ও কৌটা, বাক্স প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সংপুট হস্তের প্রয়োগ হয়।

"সূচ্যাং নিকুঞ্চিতে শ্লিষ্টে তর্জন্যৌ পাশ ঈরিতঃ।"

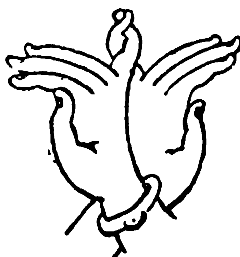


পাশ

দুই হাতে সূচীহস্ত অবস্থায় তর্জনী দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও কুণ্ঠিত অবস্থায় থাকলে পাশ হস্ত হয়।

কলহ, শৃংখল, বন্ধন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পাশ হস্তের প্রয়োগ হয়। এই মুদ্রা দুর্গা গণেশ ও শক্তিদেবতাদের প্রিয়।

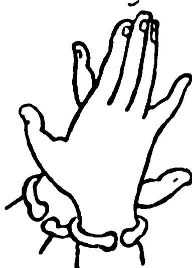
"কনিষ্ঠে কুঞ্চিতে শ্লিষ্টে মৃগশীর্ষস্ত কীলকঃ।"



কীলক

দুই হাতে মৃগশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠাদুটি কুণ্ঠিত হয়ে পিছনের দিকে পরস্পর সংযুক্ত হলে কীলক হস্ত হয়। স্নেহ, ক্রীড়া, কৌতুক, বিহার, পরিহাস, বিশ্রম্ভালাপ, সংকেত প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কীলক হস্তের প্রয়োগ হয়।

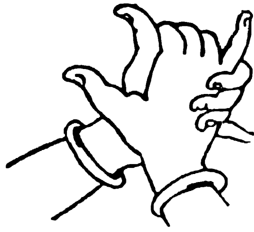
"করপৃষ্ঠোপরি ন্যস্তো যত্র হস্তত্বধোমুখঃ।
কিঞ্চিৎপ্রসারিতাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠো মৎস্যনামকঃ॥"



মৎস্য

অধোমুখ অবস্থায় করপৃষ্ঠে অপর হস্ত অধোমুখ অবস্থায় রাখলে এবং অংগুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা প্রসারিত করলে মৎস্য হস্ত হয়।

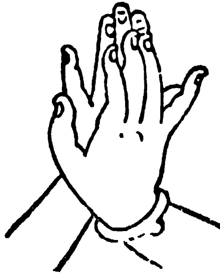
মৎস্যের রূপ প্রদর্শনে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।



কূর্ম

"কুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিশ্চক্রে ত্যক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠকঃ।
কূর্মহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো কূর্মার্থে বিনিযুজ্যতে ॥"

কূর্ম অর্থ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

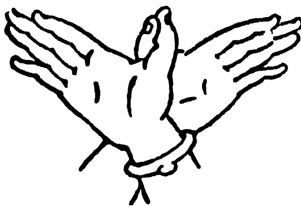


বরাহ

"মৃগশীর্ষে ত্বন্যতরে স্বোপর্যেকঃ স্থিতো যদি।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্যোগাদ্বরাহকর ঈরিতঃ ॥"

মৃগশীর্ষ অবস্থায় দুইটি হাত পরস্পরের উপর স্থাপিত হলে এবং উভয় হাতের কনিষ্ঠা ও অংগুষ্ঠ দুটি পরস্পর মিলিত হলে বরাহ হস্ত হয়।
বরাহ রূপ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

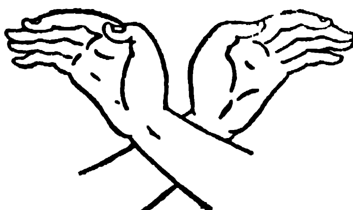
"তির্যক্‌তলস্থিতাবর্ধচন্দ্রাবঙ্গুষ্ঠযোগতঃ।
গরুড়হস্ত ইত্যাহুর্ গরুডার্থে নিযুজ্যতে ॥"



গরুড়

দুইটি অর্ধচন্দ্র হস্ত একটি অপরের তলদেশে তির্যকভাবে থাকলে এবং অংগুষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকলে গরুড় হস্ত হয়।
গরুড় রূপ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

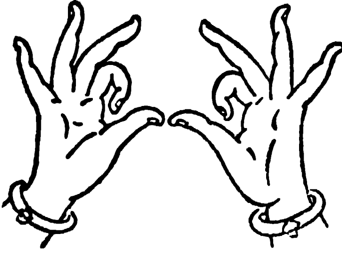
"সর্পশীর্ষস্বস্তিকশ্চ নাগবন্ধ ইতীরিতঃ।
এতস্য বিনিয়োগস্তু নাগবন্ধে হি সম্মতঃ ॥"



নাগবন্ধ

দুইটি সর্পশীর্ষ হস্ত মণিবন্ধে স্বস্তিকাকারে সংযুক্ত হলে নাগবন্ধ হস্ত হয়। নাগপাশ অর্থ প্রকাশে ইহার প্রয়োগ হয়।

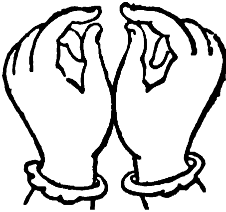
চতুরে চতুরং ন্যস্য তর্জন্যঙ্গুষ্ঠমোক্ষতঃ।
খটবাহস্তো ভবেদেষখটবাশিবিকয়োঃ স্মৃতঃ॥"



খটবা

দুইটি চতুর হস্ত পরস্পর নিবিষ্ট করে তর্জনী ও অংগুষ্ঠকে উন্মুক্ত করলে খটবা হস্ত হয়।
খটবা ও শিবিকা অর্থ প্রকাশে এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

"মণিবন্ধেকপিত্থাভ্যাং ভেরুণ্ডকর ইষ্যতে।
ভেরুণ্ডে পক্ষিদম্পত্যোর্ভেরুণ্ডো যুজ্যতে করঃ॥"



ভেরুণ্ড

দুইটি কপিত্থ হস্ত মণিবন্ধে সংযুক্ত করলে ভেরুণ্ড হস্ত হয়।
পক্ষিদম্পতি অর্থ প্রকাশে ভেরুণ্ড মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

সাধারণভাবে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রা তালিকা ও লক্ষণ এইখানেই শেষ হল, কিন্তু এ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক মুদ্রার উল্লেখ নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ ও সঙ্গীতরত্নাকরে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেবদেবীর ভূমিকায় বিভিন্নমুদ্রা প্রচলিত।

ব্রহ্মহস্ত : "ব্রহ্মণশ্চতুরো বামে হংসাস্যো দক্ষিণে করঃ।"
বাঁ হাতে চতুর হস্ত ও ডান হাতে হংসাস্য হস্ত করলে ব্রহ্ম হস্ত হয়।

ঈশ্বর হস্ত : "শম্ভোর্বামে মৃগশীর্ষস্ত্রিপতাকাস্তু দক্ষিণে।"
বাঁ হাতে মৃগশীর্ষ ও ডান হাতে ত্রিপতাক হস্ত করলে শম্ভু হস্ত বা ঈশবর হস্ত হয়।

বিষ্ণু হস্ত : "হস্তাভ্যাং ত্রিপতাকাস্তু বিষ্ণুহস্তঃ সঃ কীর্তিতঃ।"
দুই হাতেই ত্রিপতাক হস্ত করলে তাকে বিষ্ণু হস্ত বলে।

সরস্বতী হস্ত ঃ "সূচীকৃতে দক্ষিণে চ বামে চাংসসমাকৃতৌ।
কপিত্থকেঽপি ভারত্যাঃ করঃ স্যাদিতি সম্মতঃ ॥"

ডান হাতে সূচী ও স্কন্ধের সমরেখায় বাঁ হাতে কপিত্থ হস্ত করলে সরস্বতী হস্ত হয়।

পার্বতী হস্ত ঃ ঊর্ধ্বাধঃপ্রসৃতাবর্ধচন্দ্রাখ্যৌ বামদক্ষিণৌ।
অভয়ো বরদশ্চৈব পার্বত্যাঃ করঃ ঈরিতঃ ॥"

বাঁ হাতে অর্ধচন্দ্র অবস্থায় ঊর্ধ্বে ও ডান হাত অর্ধচন্দ্র অবস্থায় নিম্নমুখে প্রসারিত হলে অভয়া ও বরদা রূপে পার্বতী হস্ত হয়।

লক্ষ্মী হস্ত ঃ "অংসোপকণ্ঠে হস্তাভ্যাং কপিত্থস্ত শ্রিয়ঃ করঃ।"

দুই হাত কপিত্থ হস্ত অবস্থায় কাঁধের কাছে উত্তোলিত থাকলে লক্ষ্মী হস্ত হয়।

বিনায়ক হস্ত ঃ "উরোগতাভ্যাং হস্তাভ্যাং কপিত্থো বিঘ্নরাট্ করঃ।"

বক্ষোদেশে দুই হাত কপিত্থ হস্ত অবস্থায় রাখলে বিনায়ক হস্ত বা গণেশ হস্ত হয়।

ষন্মুখ হস্ত ঃ "বামে করে ত্রিশূলঞ্চ শিখরো দক্ষিণ করে।
ঊর্ধ্বং গতে ষন্মুখস্য হস্তঃ স্যাদিতি কীর্তিতঃ ॥"

বাঁ হাতে ত্রিশূল হস্ত ও ঊর্ধ্বে ডান হাতে শিখর হস্ত করলে ষন্মুখ হস্ত বা কার্তিকেয় হস্ত হয়।

মন্মথ হস্ত ঃ "বামে করে তু শিখরে দক্ষিণে কটকামুখঃ।
মন্মথস্য করঃ প্রোক্তো নাট্যশাস্ত্রার্থকোবিদৈঃ ॥"

বাঁ হাতে শিখর হস্ত ও ডান হাতে কটকামুখ হস্ত করলে মন্মথ হস্ত হয়।

ইন্দ্র হস্ত ঃ ত্রিপতাকঃ স্বস্তিকশ্চ শক্রহস্তঃ প্রকীর্তিতঃ ॥"

দুই হাতে ত্রিপতাক স্বস্তিকাকারে রাখলে ইন্দ্র হস্ত হয়।

যম হস্ত ঃ "বামে পাশং দক্ষিণে তু সূচী যমকরঃ স্মৃতঃ।"

বাঁ হাতে পাশ হস্ত ও ডান হাতে সূচী হস্ত করলে যম হস্ত হয়। যমরাজকে চতুর্ভুজ কল্পনা করা হয়।

অগ্নি হস্ত ঃ "ত্রিপতাকো দক্ষিণে তু বামে কাঙ্গুলহস্তকঃ।
অগ্নিহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥"
বাঁ হাতে কাঙ্গুল হস্ত ও ডান হাতে ত্রিপতাক হস্ত করলে অগ্নি হস্ত হয়।

বরুণ হস্ত ঃ "পতাকো দক্ষিণে বামে শিখরো বরুণঃ করঃ।"
বাঁ হাতে শিখর হস্ত ও ডান হাতে পতাক হস্ত করলে বরুণহস্ত হয়।

বায়ু হস্ত ঃ "অরালো দক্ষিণে হস্তে বামে চার্ধপতাকিকা।
ধৃতা চেদ্বায়ুদেবস্য কর ইত্যভিধীয়তে ॥"

বাঁ হাতে অর্ধপতাক হস্ত ও ডান হাতে অরাল হস্ত করলে বায়ু হস্ত হয়। এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন অবতার হস্ত, নবগ্রহ হস্ত ও কার্যানুসারে জাতি হস্তেরও বিভিন্ন মুদ্রা আছে। শুধুমাত্র মুদ্রা সম্পর্কেই স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও অভিধান রচিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলির পরিচয় ও লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পতাক, স্বস্তিক, ডোলা হস্ত, অঞ্জলি, কটকাবর্ধন, শকট, পাশ, কীলক, কপিত্থ, শিখর, কূর্ম, হংসাস্য ও অলপদ্ম—এই তেরটিকে নৃত্যের উপযোগী প্রধান মুদ্রারূপে গণ্য করা হয়।

নৃত্যহস্তগুলির পাঁচটি প্রধান গতি যথা—ঊর্ধ্বগতি, অধোগতি, উত্তরাগতি, প্রাচীগতি ও দক্ষিণাগতি। পাদবিক্ষেপ অনুযায়ী এই গতি সঞ্চালিত হয়।

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দপর্ণে নৃত্যহস্তের সংখ্যা ও লক্ষণে পার্থক্য আছে। বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় লক্ষণভেদে এই মুদ্রাগুলির প্রয়োগ হয়। ভারতীয় নৃত্যের ভাবসম্পদের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও সূক্ষ্মতা প্রকাশে পৃথক ঋষি, বর্ণ ও বংশসম্ভূত হস্ত মুদ্রাগুলির প্রতীকধর্মী প্রয়োগ, অধ্যাত্মভাব ও শিল্পপ্রতিভার সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

নন্দিকেশ্বর-সম্প্রদায় বহিরঙ্গের খুঁটিনাটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং নাট্য ধর্মী অভিনয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। আঙ্গিকাভিনয় পর্যায়ে অভিনয়দর্পণ একটি মূল্যবান গ্রন্থ, সেইজন্যে এই মুদ্রালক্ষণগুলি অভিনয়দর্পণের শ্লোক অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। মুদ্রার অন্যান্য লক্ষণগুলি 'কথাকলি' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম রূপে এই ভাষারীতি প্রয়োজন অনুসারে পরিপুষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সঙ্গীতরত্নাকরে ঃ "অভিনেয় বস্তু অনন্ত বলিয়া (দিগ্) দর্শনের আমি এই সত্তরটি হস্তমুদ্রার কথা বলিলাম। অনাবিধ হস্তমুদ্রা অশেষ।" (সঙ্গীত-রত্নাকর—ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত —নর্তনাধ্যায় / ২৬৮ (খ —২৯৬ (ক) পৃঃ ৩৪৯)।

নাট্যের বিভিন্ন পরিবর্তন-মুহূর্তগুলিকে ভাষারূপ দেবার জন্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় সঞ্চারিণী মুদ্রা সৃষ্টি করার অধিকারও নিশ্চয়ই শিল্পী আচার্যদের আছে। এই কথাটি নিয়ে হয়তো বিতর্কের ঝড় উঠতে পারে। কারণ দীর্ঘকাল ধরে

এই শাস্ত্রচর্চা গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে। শিল্পী ও আচার্যেরা বিভিন্ন আঙ্গিকে দক্ষ হলেও শিল্পের আবয়বিক ও আন্তররূপের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারা বা এর নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বরং অত্যন্ত কঠোর রক্ষণশীলতার সঙ্গে নিজ নিজ বংশানুক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতিকে সংরক্ষণ করেছেন, যার ফলে এর প্রসার অবরুদ্ধ হয়েছে। তাঁদেব মতে এই অভিনয়রীতি দেবপ্রদত্ত। যা ব্রহ্মা ভবতমুনিকে দিয়েছেন—তার বাইরে আর কিছু নেই, আর মানুষের কোনো অধিকারই নেই তা পরিবর্তন করার। অথচ শাস্ত্রকারগণ কিন্তু অন্য কথাই বলেছেন। শার্ঙ্গদেব-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রেও আচার্যগণকে শক্তি অনুসারে প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে (নাট্যশাস্ত্র / ৪।৫৯)। তাছাড়া দক্ষতা ও অধিকার অনুসাবে স্রষ্টা অনন্তকরণ সৃষ্টি করতে পারেন একথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের জন্যে ২ বরকম অঙ্গাভিনয়েব সংযোজনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

হস্তমুদ্রাগুলিকে প্রতীকধর্মী ভাষা হিসাবে স্বীকার করে প্রখ্যাত গবেষক George Boner বলেছেন : "At any rate the Mudras of Kathakali as an independent language do not require the support of the spoken word" শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেছেন যে প্রকাশিতব্য সমস্ত ভাব ও আবেগকে এই অঙ্গাভিনয়ের মাধ্যমে প্রস্ফুট করা যায়—"It is a beautifull pantomimic art that can portray every emotion and every gesture of human life in countless way, by the raising of an eye-brow, turning of the knees, raising of the shoulders and movements of the hands and fingers"

আদি যুগেব অনুকরণাত্মক ভাবভঙ্গী থেকে শুরু করে বৈদিক যুগের ধ্যানমুদ্রার পথ ধরে শিল্পী আচার্যদের অনুশীলনে সমৃদ্ধ এই ভাষাশৈলী এক সময়ে রক্ষণশীল অনুদারতার বন্ধনে পথ হারাল। আধুনিক মানসেব সঙ্গে তার যোগসূত্র সে রক্ষা করতে পারল না।

মানুষ যা প্রকাশ করতে চায় তা ক্রমশঃ গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে। ব্যাকরণ-এর প্রাচীন খোলস ত্যাগ করে তৈরি হয় নতুন পদ্ধতি, নতুন বানানরীতি। শব্দ প্রয়োগের পুরাতনী রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে নতুন ভাষাশৈলীর জন্ম হয়। এতে ভাষা-সম্পদ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। অন্য ভ্যষা থেকে নতুন নতুন শব্দ এসে ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করে। এই ধার-করা শব্দই পরে দেশজ রূপ ধারণ করে। রোড, লেন, টেবিল, চেয়ার, কুরসি—এসব শব্দ তো এখন বাংলা ভাষায়ই অঙ্গ। এতে ভাষার মর্যাদা নষ্ট হয় না, বরং তা আরো শক্তিশালী হয়। এ কথাটি শিল্পীদের বোঝা দরকার। এই পুষ্টির সঙ্গে আবার দেখা দেয় পুরোনো ফর্ম-কে ভেঙে নতুন রীতি তৈরি করা। কবিতার ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ তো নতুন বিগ্রহ তৈরি করেছে। সে তার চরণে মিল ত্যাগ করেছে, যতি ইচ্ছানুসারে স্থাপনা করে, শব্দের ব্যাকরণগত বন্ধন ভেঙে, নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে।

বাংলা লিরিকের গোড়ার দিকের চর্যাগান :

এথ সে সুরসরি জমুণা এথ সে গঙ্গাসাঅরু।
এথ প্ আগ বণারসী এথ সে চন্দ দিবাঅরু॥

আর আজকের বাংলা আধুনিক কবিতা ঃ

নিন্দুকে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস কোরো না।
হয়তো বলবে শিশু কিংবা নির্বোধ
অথবা ম্যাজিকওয়ালা ছেঁড়া তাঁবু, কাটা বাজনা, নানান সেলাই
করা কালো কোর্তাগায়ে লোকটা কি মারণখেলা
খেলাচ্ছে আহারে ঐ মেয়েটার চোখে,
দর্শক ভুলছে না হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা
মায়ার ওষুধে ভুগছে ; বিশ্বাস কোরো না।

(সহজ ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

আদিরূপ থেকে মাঝখানে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ভাষার এই যে পরিবর্তন,–তা অভিনয়, বা নৃত্যভাষার ক্ষেত্রে হয় নি। অথচ এই নৃত্যভাষা এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম যে তা সবকিছুই প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু তার জন্যে তো এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। শুধু পুরোনো রীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই হবে না।

যে আঙ্গিক পদ্ধতিতে কালিদাসের ঃ

তন্বী শ্যামা বিম্বাধরা শিখরিদশনা
ক্ষীণকটি নিম্ননাভি উচ্চকিত হরিণীনয়না
স্তনভারানম্রতনু শ্রোণীভারে মন্থরচরণা
বিধাতার আদিশিল্প–নিরুপমা রমণীরচনা !
হেন নারী যদি সেথা থাকে,
আমার দ্বিতীয় সত্তা বলি, মেঘ, জানিয়ো তাহাকে।

(অনুবাদ ঃ শ্যামাপদ চক্রবর্তী)

এই কবিতার চিত্রকল্পকে শরীরী করে তোলা যাবে তা আমাদের শাস্ত্রেই আছে। কিন্তু–

শান্তাদি সুন্দরী নয়, তবু তার দেহের ভঙ্গিতে
কোথায় কোথায় যেন ভাস্কর্যের স্পষ্ট ছাপ আঁকা–
দৃঢ় নমনীয় গ্রীবা, অবিকল কণ্ঠস্বর যেন ছাঁচে ধরা,
স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না, মধুরও না,
নাচের ঘুঙুর যদি আরো চাপা হত,
ট্রামের মর্মর যদি ঘনশ্যাম দাসের ভেলভেটে
আরেকটু অস্পষ্ট হত, আরেকটু সংযত,
তাহলে অনেকটা যেন শান্তাদির স্বর হত তারা।

(ইজেল ও বুনো পারাবত ঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী)

এর নৃত্যভাষার জন্যে শুধু শাস্ত্রের ব্যাকরণটি খুললে হবে না। ভেঙে চুরে, দুমড়ে মুচড়ে, প্রয়োজন হলে দেশি-বিদেশি ভঙ্গি সংযোজন করে নতুন ভাষারীতি তৈরি করতে হবে। এ কাজ আরম্ভ না করলে নৃত্যভাষা নিছক মিউজিয়ম পিস-এ পরিণত হবে।

এই শতকের গোড়ার দিকে গর্ডন ক্রেগ যে 'বিশ্ব-নাট্য'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন, ষাটের দশকে শ্রীমতী জোন লিট্‌লউড যে থিয়েটার কমপ্লেক্‌স-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন ;

তার মূলে ছিল নাট্যের এক বিশ্বজনীন, সার্বজনীন রূপের আকাঙ্ক্ষা। এ বিষয়ে ভারতীয় নাট্যচিন্তার কাছে আজ পাশ্চাত্যের নাট্যবিদ্‌দের অনেক প্রত্যাশা। কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। হাবিব তনবির বলেছেন : "It is our previlege as well as our contemporary obligation to give to the world what may be called a new type of actors craft, unique, as well as modern ; new dramatic forms, both international and indigenous ; and a new type of theatre, at once universal and truly Indian."

(Mainstream, Annual Number–1966)

প্রতীয়মানের অনাবশ্যক উপদ্রব থেকে সত্যকে খুঁজে বের করা, সাধারণের সঙ্গে বিশেষকে যুক্ত করা, বৃহত্তর প্রবাহের মধ্যে অনন্যকে চিহ্নিত করা—এই ভূমিকা পালন করে শিল্পের শুদ্ধসত্তাকে রক্ষা করে এই প্রকাশ মাধ্যম। গবেষণা ও বুদ্ধিগত চর্চার মাধ্যমে এই ভাষারীতিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে—সমকালের শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে তার আত্মীয়তা ঘটাতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে এক আন্তর্জাতিক ভাষা। গড়ে উঠবে এক বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক মহামিলনের সম্ভাবনা।



সিংহমুখ (সম্মুখ)



কাঙগুল (সম্মুখ)



চতুর (সম্মুখ)

করণ ও অঙ্গহার

শিল্পের বিভিন্ন শাখায় একটি সমতান বা হার্মনি আছে। নৃত্যকুশলা শিল্পী নিপুণ রচনাবর্তের কঠিন পরম্পরা রক্ষা করে সৃষ্টি করে একটি উপলব্ধির রূপময় প্রকাশ। কবি কবিতার শব্দ-শরীরে ধ্বনির নূপুর পরিয়ে ছন্দের দোলায় একটি অলৌকিক ব্যঞ্জনা রচনা করে। চিত্রকর বা স্থপতি তাল, মান, অঙ্গুলি, লাইট-সেড, পার্সপেকটিভ-এর সাহায্যে মূর্তি নির্মাণ করে সবশেষে ঘটায় তার এ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি। সংগীতকার সংগীত শরীরের মেলডি বা রাগরূপ-এর আবেগ বৃত্তের পরিধিকে অতিক্রম করে সৃজন করে সঙ্গীত, সমতানের রসব্যঞ্জনা।

নৃত্যকলায় সকল শিল্পের এই সমতান বিশেষভাবে দেখা যায়। এখানে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় কবিতার চিত্রকল্প ; দেহভঙ্গির বিচিত্র সংগীতে সিন্ধু তরঙ্গের হিল্লোল, গ্রীবাবিভঙ্গে লীলা বিলাস, গর্ব, আত্মনিবেদন ; আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত প্রেম, প্রতীক্ষা, সংশয়। ললিত ছন্দে শরীরী হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সচল সুষমব্যঞ্জনা। কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত এক অনন্য রূপভাবনা।

এতগুলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে শিল্পায়িত করার প্রধান উপকরণ এবং মাধ্যম হল করণ ও অংগহার, যা অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তৈরি করে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট। যার সাহায্যে শিল্প তার প্রার্থিত সিদ্ধি অর্জন করে।

করণের কাজ রূপসৃষ্টি, অংগহারের কাজ লাবণ্য যোজনা। রূপকে যথোপযুক্ত ও যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে এনে দেহভংগিতে পরিমিতি সৃজন করে করণ। আর অংগহার ঘটায় এর এ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি, ভাবের ক্রিয়া ও ভংগিতে আনে সংযম, আনে লাবণ্য। করণের বন্ধনে যে আংগিক পদ্ধতির কঠোরতাটুকু দৃষ্টিগোচর হয়, অংগহারের যোজনায় তা হয় লাবণ্যযুক্ত সুকুমার বন্ধন। করণ যেমন নিপুণ রচনাবর্তের জটিল আংগিকপরম্পরা রক্ষা করে দেহভংগিতে স্থাপত্যের রূপ সৃষ্টি করে, অংগহার যেন সেই কারুবন্ধনে রসরঞ্জনা করে। তখন মূর্তি হয় প্রতিমা। রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, অংগহারও তেমনি ভাবে লাবণ্যব্যঞ্জনা করে। করণ নৃত্যের দেহ, অংগহার নৃত্যের আত্মা।

সাহিত্যে একটি শব্দ প্রয়োগের তারতম্য যেমন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে, চিত্রকলায় একটি রং যেমন ব্যবহারগুণে বিভিন্ন রঙের আভাস আনে, নৃত্যকলায় অংগহার তেমনই বিভিন্ন করণের সমাহারে যতি ও গতি সৃষ্টি করে শিল্পপ্রতিমা নির্মাণ করে। করণে যা শুধু মাত্র পরিমিতি, অংগহারের মধ্য দিয়ে এই পরিমিতি পরম ইতিতে উপনীত হয়।

এর প্রয়োগ ও ব্যবহার স্রষ্টার সৃজনশীল প্রতিভার উপর নির্ভর করে। নাট্যশাস্ত্রে ১০৮টি করণ ও ৩২টি অংগহার-এর বর্ণনা আছে, কিন্তু ভরত একথাও বলেছেন যে দক্ষতা ও অধিকার অনুসারে স্রষ্টা অনন্ত করণের সৃষ্টি করতে পারেন।

নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনবগুপ্তের এ সম্পর্কিত বিচার বিতর্কের সৃষ্টি করে

সঠিক কারণেই। কারণ অভিনবগুপ্ত নিজে শিল্পী বা স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি মূলত তত্ত্বনির্ভর আলোচনা করে অনেক ক্ষেত্রেই ভুলপথে গিয়েছেন। যেহেতু এটা প্রয়োগ-নির্ভর শিল্প সেহেতু সেই প্রযুক্তি-তথ্য না জানার ফলেই এই ভ্রান্তি। 'হস্ত পাদ সমাযোগো নৃত্যস্য করণং ভবেৎ'—নাট্যশাস্ত্রের শুধু এই উক্তিটুকু অবলম্বন করে এবং কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অভিনবগুপ্ত করণ ও অঙ্গহার-এর প্রভেদ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অঙ্গহার-এর তিনি দুটি ব্যাখ্যা করেছেন, এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কে. এম. ভার্মা বলেছেন ঃ

"Bharata says that angaharas are made of karanas. But Abhinava explains this compound word, angahara in two ways. Firstly, he says that angahara is 'sending the limbs (of the body) from a given place to the other proper one'. Secondly he gives the explantion, Hara means of 'Siva' i e. the play of Siva which is to be done by limbs (of the body). In other words, the performance solely based on the movements of different limbs of the body as done by Siva i.e. the method in which Siva practises it, is angahara. Apparently the later explanation is a fanciful one. It would appear to be so in view also of the fact that Siva himself, according to the account given by Bharata, uses the word, angahara"

স্বভাবতই এ ধরনের কাল্পনিক ব্যাখ্যা নৃত্যকলায় করণ ও অংগহারের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ণ-এ দীর্ঘকাল বাধা সৃষ্টি করেছে।

নাট্যশাস্ত্রে অংগহার প্রসংগে ভরত ঃ

'দ্বে নৃত্তকরণে চৈব ভবতো নৃত্তমাতৃকা।
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিবাপ্যঙ্গহারস্তু মাতৃভিঃ॥
ত্রিভিঃ কলাপকং চৈব চতুর্ভিঃ খণ্ডকং ভবেৎ।
পঞ্চৈব করণানি স্যুঃ সংঘাতক ইতি স্মৃতঃ॥
ষড়্ভির্বাসপ্তভির্বাপি অষ্টভিস্তথা।
করণৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারা প্রকীর্তিতাঃ॥

হস্ত ও পদের পারস্পরিক সহযোগে করণ হয়। চারী, করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগুলি পরস্পরের সংগে অংগাংগি জড়িত। হস্তকর্মের সংগে গতির অনুকরণাত্মক অভিনয়ে বিভিন্ন পাদভেদে বিভিন্ন চরণকর্মের রূপায়ণে এগুলির প্রয়োগ অপরিহার্য। পাদ, জংঘা, উরু ও কটি যুগপৎ বিচিত্রভাবে চালিত হলে চারী হয়। অর্থাৎ একপায়ের প্রচারে চারী, দুই পায়ের প্রচারে করণ, আবার করণসমূহের সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংযোগে মণ্ডল। অভিনয়দর্পণের মতে বিশিষ্ট ভংগীতে শরীর সংস্থাপনের নাম মণ্ডল। স্থানক, আয়ত, আলীঢ়, প্রেঙ্খন, প্রেরিত, প্রত্যালীঢ়, স্বস্তিক,

মোটিত, সমসূচী ও পার্শ্বসূচী–এই দশটি মণ্ডলভেদ। নাট্যশাস্ত্রে মণ্ডলভেদ ভিন্ন-রূপ ঃ যথা–ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবর্ত, সমোৎসারিত, এড়কাক্রীড়িত, অড্ডিত, সবটাস্য, অধ্যর্থক, পিষ্টকূট ও চাষগত।

পাদ, জঙ্ঘা, উরু ও কটি–এই অংগগুলির সহযোগে যেমন চারী আবার তেমনি এই করণ, খণ্ড ও মণ্ডল সকল কর্মই চারীর সংযোগে গঠিত। এক পায়ের প্রচেষ্টায় চারী, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ। আবার মোটামুটি ছয় থেকে নয়টি করণের সমাবেশে অংগহারের প্রয়োগ। সুতরাং এই সকল কর্মেই চারীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত করণাবলী ঃ

১. তলপুষ্পপুট–পার্শ্বদেশ সন্নত থাকবে এবং দুটি হস্ত মণিবন্ধে কুঞ্চিত হবে। পরে ঘুরে একটি অপরটির উপর আসবে। পুষ্পপুটে হস্ত দুটি এমন-ভাবে স্থাপিত হবে যাতে একটি ফুলের আকারে তা ঘুরে আসে। পুষ্পাঞ্জলিক্ষেপে ও লজ্জায় প্রযুক্ত হয়।

২. বর্তিত–হস্ত দুটি শুকতুণ্ড মুদ্রা করে পরে ঘুরিয়ে এনে নিচে নামাতে হবে। মণিবন্ধে কুঞ্চিত করে একই সময়ে ব্যবৃত্ত ও পরিবর্তিত করে উরুদ্বয়ে আনতে হবে। পতাকা অবস্থায় স্থাপিত হলে অসূয়া বাক্যার্থের অভিনয় বোঝাবে। আর নিম্নমুখ হয়ে ঘর্ষিত হলে ক্রোধ প্রকাশ করবে।

৩. বলিতোরু–বক্ষক্ষেত্রে যুগপৎ হস্তদ্বয়কে ব্যবর্তিক করে আক্ষিপ্ত পাদচারীসহ পাতিত হবে। পরে পরিবর্তিত হস্তদ্বয়কে বক্ষদেশে অধোমুখ শুকতুণ্ড করে রাখতে হবে। বদ্ধাচারী দ্বারা স্থিতি অবলম্বিত হবে। মুগ্ধা নায়িকা ও স্ত্রীলোকের লজ্জাজড়িত আবেগ প্রকাশে প্রযুক্ত হবে।

৪: সমনখ–শির, অধর ও বক্ষ এক সরলরেখায় প্রসারিত, পাদদ্বয় প্রলম্বিত এবং শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে। মঞ্চে শিল্পীর প্রথম প্রবেশে প্রযুক্ত হয়।

৫ লীন–সমনখ অবস্থানে পতাকাগুলি বক্ষে স্থাপিত হবে। মস্তকের নিম্নভাগ সম্মুখে প্রসারিত হবে, গ্রীবা নত। প্রিয় অভ্যর্থনায় প্রযুক্ত হয়।

৬. স্বস্তিকরেচিত–রেচিত, আবিদ্ধবক্র, স্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, পক্ষপণ্ডিতক ও পক্ষ প্রদ্যোতক–এই ছয়টি নৃত্যহস্তের প্রয়োগ পরম্পরায় স্বস্তিকরেচিত হয়। স্থান অবহিত্থক। নৃত্যপ্রধান অভিনয়ে আনন্দাতিশয্য বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৭. মণ্ডলস্বস্তিক- হস্তদ্বয়কে চতুরস্র এবং ঊর্ধ্বমণ্ডলী করে বিচ্যবা চারী প্রয়োগে স্বস্তিক অবস্থানে মণ্ডল স্থান রচনা করতে হবে। শিকার, অপমান অর্থদ্যোতক।

৮. নিকুট্টক–পদদ্বয় নিকুট্টিত (উন্নমিত ও বিনমিত) হবে। বাহু ও মস্তক অঞ্চিত (দোলায়িত) হবে। এবং হস্তাঙ্গুলি মুখের দিকে থাকবে। অবস্থান মণ্ডল স্থানে। আত্মপ্রশংসাসূচক অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৯. অপবিদ্ধ–বামহস্তে কটকামুখ বক্ষে স্থাপিত। পদদ্বয় গোড়ালি দ্বারা যুক্ত হয়ে এক সমকোণে স্থাপিত হবে। দুই হস্ত পরে প্রসারিত হবে। অসূয়া এবং ক্রোধ প্রকাশে এর প্রয়োগ।

১০. অর্ধনিকুট্টক–বাহু এবং মস্তক অঞ্চিত করতে হবে। হস্ত অলপল্লব এবং পদ নিকুট্টক হবে। নিকুট্টক করণের ক্রিয়াবিধি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আত্মপ্রশংসা যেখানে প্রকাশে অপরিণত এই ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১১ কটিচ্ছিন্ন–ভ্রমরিকা চারীর দ্বারা পর্যায়ক্রমে একটি কটিকে ছিন্নরূপে রেখে মণ্ডলস্থানে দাঁড়িয়ে বাহুর উপরিভাগে পল্লব রচনা করতে হবে। পুনরায় অপর অঙ্গের দ্বারাও এই রকম করতে হবে। তিন বা চারবার এই ক্রিয়া করতে হবে। ইহা বিস্ময় প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১২. অর্ধরেচিত–মণ্ডলস্থানে দাঁড়িয়ে বক্ষদেশে কটকামুখ হস্তদ্বয়ের একটিকে সূচীমুখ নৃত্যহস্তে পরিবর্তিত করে পার্শ্বে প্রসারণ করে মণিবন্ধ থেকে নিম্নাভিমুখী করতে হবে। চরণ উদ্ঘট্টিত ক্রিয়ারত থাকবে। পার্শ্ব হবে সন্নত। এর নাম অর্ধরেচিত। পর্যায়ক্রমে ডানে ও বামে করতে হবে। ইহা পলায়ন ও সামঞ্জস্যহীন কর্ম প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১৩. বক্ষস্বস্তিক–বক্ষদেশে চতুরস্র হস্তদ্বয় রেচিত করে ব্যাবৃত্ত হস্ত দ্বারা বক্ষের সামনে স্বস্তিকাকারে রাখতে হবে। ইহা লজ্জাজনিত কোনো কিছু প্রকাশ করতে না পারার জন্যে অনুতাপ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

১৪. উন্মত্তক–আবিদ্ধাচারী সহযোগে এই করণের প্রয়োগ হয়। স্বস্তিক পদদ্বয়ের একটিকে কুঞ্চিত করে সামনে প্রসারিত ও অঞ্চিত করে নিপাতিত করলে আবিদ্ধাচারী হয়। পর্যায়ক্রমে অনুকৃতি হলে উন্মত্তক করণ হয়। অতি সৌভাগ্যাদি জনিত গর্ব প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

১৫. স্বস্তিক–চতুরস্রের পর উদ্বেষ্টিত হস্তকরণের দ্বারা হস্তদ্বয়কে নিষ্ক্রান্ত করে ব্যাবর্তিক্য করণের–লাফাইয়া যুগপৎ হস্ত এবং পদদ্বয়ে স্বস্তিক রচনা করতে হবে। অন্বেষণ, নিষেধ, উগ্রতা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১৬. পৃষ্ঠস্বস্তিক–উদ্বেষ্টিত ক্রিয়া দ্বারা বাহুদ্বয়ের বিক্ষেপ সহযোগে অপক্রান্তাচারী করতে হবে। এরপর অপবেষ্টিত ক্রিয়া দ্বারা হস্ত ও পদে স্বস্তিক রচনা করতে হবে। শত্রু সন্ধান, নিষেধ, প্রচণ্ডতা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১৭. দিক্‌স্বস্তিক–পূর্বে যে স্বস্তিক লক্ষণ রচনা করা হয়েছে তা যখন বহুদিকে করা হয় তখনই তা দিক্‌স্বস্তিক। গীতকালীন অঙ্গভঙ্গির সমন্বয় প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১৮. অলাত–দক্ষিণ চরণ দ্বারা অলাতাচারী প্রয়োগ করার সময় দক্ষিণ হস্তে নিতম্ব ভঙ্গী করে চতুরস্র করতে হবে। বাম পদের দ্বারা ঊর্ধ্বজানুচারী করতে হবে। ইহা ললিত বৃত্তে প্রযোজ্য।

১৯. কটিসম–আক্ষিপ্তাচারীর পরে অপক্রান্তাচারীর প্রয়োগ করতে হবে। সেই সঙ্গে একটি হস্ত নাভিস্থ হয়ে কটকামুখ হবে, অপর হস্ত কটিতে অর্ধচন্দ্র ধারণ করবে। সেই পার্শ্বটি নত এবং অপর পার্শ্ব উদ্বাহিত হবে। এই করণে বৈষ্ণবস্থান ও ভঙ্গী প্রধান। ইহা বিঘ্ননাশের জন্যে সূত্রধার কর্তৃক জর্জরের প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্ত হয়।

২০. আক্ষিপ্তরেচিত—বামহস্ত হৃদয়ে স্থিত, অপর হস্ত ঊর্ধ্বে এবং পার্শ্বদ্বয়ে ব্যবর্তিত করণ দ্বারা ক্ষিপ্ত এবং হংসপক্ষের দ্রুত ভ্রমণ রূপে রেচিত হবে। তারপর একটি হস্ত আক্ষিপ্ত হয়ে নিজদিকের বক্ষদেশে অধোমুখে আনত হবে, তারপর অঞ্চিত এবং রেচিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বাহু অপবিদ্ধ হবে। পদদ্বয় অঞ্চিত-এর সূচী আকারে স্থাপিত হবে। দান, প্রতিগ্রহণ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২১. বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক—একটি হস্তের ব্যাবর্ত ক্রিয়াকালে সেই পদের বহিঃনির্গমন করাই বিক্ষেপ। দ্বিতীয় হস্তে তখন চতুরস্র। পুনরায় পরিবর্তিত করণের দ্বারা প্রথমোক্ত হস্ত পদের আক্ষেপ (পূর্ব অবস্থায় আনয়ন করা) এবং দ্বিতীয় হস্তপদের বিক্ষেপ। গমন, আগমন সূচিত করার জন্যে ইহা প্রযুক্ত হয়।

২২. অর্ধস্বস্তিক—পদদ্বয়ে স্বস্তিক। দক্ষিণ হস্তে করিহস্ত এবং বাম হস্তে কটকামুখ করে বক্ষে রাখতে হবে। ব্যাবৃত ও পরিবর্তিত হবে। বাক্যার্থাভিনয়ে এর প্রয়োগ নেই। কেবল নৃত্যে এর বিনিয়োগ।

২৩. অঞ্চিত—করিহস্তকে ব্যাবৃত ও পরিবৃত্ত করে নাসিকাগ্রে অঞ্চিত করলে অঞ্চিত করণ হয়। তখন ঐ হস্তে অলপল্লব রচিত হবে। অন্য হস্ত বক্ষদেশে থাকবে। সম্মুখস্থ বিষয়ে কৌতুক প্রদর্শন বুঝাইতে ইহা প্রযুক্ত হয়।

২৪ ভূজঙ্গত্রাসিত—নিকটে সর্প দেখে শংকায় ত্রাসে পা তুলে, সরে যাবার যে ভঙ্গী তাই ভূজঙ্গত্রাসিত। চরণ উৎক্ষিপ্ত। ঊরু, কটি ও জানু—একটি ত্রিভুজ গঠন করবে। ব্যাবৃত্তি ও পরিবৃত্তির সহায়তায় এক হস্তে ডোলা হস্ত, অপর হস্তে কটকামুখ। ত্রাস বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

২৫ ঊর্ধ্বজানু—চরণ বৃশ্চিক অবস্থায় এক হস্ত পার্শ্বে নিকুঞ্চিত। বামপদের দ্বারা ঊর্ধ্বজানু চারী এবং অপর দিকে অলাতা চারী। ইহা ললিত নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

২৬. নিকুঞ্চিত—চরণ পশ্চাৎ প্রসারিত করে এক হস্ত শিরপার্শ্ব ক্ষেত্রে অরাল এবং দ্বিতীয় হস্ত নাসাগ্র ক্ষেত্রানুসারী বক্ষের উপর দিয়ে প্রসারিত করে অরাল করলে নিকুঞ্চিত করণ হয়। পর্যায়ক্রমে ঘূর্ণিত ও অপসর্পিত হবে। ঔৎসুক্য, আকাশ গমনোন্মুখ, বিতর্ক, প্রণিধান প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২৭. মত্তলি— হস্ত দুটি উদ্বেষ্টিত ও অপবিদ্ধ হবে। পদদ্বয় স্খলিত ও অপসৃত হবে। পরে বামহস্ত রেচিত হবে। ঘূর্ণন ও উপসর্পন সহযোগে পর্যায়ক্রমে বার বার করতে হবে। মত্ততা প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২৮. অর্ধমত্তলি—রেচিত বামহস্তে হংসপক্ষ মুদ্রা করে দ্রুত ভ্রমণ করাতে হবে। বাম-পদ নিকুট্টিত। স্খলিত চরণ অল্প মত্ততা প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

২৯. রেচিত-নিকুট্টিত—দক্ষিণহস্ত রেচিত হয়ে দক্ষিণ পদে নিকুট্টিত হবে। বামহস্ত দোলায়িত, দুটি হস্ত প্রাঙ্গমুখ হয়ে নাভিতটে স্থাপিত হবে। ডোলা হস্তের বর্তনা দ্বারা গমনাগমন সূচিত করবে।

৩০. পাদাপবিন্ধ–পদদ্বয় সূচীবিন্ধ ও অপক্রান্ত বহির্মুখ হস্তদ্বয় কটকামুখাকারে নাভিদেশে স্থাপিত। সূচীমুখাকারে একটি পদ অপর পদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপক্রান্তা চারীর অনুষ্ঠান। এবং একই ক্রিয়া অপর পদ-দ্বারা আবৃত্ত হবে।

৩১ বলিত– এখানে তিনবার ঘুরতে হয়। দক্ষিণহস্ত বর্তিত ও আঘূর্ণিত হবে। বামহস্ত দোলায়িত। উভয়দিকে ভ্রমর চারী। ললিত নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

৩২. ঘূর্ণিত– পদ স্বস্তিক ও অপসৃত (এক পা ফেলা ও অপর পায়ের গোড়ালি উঁচু হয়ে থাকবে)। বামহস্তে করিহস্ত, দক্ষিণহস্ত বিবর্তিত। শুদ্ধ নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৩. ললিত– পদদ্বয় বার বার কুট্টিত হবে এবং বাম জানুকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করে তার উপরে দক্ষিণহস্তে লতাহস্ত স্থাপিত হবে। উভয় দিকে আবৃত্ত হবে। বিলাসযুক্ত নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

৩৪. দণ্ডপক্ষ–জানু ঊর্ধ্বচারী অবস্থায় ভুজঙ্গত্রাসিত ভঙ্গী। লতাহস্ত। যথাক্রমে একপার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বে আবৃত্ত হবে। নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৫. ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত–এখানে দুই হস্ত বামপার্শ্বে স্থাপিত হবে এবং তিনবার বলিত করে হস্ত দুটি লতারেচিত হবে। নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৬ নূপুর– ভ্রমরী চারীর পরে এক পদ পশ্চাতে অঞ্চিত করে ভূমিতে দ্রুত স্থাপন করতে হবে। এবং হস্ত, পদ, কটি, গ্রীবা সবই রেচিত হবে। নৃত্যে প্রযুক্ত।

৩৭. বৈশাখ-রেচিত–এখানে পদ স্বস্তিক অবস্থায় আক্ষিপ্ত হবে। হস্তদ্বয় উদ্বেষ্টিত হবে। রেচিত নৃত্যহস্ত হংসপক্ষ অবস্থায় দ্রুত ছন্দে ভ্রমিত হবে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদ, কটি ও গ্রীবা রেচিত হবে।

৩৮. ভ্রমর– এখানে তিনবার বলন হয়, বামকর অঞ্চিত। অন্যকর চতুর। চতুর করে তিনটি অঙ্গুলি প্রসারিত, কনিষ্ঠা ঊর্ধ্বে এবং অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে স্থাপিত হবে। পা স্বস্তিক। দুই পার্শ্বেই আবর্তিত হবে। ইহা উদ্ধত গতি প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

৩৯. চতুর– বক্ষদেশে বামহস্ত অলপল্লবাকারে, দক্ষিণহস্ত চতুরাকারে। দক্ষিণ পদ কুট্টিত, ইহা বিস্ময়, অসূয়া ও বিদূষকের ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়।

৪০. ভুজঙ্গাঞ্চিত–ভুজঙ্গত্রাসিত চারী দক্ষিণ পদের সাহায্যে করতে হবে, দক্ষিণহস্ত রেচিত, বামহস্তে লতাহস্ত, হস্তপদ চারিদিকে দণ্ডের মতো বিক্ষিপ্ত।

৪১. দণ্ডকরেচিত–দণ্ডবৎ হস্ত বিক্ষেপণ হবে এবং চরণ বৃশ্চিক অবস্থায় স্থাপিত হয়ে দুই পদই নিকুট্টিত হবে। ইহা প্রমোদ নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

৪২. বৃশ্চিক কুট্টিত-হস্তদ্বয় বৃশ্চিক কুট্টিত অবস্থানে অর্থাৎ পৃষ্ঠ-ভাগে জঙ্ঘা রেচিত করে চরণ পর্যায়ক্রমে পৃষ্ঠে স্থাপন করতে হবে। হস্ত দুটি নিজ বাহুর ঊর্ধ্বভাগে অলপদ্মাকারে নিকুট্টিত। বিস্ময়, ব্যোমযান, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

৪৩. কটিভ্রান্ত–কটি রেচিত হবে, পদদ্বয় পশ্চাতে সঞ্চিত। ভ্রমরী চারী সহ হস্তদ্বয়

ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত করে চতুরস্র ভঙ্গী। তালের মাঝে মাঝে যতিপূরণে ও ইতস্ততঃ পাদচারণায় প্রযুক্ত হয়।

৪৪ লতাবৃশ্চিক–বামহস্ত লতা অবস্থায় স্থাপিত হবে। চরণ প্রথমে বৃশ্চিক, কটিদেশে অলপদ্ম এবং তা পর্যায়ক্রমে ছিন্ন হবে। অর্থাৎ দক্ষিণ পদ পৃষ্ঠদেশে, বামপদ ভূমিতে স্থাপিত। কটি পর্যায়ক্রমে উন্নমিত ও নমনিত হবে। আকাশ উল্লম্ফন বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৪৫. ছিন্ন– দেহ বৈশাখ ভঙ্গিতে, চরণ বৃশ্চিক অবস্থায় স্থাপিত, হস্তদ্বয় অলপদ্মাকারে কটির পার্শ্বদেশে স্থিত, কটি ছিন্নাকার। ইহা তাল দেওয়া এবং অঙ্গ প্রতিসারণে প্রযুক্ত হয়।

৪৬. বৃশ্চিক রেচিত–স্বস্তিকাকার হস্তদ্বয় বিশ্লিষ্ট হয়ে রেচিত হবে, পদদ্বয় পৃষ্ঠে অঞ্চিত বৃশ্চিকাকার। আকাশগমন বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৪৭. বৃশ্চিক– আলীঢ় স্থানকে অবস্থান। পৃষ্ঠ দূরে সন্নত। করিহস্তাকারে হস্তদ্বয় বক্ষে স্থাপিত। পদদ্বয় পশ্চাদভাগে বৃশ্চিকের পুচ্ছের ন্যায় স্থাপিত। ঐরাবত, ব্যোমযান বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

৪৮. ব্যংসিত–হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে ও অধোমুখে বিপ্রকীর্ণ হবে। পরে এক পার্শ্বে স্বস্তিক রেচিত হবে। পদ নিকুট্টিত। আলীঢ় স্থানক্। হনুমান প্রভৃতি বানরগণের পরিক্রমে ইহা প্রযোজ্য।

৪৯. পার্শ্বনিকুট্টিত–পায়ের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা চরণে বৃশ্চিক। স্বস্তিকাকার হস্তদ্বয়ের একটি পার্শ্বে আনীত হবে এবং ঊর্ধ্বমুখ হয়ে নিকুট্টিত হবে, অপর হস্ত অধোমুখ। অনুরূপ ভাবে চরণও নিকুট্টিত। বার বার প্রদর্শন ও গতি বোঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

৫০ ললাট তিলক–পৃষ্ঠের দিকে পা কুঞ্চিত করে পদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কপালে তিলকচিহ্ন আকার ভঙ্গী করা, তৎপরে পদক্ষেপ। বিদ্যাধরের গতিতে প্রযুক্ত হয়।

৫১. ক্রান্ত– অতিক্রান্ত চারীর সাহায্যে পদ কুঞ্চিত হবে, দুটি করে আক্ষিপ্ত, বামপদ নমিত। প্রসারিত হস্ত ব্যাবর্তিত করে কটকামুখাকারে বক্ষে স্থাপিত হবে। অপর পার্শ্বেও একই রূপ করতে হবে। উদ্ধত পাদচারে প্রযুক্ত হয়।

৫২ কুঞ্চিত– বামপার্শ্বে স্থিত অবস্থায় দক্ষিণপদ উত্তোলন করে উত্থান হবে। বাহুদুটি প্রলম্বিত। দক্ষিণহস্ত অলপদ্মাকারে বামপার্শ্বে স্থাপিত, বামপদ অগ্রতল সঞ্চার আকারে। অতীব আনন্দিত দেবতার অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৫৩. চক্রমণ্ডল–অভ্যন্তরে অপরিবদ্ধ এবং পদদ্বয় পর্যায়ক্রমে স্বস্তিক ও অপবিদ্ধ হবে। অস্তিতাচারী সম্পন্ন করে গোলাকার হস্তসহ মধ্যে চক্রের ন্যায় আবর্তন। দেব পূজায় ও উদ্ধতগতিতে প্রযুক্ত হয়।

৫৪, উরোমণ্ডল–দুটি হস্ত বক্ষের নিকটে মণ্ডলিত হবে। বেগে হস্তপদ আক্ষিপ্ত

হবে। অর্থাৎ বন্ধা ও স্থিতাবস্থাচারী অনুষ্ঠানসহ করদ্বয় উরোমণ্ডলাকারে থাকে। এই করণ শিবের প্রিয়।

৫৫, আক্ষিপ্ত—অঙ্গুলতল ঊর্ধ্বে, পার্শ্বে পা ঊর্ধ্বে প্রসারিত। অর্থাৎ আক্ষিপ্তাচারী অনুষ্ঠানসহ হস্ত কটকামুখাকার বা চতুরাকার। বিদুষকের গতিতে প্রযুক্ত।

৫৬, তলবিলসিত—একটি পদ পৃষ্ঠদেশে প্রসৃত, দুটি হস্ত সঞ্চিততল অবস্থায় ঊর্ধ্বে এবং পতাকার হস্তের সঙ্গে পদ যুক্ত অবস্থায়। এবং ক্রমশঃ অপর পার্শ্বেও এইরূপ হবে। সূত্রধার প্রভৃতিতে ইহা প্রযুক্ত হয়।

৫৭ অর্গল— বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির পার্শ্বে আড়াই তাল দূরে নিশ্চল জঙ্ঘাসহ দক্ষিণ চরণ প্রসারিত। এই সঙ্গে বামপার্শ্বে নিস্পন্দ বাহুদ্বয় বিক্ষিপ্ত হবে। অলপল্লবাকারে যুক্ত হবে। অঙ্গদ প্রভৃতির গতি বুঝাইতে প্রয়োগ হয়।

৫৮ বিক্ষিপ্ত—বিদ্যুৎভ্রান্তা ও দণ্ডপাদা চারীর অনুষ্ঠানের পর উদ্বেষ্টিত ও অপবেষ্টিত ক্রিয়াসহ হস্তদ্বয় সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে রেচিত করে পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত করতে হবে। দ্রুত আবর্তিত হবে। উদ্ধত গতির অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৫৯. আবর্ত— হস্ত দুটি স্কন্ধের নিকটে মুষ্ঠিবদ্ধ হবে এবং পদ কুঞ্চিত অবস্থায় উৎক্ষিপ্ত করে এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বে দোলায়িত হবে। অর্থাৎ চাষগতি চারীর সহায়তায় উদ্বেষ্টিত ও অপবেষ্টিত অবস্থায় হস্তদ্বয় দোলাকারে থাকবে। সভয় গতিতে ইহা প্রযুক্ত হয়।

৬০. ডোলাপাদ—ঊর্ধ্বজানু চারীর পরে অনুষ্ঠিত হবে ডোলাপাদা চারী। হস্তদ্বয় ডোলাকারে থাকবে। শুদ্ধ নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

৬১. বিবৃত্ত— হস্তদ্বয় রেচিত হবে, পরে সূচীবিদ্ধ অবস্থায় তিনবার বিনিবর্তিত হবে। অর্থাৎ পদদ্বয় আক্ষিপ্তা চারীতে, ব্যাবৃত্ত ও পরিবৃত্ত ক্রিয়াসহ হস্তদ্বয় ভ্রমরিকা অনুষ্ঠানসহ রেচিত। উদ্ধত গতিতে প্রযুক্ত হয়।

৬২. বিনিবৃত্ত—হস্ত দুটি রেচিত হবে এবং পার্শ্ব থেকে সম্মুখে পাতিত হবে। অর্থাৎ সূচ্যাকারে একটি পদের দ্বারা অপর পদের গুল্‌ফে স্বস্তি করতে হবে। ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত ক্রিয়া সহ কটিদেশ এক পার্শ্বে বলিত হয়ে বন্ধাচারী অবস্থায় করদ্বয় রেচিতাকারে রাখতে হবে। ইহা উদ্ধত গতিতে প্রযুক্ত হয়।

৬৩. পার্শ্বক্রান্ত—পদদ্বয় পশ্চাতে কুঞ্চিত, বক্ষ সমুন্নত এবং হস্তদ্বয় পদদ্বয়ের অনুগামী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হস্তদ্বয় অভিনয় অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। ভীমসেন প্রভৃতির ভীষণ গতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

৬৪ নিস্তম্ভিত—মধ্যমা কপালে তিলক চিহ্নিত করার ভঙ্গী করবে, পশ্চাতে একটি পদ বলিত করে জানু মস্তক অবধি প্রসারিত হবে। একটি পদ অপর পদের গুল্‌ফদেশে কুঞ্চিত। বক্ষস্থল সমুন্নত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হস্ত বৃশ্চিকাকার হতে পারে। শিবের অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৬৫. বিদ্যুৎভ্রান্ত–একটি পদ সর্বতো মণ্ডলাবিন্ধ অর্থাৎ সম্মুখে প্রসারিত অবস্থায় ঊরুমূলকে কেন্দ্র করে চাকার মতো ঘুরবে। পশ্চাৎ দিকে ভ্রামিত চরণ মস্তক দেশে বৃত্তাকারে সবদিকে ভ্রামিত হবে। উদ্ধত গতিতে প্রযোজ্য।

৬৬ অতিক্রান্ত–অতিক্রান্ত চারীর অনুষ্ঠানের পর হস্তদ্বয় প্রয়োগঅবাধ অবস্থায় থাকবে। চরণ সম্মুখে প্রসারিত। হস্তপদ আক্ষিপ্ত করে তিনবার বিবর্তিত হবে।

৬৭. বিবর্তিত–বামহস্ত বেচিত অবস্থায় কর্ণে অঞ্চিত। দক্ষিণহস্তে লতাহস্ত। মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে একটি পদ ও একটি হস্ত বিবর্তিত হবে।

৬৮. গজক্রীড়িতক–ডোলাপাদা গজক্রীড়িতক হবে যখন একটি চরণ দ্রুত উৎক্ষেপ সহ সম্মুখে পতিত হবে।

৬৯ তলসংস্ফোটিত–হস্তদ্বয় তলসংস্ফোটিত অর্থাৎ একসঙ্গে হস্তদ্বয় পতাকা হস্ত হয়ে পবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। পা পৃষ্ঠে প্রসারিত হয়ে সম্মুখে পতিত হবে।

৭০ গরুড় প্লুতক–শির সমুন্নত, বক্ষ উন্নত। হস্তদ্বয় লতাকার ও রেচিতাকার। চরণ বৃশ্চিকাকাব, একটি পার্শ্ব নমিত।

৭১. গণ্ডসূচী একটি হস্ত গণ্ডে অঞ্চিত হবে, অপর হস্ত উধের্ব সমবেষ্টিত হবে এবং সূচীপাদ বিবর্তিত হবে। এই করণের দ্বারা গণ্ডের অলঙ্করণ অভিনয়েয়।

৭২. পরিবৃত্ত–হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বমণ্ডলী, একটি পদ স্থির থাকবে–অন্য পদ ঊরুপৃষ্ঠে স্থাপিত হবে ও তিনবার ঘূর্ণিত হবে।

৭৩. পার্শ্বজানু–এক হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বক্ষে স্থাপিত, অপর হস্ত অর্ধচন্দ্রাকারে কটিদেশে রক্ষিত। জানুতে সঞ্চিত করে একটি পদ পৃষ্ঠে প্রসারিত। ইহা যুদ্ধ ও সম্মুখ সমর বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

৭৪ গৃধ্রাবলীনক–একটি চরণ পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত হয়ে স্বস্তিক রচনা করবে এবং লতাকার করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ভূমি সংযুক্ত হবে। বৃহৎ পক্ষীর যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়।

৭৫. সন্নত— হস্তদ্বয় সন্নত অবস্থায় থাকবে এবং পদ কুঞ্চিত অবস্থায় সম্মুখে স্থাপিত হবে : অর্থাৎ মৃগপ্লুতা চারীর পরে চরণ অগ্রভাগে স্বস্তিকাকারে স্থাপিত এবং হস্তদ্বয় গোলাকার। ইহা অধম লোকের অপসারণে প্রযুক্ত হয়।

৭৬. সূচী– একটি পদ উত্তোলিত ও কুঞ্চিত করে পাতিত করতে হবে, কিন্তু তা ভূমিস্পর্শ করবে না। সেই দিকের হস্ত কটকামুখাকারে বামে স্থাপিত। অপর হস্ত অলপদ্ম রূপে মস্তক দেশে রক্ষিত। অপর পার্শ্বও আবৃত্ত হবে। বিস্ময় প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

৭৭. অর্ধসূচী–যখন একটি পদ সূচীবদ্ধ অবস্থায় অন্যপদকে বিদ্ধ করবে তখন সূচী করণই অর্ধসূচী হবে। অর্থাৎ একটি অঙ্গদ্বারা কৃত সূচীকে অর্ধসূচী বলা যায়।

৭৮. সূচীবিদ্ধ—একটি হস্ত অর্ধচন্দ্রাকারে কটিদেশে স্থাপিত, অপর হস্ত কটকামুখাকারে বক্ষদেশে থাকবে। সূচী আকারে একটি পদ অপর গুল্‌ফে থাকবে। চিন্তা প্রভৃতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়!

৭৯. অপক্রান্তা—হস্তদ্বয় প্রয়োগবসনা অবস্থায় থাকবে। চরণ বৃশ্চিক হবে এবং দুটি হস্ত রেচিত হবে। অর্থাৎ উরু দিয়া বলন পূর্বক একটি পদ কুঞ্চিত অবস্থায় স্থাপন উত্তোলিত করে পার্শ্বে নিক্ষেপ করতে হবে। এককথায় বদ্ধা ও অপক্রান্তা চারী অনুষ্ঠিত হবে।

৮০. ময়ূর-ললিত—হস্তদ্বয় রেচিতাকার, বৃশ্চিকাকার চরণ কুঞ্চিত হবে এবং ভ্রমরী চারী অনুষ্ঠিত হবে। শির পরিবাহিত অবস্থায় তিনবার ঘুরবে।

৮১. সর্পিত—হস্তদ্বয় রেচিতাকার, চরণ নূপুর অবস্থায় এনে পায়ের অগ্রতল দিয়ে পিঠের দিকে অঞ্চিত করত ও পরে দ্রুত ভূমিতে পাতিত করতে হবে। মত্ত ব্যক্তির নিকটে আগমন এবং দূরগমনে প্রযুক্ত হয়।

৮২ দণ্ডপাদ—আবিদ্ধকর অবস্থায় দ্রুত পা পিছনে তুলে মাটিতে স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ নূপুর পাদাচারীর পরে দণ্ডপাদা চারী অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্রুতভাবে হস্ত দণ্ডের ন্যায় স্থাপিত হয়। সদর্প গতিতে প্রযোজ্য।

৮৩, হরিনপ্লুত—জঙ্ঘা অঞ্চিত করে পদ ডোলাপাদ অবস্থায় লাফিয়ে, আবার মাটিতে স্থাপন করতে হবে। মৃগ গতি বুঝাতে প্রযুক্ত।

৮৪ প্রেংখলিত—তিনবার ঘুরে হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে স্থাপন করে অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পর অভিমুখী করতে হবে। অর্থাৎ একটি চরণ দ্বারা ডোলাপাদা চারী অনুষ্ঠানের পর অপর চরণের সাহায্যে উল্লম্ফন করা এবং ভ্রমরী করতে হবে।

৮৫. নিতম্ব—অধোমুখে স্থিত অঙ্গুলিযুক্ত হস্তদ্বয় পতাকাকারে মস্তকদেশে এনে পরিবৃত্ত ক্রিয়ার সাহায্যে তাদের স্কন্ধের উপর প্রসারিত করে পরস্পরের সম্মুখীন করতে হবে।

৬৮. স্খলিত—ডোলাপাদ অবস্থায় পা দুইটি রেচিত ও ঘূর্ণিত হবে। এক হস্ত বক্ষে স্থাপিত অপরটির তল পশ্চাতে স্থাপিত। ইহা অপর পার্শ্বে আবৃত্ত হবে।

৮৭ করিহস্ত—বামহস্ত কটকামুখাকারে বক্ষে স্থাপিত. অপর হস্ত উদ্বেষ্টিত ক্রিয়া করে কর্ণদেশে ত্রিপতাকাকারে থাকবে। এবং ঐ দিকের চরণ অঞ্চিতাকারে থাকবে। হস্ত উন্নত অবস্থাতেই এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বে বিলোলিত হবে।

৮৮. প্রসর্পিত—হস্তদ্বয় পাখির ডানার মতো দোলায়িত করে পদদ্বয়কে ধীরে ধীরে ভূমিতে ঘর্ষণ করে চলতে হবে। আকাশচারীর সঞ্চরণে প্রযুক্ত।

৮৯. সিংহ বিক্রীড়িত—হস্তদ্বয় পদের অনুগামী হবে পদ পশ্চাতে প্রসর্পিত হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে হস্ত কুঞ্চিত হবে। অপর পার্শ্বেও আবৃত্ত হবে। ভয়ংকর গতিতে প্রযুক্ত হয়।

৯০. সিংহাকর্ষিত—পূর্বের অবস্থানে হস্ত, পদ ও শরীর আক্ষিপ্ত হবে। অর্থাৎ চরণ

বৃশ্চিকাকার, হস্তদ্বয় পদ্মকোশাকার অথবা ঊর্ণনাভাকার। সিংহের অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৯১ উদ্‌বৃত্ত—গাত্র উদ্‌বৃত্ত করে একটি চরণ আক্ষিপ্ত হবে, হস্তদ্বয় তার অনুগামী হবে। আবিদ্ধ অবস্থায় পা-কে আবেষ্টন করে লাফিয়ে ভূমিতে স্থাপন করা। এবং এরই পুনরাবৃত্তি।

৯২. উপসৃত—বামদিকে আক্ষিপ্তাচারী সম্পাদনের পর হস্ত ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত ক্রিয়া করে নত অবস্থায় দক্ষিণ পার্শ্বে এসে অরালাকার ধারণ করবে। সবিনয় অভিগমনে প্রযুক্ত হয়।

৯৩. তলসংঘট্টিত—ডোলাপাদা চারী অনুষ্ঠানের পর পতাকাকারে হস্তদ্বয়েব তলদেশ মিলিত হয়ে রেচিতাকার ধারণ করবে। তারপর বৈষ্ণবাকাবে দক্ষিণহস্ত কটিতে স্থাপিত হবে এবং বামহস্ত রেচিতাকার ধারণ করবে। অনুকম্পা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

৯৪ জনিত— পদদ্বয় তলের অগ্রভাগের উপর স্থাপিত হবে (পায়ের পাতার উপর) এবং হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি পরস্পরের অভিমুখী হবে। কার্যারম্ভে প্রযুক্ত হয়।

৯৫. অবহিত্থক—হস্তদ্বয় বক্ষে স্থাপিত থাকবে তারপরে ধীরে ধীরে নিপাতিত হবে। ঊরু নিভগ্ন (বাঁকা) অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ জনিতাচারী অনুষ্ঠানের পর অরাল এবং অলপল্লবাকার হস্তদ্বয়, দেহাভিমুখী অঙ্গুলিসহ যথাক্রমে কপালে ও বক্ষে স্থাপিত হবে। তারপর যথাক্রমে উদ্বেষ্টিত ও ব্যাবৃত্ত ক্রিয়ার সাহায্য পার্শ্বে আসবে। তারপর অপবেষ্টন ও পরিবৃত্তি ক্রিয়ার সহায়তায় বক্ষস্থলে এসে পরস্পরের অভিমুখী হবে। চিন্তা, দুর্বলতা প্রভৃতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

৯৬. নিবেশ—পদদ্বয় মণ্ডল স্থানকে অর্থাৎ চার তাল অন্তর স্থাপিত হবে। তারপর ধীরে ধীরে নিকটতর হয়ে লাফিয়ে আবার ভূমিতে পতিত হবে। গজ আরোহণ অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

৯৭ এড়কাক্রীড়িত—লাফিয়ে পড়ার সময় গাত্র সন্নত এবং বলিত হবে। হস্ত ঘুরে এসে ঊরুপৃষ্ঠে অঞ্চিত হবে। ইতর প্রাণীর গতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

৯৮ ঊরুদ্‌বৃত্ত—জঙ্ঘা অঞ্চিত হয়ে তৎপরে উদবৃত্ত হবে এবং হস্তদ্বয় প্রলম্বিত এবং মস্তক পরিবাহিত হবে। অর্থাৎ ঊরুদ্‌বৃত্তাচারীসহ ব্যাবর্তনযুক্ত হস্তদ্বয় অরালাকারে ও কটকামুখাকারে ঊরুপৃষ্ঠে স্থাপিত হবে। ঈর্ষ্যা, প্রার্থনা, প্রণয়জনিত ক্রোধ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

৯৯. মদস্খলিতক—পদদ্বয় বলিত হয়ে আবিদ্ধ হবে এবং সম্মুখে প্রসারিত হয়ে কুঞ্চিত অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী হবে। অর্থাৎ স্বস্তিকাকার থেকে পদদ্বয় অপসৃত হবে, মস্তক পরিবাহিত এবং হস্তদ্বয় ডোলাকার হবে। ইহা মধ্যম শ্রেণীর মত্ততা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

১০০ বিষ্ণুক্রান্ত—হস্তদ্বয় রেচিত হবে এবং তারপর আবর্তিত করে ঊরুপৃষ্ঠে নিকুঞ্চিত অবস্থায় স্থাপিত করতে হবে। বিষ্ণুর পদক্ষেপে প্রযুক্ত হয়।

১০১ সংক্রান্ত—উরু আবিদ্ধ অবস্থায় থাকবে। হস্তদ্বয় সূচী অবস্থায় অপবিদ্ধ হবে। পদ নিকুঞ্চিত। অর্থাৎ আবিদ্ধাচারী করার পর ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত ক্রিয়া সহ হস্ত অলপদ্মাকারে উরুপৃষ্ঠে স্থাপিত হবে। ব্যস্ততাপূর্ণ গতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

১০২ বিষ্কম্ভ—বামহস্ত প্রথমে বক্ষে স্থাপিত হবে। পদদ্বয় উদ্ঘট্টিত হবে এবং হস্তদ্বয় পরে তলসংঘট্টিত হবে। অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত সূচীমুখ নৃত্যাকারে বামহস্তের সন্নিকটস্থ হয়ে দক্ষিণপদ সহ নিকুট্টিত হয়ে বামহস্ত হৃদয়ে স্থাপিত হবে। অপর পার্শ্বেও অনুরূপ ক্রিয়া আবৃত্ত হয়। তারপর দক্ষিণপদ সূচ্যাকার এবং দক্ষিণহস্ত অলপদ্মাকার হয় এবং বামহস্ত পূর্ববৎ থাকে। এইরূপ বার বার করতে হবে।

১০৩. উদ্ঘট্টিত—পার্শ্বদেশ নমিত হবে, তৎপরে প্রথমে হস্তদ্বয়ে অলাতক করে রেচিত করতে হবে। অর্থাৎ চরণ উদ্ঘট্টিত, সেই দিকের পার্শ্ব সন্নত ও হস্তদ্বয় তাল দিতে প্রস্তুত হয় এবং এইরূপ ক্রিয়া অপর পার্শ্বে আবৃত্ত হয়। ইহা হর্ষ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।

১০৪ বৃষভক্রীড়িত—পদদ্বয় প্রথমে কুঞ্চিত ও অঞ্চিত করতে হবে, হস্তদ্বয় রেচিত ও আঞ্চিত হবে, মস্তক লোলিত ও বর্তিত হবে। অর্থাৎ অলাতচারীর পরে করদ্বয় রেচিত হবে এবং তারপর ব্যাবর্তন ক্রিয়ার সহায়তায় কুঞ্চিত হয়ে স্কন্ধের উপর অলপদ্মাকারে স্থাপিত হবে।

১০৫ লোলিত—এখানে উভয় পার্শ্বে পদদ্বয় স্বস্তিক ও অপসৃত হবে এবং মস্তক পরিবাহিত হবে। অর্থাৎ একটি হস্ত রেচিত, অপর হস্ত অলপল্লবাকারে বক্ষে স্থিত। মস্তক লোলিত হয়ে ঐ অবস্থায় উভয় পার্শ্বে বিশ্রাম লাভ করে এবং বৈষ্ণব ভঙ্গি অবলম্বিত হয়।

১০৬ নাগাপসর্পিত—হস্তদ্বয় রেচিত, দেহ নিষণ্ণ অবস্থায় চরণ প্রসারিত করে দেহকে সঞ্চারিত করতে হবে। অর্থাৎ করদ্বয় রেচিত, মস্তক পরিবাহিত এবং পদদ্বয় স্বস্তিক থেকে অপসৃত। অল্প মত্ততার অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

১০৭ শকটাস্য—বক্ষ উদ্বাহিত করে পদদ্বয় ঊর্ধ্বে বক্রাকারে প্রসারিত করতে হবে। এবং অঙ্গুলিতল অধোমুখী ও হস্তদ্বয়ে ত্রিপতাক মুদ্রা। অর্থাৎ শকটাস্যাচারীর পর একটি হস্ত, পদ সহ প্রসারিত হয় এবং অপর হস্ত কটকামুখাকারে বক্ষে স্থাপিত হবে। ইহা বালক্রীড়া অভিনয়ে প্রযুক্ত হয়।

১০৮. গঙ্গাবতরণ—পদদ্বয় পশ্চাতে উন্নমিত, হস্তদ্বয়ের উপর শির স্থাপিত। অর্থাৎ চরণ উৎক্ষিপ্ত ও অবনমিত, হস্তদ্বয় ত্রিপতকাকারে উন্নমিত ও অবনমিত হয় এবং মস্তকও এইরূপে চালিত হয়। গঙ্গার মর্তে অবতরণ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

অঙ্গহার

একশত আটটি করণের পর নাট্যশাস্ত্র অনুসারে বত্রিশটি অঙ্গহার আলোচ্য।

অভিনবগ্নপ্ত বলেছেন "অঙ্গহারাঃ অঙ্গানাং হরনানি ইতি অত্রুটিতর্পয়া সমুচিতস্থান প্রাপ্তি।"

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপরাজিত, বৈশাখরেচিত, পার্শ্বস্বস্তিক, ভ্রমর, আক্ষিপ্তক, পরিচ্ছিন্ন, মদবিলসিত, আলীঢ়, আচ্ছুরিত, পার্শ্বচ্ছেদ, অপসর্পিত, মত্তাক্রীড়, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত—এই ষোলটি অঙ্গাহার সমসংখ্যক তালযুক্ত।

বিষ্কম্ভাপসৃত, মদস্খলিত, গতিমণ্ডল, অপবিদ্ধ, বিষ্কম্ভ, উদ্ঘট্টিত, আক্ষিপ্তরেচিত, রেচিত, অর্ধ-নিকুট্ট, বৃশ্চিকাপসৃত, অলাত, পরাবৃত্ত, পরিবৃত্ত রেচিত, উদবৃত্ত স্বস্তিকরেচিত—এই ষোলটি বিষম সংখ্যক তালযুক্ত।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যেমন করণের ক্ষেত্রে প্রতিভা অনুযায়ী রূপসৃষ্টির জন্যে শিল্পীর অনন্ত করণ সৃষ্টির স্বাধীনতা আছে, তেমনি করণসমূহের অনন্ত সংসৃষ্টি হেতু অঙ্গহারও অনন্ত। এ ক্ষেত্রেও শিল্পীর সেই স্বাধীনতা আছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন টীকাকার আরও কিছু করণ ও অঙ্গহার-এর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই বত্রিশটিই প্রধান।

১. স্থিরহস্ত—লীন, সমনখ ও ব্যংসিত করণের পর হস্তদ্বয় বিশ্লিষ্ট করে আলীঢ় থেকে প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে। তারপর ক্রমশঃ নিকুট্টক, উরুদ্‌বৃত্ত, স্বস্তিক, আক্ষিপ্তক, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ আশ্রয় করতে হবে।

২. পর্যস্তক—তলপুষ্পপুট, অপবিদ্ধ ও বর্তিত, তৎপরে নিকুট্টক, উরুদ্‌বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত, কটিচ্ছিন্ন এই দশটি করণের সমাযোগে পর্যস্তক।

৩, সূচীবিদ্ধ—অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, আবর্ত, নিকুট্টক, উরুদ্‌বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন—এই নয়টি করণ দ্বারা সূচীবিদ্ধ হয়।

৪. অপরাজিত—দণ্ডপাদ, ব্যংসিত, প্রসর্পিতক, নিকুট্টক, অর্ধনিকুট্টক, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন—এই নয়টি করণ এর সমাযোগে অপরাজিত।

৫. বৈশাখরেচিত—দুই পার্শ্বে কৃত বৈশাখরেচিত করণ, তারপরে নূপুর, ভুজঙ্গত্রাসিত, উন্মত্ত, মণ্ডলস্বস্তিক, নিকুট্টক, উরুদ্‌বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত এবং কটিচ্ছিন্ন—ক্রমানুসারে এই এগারোটি করণের মাধ্যমে বৈশাখরেচিত।

৬. পার্শ্বস্বস্তিক—দিক্‌স্বস্তিক, তারপরে একপার্শ্বেকৃত অর্ধনিকুট্টক, আবার দিক্‌স্বস্তিক, আবার অপর পার্শ্বে কৃত অর্ধনিকুট্টক, আবার দিকস্বস্তিক, আবার অপরপার্শ্বে কৃত অর্ধনিকুট্টক, অপবিদ্ধ, উরুদ্‌বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন—এদের সমাযোগে পার্শ্বস্বস্তিক।

৭. ভ্রমর—নূপুর, আক্ষিপ্ত, ছিন্ন, সূচী, নিতম্ব, করিহস্ত, উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন—এই আটটি করণের দ্বারা ভ্রমর।

৮. আক্ষিপ্ত—নূপুর, বিক্ষিপ্ত, অলাত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন—এই আটটি করণের দ্বারা আক্ষিপ্ত।

৯. পরিচ্ছিন্ন—সমনখ, ছিন্ন, সম্ভ্রান্ত, তারপরে বামদিকে ভ্রমর, বামপার্শ্বে অর্ধসূচী,

অতিক্রান্ত, ভুজঙ্গত্রাসিত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন—এই নয়টি করণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

১০. মদবিলসিত—মদস্খলিত, মত্তলি, এবং তলস্ফোটিক—এই তিনটি করণ প্রথমে তিনবার করে করতে হবে। তারপর নিকুট্টক, ঊরূদ্বৃত্ত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

১১. আলীঢ়—ব্যংসিত, নিকুট্টক, বামপদের দ্বারা নূপুর, অপর পদের দ্বারা অলাতক ও আক্ষিপ্ত, তারপর ঊরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

১২. আচ্ছুরিত—নূপুর, ভ্রমর, ব্যংসিত, অলাতক নিতম্ব, সূচী, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন —এই আটটি করণের সাহায্যে আচ্ছুরিত হয়।

১৩. পার্শ্বচ্ছেদ—বৃশ্চিককুট্টিত, উর্ধ্বজানু, আক্ষিপ্তস্বস্তিক, তারপরে আবর্তনান্তর ঊরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন আশ্রয় করতে হবে।

১৪. অপসর্পিত—অপক্রান্ত, তারপর ব্যংসিতের শুধু হস্তক্রিয়া, তারপর যথাক্রমে করিহস্ত, অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, কটিচ্ছিন্ন, ঊরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, করিহস্ত এবং কটিচ্ছিন্ন-এর মাধ্যমে হয় অপসারিত।

১৫. মত্তাক্রীড় প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে ভ্রমর, নূপুর ও ভুজঙ্গত্রাসিত, তারপর যথাক্রমে বৈশাখরেচিত, আক্ষিপ্ত, ছিন্ন, ভ্রমর, ব্যংসিত, ঊরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে। এই অঙ্গহার শিবের বিশেষ প্রিয়।

১৬. বিদ্যুৎভ্রান্ত—বাম পার্শ্বে অর্ধসূচী, দক্ষিণ পার্শ্বে বিদ্যুৎভ্রান্ত, তারপর আবার দক্ষিণ পার্শ্বে অর্ধসূচী, বামপার্শ্বে বিদ্যুৎভ্রান্ত, তারপর ছিন্ন ও অতিক্রান্ত, তারপর বামপার্শ্বে বৃশ্চিক ও কটিচ্ছিন্ন—এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে করতে হবে।

১৭. বিষ্কম্ভাপসৃত—নিকুট্টক করণ আশ্রয় করার পর যথাক্রমে অর্ধনিকুট্টক, ভুজঙ্গত্রাসিত, ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত, আক্ষিপ্ত, ঊরোমণ্ডল, লতাহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

১৮. মদস্খলিত—মত্তল্লি, গণ্ডসূচী, লীন, অপবিদ্ধ, তারপরে দ্রুতভাবে তলসংস্ফোটিত নিষ্পন্ন করতে হবে। তারপর করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

১৯ গতিমণ্ডল—মণ্ডলস্বস্তিক, নিবেশ, উন্মত্ত, উদ্ঘট্টিত, মত্তলি, আক্ষিপ্ত, ঊরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন ক্রমানুসারে করতে হবে।

২০. অপবিদ্ধ—প্রথমে অপবিদ্ধ করণ আশ্রয় করতে হবে, তারপর সূচীবিদ্ধ, তারপর হস্তদ্বয়ের উদ্বেষ্টিত ক্রিয়া এবং বদ্ধাচারী সহ ত্রিকের ঘূর্ণন, ঊরূদ্বৃত্ত ঊরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২১. বিষ্কম্ভ—নিকুট্টক, নিকুঞ্চিত, অঞ্চিত, ঊরূদ্বৃত্ত, অর্ধনিকুট্টক, ভুজঙ্গত্রাসিত, তারপর করদ্বয়ের উদ্বেষ্টিত ক্রিয়া সহ ভ্রমর, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২২. উদ্ঘট্টিত—নিকুট্টক, ঊরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন ক্রমানুসারে করতে হবে।

২৩ আক্ষিপ্তরেচিত—স্বস্তিকরেচিত, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিক্স্বস্তিক, কটিসম, ঘূর্ণিত, ভ্রমর, বৃশ্চিকরেচিত, পার্শ্বনিকুট্টক, ঊরোমণ্ডল, সন্নত, সিংহাকর্ষিত,

নাগাপসর্পিত, তারপর বক্ষস্বস্তিক দণ্ডপক্ষ, ললাটতিলক, লতাবৃশ্চিক, নিস্তম্ভিত, বিদ্যুৎভ্রান্ত, গজবিক্রীড়িত, নিতম্ব, বিষ্ণুক্রান্ত, উরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমন্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত এবং বিকল্পে কটিচ্ছিন্ন। কিছু মত পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে আক্ষিপ্তরেচিতে পঁচিশটি করণের প্রয়োগ আচার্যেরা স্বীকার করেন।

২৪. রেচিত—স্বস্তিকরেচিত, অর্ধরেচিত, বক্ষস্বস্তিক, উন্মত্ত, আক্ষিপ্তরেচিত, অর্ধমত্তল্লি, রেচকনিকুট্টক, ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত, নূপুর, বৈশাখরেচিত, ভুজঙ্গাঞ্চিত, দণ্ডরেচিত, চক্রমণ্ডল, বৃশ্চিকরেচিত, বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, বিবর্তিত, গরুড়প্লুত, ললিত, ময়ূরললিত, সর্পিত, স্খলিত, প্রসর্পিত, তলসংঘট্টিত, বৃষভক্রীড়িত, লোলিত—চারিদিকে বিষয় বিভাগ করে করতে হবে, তারপরে উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন।

২৫. অর্ধনিকুট্টক—নূপুর, নিবৃত্ত, নিকুট্টক, অর্ধনিকুট্টক, রেচকনিকুট্টক, ললিত, বৈশাখরেচিত, চতুর, দণ্ডরেচিত, বৃশ্চিক কুট্টিত, পার্শ্বনিকুট্টক, সম্ভ্রান্ত, উদ্ঘট্টিত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত এবং কটিচ্ছিন্ন ক্রমানুসারে করতে হবে।

২৬. বৃশ্চিকাপসৃত—প্রথমে লতাবৃশ্চিক করণ আশ্রয় করতে হবে। তারপর নিকুঞ্চিত, মত্তলি, নিতম্ব (মতান্তরে ভ্রমর), করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২৭. অলাত—স্বস্তিক, তারপরে দুইবার ব্যংসিত, অলাত, ঊর্ধ্বজানু, নিকুঞ্চিত, অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, উদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২৮. পরাবৃত্ত—দক্ষিণ পার্শ্বের দ্বারা জনিত, তারপর শকটাস্য ও অলাত ; বাম অঙ্গে ভ্রমর, তারপর করদ্বয়ের নিকুট্টিত ক্রিয়াসহ করিহস্ত এবং শেষে কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২৯. পরিবৃত্তরেচিত—প্রথমে নিতম্ব, তারপর ক্রমানুসারে স্বস্তিকরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক, লতাবৃশ্চিক, উন্মত্ত, করিহস্ত, ভুজঙ্গত্রাসিত, আক্ষিপ্ত ও নিতম্ব। এ পর্যন্ত ভ্রমরিকা ক্রিয়া সহ এক পার্শ্বে করতে হবে। তারপর অপর পার্শ্বেও অনুরূপ ক্রিয়া করার পর প্রথম স্থানে দাঁড়িয়ে অপর দুইদিকে ঘুরে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

৩০. উদ্বৃত্তক—নূপুর, ভুজঙ্গাঞ্চিত, গৃধ্রাবলীনক, তারপর প্রতিপার্শ্বে একবার করে দুইবার বিক্ষিপ্ত, তারপর সূচী, নিতম্ব, লতাবৃশ্চিক ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

৩১. সম্ভ্রান্ত—বিক্ষিপ্ত, অঞ্চিত, গণ্ডসূচী, গঙ্গাবতরণ, অর্ধসূচী, দণ্ডপাদ, বামপার্শ্বে চতুর, তারপর ভ্রমর, নূপুর, আক্ষিপ্ত, অর্ধস্বস্তিক, নিতম্ব, করিহস্ত, উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

৩২. স্বস্তিকরেচিত—প্রথমে বৈশাখরেচিত, তারপরে বৃশ্চিক, এবারে এ দুটির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তারপর লতাহস্ত সহ নিকুট্টক ও শেষে কটিচ্ছিন্ন করতে হবে।

আহার্য, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়

আহার্য অভিনয়

পূর্বেই বলা হয়েছে নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে, চরিত্র অলংকরণের অঙ্গসজ্জা, বসন-ভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয়, তাকে আহার্য অভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। আহার্য অর্থে আহরণীয় অর্থাৎ কৃত্রিম শোভা এবং এই শোভাযুক্ত অভিনয় আহার্য অভিনয়। মঞ্চসজ্জায় প্রাচীনকালে নট-নটীদের পিছনে দৃশ্যপট ব্যবহার করা হত না। কিন্তু তা না থাকলেও দর্শকদের বোধের সুবিধার্থে নেপথ্যসজ্জার ব্যবস্থা ছিল। এই আহার্য অভিনয় ও নেপথ্যবিধানের প্রধান অঙ্গ ছিল পুস্ত, অলংকার ও অঙ্গরচনা।

পুস্ত : রঙ্গমঞ্চে পাহাড়, গুহা, রথ, বিমান, অশ্ব প্রভৃতি দেখাবার জন্যে মাদুর, কাপড়, চাটাই, চামড়া প্রভৃতির সাহায্যে এদের যে কৃত্রিম প্রতিরূপ নির্মাণ করা হত তার নাম পুস্ত। এছাড়া কৃত্রিম মাথা, হাত, বিকটদর্শন বৃহৎ পুতুল প্রভৃতিও তৈরি করা হত। দশানন, গজাসুর প্রভৃতি চরিত্রের জন্যে কৃত্রিম মাথা, হাত প্রভৃতির ব্যবহার করা হয়। অবশ্য অনেক সময় রঙ্গমঞ্চে পাহাড়, গুহার প্রতিরূপ না এনে বর্ণনার সাহায্যেও ঐ সব জিনিসের কথা বোঝানো হত।

অলংকার : মাল্য, আভরণ, বস্ত্র, কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, বিভিন্ন পোশাক ও আভরণাদি, এছাড়াও অলংকারের প্রচুর বৈচিত্র্য, কাপড়ের রঙ, কেশবিন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে শিল্পীদের চরিত্র বোঝানো হত। সে সময় দেবতা, রাজা, মুনিকন্যা, সিদ্ধাঙ্গনা, রাক্ষসী প্রভৃতি চরিত্রের পার্থক্য তাদের বস্ত্রালংকার ও সাজসজ্জা দেখেই দর্শকরা অনুমান করতে পারতেন।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অলংকারকে চারভাগে ভাগ করা হয়।

"চতুর্বিধস্তু বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকস্তথা।।"

আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য—এই চার প্রকার অলংকারের মধ্যে কুণ্ডলাদি আবেধ্য; শ্রোণীসূত্র, অঙ্গদ প্রভৃতি বন্ধনীয়; নূপুর, বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি ক্ষেপ্য; স্বর্ণসূত্র ও বহুবিধ হার প্রভৃতি আরোপ্য। দেবতা ও নারীদের জন্যে নাট্যশাস্ত্রে শিখাপাশ, কুণ্ডল, শিখাজাল, খড়্গপত্র, বেণীগুচ্ছ, চূড়ামণি, দারক, মকরিকা, ললাটতিলক, মুক্তাজাল, গুচ্ছ, গবাক্ষ, কুসুম, কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, কর্ণোৎপল, তিলক, পত্রলেখা প্রভৃতি অলংকারের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে।

এই অঙ্গসজ্জা, বেশভূষা ও অলংকারের প্রয়োগের দিকে কিরূপ যত্ন নেওয়া উচিত তা শাস্ত্রানুযায়ী নর্তকীর মণ্ডন বা অলংকরণবিধির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। "স্নিগ্ধ, বিস্তীর্ণ অবেণীসংবন্ধ কেশপাশ গ্রন্থিহীন অবস্থায় পৃষ্ঠে বিলীন থাকবে। মস্তকে পুষ্পের মালা (chaplet) অথবা মুক্তাজালশোভিতা দীর্ঘা সরলা বেণী বিলম্বিত করতে

হবে। ভালদেশে কস্তুরীচন্দনানুলেপনে বিচিত্র পত্রলেখার উপর ঈষৎ অসংযত অলকগুচ্ছ শোভা পাবে। নয়নযুগলে সূক্ষ্ম অঞ্জনরেখা। কর্ণযুগলে সমুজ্জ্বল বলয়াকৃতি কুণ্ডল বা তালপত্র। দন্তপঙ্‌ক্তির প্রভায় সমগ্র রঙ্গভূমি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কপোলযুগলে কস্তুরীচিত্রিত পত্রভঙ্গরেখা (অলকা-তিলকা কাটা)। কণ্ঠে তারাহার দল-দল দুলবে। স্থূল মুক্তাহারে কুচযুগল মণ্ডিত করতে হবে। প্রকোষ্ঠে বহুমূল্যরত্নখচিত সুবর্ণবলয়; অঙ্গুলীতে মাণিক্য, নীলা বা হীরকখচিত অঙ্গুরীয়কমুদ্রা। গাত্র হবে চন্দনে ধূসর অথবা কুংকুমে রঞ্জিত। পরিধানে দুগ্ধধবল দুকূলবসন। তনুর ঊর্ধ্বভাগ কূর্পাসকে (bodice) আবৃত; অথবা দেশের প্রথা অনুসারে কঞ্চুকও (হাতাসুদ্ধ জামা) পরিধান করা যেতে পারে।" (অশোকনাথ শাস্ত্রী)।

অঙ্গরচনা: মুখ, হাত প্রভৃতিতে রঙ মাখানো হচ্ছে অঙ্গরচনা। রঙের সাহায্যে বিশেষ জাতি বা চরিত্র বোঝানো হত। যেমন সাধারণ দেবতা ও অপ্সরাদের রঙ করা হত গৌরবর্ণ। আবার ব্রহ্মা, রুদ্র ও স্কন্দকে সোনালী রঙ করা হত। চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি, বরুণ, সমুদ্র, গঙ্গা প্রভৃতিকে সাদা, অগ্নিকে হলুদ রঙ, নারায়ণ, নর, বাসুকি, দৈত্য, দানব প্রভৃতিকে শ্যামবর্ণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব, বানর প্রভৃতিদের তপ্তকাঞ্চন রঙ করা হত। জাতি ও বর্ণ অনুযায়ী মর্তবাসীদেরও রঙের সাহায্যে তাঁদের প্রভেদ নির্দেশ করা হত। এ ছাড়াও শ্মশ্রুকর্ম অথবা গোঁফদাড়ির ব্যবহারের বৈচিত্র্য ছিল। রাজা, অমাত্য, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের সাদা দাড়ি, গরীব দুঃখী তপশ্চর্যারত ব্যক্তিদের অপরিষ্কার দাড়ি, ঋষিদের রোমশ দাড়ি ও রাজা, রাজপুরুষ, সম্ভ্রান্ত ও বিলাসী ব্যক্তিদের জন্যে বিচিত্র দাড়ি ব্যবহার করা হত।

এই সব ছাড়াও বিভিন্ন ভয়াল ভূমিকানুযায়ী মুখোস প্রভৃতিও ব্যবহার করা হত।

বাচিক অভিনয়

কাব্য, সাহিত্য, ও নাটকের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এর উৎস ঋগ্‌বেদ; ভাব সঞ্চারী।

সাধারণভাবে নৃত্যকলায় আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমেই কাব্যের ও নাটকের ভাষা ও ভাব রূপায়িত হয়, সেজন্যে বাচিক অভিনয় প্রধানতঃ নাট্যাংশের উপজীব্য। কণ্ঠস্বরের যথোচিত ব্যবহার ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রাচীনকালে নট-নটীদের আবৃত্তি অংশে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য আনার জন্যে সঙ্গীত ব্যবহার করা হত। এবং বাক্যের অন্তর্গত অর্থ, রস ও ভাবের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন সুর, স্থান ও বর্ণের প্রয়োগ হত। নৃত্যকলার প্রসঙ্গে বাহুল্য বোধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল না।

সাত্ত্বিক অভিনয়

মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে বিভিন্ন শারীরিক অবস্থার (সাত্ত্বিক ভাবসমূহের দ্বারা) সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ; ভাব বিপাস্থায়ী।

নাট্যশাস্ত্রের মতে 'দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং' অর্থাৎ সত্ত্ব হচ্ছে দেহমূলক বস্তু। নাট্যশাস্ত্র

ও অভিনয়দর্পণের মতে সাত্ত্বিকভাব আটটি। যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ও মূর্ছা।

স্তম্ভ বলতে শারীরিক ক্রিয়ার সাময়িক বিলোপ বুঝায়। হর্ষ, ভয়, রোগ, বিপদ, বিস্ময়, ক্রোধ প্রভৃতি থেকে এই ভাবের উৎপত্তি। সংজ্ঞাহীন, নিঃস্পন্দ, শূন্যজড়াকৃতি অবস্থায় স্তম্ভের অভিনয় হয়।

শ্রম, ব্যায়ামজনিত ক্লান্তি, দৃঢ় নিপীড়ন, ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, দুঃখ, রোগ, তাপ, আঘাত প্রভৃতির ফলে শরীরের স্বেদ দেখা দেয়। রতিভাব ও শারীরিক শ্রম প্রধানতঃ স্বেদবিন্দু উদ্গত করে। ব্যজন গ্রহণের দ্বারা, ঘর্মমার্জনা, বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রভৃতি বুঝিয়ে এই অভিনয় হয়।

রোমগুলি শরীরের উপর কণ্টকিত হয়ে ওঠার নাম রোমাঞ্চ। ভয়, শৈত্য, হর্ষ, ক্রোধ, রোগ প্রভৃতি থেকে এই ভাবের উৎপত্তি। শরীর কণ্টকিত, রোমহর্ষণ, পুলকোদ্গম প্রভৃতির মাধ্যমে এই ভাবের অভিনয় হয়।

ভয়, হর্ষ, জরা, ক্রোধ, রুক্ষতা, রোগ, গর্ব প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত বিস্বর ভাবকে স্বরভঙ্গ বলে। অভিভূত গদ্গদভাবের অভিনয়।

শীত, ভয়, হর্ষ, রোষ, পীড়া, অনুরাগ, দ্বেষ ও পরিশ্রম প্রভৃতি থেকে কম্পভাবের উৎপত্তি। অবিরাম স্ফুরণ ও কম্পনের মাধ্যমে এই ভাবের অভিনয় হয়।

শীত, ক্রোধ, ভয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রোগ, ক্লান্তি, তাপ, বিষাদ, রোষ প্রভৃতি থেকে বিবর্ণতা ভাবের উৎপত্তি। মুখরাগের পরিবর্তন, দেহের বর্ণান্তর ধারণ প্রভৃতির মাধ্যমে এই অভিনয় হয়। ভয়ে, শোকে, অনিমেষ দৃষ্টিপাতে আনন্দে, ক্রোধাতিশয্যে, চোখে ধূম্র বা অঞ্জন লাগালে অশ্রু উদ্গত হয়।

চোখের জল ফেলা, চক্ষুমার্জনা, ছলছল ভাব প্রভৃতির মাধ্যমে এই অভিনয় হয়।

সুখ দুঃখের দ্বারা জ্ঞানের লোপ হলে তাকে মূর্ছা বলে। ভূমিতে পতন, নিশ্চেষ্ট ভাব, নিষ্কম্পতা, শ্বাসরোধ প্রভৃতির মাধ্যমে এর অভিনয় হয়।

সাত্ত্বিক ভাব ও সাত্ত্বিক যোষিদলংকারগুলির যথাযথ প্রয়োগের জন্যে নায়ক-ভেদ, নায়িকা-ভেদ ও অন্যান্য চরিত্রের রীতি লক্ষণ জানার বিশেষ প্রয়োজন।

ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীর-লোলিত, এবং ধীর-প্রশান্ত- সাধারণ ভাবে এই চারিটি নায়ক-ভেদ প্রধান। এদের আবার প্রত্যেকেরই দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল এবং শঠ রূপে ষোল প্রকার ভেদ আছে। অবিকত্থন (যে নিজের প্রশংসা করে না), ক্ষমাশীল, অতি-গম্ভীর, মহাসত্ত্ব (যার হৃদয় সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে অভিভূত হয় না) স্থির প্রকৃতি, নিগূঢ়মান (যে বিনয় দিয়ে গর্বকে ঢেকে রাখে) ও দৃঢ়ব্রত (যে নিজ প্রতিজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করে)—এদের ধীরোদাত্ত নায়ক বলা হয়। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এই শ্রেণীর নায়ক।

ছলনাপটু, উগ্রস্বভাব, চপল, অহংকার ও দর্পকারী আত্মপ্রশংসা-নিরত—এদের ধীরোদ্ধত নায়ক বলা হয়। দুর্যোধন, ভীমসেন প্রভৃতি এই শ্রেণীর নায়ক।

নিশ্চিন্ত, মৃদুস্বভাব এবং সর্বদাকলাপরায়ণ (সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতিতে অনুরক্ত) —এদের ধীর-ললিত নায়ক বলা হয়। অগ্নিমিত্র, বৎসরাজ প্রভৃতি এই শ্রেণীর নায়ক।

নায়কোচিত সাধারণ গুণে পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ধীর-প্রশান্ত নায়ক বলা হয়।

এরা, ত্যাগী, কৃতী, কুলীন, তেজস্বী, বিদগ্ধ ও সচ্চরিত্র। মালতীমাধব নাটকের মাধব প্রভৃতি এই শ্রেণীর নায়ক।

আগেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠরূপে এরা ষোল প্রকার। এদের মধ্যে যার অনেক স্ত্রীতে সমান অনুরাগ, সে দক্ষিণ। যে অপরাধী হয়েও শংকাহীন, ভর্ৎসনাতেও যে লজ্জাহীন এবং দোষ দেখিয়ে দিলেও যে অস্বীকার করে, তাকে ধৃষ্ট-নায়ক বলে। যে নায়ক একটি নারীতে আসক্ত থাকে তাকে অনুকূল-নায়ক বলা হয়। যে নায়ক একটিমাত্র নায়িকাতে অনুরক্ত হয়েও অন্য নারীদের প্রতি বাহ্য আসক্তি দেখিয়ে ভিতরে ভিতরে বিরূপ আচরণ করে, তাকে শঠ-নায়ক বলে।

উত্তম, মধ্যম ও অধম হিসাবে এদের সবগুলির প্রত্যেকেই আবার তিন প্রকার। অর্থাৎ সমগ্রভাবে নায়কভেদ আটচল্লিশ।

নায়িকা ভেদ মূলত তিন প্রকার—স্বীয়া, অন্যা ও সাধারণী। বিনয়, সারল্য প্রভৃতি গুণযুক্তা, গৃহকর্মনিপুণা ও পতিব্রতা স্ত্রীই স্বীয়া। এর আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা এই তিনটি ভেদ আছে। যে নায়িকা প্রথম যৌবন সমাগমা, যার মদনবিকার-গুলি সদ্য পরিস্ফুট, যে রতি ব্যাপারে প্রতিকূল ভাবাপন্না, মনের ব্যাপারে মৃদুভাবাপন্না এবং অধিক লজ্জাশীলা—সেই মুগ্ধা। বিচিত্র সুরত-লীলায় অভিজ্ঞ, অধিক-যৌবনা, প্রগল্‌ভবচনা এবং ব্রীড়ামধ্যমা নায়িকাকে মধ্যা বলা হয়। গাঢ়-যৌবনা, কামান্ধা, ভাব-পটীয়সী, স্বল্প লজ্জাশীলা, রতিনিপুণা এবং রতি বিষয়ে যে নায়ককে অধীনে রাখে তাকে প্রগল্‌ভা বলে।

ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা ভেদে এরা ছয় প্রকার। তাহলে মধ্যা ও প্রগল্‌ভার বারটি ভেদ, কারণ নায়কের প্রণয়ের মাত্রাভেদে এরা আবার দুই প্রকার। মুগ্ধা কিন্তু একটিই। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বীয়ার ভেদ হচ্ছে তেরটি।

অবিবাহিতা, লজ্জাশীলা ও নবযৌবনা নারী অন্যা। পরকীয়ার দুই প্রকার ভেদ—বিবাহিতা ও অবিবাহিতা। পিতার অধীন বলে অবিবাহিতাও পরকীয়া।

ধীরা, নৃত্যগীত নিপুণা বেশ্যাই সাধারণী বা সামান্যা নায়িকা।

এই ষোল প্রকার নায়িকা আবার অবস্থাভেদে আট প্রকার স্বাধীনভর্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা-প্রোষিতভর্তৃকা, বাসক-সজ্জিতা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা।

বিচিত্র বিলাসে আসক্তা এবং রতিগুণে আবিষ্ট হয়ে প্রিয়তম সর্বদাই যার সান্নিধ্যে থাকে, সেইই স্বাধীন ভর্তৃকা। অন্য নারীর সম্ভোগচিহ্ন ধারণ করে সমাগত প্রিয়তমকে দেখে ঈর্ষাকাতরা নায়িকাকে খণ্ডিতা বলা হয়। কামাবিষ্টা নায়িকা যখন প্রিয়তমকে দূতী পাঠিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসে অথবা নিজেই তার কাছে যায় তাকে অভিসারিকা নায়িকা বলে। যে নায়িকা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চাটুভাষী প্রিয়তমকে প্রত্যাখ্যান করে পরে অনুতপ্ত হয় তাকে কলহান্তরিতা বলা হয়। সংকেত সত্ত্বেও প্রিয়তম যার কুঞ্জে আসে না, অপমানিতা সেই নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলা হয়। কার্য-ব্যাপদেশে যার স্বামী প্রবাসী, রতিকাতরা সেই নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলা হয়। প্রিয়সঙ্গম আসন্ন জেনে যে নারী বেশবাসে সজ্জিতা ও প্রসাধিতা, সেই নায়িকাই বাসকসজ্জিতা। আসার সংবাদ জানিয়েও যার প্রিয়তম দৈববশত আসতে পারে না, প্রিয়বিরহক্লিষ্টা সেই নারী বিরহোৎ-কণ্ঠিতা—এই ভাবে একশো আঠাশ প্রকার নায়িকা উত্তম, মধ্যম ও অধম অনুসারে মোট

নায়িকা ভেদের সংখ্যা তিনশ চুরাশি। যেহেতু নারীচরিত্র বিচিত্র রূপিণী, সেহেতু অনেক সময়েই এদের একের সঙ্গে অন্যকে মিশে থাকতে দেখা যায়। যে সব যৌবনসুলভ ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে রমণীরা লোকচিত্ত আকর্ষণ করতে পারে সেই সব যোষিদলংকারগুলিও সাত্ত্বিক অভিনয়ের অঙ্গ।

এই সাত্ত্বিক যোষিদলংকারগুলির মধ্যে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য, ধৈর্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলি প্রধান। অঙ্গজাত ও স্বভাবজাত এই সাত্ত্বিক অলংকারগুলির অভিনয়ে অপরিহার্য।

জন্ম থেকে নির্বিকার—এমন মনে সদ্য উদ্ভূত প্রথম বিকারকে 'ভাব' বলে। ভ্রূ চোখ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভোগেচ্ছা-প্রকাশক ভাবের বিকার অল্প দৃষ্টিগোচর হলে তাকে 'হাব' বলে। আবার এই বিকার যখন প্রকট হয়ে লক্ষ্যগোচর হয় তখন তাকে বলে 'হেলা'। রূপ, যৌবন, লালিত্য, ভোগ প্রভৃতি অঙ্গভূষণকে 'শোভা' বলা হয়। কামোন্মেষের ফলে শোভার দ্যুতি উজ্জ্বলতর হলে তাকে 'কান্তি' বলে। কান্তি উজ্জ্বলতর হলে তাকে 'দীপ্তি' বলা হয়। যে রমণীয়তা সকল অবস্থাতেই অম্লান থাকে তাকে 'মাধুর্য' বলে। ভীতিশূন্যতাকে 'প্রগল্‌ভতা' বলা হয়। সর্বদা বিনয়ী ও মধুর ভাবকে 'ঔদার্য' বলে। আত্মশ্লাঘামুক্ত অচঞ্চল মনোবৃত্তিই হচ্ছে 'ধৈর্য'। দেহ, বসনভূষণ, প্রেমালাপ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রীতিবশত প্রিয়তমের অনুকরণকে 'লীলা' বলা হয়। অভীষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করার ফলে চারিদিকে অকারণ ঘোরাফেরা, দাঁড়ান, বসা প্রভৃতি এবং মুখ, চোখ প্রভৃতির ভঙ্গীর যে বৈচিত্র্য তাকে 'বিলাস' বলে। যে প্রসাধন ও বেশবিন্যাস স্বল্প হলেও কান্তিকে দীপ্ত করে তাকে 'বিচ্ছিত্তি' বলে। গর্বিত অবস্থায় অভীষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অনাদরের ভাবকে 'বিব্বোক' বলা হয়। অভীষ্টতম ব্যক্তিকে কাছে পাওয়ার আনন্দের উত্তেজনাবশত ঈষৎ হাস্য, শুষ্ক রোদন, ত্রাস, ক্রোধ, শ্রম প্রভৃতির যে মিশ্রণ তাকে 'কিলকিঞ্চিত' বলে। প্রিয়জন প্রসঙ্গে আলোচনার সময় প্রিয়ভাবনায় তন্ময়চিত্ত নারীর কান চুলকানো, মাথার চুল ধরে নাড়া প্রভৃতি কাজগুলিকে 'মোট্টায়িত' বলা হয়। কেশ, স্তন অধর প্রভৃতি স্পর্শিত হলে আনন্দ সত্ত্বেও মাথা ও হাত নেড়ে অসম্মতির ভাবটিকে 'কুট্টমিত' বলে। প্রিয় আগমনে আনন্দোচ্ছ্বাসে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দেহের এক স্থানের অলংকার অন্য স্থানে পরাকে 'বিভ্রম' বলে। সৌকুমার্যের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসকে 'ললিত' বলা হয়। সৌভাগ্য, যৌবন প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অহংকারের ফলে যে চিত্তবিকার হয় তাহাকে 'মদ' বলে। কথা বলার সময়ে ব্রীড়াবসতঃ যে নীরবতা তাকে 'বিকৃত' বলে। প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশজনিত আচরণকে 'তপন' বলা হয়। প্রিয়তমের কাছে কপটভাবে না জানার ভান করে জানা জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করাকে 'মৌগ্ধ' বলা হয়। রমণীয় বস্তু দর্শনের ফলে যে চিত্তচাঞ্চল্য তাকে 'কুতূহল' বলে। যৌবনের আবির্ভাবে অকারণ হাসিকে হসিত' বলে। সামান্য কারণে অথবা অকারণে প্রিয়তমের কাছে যে ব্যস্ততা তাই 'চকিত'। প্রিয়তমের সঙ্গে বিহারকালে যে ক্রীড়া তাকেই 'কেলি' বলা হয়।

এইসব অঙ্গজাত ও স্বভাবজাত অলংকারগুলি সাত্ত্বিক অভিনয়ে উৎকর্ষ ও শোভা-সম্পাদন করে।

রসনিষ্পত্তি

নৃত্যকলার আত্মারূপে রস ও ভাবই স্বীকৃত। রসনিষ্পত্তি না হলে কোনো শিল্পসৃষ্টিই শিল্প আখ্যা লাভ করতে পারে না। যেমন লাবণ্যযুক্ত না হলে রমণীদেহ শত অলংকার ও বসনভূষণ প্রসাধনে বহিরঙ্গে উজ্জ্বল হলেও প্রাণহীন মনে হয়। ঠিক তেমনই নৃত্যকলা আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়ে প্রদর্শিত হলেও তার রস-উদ্বোধন না হলে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিল্পকলার ও রসানুভবের প্রতি বিভিন্ন আচার্যেরা পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। উপনিষদের ঋষি পরমপুরুষ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে এই উচ্চ আদর্শ কল্পনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রসভাবব্যঞ্জনা দ্বারা আনন্দবিধান, উপদেশদান ও মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদন-এর যে তত্ত্ব নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে সেই তত্ত্বটি আরো সুপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল।

নাট্যশাস্ত্রের মতে রস হচ্ছে আস্বাদন। এবং রস ও ভাবের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। রস ও ভাবের জন্য-জনক বা কার্যকারণ সম্বন্ধ। অবশ্য এই রসতত্ত্ব সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের সাহায্যে রসনিষ্পত্তি হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব সহযোগে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব সহৃদয়ে ব্যক্ত হলেই রসতা প্রাপ্ত হয়।

রসের মানসিক উপাদান হচ্ছে মনের ভাব অর্থাৎ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি বা 'ইমোশন'গুলি। লৌকিক দশায় প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে অনাস্বাদ্য থাকবার পর যা বাচিক অভিনয় প্রক্রিয়ারূঢ় হয়ে নিজেকে আস্বাদ্য (রসরূপে) পরিণত করে, তাই ভাব।

মানুষের মনে ভাব অসংখ্য। কারণ এই চিত্তবৃত্তিগুলি শুধুমাত্র সুখদুঃখের অনুভূতি নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন চিত্তবৃত্তিগুলি একটি সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা (Complete Psychosis), বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত চিন্তার পরিবর্তনে ভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। এই অসংখ্য ভাবগুলির মধ্যে নয়টি ভাবকে স্থায়ীভাবরূপে স্বীকার করা হয়।

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম—এই নয়টি স্থায়ীভাব। ভাব হচ্ছে চিত্তবৃত্তি ; সুতরাং এর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু এই ভাবগুলি স্বরূপতঃ বিনষ্ট বলে বোধ হলেও সংস্কাররূপে এ চিরকাল বিদ্যমান থাকে এবং প্রতীতিকালে এর অনুসন্ধান পাওয়া যায়—এই জন্যেই একে স্থায়ীভাব বলা হয়। আলংকারিকরা বলেন, ভাবরূপ বহু ভাবের মধ্যে যে ভাবগুলি বহুলরূপে পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে স্থায়ীভাব বলে।

এই নয়টি স্থায়ী ভাব বিভাব ও অনুভাবের সংযোগে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত—এই নয়টি রসে পরিণত হয়।

এই ভাবগুলি ছাড়াও মানুষের মনে আরো তেত্রিশটি ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি,

জাগরণ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক। এই ভাবগুলি স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। এগুলি অন্যান্য স্থায়ী ভাবগুলির অভিমুখে মনকে চালিত করে। এই চরণশীলতার জন্যে এই ভাবগুলিকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। ভরতের মতে, রসের প্রতি বিবিধ প্রকারে অভিমুখভাবে চরণশীল ভাবই ব্যভিচারী; ইহারা অস্থায়ী। সমুদ্রজলে তরঙ্গের মতো রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের উপর ইহারা কখনও আবির্ভূত কখনও বা তিরোভূত হয়। রসসৃষ্টির প্রয়োজনে এদের আবির্ভাব, কার্যনিষ্পত্তির পরেই অন্তর্ধান, সঞ্চারীভাবের এই হল প্রধান বিশেষত্ব।

ভাবগুলিকে আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাগে ভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের মতে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, অশ্রু, বিবর্ণতা ও প্রলয়—এই আটটিকেই সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়।

রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের যা উদ্বোধক, কারণ বা হেতু তাকে বিভাব বলে। বিভাবের সাহায্যেই আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।

"স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।
বহে মম শিরে শিরে এ কী দাহ, কি প্রবাহ
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা"

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এখানে নায়িকার চিত্তে রতিভাবের উদ্বোধন করে তার প্রেমানুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। আবার—

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে
নয়নে নয়নে।"

সহৃদয় দর্শকের চিত্তে এই দৃশ্যে সেই ভাব পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

বিভাব দু-রকমের—আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। যাকে অবলম্বন করে রতি প্রভৃতি ভাব মনে জেগে ওঠে তাকে আলম্বন বিভাব বলে। সাধারণত নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতিকে অবলম্বন করেই রসোদ্গম হয়।

অর্জুন। "কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া!
সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া!
(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)
এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও, নও স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা॥"

এখানে চিত্রাঙ্গদাকে অবলম্বন করে অর্জুনের মনে রতিভাবের উদ্বোধন ঘটছে।

যা রসকে উদ্দীপিত করে তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। বেশ, ভূষা, রূপ, দেশ, কাল, চন্দ্র, চন্দন, কোকিলালাপ, ভ্রমরঝঙ্কার, মলয়পবন, প্রকৃতি প্রভৃতি উদ্দীপনের প্রধান সহায়ক।

চিত্রাঙ্গদা। "কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে।"

এখানে চিত্রাঙ্গদার চিত্তে বহিঃপ্রকৃতি প্রেমকে উদ্দীপনা দান করছে।

অবলম্বন ও উদ্দীপন কারণসমূহের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের বহিঃপ্রকাশ যা লোকজগতে কার্যরূপে পরিচিত তাকে অনুভাব বলে। অনুভাবের সাহায্যেই স্থায়ীভাব সহৃদয় দর্শকসমাজে অনুভাবিত বা প্রকাশিত হয়। কটাক্ষ, ভ্রূবিক্ষেপ, হাস্য, বাহু প্রভৃতি অঙ্গ বিক্ষেপের মাধ্যমে অনুভাব প্রকাশিত হয়। বিভাব ও অনুভাবে নিত্যসম্বন্ধ। বিভাব হচ্ছে কারণ আর অনুভাব হচ্ছে কার্য। অর্থাৎ বলা যেতে পারে ভাব উদ্‌বুদ্ধ হলে অনুভাবের উৎপত্তি হয়। অনুভাবের মধ্য দিয়েই ভাবটিকে চেনা যায়।

"কোন দেবতা সে কি পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।"

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে এই ছবিটি অনুভাবের উপাদানে সমৃদ্ধ এবং ভাবটির প্রকাশক।

এখন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সহযোগে রসনিষ্পত্তি। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব স্থায়ীভাবকে রসতা দান করে। রসের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে স্থায়ীভাব সমুদ্র ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব হচ্ছে তরঙ্গ। ব্যভিচারীভাবগুলি স্থায়ীকে আশ্রয় করেই থাকে এবং পারস্পরিক ফলন-প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে স্থায়ীভাবকে আস্বাদ্য রসে পরিণত করে।

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই আটটিকেই রস বলে প্রথমে গণ্য করা হত। পরবর্তীকালে শান্তকেও রসরূপে গণ্য করে নবরস-এর কথা বলা হয়েছে।

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভূতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ রসা স্মৃতাঃ॥"

শৃঙ্গার: শৃঙ্গ শব্দের অর্থ কামোদ্রেক। স্বভাবতই কামোদ্রেকের কারণস্বরূপ যে রসের প্রকৃতি উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বল তাকে শৃঙ্গার বলে। শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব রতি। এই রস শ্যামবর্ণ এবং এর দেবতা বিষ্ণু।

এই রসের দুটি অধিষ্ঠান—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ, রতি যেখানে অত্যন্ত প্রবল অথচ অভীষ্ট ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না সেই অবস্থাকে বিপ্রলম্ভ বলে। বিপ্রলম্ভ

অবস্থায় অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে—নির্বেদ, শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া, শ্রম, মদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, জড়তা, বিষাদ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, নিদ্রা, স্বপ্ন, অবহিত্থা, অমর্ষ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক।

যখন বিলাসী ও অনুরক্ত নায়ক-নায়িকা সাক্ষাৎকার, স্পর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে পরস্পরকে উপভোগ করে সেই অবস্থাকে সম্ভোগ বলে। সম্ভোগ অবস্থায় অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ও অশ্রু। মন-ব্যভিচার হচ্ছে গ্লানি, মদ, ধৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, নিদ্রা, উন্মাদ। শৃঙ্গারকে আদিরস বলা হয়।

হাস্য ঃ চেহারা, অঙ্গভঙ্গী, পোশাক, আচার আচরণ ইত্যাদির বিকৃতি থেকে কৌতুক সৃষ্টি হলে হাস্যরস হয়। হাস্যের স্থায়ীভাব হাস। রঙ শাদা ও দেবতা প্রমথ। এর দুটি প্রকাশ—আত্মস্থ ও পরস্থ। নিজে হাসলে হয় আত্মস্থ ও পরকে হাসালে হয় পরস্থ।

হাসে ছটি ভেদ, যথা—স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত। যে হাস্যে চোখদুটি সামান্য বিকশিত ও অধর স্পন্দিত হয় তাকে স্মিত হাসি বলে। সামান্য দাঁত দেখা গেলে তাকে বলে হসিত, মধুর স্বরযুক্ত হাস্যকে বিহসিত বলা হয়। কাঁধ ও মাথা কম্পিত হলে সেই হাস্যকে অবহসিত বলে। যে হাসিতে চোখে জল আসে তাকে অপহসিত বলা হয়। হাসির সঙ্গে অঙ্গবিক্ষেপ ঘটলে তাকে অতিহসিত বলে।

হাস্যের অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে বিবর্ণ, হাস, স্বরভঙ্গ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, স্মৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, মতি, বিতর্ক।

করুণ ঃ অনিষ্ট ও শোকের ফলে করুণরসের উৎপত্তি। বর্ণ কপোত ও দেবতা যম। স্থায়ীভাব শোক।

অনুভাব ও তনু ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ ও অশ্রু। মন-ব্যভিচার হচ্ছে শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, উৎকণ্ঠা, স্বপ্ন, অবহিত্থা, ব্যাধি, মরণ ও ত্রাস।

রৌদ্র ঃ রৌদ্ররসের স্থায়ীভাব ক্রোধ। বর্ণ রক্ত ও দেবতা রুদ্র। আলম্বনবিভাব হচ্ছে শত্রু ও তার চেষ্টাতেই উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে—স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে—অসূয়া, মদ, স্মৃতি, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ ও বিতর্ক।

বীর ঃ বীররসের প্রকৃতি উত্তম এবং এর স্থায়ীভাব উৎসাহ। বর্ণ হেম ও দেবতা মহেন্দ্র।

দান, ধর্ম, যুদ্ধ ও দয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই রসের চার প্রকার ভেদ হয়। অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, বিবর্ণ, অশ্রু ও সংমোহ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, স্মৃতি, ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ ও বিতর্ক।

ভয়ানক : ভয়ানকরসের স্থায়ীভাব ভয়, বর্ণ কৃষ্ণ ও দেবতা কাল। অনুভব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে শঙ্কা, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ব্রীড়া, বিষাদ, আবেগ, অপস্মার ও ত্রাস।

বীভৎস : বীভৎসরসের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা। দোষ দেখা ইত্যাদির ফলে কোনো বিষয় থেকে যে ঘৃণার উদ্ভব হয় তাকে জুগুপ্সা বলে। বীভৎসরসের বর্ণ নীল এবং দেবতা মহাকাল।

অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে রোমাঞ্চ ও প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা ও ব্যাধি।

অদ্ভুত : অদ্ভুতরসের স্থায়ীভাব বিস্ময়। বর্ণ পীত ও দেবতা ব্রহ্মা।

অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও বিবর্ণ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে অসূয়া।

শান্ত : শান্তরসের স্থায়ীভাব শম এবং প্রকৃতি উত্তম। এর বর্ণ কুন্দেন্দুসুন্দর এবং দেবতা শ্রীনারায়ণ। অনিত্যতা উপলব্ধি থেকে অবলম্বন করেই এই রস।

অনুভাব ও তনু ব্যভিচার হচ্ছে স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, অশ্রু। মন-ব্যভিচার হচ্ছে নির্বেদ, হর্ষ, স্মৃতি, মতি, ধৃতি, নিদ্রা প্রভৃতি।

নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার গর্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক—এই ব্যভিচারী ভাবগুলির উৎস ও লক্ষণ সম্পর্কে নৃত্যশিল্পীদের বিশেষ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

নির্বেদ : আপদ, ঈর্ষ্যা, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির ফলে যে আত্মাবমাননা, তাকে নির্বেদ বলে। এর থেকে দৈন্য, চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বিবর্ণতা, উৎ-শ্বাস প্রভৃতি তনু-ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়।

আবেগ : আবেগ অর্থে সাধারণভাবে ব্যস্ততা বোঝায়। বিভিন্ন আবেগে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন বৃষ্টিজাত আবেগে দেহ কুঁকড়ে যায়, আবার অগ্নিজাত আবেগে আসে বিহ্বলতা। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেলে যেমন আসে আনন্দ আবার না পেলে শোক। এর তনু-ব্যভিচার অসংখ্য।

দৈন্য : দুর্দশার জন্যে যে নিস্তেজভাব, তাকে দৈন্য বলে। দৈন্য মলিনতা প্রভৃতি তনু ব্যভিচার সৃষ্টি করে।

শ্রম : দীর্ঘ পথ ভ্রমণ, রতিক্রিয়া প্রভৃতির ফলে যে ক্লান্তি আসে তাকে শ্রম বলে। ঘন ঘন শ্বাস, নিদ্রা প্রভৃতি তনু-ব্যাভিচার শ্রম সৃষ্টি করে।

মদ : মদ্যপানজনিত প্রভাব ও আনন্দের সংমিশ্রণে যে অবস্থা তাকে মদ বলা হয়। এর থেকে স্তম্ভ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি তনু-ব্যভিচার সৃষ্টি হয়।

জড়তা : আকাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা অকল্পনীয় কিছু হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হলে যে কর্তব্যবিমূঢ়তা আসে তাকে জড়তা বলে। এর থেকে নির্নিমেষ নিরীক্ষণ, স্তব্ধতা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

উগ্রতা ঃ বীরত্ব অথবা অন্যায় আচরণ প্রভৃতির জন্যে মেজাজ খুব গরম হলে সেই অবস্থাকে উগ্রতা বলে। স্বেদ, শিরকম্পন, তর্জন, তাড়ন প্রভৃতি এর ফলে সৃষ্ট হয়।

মোহ ঃ দুঃখ, শোক, আবেগ, ভয় ও অতিরিক্ত চিন্তার ফলে যে চিত্তবৈকল্য আসে তাকে মোহ বলে। এর থেকে ঘূর্ণমান চক্ষু, ভূমিতে পতন, ভ্রমণ, অচেতন ভাব প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

বিবোধ ঃ ঘুম ভেঙে যাবার পর চেতনার যে অবস্থা হয় তাকে বিবোধ বলে। এর ফলে হাইতোলা, আড়ামোড়া ভাঙা, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শয়নকক্ষের চার পাশ দেখা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

স্বপ্ন ঃ নিদ্রামগ্ন অবস্থায় মানুষের যে বিষয়ানুভূতি তাকে স্বপ্ন বলে। এর থেকে ক্রোধ, আবেগ, ভয়, গ্লানি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জন্মে।

অপস্মার ঃ গ্রহাদির প্রভাবে অথবা স্নায়ুবিকারজনিত রোগে মনের যে বিকলতা জন্মায় তাকে অপস্মার বলে। এর ফলে স্বেদ, স্তম্ভ, কম্পন প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

গর্ব ঃ বিদ্যা, রূপ, বংশকৌলিন্য প্রভৃতি থেকে যে অহঙ্কার জন্মে সেই মানসিক অবস্থাকে গর্ব বলে। এর ফলে বিনয়ের অভাব, অবজ্ঞা প্রদর্শন, উন্নাসিকতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

মরণ ঃ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে মরণ ঘটে। এর ফলে শীতলতা, কাঠিন্য, ভূমিতে পতন প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হয়।

আলস্য ঃ পরিশ্রম, গর্ভধারণ প্রভৃতির ফলে যে জড়তা দেখা যায় তাকে আলস্য বলে। এর ফলে হাইওঠা, বসেথাকা, নিদ্রাবেশ প্রভৃতি অবস্থার উদ্ভব হয়।

অমর্ষ ঃ অপমান, আক্ষেপ, নিন্দা প্রভৃতির ফলে মনের যে অভিনিবিষ্টতা তাকে অমর্ষ বলে। এর থেকে শিরঃকম্পন, ভ্রূকুঞ্চন, শাসন, তাড়ন, রক্তবর্ণচক্ষু প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

নিদ্রা ঃ অবসাদ, পরিশ্রম, মদমত্ততা প্রভৃতির ফলে মনের যে নিষ্ক্রিয় অবস্থা আসে তাকে নিদ্রা বলে। উৎশ্বাস, আলস্য, হাইতোলা প্রভৃতি অবস্থা এর থেকে সৃষ্ট হয়।

অবহিত্থা ঃ লজ্জা, গৌরব, ভয়, গুপ্তপ্রণয় প্রভৃতির ফলে আনন্দের ভাবটিকে গোপন করার প্রচেষ্টার ভাবকে অবহিত্থা বলে। এর ফলে ব্যস্ততা, হঠাৎ অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ, অস্ফুটকণ্ঠে কথা বলা, মাটির দিকে চেয়ে থাকা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঔৎসুক্য ঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলি না পাওয়ার ফলে কালক্ষেপজনিত যে অসহিষ্ণুতা ঘটে তাকে ঔৎসুক্য বলে। এর থেকে স্বেদ, ব্যস্ততা, দীর্ঘনিশ্বাস, চিত্ত-সন্তাপ প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

উন্মাদ ঃ কাম, ভয়, শোক প্রভৃতির কারণে যে চিত্ত-সম্মোহ জন্মে তাকে উন্মাদ বলা হয়। এর ফলে প্রলাপ, হাসি, কান্না প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

শঙ্কা ঃ নিজের ত্রুটি, শত্রুর ক্রূরতা প্রভৃতি থেকে বিপদের যে ভাবনা তাকে শঙ্কা বলে। বিবর্ণতা, কম্পন, স্বরবিকৃতি প্রভৃতি এর ফলে সৃষ্টি হয়।

স্মৃতি ঃ চিন্তা, কোনো কিছুর সাদৃশ্যবোধ প্রভৃতি কারণে পূর্বে অনুভূত বিষয় সম্পর্কে যে বোধ তাকে স্মৃতি বলে। ভ্রূ তোলা প্রভৃতি অবস্থা এর থেকে সৃষ্ট হয়।

মতি ঃ উচিত, অনুচিত বিবেচনা করে কোনো বিষয় নির্ধারণ করাকে মতি বলে। এর থেকে ধৈর্য, সন্তোষ, হাসি, নিজের উপব অত্যন্ত আস্থা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি করে।

ব্যাধি ঃ স্নায়বিক দর্বলতা, বাত প্রভৃতির ফলে জ্বর প্রভৃতি হলে তাকে ব্যাধি বলে। এর থেকে কম্পন, মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ত্রাস ঃ উল্কাপাত, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, প্রচণ্ড ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ত্রাস-এর উৎপত্তি হয়। কম্পন এর প্রধান অবস্থা।

ব্রীড়া ঃ ধৃষ্টতার অভাবকে ব্রীড়া বলে। মাথা নত করে থাকা এর প্রধান লক্ষণ।

হর্ষ ঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার ফলে যে মানসিক সন্তোষ তাকে হর্ষ বলে। অশ্রু, অস্ফুট গদগদভাব প্রভৃতি এর লক্ষণ।

অসূয়া ঃ অপরের গুণ, সমৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে অহংকারজনিত অসহিষ্ণুতাকে অসূয়া বলে। পরচর্চা, ভ্রূকুটি, অবজ্ঞা, ক্রোধভাব প্রভৃতি এর ফলে উদ্ভূত হয়।

বিষাদ ঃ কোনো বিষয় থেকে নিষ্কৃতির উপাযের অভাবজনিত উদ্যমহীনতাকে বিষাদ বলে। চিত্তসন্তাপ, উৎ-শ্বাস, দীর্ঘনিশ্বাস, সাহায্য, অন্বেষণ এর থেকে উদ্ভূত হয়।

ধৃতি ঃ জ্ঞানচর্চা, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আগমন প্রভৃতির ফলে কামনাচরিতার্থতাকে ধৃতি বলে। উল্লাস, সপ্রতিভতা, হাস্যময়তা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

চপলতা ঃ মাৎসর্য, অনুরাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অস্থিরতাকে চপলতা বলে। ভর্ৎসনা, স্বচ্ছন্দ আচরণ, লঘুতা, পরুষভাব প্রভৃতি এর লক্ষণ।

গ্লানি ঃ রতি, মনস্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, পরিশ্রম, প্রভৃতির ফলে উদ্ভূত নিষ্প্রাণতাকে গ্লানি বলে। কম্পন, বিবর্ণতা, কৃশতা, অবসাদ, উদ্যমহীনতা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

চিন্তা ঃ প্রয়োজনীয় এবং হিতকরবস্তু না পাওয়ার ফলে যে মানসিক ভাবনা তাকেই চিন্তা বলে। শূন্যতা, দীর্ঘনিশ্বাস, অন্তর্জালা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

বিতর্ক ঃ কোনো বিষয়ে মতের ঐক্য না হলে, সন্দেহ থাকলে হাত পা মাথা সঞ্চালন করে বিচার করাকে বিতর্ক বলে। ভ্রূকুঞ্চন, শির, হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতির সঞ্চালন এর লক্ষণ।

নাট্যশাস্ত্রের মতে মূলরস হচ্ছে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। এদের মূল ভাব থেকেই সকল ভাব জন্মগ্রহণ করে। শৃঙ্গার থেকে হাস্যের উৎপত্তি, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত ও বীভৎস থেকে ভয়ানক এর সৃষ্টি। করুণ, বীভৎস রৌদ্র, বীর ও ভয়ানকের সঙ্গে শৃঙ্গাররস বিরোধী। ভয়ানক ও করুণের সঙ্গে বিরোধী হাস্যরস। হাস্য ও শৃঙ্গারের বিরোধী করুণরস। হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানকরসের বিরোধী রৌদ্ররস। ভয়ানক ও শান্তরসের বিরোধী বীররস। এবং শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও ভয়ানকের বিরোধী শান্তরস। শৃঙ্গারের সঙ্গে বীভৎসের বিরোধিতা।

নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসেরই প্রাধান্য স্বীকৃত। পরবর্তীকালে সম্ভবত ভট্ট উদ্ভটই শান্ত (শম) কে স্বীকৃতি দিয়ে নব রস করেছেন। ধনঞ্জয়ের মতে নাটকে শমভাবের স্ফূর্তি ঘটে না (দশরূপক ৪।৩৫)। শারদাতনয়ের মতে অনুভাব নেই বলে নাট্যে শম অভিনেয় নয়, যেজন্য নাট্যের স্থায়ীভাবও আটটি (ভাব প্রকাশন-প্রথম অধ্যায়)। দশম একটি রসের কথাও পরবর্তীকালে পাওয়া যায়। মুনীন্দ্রের মতে দশম রস হচ্ছে বৎসল। ভোজদেবের শৃঙ্গারপ্রকাশেও বৎসলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কর্ণপূরের মতে বৎসলের স্থায়ীভাব মমকার।

বিভিন্ন ভাবের আভাস, উপশম, উদয়, সন্ধি ও মিশ্রণে এই রসনিষ্পত্তি নৃত্যকলা ও সকল শিল্পের আত্মা ও প্রাণ এবং সার্থকতার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ, কারণ হিন্দু মনোবিজ্ঞানীরা অন্তঃকরণ বা মনকে মানুষ ও প্রাণীর নিয়ামক বলে মনে করেন।

পূর্বরঙ্গ

অন্যান্য মহৎ শিল্পের মতো নৃত্যকলারও অন্যতম উদ্দেশ্য মানবমনের অন্তর্নিহিত কল্পনাশক্তি ও ছন্দোবোধকে ক্রিয়াশীল করে তোলা। তাই শুধুমাত্র স্বাভাবিকতার দিকে বেশি জোর না দিয়ে, তার যথাযোগ্য ভাব বজায় রেখে, বিভিন্ন বিচিত্র পদ্ধতিতে ছন্দ সৃষ্টি করে দর্শকমনকে রঞ্জিত ও সরস করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

নাট্যদর্শকবৃন্দ যাতে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তিকে বাহ্য জগতের প্রভাব মুক্ত করে রসাস্বাদনের অনুকূল অবস্থায় আসতে পারেন সেজন্যে নাট্যারম্ভের প্রাক্কালে পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানের আয়োজন।

নাট্যশাস্ত্রমতে যেহেতু রঙ্গপ্রয়োগের এই অংশটি পূর্বেই প্রযুক্ত হয় তাই এর নাম পূর্বরঙ্গ। নৃত্যের সূচনার আগে যে নমস্কারক্রিয়া, যাকে পুষ্পাঞ্জলি বলা হয় তাও পূর্বরঙ্গ। অভিনয়দর্পণে এই প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা আছে তা উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"বিঘ্নানাং নাশনং কর্তুং ভূতানাং রক্ষণায় চ।
দেবানাং তুষ্টয়ে চাপি প্রেক্ষকাণাং বিভূতয়ে॥
শ্রেয়সে নায়কস্যাত্র পাত্রসংরক্ষণায় চ।
আচার্যশিক্ষাসিদ্ধ্যর্থং পুষ্পাঞ্জলিমথারভেৎ॥
এবং কৃত্বা পূর্বরঙ্গং নৃত্যং কার্যং ততঃ পরম্।
নৃত্যং গীতাভিনয়নভাবতালযুতং ভবেৎ॥
আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ॥
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥"

বিঘ্ন নাশের জন্যে, প্রাণীগণের রক্ষাবিধানের জন্য, দেবতাদের তুষ্টির জন্যে, দর্শকবৃন্দের বিভূতিলাভের জন্যে, নায়কের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির জন্যে, পাত্রের রক্ষণের জন্যে ও গুরুপ্রদত্ত শিক্ষায় সিদ্ধিলাভের জন্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা কর্তব্য। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতেও নাট বস্তু প্রয়োগের পূর্বে রঙ্গবিঘ্নশান্তির জন্যে নটনটী, কুশীলবগণ যে অনুষ্ঠানটি করেন তাই পূর্বরঙ্গ। আবার উপরোক্ত শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে যে নৃত্যের আনুষঙ্গিক অন্তর্ছন্দের সাহায্যে রূপদান করার জন্য পূর্বরঙ্গে শোভাসম্পাদক নৃত্যের বিধি ছিল। এই নৃত্য-গীত ও অভিনয় ভাব ও তালযুক্ত। বদনের মাধ্যমে গীতের অবলম্বন, হস্তের দ্বারা গীতের অর্থ প্রদর্শন, নয়নে ভাব প্রকাশ এবং পদদ্বয়ে তালরক্ষা। আবার যেখানে হস্ত, সেখানেই নয়ন এবং যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি এবং যেখানে মন সেখানেই ভাব আর যেখানে ভাব সেখানেই রস।

যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে তার সঙ্গে পূর্বরঙ্গের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। পূর্বরঙ্গের সাহায্যে আবহপরিমণ্ডলের সৃষ্টি করা হত। এককথায় পূর্বরঙ্গ দর্শকবৃন্দের রঞ্জনের পূর্বকৃত্যের আয়োজন। এই পর্যায়ে অভিনয় আরম্ভের আগে গীত, তাল, নৃত্য, পাঠ্য প্রভৃতির ব্যস্ত বা সমস্তভাবে যে প্রয়োগ তাই হচ্ছে পূর্বরঙ্গ।

নাট্যশাস্ত্রের মতে পূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গ। এদের মধ্যে প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ আশ্রাবনা, বক্ত্রপানি, পরিঘট্টনা, পরিবন্দনা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসরিত বা আসারিতক্রিয়া—এই ন-টি যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয়। গীতক, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত ও প্ররোচনা- এই দশটি যবনিকা উত্তোলিত করে বাইরে অনুষ্ঠিত হয়।

এই পূর্বরঙ্গ আবার চতুরস্র, ত্র্যস্র, চিত্র ও শুদ্ধ—এই চার পর্যায়ে বিভক্ত। পূর্বরঙ্গের 'গীতক' অংশ হচ্ছে গীতবিধি, এর বিষয় হচ্ছে দেবস্তুতিকীর্তন, এই গীত অঙ্গসঞ্চালন বাদ দিয়ে প্রয়োগ হলে সেটা হচ্ছে শুদ্ধপূর্বরঙ্গ আর যদি নৃত্য সংমিশ্রিত হয়ে প্রযুক্ত হয় তাহলে সেটা হবে চিত্রপূর্বরঙ্গ। উদ্ধতপূর্বরঙ্গে মহাদেব প্রবর্তিত উদ্ধতকরণ ও অঙ্গহারের প্রয়োগ হয় এবং সুকুমারপূর্বরঙ্গে পার্বতী প্রবর্তিত সুকুমার অঙ্গহার ও করণ অর্থাৎ লাস্যভঙ্গীর প্রয়োগ হয়।

'জর্জর' দণ্ড হাতে নৃত্যের পর মহাচারী নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষে সূত্রধার সর্বশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিগত পর্যায়ে অভিনয়ারম্ভের সূচনা করতেন।

দর্শকবৃন্দের কল্পনাকে ক্রিয়াশীল করে তুলে রস উদ্বোধনের এই প্রক্রিয়া 'পূর্বরঙ্গ' ভারতীয় নাট্যকলার এক অভিনব প্রকাশ।

। পূর্বরঙ্গবিধি ।

পূর্বরঙ্গ	যবনিকার অন্তরালে প্রযোজ্য	যবনিকার বাহিরে প্রযোজ্য
(ক) চতুরস্র (খ) ত্র্যস্র (গ) চিত্র (ঘ শুদ্ধ (ঙ) মিশ্র	প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিবন্দনা বা পরিঘট্টনা, সঙ্ঘোটনা বা সঙ্খোটনা, মার্গাসারিত ও আসারিত ক্রিয়াসমূহ।	গীতক (বর্ধমানাদি গীত বিধি), উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা (ধ্রুবা) রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত ও প্ররোচনা।

। নবরস ।

সংখ্যা	রস	ভাব	বর্ণ	অধিদেবতা
১	শৃঙ্গার	রতি	শ্যাম	বিষ্ণু
২	হাস্য	হাস	শুক্ল	প্রমথ
৩	করুণ	শোক	কপোত	যম
৪	রৌদ্র	ক্রোধ	রক্ত	রুদ্র
৫	বীর	উৎসাহ	হেম	মহেন্দ্র
৬	ভয়ানক	ভয়	কৃষ্ণ	কাল
৭	বীভৎস	জুগুপ্সা	নীল	মহাকাল
৮	অদ্ভুত	বিস্ময়	পীত	ব্রহ্মা
৯	শান্ত	শম	কুন্দেন্দু-সুন্দর	শ্রীনারায়ণ

নৃত্যতত্ত্ব

নৃত্যকলা মানব জীবনের প্রাচীনতম শিল্প। আদিতে নৃত্যবিকশিত হয়েছে দুই পথে। প্রথম—আদিম গোষ্ঠীর আনন্দ-অভিব্যক্তির উপায় রূপে। দ্বিতীয়—ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে শাস্ত্র রচিত হয়েছে অনেক পরে, কারণ আগে শিল্পী ও তাঁর সৃষ্টি পরে শিল্প-শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার। শাস্ত্রের জন্যে তো শিল্প সৃষ্টি হয় না, শিল্পের জন্যেই শাস্ত্র গড়ে ওঠে।

শিল্প ও সুন্দরের অনুসন্ধিৎসা অন্তহীন। মানুষ এখনও বিচিত্র রূপলীলার মাঝে অপরূপের সন্ধান করে চলেছে। এই অনুসন্ধিৎসার পথ ধরেই যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষী শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও অনুসিদ্ধান্ত সৃষ্টি করেছেন।

প্রাণী ও মানুষের মধ্যে চেতনার এমন একটি গুণগত পার্থক্য ঘটেছে যার অভাবে প্রাণীরা বাক্‌শক্তিহীন এবং সদ্ভাবে মানুষ বাক্‌শক্তির অধিকারী। প্রাণীরা যেখানে নিছক প্রাণের দায় মিটিয়েই ক্ষান্ত, মানুষকে সেখানে একই সঙ্গে প্রাণ ও মনের দায় মেটাতে হয়। জৈবিক আনন্দের জন্যে প্রাণী যৌথ জীবন যাপন করে কিন্তু মনের আনন্দে মানুষ 'সামাজিক' জীবন গড়ে তোলে। তাই প্রাণীর পরিবেশ প্রাকৃতিক কিন্তু মানুষকে জীবন যাপনের জন্যে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশ গড়তে হয়। এজন্যই মানুষকে বিভিন্ন মানসিকবৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি প্রভৃতির চাহিদা পরিপূর্ণ করতে হয়। শিল্প এই সজ্ঞান মনেরই সৃষ্টি।

ধর্মেই কর্মের উৎপত্তি। কর্মের প্রকৃতি জানতে গেলেই ধর্মের স্বরূপ জানতে হবে, অর্থাৎ মানুষের ধর্মের বিশেষত্ব বুঝতে হবে। দর্শনকে বাদ দিয়ে ধর্মালোচনা সম্ভব নয় তাই শিল্পতত্ত্বের আলোচনাতে তাত্ত্বিকরা প্রথমে দর্শন বন্দনা করেছেন। সকল তাত্ত্বিক-শিল্পকে সৌন্দর্যতত্ত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন শিল্প আনন্দতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব। এঁরা বিশ্বাস করেন শিল্পের জন্ম আনন্দ থেকে। আনন্দ দেওয়াই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এঁদের কাছে—আনন্দই পরমার্থিক, সৌন্দর্য আনুষঙ্গিক। আনন্দের সুষ্ঠু প্রকাশেই সুন্দরের জন্ম—যা আনন্দ দেয় তাই সুন্দর।

অপর একদল যাঁরা ভাববাদী বা রসবাদী এঁদের কাছে শিল্পতত্ত্ব—'রসতত্ত্ব' 'Expression of feeling'-'ভাব' এর প্রকাশ। ভাবকে রূপ দেওয়াই শিল্পের বিশেষত্ব বলে এঁরা দাবী করেন। ভাব প্রকাশের প্রেরণাতেই শিল্পের জন্ম। ভাবকে আস্বাদ্য করে তোলাই শিল্পের উদ্দেশ্য, রূপ রসাত্মক হয়েই 'সুন্দর' হয়, 'আনন্দ'-দায়ক হয়। সৌন্দর্য বা আনন্দ আনুষঙ্গিক, রসই পরমার্থিক।

তৃতীয়দল-এর মতে শিল্প 'সৌন্দর্য' 'আনন্দ' বা 'রস' কোনও তত্ত্বই নয়, শিল্প হচ্ছে প্রকাশতত্ত্ব Science of expression of General Linguistic (ক্রোচে) 'প্রকাশবিজ্ঞান' কল্পনাতত্ত্ব। তাঁদের মতে সৌন্দর্য, আনন্দ বা রস কল্পনারই আনুষঙ্গিক ফল। এঁরা বলেন—'শিল্পের প্রেরণা—আমার প্রকাশবৃত্তির মধ্যে, জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে।

শিল্প এক প্রকার জ্ঞান—কল্পনাত্মক জ্ঞান। বিশেষকে ভাবে জানার প্রেরণা থেকেই শিল্পের জন্ম। কল্পনাই শিল্পের আত্মা এবং তাকে চরিতার্থ করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। যা সুপরিকল্পিত, সুমিত, সুপ্রকাশিত—তাই সুন্দর, তাই আনন্দদায়ক। অতএব সৌন্দর্য, আনন্দ, রস—এ সমস্তই কল্পনা ব্যাপারের আনুষঙ্গিক—গৌণ। অর্থাৎ শিল্প মুখ্যত সৌন্দর্যবোধের বা আনন্দবোধের বা রসবোধের অভিব্যক্তি নয়, শিল্পে ব্যক্ত হয় মানুষের জ্ঞানেরই আবেগ 'Spiritual activity' কল্পনাশ্রয়ী জ্ঞানের রূপ। এঁদের মতে শিল্প হচ্ছে "Imaginative knowledge'—'Intution'—'Expression'।

গ্রীক ঈস্থেটিক শব্দের অর্থ—'Sense preception'—ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। বাংলায় অনেকে একে বলেন বীক্ষণতত্ত্ব—বীক্ষণশাস্ত্র। এঁরা মনে করেন—শিল্প হচ্ছে বিশেষ জাতীয় বীক্ষণ—'Art is Expression'—'Expression of hightend experience'। প্রতিভাবাদীর কাছে যেখানে—'Art is Expression বা Intution, বীক্ষণবাদীদের কাছে সেখানে Art is 'Experience'।

মনীষী টলস্টয়ের মতে শিল্পতত্ত্ব—'Art is human activity consisting in this that one man consciously by means of certain signs lianes on to other feelings he has lived through, and that others are, infected by these feelings and also expeirence them'.

ভাববাদী বা অ্যারিস্টটলের অনুকরণ বা নির্ণিতবাদ থেকে আরম্ভ করে সৌন্দর্যবাদ, আনন্দবাদ, রসবাদ, প্রকাশবাদ, বীক্ষণবাদ প্রভৃতি মতবাদী আছেন—সকলেই (অ্যারিস্টটলের 'ক্যাথারসিস্'-তত্ত্ব এবং রসবাদ ব্যতিক্রম) মানুষকে যতটা ব্যক্তি হিসাবে দেখেছেন ততটা 'সামাজিক জীব' হিসাবে দেখেন নি—কিন্তু মনীষী টলস্টয় শিল্পকে সামাজিক মানুষের কাছে সামাজিক মানুষের ভাবসঞ্চারের উপায় হিসাবে দেখেছেন—

'Art is not, as the metaphysician say, the manifestation of some mysterious Idea of Beauty of God ; it is not as the aesthetic physiologists say, a game in which man lets off his excess of stored up energy, it is not the expression of man's emotions by external signs ; it is not the production of pleasing objects, and above all it is not pleasure ; but it is a means of union among men joining them together in the same feeling and indispensable for the life and progress towards well being of individuals and af humanity'.—"What is Art". p. 123.

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যের স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে ভরত বার বার অনুকরণ, অনুদর্শক, অনুকীর্তন শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেমন,

"ত্রৈলোক্যস্যাস্য, সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্"...

"লোকস্য সর্বহকমনুদর্শকম্"—"লোকবৃত্তানুকরণম্ নাট্যম।"

তারপর চিত্রসূত্রেও আছে—

"যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতঃ।" 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা' গ্রন্থে

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন—'অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় চিত্র পদ্ধতিতে প্রকৃতের অনুকরণের কোনও ধারণা ছিল না, কিন্তু একথা ঠিক নহে। চিত্র এবং নৃত্য এই উভয়কেই তাঁহারা একজাতীয় মনে করতেন এবং এই উভয়কেই তাঁহারা প্রকৃতি অনুকরণ বলিয়া মনে করতেন। নৃত্যের উৎপত্তি বিষয়ে বলিতে গিয়া বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে প্রলয়ের সময় ভগবান নারায়ণ বেদোদ্ধারের জন্য যে অনন্ত জলাশয়ে বিবিধ ভঙ্গীতে চংক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার সেই স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতেই নৃত্যের উৎপত্তি। বোধহয় তাৎপর্য এই যে, যে সাবলীল প্রাণের ক্রিয়াতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিবৃত রহিয়াছে সেই প্রাণ পরিস্পন্দন ব্যাপারেই ত্রৈলোক্যের স্বরূপ এবং সেই প্রাণ ব্যাপারের অনুকরণ। এই জন্যই নৃত্য এবং চিত্র উভয়কেই ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।"—(পৃঃ ১৯)

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কাছে—

ক. আইডিয়াই সত্য (essence) এবং আইডিয়ারই নিত্যসত্তা (existence) আছে।

খ. বিশেষবস্তুর প্রকৃত বাস্তবতা বা নিত্যতা নেই—আছে সত্তাভাস (semblance of existence)।

গ. প্রত্যেক বিষয়বস্তুর একটি এবং একটি মাত্রই ঈশ্বরকৃত আদর্শরূপ আছে। এই রূপকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক'। এই শিল্পের স্রষ্টা ঈশ্বর।

ঘ. দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে—কারুকর্মীদের নানা কর্ম। এই সব বস্তুর নিত্যতা নেই, শুধু সত্তাভাসই আছে।

ঙ. তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে—শিল্পীরা, অনুকারীর দল, যারা অন্যের গড়াবস্তুর প্রতিমা নির্মাণ করেন। ভাস্কর, চিত্রকর, মহাকাব্যকার, নাট্যকার সকলেই অনুকারী, সকলেরই সৃষ্টবস্তু অনুকৃতি রচনা করে।

প্লেটো আরও বলেছেন—১. শিল্পসৃষ্টি দৈবপ্রেরণার আবেশের মতো একটা আবেশের অবস্থায় সম্ভব, ২. আবেশবিভোর অবস্থার অর্থ আবেগোদ্দীপিত অবস্থা, এই অবস্থায় বিচার বিকল্প নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কবিতা বুদ্ধি বা যুক্তির সৃষ্টি নয় আবেগের সৃষ্টি। লক্ষণীয় এই যে তত্ত্ব বুদ্ধিসাধ্য ও গ্রাহ্য কিন্তু কাব্য অনুভবসাধ্য হৃদয় সংবেদ্য। শাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের এখানেই পার্থক্য।

Idea-বাদী প্লেটো বলেছেন—(ক) অনুকরণ সত্য থেকে তিনধাপ দূরে। (খ) 'Idea'-কে তথা সত্যকে পাওয়া যায় শুধু যুক্তির (Reason) মধ্যেই; (গ) শিল্প যেহেতু অনুকৃতির অনুকৃতি—Idea নয়, শিল্পের জগৎ তাই মিথ্যার বা মায়ার জগৎ, (ঘ) শিল্প বুদ্ধির সৃষ্টি নয় আবেগের সৃষ্টি—'Image making'.

দৈবপ্রেরণাবাদী প্লেটো কিন্তু শিল্প সম্পর্কে এ কথাও বলেছেন যে—শিল্প-ভাবাবেগের—ভাবাবেগের সৃষ্টি হলেও শিল্পের আত্মা "Speak the truth"—অর্থাৎ শিল্পে নৈতিকতার কথাটাও তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি।

প্লেটোর যদিও 'Idea'-ই সত্য সার্বিক সংজ্ঞাই বাস্তব বলেছেন কিন্তু শিষ্য এ্যারিস্টটল সেখানে বলেছেন 'Idea' বা সার্বিক সংজ্ঞা নামমাত্র, বাস্তব হচ্ছে বিশেষ—'বিশেষ'ই সত্য। প্লেটো Universal-কে কিন্তু এ্যারিস্টটল 'Particular'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস গ্রন্থে শিল্পের প্রকৃতি ও প্রসার সম্পর্কে বলতে গিয়ে

সমস্ত জিনিসকেই অনুকরণের নানা উপায় বলেছেন। এদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য তিনটি বিষয়ে—অনুকরণের মাধ্যম, অনুকরণের বিষয়, এবং অনুকরণের রীতি। তাঁর মতে শিল্পের সামান্য লক্ষণ—'মাইমেসিস'। ভাস্কর্য, চিত্র, নৃত্য, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পের বিভিন্ন প্রজাতি।

প্লেটো শিল্পকে দৈবানুপ্রেরণা মনে করলেও এ্যারিস্টটলের মতে শিল্পের প্রেরণা মানুষের সহজাত দুটি প্রবৃত্তিতেই বিদ্যমান—প্রথম-'অনুচিকীর্ষা' (Instinct of Imitation) দ্বিতীয়—মানুষের মধ্যেই আছে "Instinct of harmony and rhythm" —ছন্দ ও সুষমা বোধ। এরই পরিশীলিত ও পরিণত অবস্থা থেকে শিল্পের উৎপত্তি। সুষমা ও ছন্দচেতনা বোধক্রিয়ারই আনুষঙ্গিক সংস্কার। অঙ্গবিন্যাসে যে দৈহিক সুষমা সৃষ্টি হয় তার নাম 'হারমনি' এবং গতিলয়ের কাল মাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে যে সুষমার সৃষ্টি হয় তার নাম ছন্দ। এই ছন্দ ও সুষমা বোধ রূপচেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

শিল্পের তত্ত্ব বা সূত্রগুলি মোটামুটি এই রূপে বিভক্ত।

এখন আলোচ্য বিষয় নৃত্যের সঙ্গে এই সূত্রের সংযোগ কোথায়—আমরা দেখছি এ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস্-এ বলেছেন—

'In Dancing, rhythm alone is used without 'harmony', for even dancing imitates character emotion, and action, and action by rhythmical movement.'

নৃত্য—দেহের ছন্দে "ক্রিয়া, আবেগ ও চরিত্রের" অনুকরণ। যদিও নাটক ও নৃত্যে ঐ অনুকরণের পার্থক্য বিদ্যমান। নৃত্য ভাবাশ্রয়, নাটক রসাশ্রয়। আর নৃত্যের সঙ্গে নৃত্তের পার্থক্য হল—"নৃত্য ভাবাশ্রয়" আর নৃত্ত "তাললয়াশ্রয়।". নৃত্যে আমরা তাল, লয় রস ও সর্বোপরি ভাব সবকিছুকেই মিশ্রভাবে পাই। নাটকে পাই বাক্যার্থাভিনয়। এবং নৃত্তে দেখি তাললয়েরই প্রাধান্য। নৃত্যে শিল্পী নিজে দেহভঙ্গিতে চিত্রকল্প রচনা করে ভাবাবেগকে বিভিন্ন ছন্দে ছন্দায়িত করে অভিনয়ের মাধ্যমে তাকে শরীরী করে তোলে। নাটকে বাচনভঙ্গিই প্রধান, নৃত্তে বা নৃত্যে কিন্তু দেহভঙ্গির প্রাধান্য। নৃত্তে বা নৃত্যে rhythmical movement চাই। শিল্পের ক্ষেত্রে একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে এখানে উপস্থাপনায় শিল্পী শুধুমাত্র 'বিষয়'কে উপস্থাপিত করার মধ্যেই সীমিত থাকবে না। উপস্থাপনার রীতিটিকেও মূল্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রথম ক্ষেত্রে উপস্থাপ্য 'পদার্থ" দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপস্থাপ্য 'আঙ্গিক-কৌশল'-এর বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের নৈপুণ্য। কিন্তু 'কমসু কৌশলম' দেখানো কখনই শিল্পীর কাজ নয়। নৃত্যে ভাবের সংগীত বাজাতে গিয়ে যদি ভাবকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র দেহভঙ্গ, গ্রীবাভঙ্গ, করমুদ্রা, পদসঞ্চালন প্রভৃতি প্রধান হয়ে ওঠে, তখন কিন্তু তাকে সার্থক শিল্প বলব না। সার্থক শিল্প হয়ে ওঠার জন্যে নৃত্ত ও নৃত্য উভয়েরই সুষম সংযোজন প্রয়োজন।

নৃত্যকলা মূলত প্রয়োগ নির্ভর। অন্য শিল্পের মতো এর আবেদনও একই সংগে আত্মগত ও সমষ্টিগত। রূপসৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার অন্তর্লোকে এবং অন্তে দ্রষ্টার রস-দৃষ্টিতে এর স্থিতি এবং গতি। শুধুমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য নয় কারণ এর মুখ্য আবেদন মানসচৈতন্যের নিকট। মানসজ ও ইন্দ্রিয়জ এই দুই ক্রিয়ার সুষ্ঠু

সমন্বয়ের উপরেই এর সার্থকতা নির্ভরশীল।

নৃত্য ভাবকে বর্জন করে বিশুদ্ধরূপ আকারে প্রযুক্ত হলে তা হয় নৃত্ত। আবার ভাবের বাহন হিসাবে নৃত্য তার বিমূর্ততা অর্থাৎ কেবল মাত্র বিশুদ্ধ দেহভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল শিল্পবস্তু হিসাবে ইন্দ্রিয়জ নিছক আনন্দ দানের পরিবর্তে মানসজ ও ইন্দ্রিয়জ ক্রিয়ার সুষম সমন্বয়ে মন্ময় হয়ে উঠতে পারে।

কলাকৈবল্যবাদীদের মতে form বা রীতিই শিল্পের একমাত্র বিষয়। শিল্পের আদি, মধ্য ও অন্তে এই Form ই বিরাজ করে। এঁরা বলেন রূপের মূল্য ছাড়া শিল্পের অন্য কোনও মূল্য নেই।

নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এই কলাকৈবল্যবাদকে একটি প্রধান স্থান দিতে হবে। কারণ শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে ভাবকে ব্যক্ত করলে তাকে 'মাইম' বলা যায়, তা নৃত্য বা নৃত্ত হয় না। বিভিন্ন নৃত্ত ছকের মাধ্যমে মাইমের স্তরকে অতিক্রম করে নৃত্যকলার রূপকল্প ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সৌন্দর্য তা কি শুধুমাত্র বস্তুনির্ভর। সৌন্দর্য বস্তুর গুণ না ভাবের সম্পদ। বস্তু তার নিজস্ব প্রকাশে শুধু একটি অস্তিত্ব। সে তখনই সুন্দর যখন তার উপর সৌন্দর্য পিপাসুর চেতনার রং লাগে। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের:— 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ চুনি উঠল রাঙা হয়ে / আমি চোখ মেললুম আকাশে / জ্বলে উঠল আলো। পূর্বে পশ্চিমে। / গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর / সুন্দর হল সে।'—এখানেও সেই ব্যক্তি-চৈতন্য।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধ প্রসঙ্গে বলেছেন:—'ছবি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি আনাড়ি সে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রং-চং বা গোলগাল আকৃতি দেখলেই খুশি হইয়া ওঠে। ছবিকে সে বড়ো ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না। এখানে তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে এমন কোনো উচ্চতর বিচার বুদ্ধি নাই। গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহ্বান করে তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়ে বসে। যে ব্যক্তি সমঝদার ছবিতে, সে ছবিতে একটা রং-চং-এর ঘটা দেখলেই তদ্গতভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখ্যের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারিপাশের, সম্মুখের সঙ্গে পিছনের সামঞ্জস্য খুঁজতে থাকে। রং-চং-এ চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীরভাবে দেখিতে হয় এই জন্য তাহার আনন্দ গভীরতর।'

নৃত্যকলার বিচারের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। কারণ নৃত্যকে শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন হলেই চলবে না, তাকে সুন্দর হতে হবে। সুন্দর শুধুমাত্র চোখের সুখ নয়, ধ্যানের ধন।

প্রসঙ্গতঃ কথক নৃত্য ও ভরতনাট্যম নৃত্যের কথা বলা যেতে পারে। কথক নৃত্যের তাল লয় সমন্বিত পাদকর্মের চটুল চাতুর্য সহজেই দর্শকের মন ভোলায়। কিন্তু ভরত-নাট্যমের ভাবরাগ সমন্বিত অনন্ত সুষমা দর্শকচিত্তের অন্তর্নিহিত গভীরতাকে নাড়া দেয়।

ধর্ম সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে নৃত্যের বিকাশ থেকে নৃত্যের প্রেরণায় ধর্মের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এ শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, প্রাচীন মিশর ও গ্রীসেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটো বলেছেন: 'The Dance, of all the arts,

is the one that—most influences the soul. Dancing is divine in its nature and is the gift of God.' আমাদের শিল্প সম্পর্কে ঐতরেয়ের বক্তব্য ঃ

'শিল্পীরা তাদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেব-শিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এই ভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পারবেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্প সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন।'

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ থেকে শিল্প সম্পর্কে সে যুগের চিন্তা যে কত মহৎ তা জানতে পারা যায়। জীবন দর্শন সম্পর্কে সুস্থ, স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভংগী ছিল বলেই সেই প্রাচীন যুগে কথিত শিল্পতত্ত্ব পরবর্তীকালে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন নন্দন-তাত্ত্বিকের গবেষণায় প্রতিভাত হয়েছে বিভিন্নভাবে।

শিল্পকলা সমাজনির্ভর। কলাকৈবল্যবাদীরা কলাকর্ষণের প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'আর্টের জন্যেই আর্ট'—অন্য কোনো দায়ভাগ এর নেই। কিন্তু শিল্পতত্ত্ব-এর বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিল্পমাত্রই উদ্দেশ্যযুক্ত এবং তার পরিণতি প্রাপ্তিতেই শিল্পের কৈবল্যসিদ্ধি। সুন্দর, আনন্দ যাই আমরা কল্পনা করি না কেন, আসল কথা জনজীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করাই শিল্পের লক্ষ্য। নৃত্যকলা বা যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র আপাত মাধুর্যকে নয়, পরিণামরমণীয়তাকে অবলম্বন করাই কর্তব্য।

শিল্পসৃষ্টির মূলকথা রসসৃষ্টি। জীবনকে বাদ দিয়ে 'রসনিষ্পত্তি'। শিল্প ও সাহিত্য জীবনের মধ্য দিয়েই জীবনসত্যকে প্রকাশ করে।

শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে এত যে বাদ বিসংবাদ তার কারণ—(১) মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যের একটিকে একমাত্র করে তোলা, (২) আনন্দকে প্রয়োজন নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হিসাবে দেখা। (৩) জীবনের রূপ বলতে কী বোঝায় তা উপলব্ধি করতে না পারা।

অনেকে মনে করেন প্রকাশ যেন একটি বিষয়নিরপেক্ষ ব্যাপার। এ যেন বিষয়ের প্রকাশ নয়, বিষয় না থাকলেও যেন মহৎ প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু প্রকাশের মহিমাই যে বিষয়বস্তুকে সু-প্রকাশিত, সুব্যক্ত করবে একথা রূপবাদী বা কলাকৈবল্যবাদীরা স্বীকার করেন না। মহৎ প্রকাশ বলে আজ পর্যন্ত যা কিছু শিল্প সৃষ্টি স্বীকৃত হয়েছে, তাতে বিষয়ের মহিমা প্রকাশ করেই প্রকাশ আপন মহত্ত্ব অর্জন করেছে।

শিল্পসৃষ্টিতে আপেক্ষবাদীরা সব সময়েই রূপ থেকে অনুরূপ সৃষ্টি করেন, নিজের ধ্যানাধৃত রূপের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁরা শিল্পসৃষ্টি করেন। ধরা যাক এঁরা যদি কালিদাসের 'শকুন্তলা'-কে নৃত্যে রূপ দেন, তাহলে শিল্পীর মনে চিরকাল ধরে শকুন্তলার যে রূপটি আঁকা আছে, তিনি কখনই তার বাইরে যাবেন না। শিল্পীর Image-এ যে শকুন্তলা তারই রূপ সৃষ্টি হবে। কিন্তু নিরপেক্ষবাদীদের কাছে এই শকুন্তলা কতখানি ললিত সুন্দর মূর্তিবৎ দেহভঙ্গিমা বা রূপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, ছন্দলালিত দেহ বিভঙ্গে কতখানি Organic Unity সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই হবে বিচারের মানদণ্ড।

দেখা যাচ্ছে সমস্যাটি form ও content-এর। কিন্তু প্রকাশ যখন সুন্দরের প্রকাশ, ঠিক তেমনই বিষয়ের প্রকাশ। দুটিই পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞানকে যুগলবন্দী হতে হবে। নীতিবিজ্ঞান মানুষের বিজ্ঞান, মানুষের শুভাশুভ বিচার করাই তার কাজ। শিল্পবিজ্ঞানও মানুষের বিজ্ঞান। শিল্পবোধ ও মনুষ্যত্ব অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ইতিহাসসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ সজ্ঞানে শিল্পচর্চা করে আসছে। শিল্প সৃষ্টি হয়েছে আগে। স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্যে পরে জন্ম হল নন্দনতত্ত্বের, সৃষ্টি হল মনোবিজ্ঞানের। শুরু হল কলাবিদ্যার যৌক্তিক বিশ্লেষণ। আজকের মতো প্রথানুগ ইসথেটিক্ চিন্তা নৃত্যসৃষ্টির প্রথম ও মধ্যযুগে হয়তো দুর্লভ ছিল, কিন্তু সৌন্দর্য সন্দর্শনের শৈল্পিক অনুভূতি এখানকার থেকে কিছু কম ছিল না। অবশ্য শিল্পের সম্পূর্ণতা জ্ঞান ও কর্মের দ্বৈতসংযোগে এ বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে নৃত্যকলার ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, শিল্পের এই সব বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে যত বিশ্লেষণ ও গবেষণামূলক নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এদেশে তা প্রায় বিরল। তার দায়ভাগ অবশ্যই এদেশের নৃত্যশিল্পীদের। কারণ অন্যান্য শিল্পের সহযাত্রীদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে আমরা নৃত্যশিল্পী ও স্রষ্টারা বুদ্ধিদীপ্ত সজ্ঞান মননসঞ্জাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। এ ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনা হিসাবে আমি একটি কথাই উদ্ধৃত করতে চাই: 'কালচক্রের অগ্রগতির সঙ্গে যিনি তাল মিলিয়ে চলতে না পারেন তাঁর শিল্পী জীবন নিরর্থক।'

দৃশ্যকাব্য কথাকলি

কেরলের সম্পদ কথাকলি নৃত্য। পশ্চিমে অনন্ত গর্জনশীল চিরসংক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগর উচ্চারণ করছে গতির মহামন্ত্র, আর পূর্বে নদীমালাশোভিত শ্যামলসুন্দর ধ্যানগম্ভীর পর্বতবিন্যস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া বনপ্রান্তর। কোমলে-কঠোরে মধুরে-ভয়ংকরে পূর্ণ-প্রাণ মালাবারের জনজীবনের সংস্কৃতির পূর্ণবিন্দু রূপায়িত হয়েছে কথাকলি নৃত্যে। প্রকৃতির মুক্ত লীলাভূমিতে যে সহজ সরল সাধারণ মানুষগুলি বাস করে ছোটবড় গ্রামগুলিতে, পাহাড়তলীতে, বনপ্রান্তরের আড়ালে আড়ালে কৃষ্ণচ্ছায়া নারিকেলকুঞ্জের মর্মরিত জীবনস্পন্দনের ছন্দে ছন্দে, তাদের স্বতস্ফূর্ত শিল্পীপ্রাণ সমস্ত সৌকুমার্য নিয়ে যেন লীলায়িত হয়েছে এই কথাকলি নৃত্যে।

কিংবদন্তী থেকে জানা যায় বিষ্ণুর অবতার ঋষি ভার্গব পরশুরাম কেরলরাজ্য সৃষ্টি করেন। মাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে তিনি গোকর্ণ থেকে তার কুঠার সবেগে নিক্ষেপ করলে তা ভারত মহাসাগরে পতিত হয়। যেখানে কুঠার পড়ে সেখান থেকে সমুদ্র সরে গিয়ে যে স্থলভাগের সৃষ্টি হয় তা তিনি মাতৃহত্যার পাপস্খলনের জন্যে ব্রাহ্মণদের দান করেন। এই কাহিনী সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূর্বতন দ্রাবিড় সভ্যতার অবদানকে অস্বীকার করার জন্যে রচিত হয়েছে।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই মালাবার উপকূলে গ্রীক, রোমান, ফিনিসীয়, আরব-দেশের বণিকদের বাণিজ্যসূত্রে যাতায়াত ছিল। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা মালাবার উপকূলেই অবতরণ করেন। খ্রীস্টধর্মের ভারতে প্রথম আবির্ভাবও মালাবারেই ঘটে। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সমন্বয়ে মালাবার বহির্জগতের সহিত যোগসূত্রের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে শ্রী ভরত আয়ার বলেছেন ঃ

'Thus the western sea-board of Malabar with its belt of sleepy lagoons remained for a long time the most conspicuous gate-way of India. Many strange influences filtered through. The cross of Christ was planted on Indian soil first in Malabar. According to local Christian tradition St. Thomas was the earliest evangelist to arrive ; and much of the missionary work of St. Xavier is also associated with this land, After the second sack of their temple at Jerusalem, the Jews, a much persecuted race, sought asylam at Mazuris. They too, like the early Christians, enjoyed the patronage and protection of the ruling chiefs. The sea-faring Arabs who come later, settled down in the coastal regions. The Muslims of Kerala known as Moplahs are said to be descended from these Arab traders, Thus the Jew, Christian and Muslim met here. In a mystic setting, as it were, of their new homeland they forgot old rivalries and for over a thousand

years they have lived side by side in amity and have ever been treated kindly by the sons of the land To-day they are an integral part of the society and inherit and share a common culture and way of life, unmistakably Malayali in tone and texture'. মালাবারের শিল্প-সংস্কৃতি আলোচনায় এই তত্ত্ব মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কেরলের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড় জাতীয়। পরে আর্য সভ্যতার প্রসার হয়। আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার মিশ্রণেই এখানকার শিল্প সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কথাকলি নৃত্য তার অন্যতম নিদর্শন। দীর্ঘকাল ধরে মালাবারে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরাই শাসনকার্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বারো বৎসর অন্তর মিলিত হয়ে চোল অথবা পাণ্ড্য বংশের কোনো রাজপুত্রকে রাজা নির্বাচিত করতেন। এই নির্বাচিত রাজা 'পেরুমল' নামে খ্যাত হলেন। পরবর্তীকালে নায়ার-সম্প্রদায়ের আধিপত্য দেখা যায়। অবশ্য নায়ার-সম্প্রদায় ও নাম্বুদ্রি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে মর্যাদার লড়াই হয়নি। কারণ নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণই সমাজে প্রধান নাগরিক হিসাবে সম্মানিত হতেন। এবং বংশের প্রথম সন্তান ছাড়া অন্যান্য সকলেই নায়ার-সম্প্রদায়ে বিবাহাদি করতে পারতেন। এর ফলে নাম্বুদ্রি ও নায়ার সম্প্রদায়ের সামাজিক যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয়। নাম্বুদ্রি-সম্প্রদায় অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সংস্কৃতচর্চার অনুরাগী ছিলেন। ভগবতী বা দুর্গার উপাসনা, তান্ত্রিক আচার, সর্পপূজা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। কবিতার প্রতি অনুরাগ মালয়ালী সম্প্রদায়ের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কবিতা পাঠের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

কেরলে প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্য ও নাট্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমারোহ দেখা যায়। তার মধ্যে 'মুতিয়েটু'-কে প্রাচীনতম বলা যায়। এ হল বিজয়োৎসবসূচক নৃত্য। ভগবতী কর্তৃক দারিকাসুর বধের আখ্যান নিয়ে এর নৃত্যাংশ অভিনীত হত। 'চাক্কিয়ার কুথুর' কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাক্কিয়ার হচ্ছে অভিনেতা ও কথক-সম্প্রদায়। এরা পুরাণে বর্ণিত 'সূত' সম্প্রদায়ের বংশধর বলে নিজেদের দাবী করত। চাক্কিয়ারদের অম্বলাবাসী গোষ্ঠীর অর্থাৎ নাম্বুদ্রি ও নায়ার-সম্প্রদায়ের অন্তবর্তী গোষ্ঠী মনে করা হত। এরা মন্দিরে,বাস করত। কথিত আছে নাম্বুদ্রি-সম্প্রদায়ের কোনো স্ত্রীলোককে অসতী বলে মনে করা হলে ব্রাহ্মণেরা তার বিচার করতেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে জাতিচ্যুত করা হত। এ সময়ে তার পুত্রসন্তান হলে তাকে চাক্কিয়ার এবং কন্যাসন্তান হলে তাকে নাঙ্গিয়ার বলা হত। এইভাবে চাক্কিয়ার-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই সন্তানরা সমাজে স্বীকৃত হত, তাদের কোন শাস্তি হত না। তারা নটবৃত্তি গ্রহণ করত। বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ 'শিলপ্পদিকারম্'-এ চাক্কিয়ার-এর উল্লেখ আছে। 'শিলপ্পদিকারম্' একটি তামিল মহা কাব্য, রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল। এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় নৃত্য গীত ও বাদ্যের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রী আয়ারের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য:

'The Chakkyars, it seems, were practising their dramatic art in the early centuries of the christian era. This is evident from a reference in the Silappadhikaram a Tamil classic whose date is assigned to the 2nd century A. D. (?). A Chakkyar from parur near Tiruvancikulam where

it is believed the poem was composed, is mentioned as having executed a Siva Tandava dance before king Cenguttuvan while he was encamped at the Nilgiris. The description of this dance resembles in a remarkeble way the theme of a Kangra painting which Dr. Coomaraswamy has reproduced in his Indian Drawings, where the Mula-prakriti or Parvati the consort of Siva is depicted as seated looking at her form in a mirror as if absolutely unaffected by the cosmic dance. The Silappadhikaram descibes the dance as follows : when Siva danced, his anklets jingled, the damrru (drum) in his quick moving hands sounded, his red eyes reflected a thousand indications (moods, ideas) and his whirling Jata swept the four quarters And Uma sat—not even her anklets, bangles or bejewelled belt whispered, neither her bosom not her ear-drops or coiffure moved.'

এই সুপ্রাচীন তামিল গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের নাট্য ও নৃত্যকলার বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। এই কাহিনীর নায়িকা মাধবী নৃত্যকলায় পারদর্শিনী। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রাজা ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের এক মহতী সমাবেশে কাবেরীপুষ্পত্তিনম্ নগরে মাধবী নৃত্যকলার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করেন। মাধবীর নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে ১০০১ স্বর্ণমুদ্রা ও নিজ কণ্ঠের পুষ্পমালা উপহার দেন। মাধবীর সহচরীরা ঐ পুষ্পমালা অভিজাত সম্প্রদায়ের দরবারে নিয়ে ঘোষণা করেন যে যিনি ১০০১ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ঐ মালা কিনবেন তিনিই মাধবীর প্রণয়ভাজন হবেন। কোভলন নামে এক বণিক যুবক ঐ মালা কিনলেন এবং তিনি মাধবীর রূপলাবণ্য ও নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে নিজ স্ত্রী, পুত্র ও সংসারের দায়িত্ব ভুলে গেলেন। এই ঘটনার পরিণতিই বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

এই কাহিনী অবশ্য আর একটি পরিবর্তিত রূপেও প্রচলিত আছে। নৃত্যশিল্পী মাধবীকে শহরের অন্যতম প্রধান শ্রেষ্ঠীপুত্র কোভলন ও কান্নাকাই-এর বিবাহ উৎসবে নৃত্য প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। মাধবী একটি শর্তে নৃত্য প্রদর্শনে সম্মত হলেন। তিনি বললেন যে নৃত্যের শেষে তিনি তার কণ্ঠের মুক্তামালা ছুঁড়ে দেবেন। ঐ মালা যার কণ্ঠলগ্ন হবে সেই পুরুষকে তাকে গ্রহণ করতে হবে। শ্রেষ্ঠী সম্মত হলে বিবাহসভায় নৃত্যের শেষ পর্যায়ে ঘটনাচক্রে মাধবীর মুক্তামালা কোভলন-এর কণ্ঠলগ্ন হল। মাধবী তখন সেই সদ্যবিবাহিত পুরুষকে শর্ত অনুযায়ী দাবী করলেন। এই ঘটনা থেকেই কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতি সূচিত হয়।

যাই হোক, ভারতের নৃত্যকলা, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নৃত্যধারা সম্পর্কে "শিলাপ্পদিকরম্" সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ।

চাক্কিয়ার কুথু—প্রবন্ধম্ কুথু ও কুটিয়াট্টম্ এই দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হত। প্রবন্ধম্ কুথু অনুষ্ঠানে মূলতঃ চাক্কিয়ার সম্প্রদায়ের কথকথা ও কাহিনী বর্ণনা কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা বাচিক অভিনয় সমৃদ্ধ। কাহিনীকে স্পষ্ট করার জন্যে কিছু ভাবভঙ্গী ছাড়া এর মধ্যে নৃত্যের অংশ বিশেষ কিছুই ছিল না। পুরাণের কাহিনীই সাধারণতঃ

সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে অভিনীত হত।

কুডিয়াট্টম্ অভিনয়-প্রধান। এতে স্ত্রী ও পুরুষ অর্থাৎ চাক্কিয়ার ও নাঙ্গিয়ার উভয়েই অংশগ্রহণ করত। এক-একটি নাটক এত দীর্ঘ হত যে অনেক সময় পুরো নাটকের অভিনয় শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগত। পেরুমলগণ এই শিল্পকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশেষভাবে ভাস্কর রবিবর্মা পেরুমল, চেরামন পেরুমল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরিত্র অনুযায়ী রূপসজ্জা ও রং-এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যার প্রভাব পরবর্তীকালে কথাকলি নৃত্যধারায় দেখা যায়।

এছাড়া পতাকম্ নৃত্য প্রচলিত ছিল। চাক্কিয়ার কুথু, কুডিয়াট্টম, পতাকম্ প্রভৃতি নৃত্যধারা আর্যসভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এগুলি পূর্বতন দ্রাবিড় সংস্কৃতিপুষ্ট মুটিয়েট্টু, তিরায়াট্টম্ প্রভৃতি ভগবতী অর্চনামূলক নৃত্যধারা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

কথাকলি নৃত্য সম্পর্কে একটি প্রচলিত তথ্য হল পরম বৈষ্ণব কালিকটের জামুরিন বংশীয় মানবদেবরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষ্ণনাট্যম্ নৃত্যনাট্যের উন্নততম রূপই পরবর্তী কালে কথাকলি রূপে পরিচিত। কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের আখ্যান অবলম্বনে অষ্টাপদী আট্যম্ নামে একপ্রকার লোকনৃত্যের ভিত্তিতে আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণনাট্যম্ প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনাট্যম্-এর কাহিনী-অংশ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে রচিত এবং রাজসভা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই এর প্রসার সীমায়িত ছিল। কৃষ্ণনাট্যম্-এ কাঠের মুখোস ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

কথিত আছে যে কোট্টারাকারার রাজা বীর কেরালাবর্মা রাজ পরিবারের বিবাহ উপলক্ষে কালিকটের জামুরিনের নিকট কৃষ্ণনাট্যম্ অভিনয়ের একটি দলকে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করেন। জামুরিন এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জানালেন যে গভীর ভাবসম্পদ পূর্ণ, সাহিত্যধর্মী ও উন্নত আভিজাত্যসম্পন্ন আঙ্গিক সমৃদ্ধ এই কৃষ্ণনাট্যম্ উপভোগ করার মতো সুধীজন দক্ষিণ দেশে নেই। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে কোট্টারাকারার রাজা নিজ দেশে একটি নতুন নৃত্যনাট্যের প্রবর্তন করলেন। এরই নাম রামনাট্যম্। কথিত আছে যে ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে কোট্টারাকারার গণেশমন্দির প্রাঙ্গণে রামনাট্যম্ সর্বপ্রথম অভিনীত হয় এবং পরবর্তীকালে কথাকলি শিল্পীগণের প্রথম প্রদর্শনী এই মন্দিরে গণেশদেবের আরাধনা হিসাবে অনুষ্ঠানের প্রথারূপে প্রচলিত হয়। কোট্টারাকারার রাজা কৃষ্ণনাট্যমের আড়ম্বর-পূর্ণ সাজসজ্জা বর্জন করে রামনাট্যমে অনাড়ম্বর প্রাচীন পোশাক ব্যবহার করেন। রামনাট্যমকেই কথাকলি নৃত্যের উৎস ও প্রাথমিক স্তর বলে মনে করা হয়। আঙ্গিক, ভাবসম্পদ, গভীরতা ও কলাসৌকর্যে রামনাট্যম এক অনুপম সৃষ্টি। আকৃতি, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে কথাকলি রামনাট্যম্-এর অনুরূপ। মূলতঃ পুরাতন লোকনৃত্যের আঙ্গিকের বিস্ময়কর বৈপ্লবিক নবরূপায়ণ। কৃষ্ণনাট্যমের ভাষা সংস্কৃত ছিল বলে তা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। কোট্টারাকারার রাজা মালয়ালী ভাষায় রামনাট্যম্ রচনা করেন। তার ফলে জনজীবনের সঙ্গে এই নৃত্যনাট্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্যের আখ্যানভাগ রচিত হত বলে এই নৃত্যনাট্য রামনাট্যম্ নামে অভিহিত হয়। কোট্টারাকারার রাজা পরে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেও এই নৃত্য-নাট্য রচনা করেছিলেন। ১৬৬৫ থেকে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে তিনি

এই শিল্পকলার এক গৌরবময় ভূমিকা সৃষ্টি করেন। নাট্যকার, প্রযোজক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে তাঁর আদর্শ পরবর্তীকালের শিল্পীদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করে। কৃষ্ণনাট্যম্-এর মতো রামনাট্যম্ও আটরাত্রি ধরে অভিনীত হত। এবং রামনাট্যমেও কাঠের মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দৃশ্যকাব্য কথাকলি তার বর্তমান রূপে আসার আগে এতগুলি স্তর অতিক্রম করেছে।

কেরলের প্রাচীন লোকনৃত্যধারা, পেরুমল যুগের চাক্কিয়ার কুথু, কুডিয়াট্যম্ ও পরবর্তীকালে কৃষ্ণনাট্যম্ ও রামনাট্যম্-এর স্তর অতিক্রম করে এই বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর অফুরন্ত জীবনীশক্তি, ছন্দোময়তা ও উদ্দামতা, তান্ত্রিক পূজাপাঠের আভিচারিক পদ্ধতি কথাকলি নৃত্যে এক বিচিত্র সজীবতা সৃষ্টি করেছে।

কথাকলি শিল্পকলা কথাকলি-সাহিত্য অপেক্ষাও প্রাচীন। কথাকলি-সাহিত্য চারশত বৎসরের পুরোনো, কিন্তু কথাকলি-শিল্পকলা প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত। কথাকলি নৃত্যনাট্যগুলি গভীর ভাবসম্পদ ও নাটকীয়তাপূর্ণ। ইহা সাধারণত গদ্য ও কবিতা উভয় পর্যায়ে রচিত। সংলাপ অংশ মালয়ালম্ ভাষায় রচিত কিন্তু দৃশ্যান্তরস্থ কবিতাংশ সংস্কৃত ও মালয়ালম্ উভয় ভাষাতেই রচিত হয়। কথাকলি-সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দীর্ঘকালের শ্রম ও অনুশীলনের ফলে বিশেষ ঐতিহ্যসম্পন্ন। পুরাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যানমালাকে ভিত্তি করে গভীর ভাব-সম্পদপূর্ণ ও সুললিত ছন্দোবদ্ধ কথাকলি সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

কথাকলি-সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশে কেরলের রাজন্যবর্গের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোট্টারাকারাব রাজা বীর কেরালাবর্মা রামচন্দ্রের জন্ম থেকে রাবণবধের পর সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে আটটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। কোট্টায়ামের রাজা থাম্পুরণ বকবধ, কালকেয় বধ, কৃমিরা বধ ও কল্যাণ সৌগন্ধিকম—এই চারটি নৃত্য-নাট্য মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা কার্তিক থিরুমল (১৭২৪-১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দ) সুভদ্রাহরণম, নরকাসুরবধ, গন্ধর্ব বিজয়ম্ রাজ-সুয়েম্, বকবধ, পাঞ্চালী স্বয়ংবরম ও কল্যাণ সৌগন্ধিকম্ নামে সাতটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। তিনি নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বলরাম ভরতম্ নামে নাট্যশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। রাজা অশ্বথী থিরুমল পুতেনা মোক্ষম অম্বরীষ চরিতম্, পুণ্ডরীক বধ ও রুক্মিণী স্বয়ংবরম্—এই চারটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বামী থিরুমল রামবর্মা (১৮১৩ ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ) তার রাজত্বকালে কথাকলি সঙ্গীত ও শিল্প-কলার প্রসারের জন্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি কথাকলি নৃত্যনাট্যের জন্যে পঁচাত্তরটি সুললিত পদ রচনা করেন। তার রাজত্বকালেই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ইরিয়াম্মান থাম্পি (১৭৮৩-১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ) কীচক বধ, দক্ষযজ্ঞম্ ও উত্তরা স্বয়ংবরম্ এই তিনটি শ্রেষ্ঠ কথাকলি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ইরিয়াম্মান থাম্পির কন্যা শ্রীমতী থংকাচি রচিত শ্রীমতী স্বয়ংবরম্, পার্বতী স্বয়ংবরম্ ও মিত্রসহ মোক্ষম নাট্যগুলিও উল্লেখযোগ্য। কবি উন্নায়ি ওয়ারিয়র রচিত 'নল চরিতম্' অন্যতম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

বিভিন্ন পদ বা শ্লোকের সাহায্যেই অভিনেতাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে সঙ্গীত ও কাব্যরসসমৃদ্ধ সুললিত ছন্দে রচিত কথাকলি নৃত্যনাট্যে মালাবার অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক

অনুষ্ঠানের প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে সাহিত্য শিল্পাশ্রয়ী। তাই অধিকাংশ কথাকলি নৃত্যনাট্য রচয়িতারা এই শিল্পকলার আঙ্গিকে নিপুণ ছিলেন। এই নৈপুণ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে ডাঃ এস. কে. নায়ার বলেছেন ঃ

'The stage, curtain actors and various other aspects connected with drama, make the playwright conscious of the innumerable technicalities to be followed at the time of production and, therefore, a theme very successfully handled by a novelist or verse writer finds difficulties in the hands of a playwright. As Aatta katha (kathakali play) is almost alike to a play, the writer has to be very careful in composing one. His main job is to write a play for "kathakali stage", which puts restrictions on the free play of his imagination, He has to allow full justice to the actors in their interpretation of the situations of the play, only by means of gestural and facial expression.'

কথাকলি একটি সুপরিকল্পিত বিশেষ অঙ্গাভিনয় ও মুদ্রাসমন্বয়ে ভাবরসে উজ্জ্বল দৃশ্যকাব্য তাই এর নাট্যরচনা ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে কথাকলি এক প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী শিল্প যা প্রায় সম্পূর্ণ বিদেশীয় প্রভাবমুক্ত। কথাকলি মূলতঃ দৃশ্যকাব্য, এতে বাদক ও সঙ্গীতশিল্পীর গীতি মিলিতভাবে পরিবেশিত হয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবব্যঞ্জক মূকাভিনয় সমন্বিত দৃশ্যকাব্য এই কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে একমাত্র জাভা দ্বীপের ছায়ানাট্য ও ছায়ানৃত্যের তুলনা চলে। এর কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, প্রায় হাজার বছর পূর্বে বলিদ্বীপের অম্বুরাজা ত্রিবাংকুর থেকে কয়েকজন শিল্পীকে বন্দী করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে সেই বন্দী শিল্পীদের মাধ্যমে জাভা ও বলিদ্বীপে কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ নৃত্যের প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে এই দৃশ্যকাব্য কেরলের প্রাচীন লোকনৃত্য ও পেরুমল যুগের শাস্ত্রীয় চাক্কিয়ার কুথু ও কুডিয়াট্যম্ নৃত্যধারার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যের সুসংবদ্ধ প্রকাশভঙ্গী ও লোকনৃত্যের প্রাণময় উদ্দামতা কথাকলি নৃত্যনাট্যে স্বতস্ফূর্ত সজীবতা সৃষ্টি করেছে।

আদিমযুগে মানুষ আকারে-ইঙ্গিতে ও হাত ও মুখের নানারূপ ভঙ্গীতে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করত। এই বিভিন্ন প্রকার প্রতীকধর্মী ভঙ্গী ও মুদ্রাগুলিই সংস্কৃতরূপ পরবর্তীকালে নৃত্য ও অভিনয়কলার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে। কথাকলি অনুষ্ঠানের বিশেষ রীতির মধ্যেই এই দৃশ্যকাব্য পরিকল্পনার গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলাঘর কেরলের গ্রামে গ্রামে, মন্দির প্রাঙ্গণে সারারাত্রিব্যাপী কথাকলি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠানের পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে এর ধর্মপ্রবণতা, ভাবগাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয়। কথাকলি অভিনয় কখনো দিবাভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ পনের থেকে পঁচিশজন শিল্পী সমন্বয়ে কথাকলি

নৃত্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। কথাকলি সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ কোনো মহিলা-শিল্পী অংশগ্রহণ করে না, পুরুষেরাই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করে। সাধারণভাবে এই তথ্য সত্য হলেও মহিলা শিল্পীরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন।

অপরাহ্নের সূর্য যখন আরব সাগরের ব্যাকুল আহ্বানে মিলন অভিসারের আরক্তিম লজ্জায় লোহিত হয়ে মালাবারের শ্যামল পাহাড়ের নীরব গাম্ভীর্যকেও সলজ্জ রক্তিম করে তোলে, তখন চর্মযন্ত্রের মহামন্দ্র ঐকতানে কথাকলি অনুষ্ঠানের সুদূরসঞ্চারী আহ্বান ঘোষিত হয়। চতুর্বাদ্যের এই অমোঘ আহ্বানে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ কথাকলি নৃত্য মহামণ্ডপে সমবেত হয়। এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের নাম কেলি।

রাত্রি আটটার পর কথাকলি নৃত্যের সূচনা এবং পরদিন সকালে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। মুক্তাঙ্গন অভিনয়-মঞ্চ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় ষোল ফুট। চারিদিকে চারটি স্তম্ভাকৃতি দণ্ডের সঙ্গে সামিয়ানা বেঁধে তৈরি হয় মঞ্চের উপরিভাগের আচ্ছাদন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঞ্চের জন্যে কোনো বিশেষ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয় না। জমির ওপরেই আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সবুজ পাতা ও ফুল দিয়ে মঞ্চসজ্জা করা হয়। চার থেকে পাঁচফুট লম্বা একটি বিরাট পিতলের পিলসুজের ওপর একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ। এই সময় চাণ্ডা, মাদলম, চ্যাংগালা ও কাইমনি বাজানো হয়ে থাকে। একে বলা হয় আরঙ্গকেলি।

এই প্রদীপের আলোর এই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শ্রীআয়ার বলেছেন ঃ—

'The tall massive, shining metal lamp is the only lighting. Fed by an abundant supply of coconut oil, the two thick clusters of wicks—the thicker one facing the stage and the other the audience create a small magic power of light. The area close to the lamp is brilliantly lit against the surrounding darkness. The lamp is the focal point of the actor. This oil fed lamp has a distinct personality and function in the drama. It vivifies and subdues, an effect, that can hardly be achieved by the most scientific lighting scheme. The dancing flame of the lamp now leaping, now flickering, pulsates with a live and intelligent energy, reacting to the rhythmic cadences and moods of the play.'

আরঙ্গকেলি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন শিল্পী অভিনয় প্রাঙ্গণে একটি পর্দা ধরে দাঁড়ায়। এই পর্দাটিকে তেরেশিলা বলা হয়। তেরেশিলার অন্তরালে দুজন শিল্পী একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এর নাম পূর্বরঙ্গম বা তোডেয়াম্। তেরেশিলা সাধারণতঃ বারোফুট লম্বা ও আট ফুট চওড়া গাঢ় রঙের সিল্ক বা সাটিনে তৈরি এবং এর মাঝখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম আঁকা থাকে।

তোডেয়াম্-এর সমাপ্তিকে বন্দনাশ্লোকম্ গীত হয়। তারপর পুরপ্পাড। এই অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চ হতে ধীরে ধীরে তেরেশিলা অপসারিত করা হয়। কাহিনীর

প্রধান দুই চরিত্র পুরুপ্পাড নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চবন্দনা করেন। এই সময় ভাবাভিনয় ও কলাশমের ছন্দের মাধ্যমে দেহভঙ্গীর সুষম সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। কলাশম মূলত তালাশ্রয়ী নৃত্য।

পুরুপ্পাডের পর অনুষ্ঠিত হয় মঞ্জুথরারা বা মালাপদম্। এ হচ্ছে পুরুপ্পাডের সমাপ্তি ও মূল নাট্যকাহিনী আরম্ভের পূর্বে অনুষ্ঠিত এক সাঙ্গীতিক বিস্কম্ভক বিশেষ। এখন মঞ্চের ওপর পূর্বোক্ত চতুর্বাদ্যযন্ত্রীর একাধিপত্য, এই সময় যন্ত্র ও কণ্ঠশিল্পীগণ প্রায় প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। মঞ্জুথরারায় গীতগোবিন্দ হতে সংস্কৃত গীতিমাল্য পরিবেশিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানের পর আরম্ভ হয় মূল কাহিনীর অভিনয়। সাধারণভাবে কথাকলি নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে প্রমোদোদ্যানে নায়ক ও নায়িকাকে দেখা যায়।

কথাকলি নৃত্যনাট্য আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য—এই চারপ্রকার অভিনয় সমৃদ্ধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর যে চলন তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। কাব্য নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এর উৎস ঋগ্‌বেদ, ভাব সঞ্চারী। নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্র অলংকরণের অঙ্গসজ্জা, বসনভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আহার্য অভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে সত্ত্বভাবে সমাহিতকরণের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী। কথাকলি নৃত্যে আহার্য অভিনয় একটি প্রধান ও অন্যতম উপকরণ।

আহার্য অভিনায়ংশে কথাকলি রূপসজ্জা ও পোশাক ভারতীয় নৃত্যকলার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রাচীন নাট্যকলায় মুখোস ও গাঢ় উজ্জ্বল রং-এর ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কথাকলি নৃত্যে বর্ণ বৈচিত্র্য ও মুখোসের ব্যবহার দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত।

বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি বিচিত্র রং-এর খেলাঘর। নাট্যশাস্ত্রেও বিভিন্ন ভাব ও রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রং নির্বাচন ও ব্যবহারের নির্দেশ আছে। আহার্য অভিনয় প্রধান কথাকলি নৃত্যে সাত্ত্বিক, তামসিক ও রাজসিক এই তিনটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলির রূপসজ্জার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অভিনবত্বে অতুলনীয়, পৃথিবীতে অনুরূপ কোনো মডেল নেই। তিনটি মূল ভাবকে অবলম্বন করে কথাকলি নৃত্যে রূপসজ্জা অনুযায়ী চরিত্রগুলিকে পাচ্চা, কাত্তি, তাড়ি, কারি ও মিনিক্কু এই পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

পাচ্চা চরিত্র রূপসজ্জার মূল রং সবুজ। এই চরিত্রে সাদা চুট্টির বিপরীতে মুখে সবুজ এবং তাকে আরো উজ্জ্বল করার জন্যে লাল ঠোঁট ও কালো রং এর চোখ ও ভুরু আঁকা হয়। কপালে আঁকা হয় চাঁপা রং-এর তিলক। এই প্রসাধনে ইন্দ্র, রাম, অর্জুন, কৃষ্ণ, নল প্রভৃতি বীর ও সাত্ত্বিক চরিত্র রূপায়িত হয়। পাচ্চার মূল রস বীর ও শৃঙ্গার।

কাত্তি চরিত্রে সবুজ রং-এর উপরে লাল এবং তাকে আরো উজ্জ্বল করার জন্যে সাদা বর্ডার দেওয়া হয়। নাকে ও কপালে দুটি শোলার বল হিংস্রতাকে প্রকট করে। এই

প্রসাধন রাবণ, কীচক, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি চরিত্রের অসাধুতা ও উগ্রতা প্রকাশ করে। কাত্তি চরিত্রের মূল রস বীর ও রৌদ্র।

তাড়ি চরিত্রে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রকট প্রসাধন ব্যবহার হয়। চরিত্রের গুণ অনুযায়ী লাল, কালো ও সাদা এই তিনপ্রকার তাড়ির রূপসজ্জা প্রচলিত। দুঃশাসন, বকাসুর প্রভৃতি চরিত্রের ভয়াল ও শয়তান রূপ প্রকাশের জন্যে লাল তাড়ি এবং ব্যাধ, শিকারী প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক চরিত্র প্রকাশের জন্যে কালো তাড়ি ব্যবহৃত হয়। এর মূল রস বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক। হনুমান চরিত্রে বীর, হাস্য ভাব প্রকাশের জন্যে সাদা তাড়ি ব্যবহার হয়।

কারি চরিত্র রূপসজ্জার মূল রং কালো। পুতনা, তাড়কা, শূর্পণখা প্রভৃতি কুটিল চরিত্র প্রকাশে এই প্রসাধন-এর ব্যবহার হয়। এই চরিত্রের পোশাক-এর রং সম্পূর্ণ কালো। এর মূল রস রৌদ্র ও বীভৎস।

মিনিক্কু চরিত্রের প্রসাধন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রসাধনে বিশেষ উজ্জ্বল রং-এর ব্যবহার হয় না। সাধারণভাবে দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সাধু প্রভৃতি চরিত্র রূপায়ণে এই মসৃণ স্বল্পোজ্জ্বল রূপসজ্জা ব্যবহার হয়। মূল রস শান্ত ও শৃঙ্গার।

কথাকলি নৃত্যে পোশাক ও রূপসজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে। এই পোশাক সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। যখন কালিকটের জামুরিন বংশীয় মানবদেবরাজ কৃষ্ণনাট্যম্ সৃষ্টি করেন, তখন একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যেন সমুদ্রে এক একটি ঢেউ সরে যাচ্ছে আর কথাকলি নৃত্যের পোশাক ও প্রসাধনের অপরূপ রং প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সেইজন্যে কথাকলি অনুষ্ঠানের পুরপ্পাডের সময় তেরেশিলা ধীরে ধীরে অপসারিত করা হয় ও শিল্পীর পোশাক ও রূপসজ্জার বর্ণবৈচিত্র্য অন্ধকার থেকে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

কথাকলি নৃত্যে পুরুষ চরিত্রাভিনেতার মস্তকাভরণ 'কিরীটম' এক অপূর্ব শিল্প-কলার নিদর্শন। কানের পাশে কাঠের গোল দুইটি বড় অলংকার, ইহাকে 'তোড়া' বলে। কানের ছোট দুটি অলংকারকে 'চেতিপুরু' বলা হয়। মুকুটের নিচে কপালের উপর যে লাল কাপড়ের বন্ধনী তাকে 'চুট্টিতুর্ন' বলে। চুট্টিতুর্নির উপর মোতির বা পুঁতির কাজ করা যে ফিতা থাকে তাকে 'নারা' বলা হয়। পিঠে যে লম্বা কালো রং এর নকল চুল থাকে তাকে 'চামরম্' বলে।

চরিত্রানুযায়ী কথাকলি নৃত্যশিল্পীরা ঊর্ধ্বাঙ্গে যে বিভিন্ন রঙের জামা পরেন তাকে 'কুপ্পায়াম' বলে। উপর হাতে যে কাঠের গহনা পরা হয় তার নাম 'তোলপুট'। তোলপুটের ঠিক নিচের হাতের কাঠের গহনার নাম 'ভালই'। ভালই-এর নিচে ব্রেসলেটের মতো কাঠের গহনাকে 'হস্তকটকম্' বলা হয়। গলার পুঁতির মালার নাম 'কাজুহারম্'। গলা থেকে ঝোলান চাদরের দুপাশে দুটি আয়না থাকে। একে 'উত্তরীয়ম্' বলে। কথা-কলিশিল্পীরা যে ঘাঘরা পরেন তাকে 'উরুতেকেট্টা' বলে। ঘাঘরার ওপর দিয়ে দুই পাশে
[redacted] রং-এর কাপড়ের ফালি ঝোলান থাকে তাকে 'পাটুওয়ালা' বলে। ঘাঘরার
[redacted] কাজ করা কোঁচাকে 'মুণ্ডি' বলা হয়। কোমরের উপর অর্ধ-
[redacted] কে 'পাড়িএরেজানম্' বলে। পায়ের গোড়ালিতে লাল রং-এর

দাঁড় দিয়ে তৈরি যে আভরণ তাকে 'তাণ্ডপদম্' বলে। কথাকলি নৃত্যের ঘুঙুরকে 'গোচামণি' বলে।

মহিলা শিল্পীরা মাথায় যে উড়নী ব্যবহার করে তাকে 'উরুমণ' বলা হয়। উড়নীর ভিতরের পরচুলাটিকে 'কোণ্ডা' বলা হয়। মহিলা চরিত্রের শিল্পীরা 'উত্তরীয়ম্' ব্যবহার করে না। এ ছাড়া অন্যান্য অলংকার পুরুষ চরিত্রের অনুরূপ। চরিত্র অনুযায়ী মাথায় বিভিন্ন প্রকারের 'মুড়ি' ব্যবহার প্রচলিত।

কথাকলি নৃত্যে বাচিক অভিনয়ের অংশ অত্যন্ত গৌণ—নেপথ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের মাধ্যমে অভিনয় হয়। শ্রীআয়ার-এর মতে :

'The Natyacharyas of kathakali stage took the view that the spoken word was a needless burden on the actor and that it was imperfectly equipped to discharge the function it was called upon to bear in the drama.'

আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের মাধ্যমে বিবিধভাবে প্রকাশিত হয়। কথাকলি নৃত্য আঙ্গিক অভিনয় সমৃদ্ধ। শির, হস্তদ্বয়, বক্ষোদেশ, পার্শ্বদ্বয়, কটিতট ও পদদ্বয় -এই ছয়টিকে অঙ্গ বলা হয়। অনেকে গ্রীবাকেও অঙ্গ বলেন। স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, ঊরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় এগুলি প্রত্যঙ্গ। নেত্র, ভ্রু, অক্ষিপট, অক্ষিতারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, অধর, দন্তপঙক্তি, জিহ্বা, চিবুক, মুখ এগুলিকে উপাঙ্গ বলে। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের অভিনয়ের মাধ্যমে কথাকলি নৃত্যশিল্পীর নাট্যের মর্মকথা বিধৃত করেন।

"আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥"

অর্থাৎ বদনের মাধ্যমে গীত অবলম্বন করা কর্তব্য; হস্তের দ্বারা গীতের অর্থ নির্দেশ, নেত্রদ্বয়ে ভাব প্রদর্শন ও পদদ্বয়ে তালরক্ষা করা উচিত। যেখানে হস্ত সেখানেই দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি, যেখান মন সেখানেই ভাব আর যেখানে ভাব সেখানেই রসোৎপত্তি। এই রস নিষ্পত্তিই কলা সাধনার চরম উৎকর্ষ।

আঙ্গিক অভিনয়ের এই চরম উৎকর্ষ কথাকলি নৃত্যধারায় বিস্ময়কর রূপ এনেছে। প্রকাশিতব্য সমস্ত ভাব ও রূপকর্মকে এই কথাকলি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করা যায়। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেছেন :

'It is a beautiful pantomimic art that can portray every emotion and every gesture of human life in countless ways, by the raising of an eye-brow, turning of the knees, raising of the shoulders and movements of the hands and fingers.'

কথাকলির হস্তমুদ্রাগুলিকে প্রতীকধর্মী ভাষা বলা যেতে পারে। Georgette Boner বলেছেন : 'At any rate the mudras of kathakali as an independent language do not require the support of the spoken word.' এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা প্রয়োজন এবং কথাকলির মুদ্রার একটি অভিধান রচনা একান্ত আবশ্যক। কারণ বৈদিক যুগের ধ্যানমুদ্রা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাব ও ভাষার বাহন এই নতুন আঙ্গিক নিঃসন্দেহে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

কথাকলি নৃত্যে মূল চব্বিশটি হস্ত প্রচলিত—(১) পতাকা (২) মুদ্রাক্ষম্ (৩) কটকম্ (৪) মুষ্টি (৫) কর্তরীমুখ (৬) সুখতুণ্ড (৭) কপিত্থ (৮) হংসপক্ষ (৯) শিখর (১০) হংসাস্য (১১) অঞ্জলি (১২) অর্ধচন্দ্র (১৩) মুকুরম্ (১৪) ভ্রমর (১৫) সূচীমুখ (১৬) পল্লব (১৭) ত্রিপতাকা (১৮) মৃগশীর্ষ (১৯) সর্পশীর্ষঃ (২০) বর্ধমানকম্ (২১) অরাল (২২) ঊর্ণনাভ (২৩) মুকুল (২৪) কটকামুখ। এই হস্তগুলি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। গুরু গোপীনাথের মতে সুখতুণ্ড, কপিত্থ, শিখর, ত্রিপতাকা, মৃগশীর্ষ, অরাল, ঊর্ণনাভ, মুকুল, কটকামুখ—এই ন-টি হস্তের অসংযুক্ত ব্যবহার হয় না।

পতাকা : "নমিতা অনামিকা যস্য পতাকাঃ সঃ করস্মৃতঃ"

অনামিকাকে নিচু করে মাটির সমান্তরাল করলে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলিকে সংলগ্ন রাখলে যে হস্ত হয় তাকে পতাকা বলে। পতাকা সংযুক্ত হস্তে সূর্য, রাজা, গজ, সিংহ, বৃষ, প্রসাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত হস্তে জিহ্বা, দেহ, দন্ত প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

মুদ্রাক্ষম্ : "অঙ্গুষ্ঠস্যতুঃ তর্জন্যা যস্যাগ্রে মিলিতো ভবেত
শেষাঃ বিশ্লষিতা যস্য মুদ্রাক্ষঃ সঃ করস্মৃত"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রের সহিত তর্জনী এসে মিলিত হলে এবং বাকী অঙ্গুলিগুলি সংলগ্ন অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী থাকলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে বলে মুদ্রাক্ষম্। মুদ্রাক্ষম্ সংযুক্ত হস্তে স্বর্গ, সমুদ্র, তপস্যা, মৃত্যু, বিস্মৃতি, সর্প প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত অবস্থায় মন, চিন্তা, বাসনা, আত্মজ্ঞান, সৃষ্টি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

কটকম্ : "অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমূলম্ তু সম্স্পৃশেদ্যদি মধ্যমা
মুদ্রাভিধানহস্তস্তু কটকাক্ষম্ ব্রজেৎ তদা।"

মুদ্রাক্ষম্ হস্ত করে মধ্যমা যদি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলভাগ স্পর্শ করে তাহলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে কটকম্ বলে। কটকম্ সংযুক্ত অবস্থার বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বলরাম, স্বর্ণ, রৌপ্য, নিদ্রা, বীণা, মালা, রথ, প্রভৃতি ও অসংযুক্ত অবস্থায় ফুল, দর্পণ, স্ত্রী, সুগন্ধ ত্যাগ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

মুষ্টি : "অঙ্গুষ্ঠাস্তর্জনী পার্শ্বমাশ্রিতঙ্গুলয়ঃ পরাঃ
আকুঞ্চিতাশ্চ যস্য স্যুঃ স হস্তো মুষ্টি।"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুঠার মধ্যে রাখলে অন্য অঙ্গুলিগুলি সংলগ্ন হয়ে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়

থাকলে যে হস্ত হয় তাকে মুষ্টি বলে। মুষ্টি সংযুক্ত অবস্থায় যম, ঔষধ, অভিশাপ, দান, বন্ধন, মেধা প্রভৃতি ও অসংযুক্ত অবস্থায় মন্ত্রী, জয়, ধনু, বার্ধক্য, আহার্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

কর্তরীমুখ : "কনিয়স্‌শূন্যতা যত্র তিস্র স্যুঃ সংনতা পরাঃ
অঙ্গুষ্ঠস্তর্জনীপার্শ্বম্ সম্ স্পৃশেদ্ভবতর্ষভঃ
কর্তরীমুখম্ ইত্যাহুঃ আচার্যা ভরতর্ষভঃ।"

কনিষ্ঠা ঊর্ধ্বমুখে থাকলে, তর্জনী, মধ্যমা অনামিকা কুঞ্চিত হয়ে মাটির সমান্তরাল হলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তর্জনীকে স্পর্শ করলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে বলে কর্তরীমুখ। কর্তরীমুখ সংযুক্ত অবস্থায় পাপ, ব্রাহ্মণ, যশ, মস্তক, গৃহ, জাতি, সমাপ্তি প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল, শিশু, সময়, মানুষ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

সুখতুণ্ড : "ভ্রূলতেবা যদা বক্রা তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ সংযুতা
নমিতানামিকাশেষে কুঞ্চিতোদাঞ্চিতে তদা॥
সুখতুণ্ডম্ ইত্যাহুঃ আচার্যা ভবতর্ষভ।"

ভ্রূর মতো তর্জনী বাঁকা থাকবে, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা মোড়া থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে মোড়া অঙ্গুলির উপরে থাকবে—হস্তের এই অবস্থানকে সুখতুণ্ড বলে। সুখতুণ্ড সংযুক্ত হস্তে অংকুশ, পাখি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। সুখতুণ্ডের অসংযুক্তরূপে প্রয়োগ হয় না।

কপিত্থ : "নমিতানামিকাপৃষ্ঠমঙ্গুষ্ঠা যদি সম্পৃশেৎ
কর্নিষ্ঠিকা সুনম্রা চ যস্মিন্তু স করঃস্মৃত
কপিত্থকশ্চ বিদুদ্ধি নৃত্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ।"

কনিষ্ঠা ও অনামিকা মোড়া থাকবে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ওদের উপর এসে সংযুক্ত হবে এবং তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে অল্প ফাঁক থাকা অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী হলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে কপিত্থ বলে। সংযুক্ত অবস্থায় কপিত্থ স্পর্শ, সন্দেহ, পান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। কপিত্থেরও অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

হংসপক্ষ : "অঙ্গুল্যশ্চ যথাপূর্বং সমস্থিতা যদি তস্যতু
স হস্তো হংসপক্ষাস্ত্যো ভপ্যতে ভরতাদিভিঃ।"

আঙুলগুলি যে যার নিজের জায়গায় সমভাবে অবস্থান করলে তাকে হংসপক্ষ হস্ত বলে। সংযুক্ত রূপে হংসপক্ষ চন্দ্র, দেবগণ, কামদেব, মৎস্য, পর্বত, শয্যা, বস্ত্র, কেশ, পাদুকা প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত রূপে তুমি, আমি, শিবের কুঠার, অসি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

শিখর ঃ "পুরতো মধ্যমং চাপি পৃষ্ঠতস্তর্জনীং নয়েৎ

কপিত্থহস্তস্তু তদা প্রাপ্নুয়াশিখরাভিধাম্।"

তর্জনী ও মধ্যমা দুটি কাঁচির মতো অবস্থায় থাকবে। কনিষ্ঠা, অনামিকা সংশ্লিষ্ট হয়ে নিচের দিকে এবং অঙ্গুষ্ঠ এসে কনিষ্ঠা ও অনামিকার সঙ্গে যুক্ত হলে হাতের যে রূপ তাকে শিখর বলে। সংযুক্ত হস্তে শিখর পদদ্বয়, চক্ষু, পথ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং শিখরের অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

হংসাস্য ঃ "সন্নতাশ্চলদগ্রাস্যস্তর্জন্যাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমাঃ

ইতরৌ চোন্নতৌ যত্র হংসাস্যম্ তদুদীরিতম্।"

তর্জনী, মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠ তিনটি একত্রে যুক্ত হয়ে কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপরের দিকে উঁচু হয়ে থাকলে হংসাস্য হস্ত হয়। সংযুক্তরূপে হংসাস্য হস্ত অক্ষিগোলক, সহানুভূতি, শ্বেত প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে বর্ণাবন্ত, কেশ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

অঞ্জলি ঃ "করশাখাশ্চ বিশ্লিষ্টা মধ্যং হস্ততলস্য তু

কিঞ্চিদকুঞ্চিতং যস্য লুটিতম সোহঞ্জলিঃ করঃ।"

পঞ্চ অঙ্গুলি একটু কুঞ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট হবে এবং সংলগ্ন থাকবে এবং তালুও সামান্য কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে অঞ্জলি হস্ত হবে। সংযুক্তরূপে অঞ্জলি অগ্নি, বমন, অশ্ব, নদী, শোণিত প্রভৃতি এবং অসংযুক্তরূপে বৃক্ষশাখা, ক্রোধ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

অর্ধচন্দ্র ঃ "অঙ্গুষ্ঠং তর্জনীং চাপি বর্জয়িত্বৈতবা ক্রমাৎ

ঈষদাকুঞ্চিতা যত্র সোহর্ধচন্দ্রকবাঃ স্মৃতাঃ।"

কনিষ্ঠা, অনামিকা মধ্যমা ও তর্জনীকে ঘুরিয়ে একটু ওপরের দিকে করলেও অঙ্গুষ্ঠকে কিছু পিছনে রাখলে হাতের যে রূপ হয় তাকে অর্ধচন্দ্র হস্ত বলা হয়। অসংযুক্তরূপে ঈশ্বর, আকাশ, ক্লান্তি প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে হাস্য, ঘৃণা প্রভৃতি অর্থ অর্ধচন্দ্র হস্ত প্রকাশ করে।

মুকুর ঃ "মধ্যমানামিকানগ্রে অঙ্গুষ্ঠোহপি পরস্পরম্

যত্নাবভেরনু স্পর্শায় মুকুরঃ স করঃ স্মৃতঃ।"

মধ্যমা অনামিকাকে নিচু করে এবং অঙ্গুষ্ঠা এদের সামনাসামনি কুঞ্চিত অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী হলে এবং তর্জনী ও কনিষ্ঠা কুঞ্চিত হয়ে ওপরের দিকে মুখ করে থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মুকুর বলে। সংযুক্তরূপে মুকুর বেদ, স্তম্ভ, ভ্রাতা, শয়তান, বিচ্ছেদ প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে শত্রু, ক্রোধ, গ্রীবা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

ভ্রমর ঃ "নমিতা তর্জনী যস্য স হস্তো ভ্রমরহয়ঃ"

তর্জনীকে নিচু করলে হাতের যে রূপ হয় তাকে ভ্রমর হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে

ছাতা, পাখা, সঙ্গীত, জল প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে গন্ধর্ব, জন্ম, ভীতি, রোদন প্রভৃতি অর্থ ভ্রমর হস্ত প্রকাশ করে।

সূচীমুখ : "মধ্যমানামিকা পৃষ্ঠমঙ্গুষ্ঠো যদি সংস্পৃশেৎ
কনিষ্ঠিকা কুঞ্চিতা চ সূচীমুখকরস্তু সঃ।"

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা তিনটি কুঞ্চিত থাকলে এবং অঙ্গুষ্ঠ এসে যুক্ত হলে এবং তর্জনী সোজা হয়ে উর্ধ্বমুখী হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে সূচীমুখ বলে। সূচীমুখ সংযুক্তরূপে, লক্ষণ, উর্ধ্বলম্ফন, পৃথিবী প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে মৃতদেহ, কর্ণ, রাজা, সাক্ষ্যদাতা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

পল্লব : "মূলম্ চানামিকাঙ্গুল্যা অঙ্গুষ্ঠো যদি সম্পৃশেৎ
স পল্লবকরঃ প্রোক্তো নৃত্যকর্মবিশারদৈঃ।"

অনামিকার নিচে এসে অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত হলে পল্লব হস্ত হয়। সংযুক্তরূপে পল্লব হস্ত ইন্দ্রায়ুধ, গিরিশিখর, মহিষ প্রভৃতি এবং অসংযুক্তরূপে দূরত্ব, ধুম্র, ধান্য, যবাদি শস্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

ত্রিপতাক : "অঙ্গুষ্ঠঃ কুঞ্চিতাকারস্তর্জনী মূলমাশ্রিতঃ
যদি স্যাৎস করঃ প্রোক্ত ত্রিপতাকে মুনীশ্বরৈঃ।"

অঙ্গুষ্ঠকে কুঞ্চিত করে তর্জনীর মূলদেশ স্পর্শ করলে হাতের যে রূপ হয় তাহাকে ত্রিপতাক হস্ত বলে। কনিষ্ঠা অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী উর্ধ্বমুখী হবে। সংযুক্তরূপে ত্রিপতাক সূর্যাস্ত, দেহ, ভিক্ষা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। ইহার কোনো অসংযুক্তরূপে প্রয়োগ হয় না।

মৃগশীর্ষ : "মধ্যমানামিকামধ্যমঙ্গুষ্ঠো যদি সংস্পৃশেৎ
মৃগশির্ষকহস্তোহয়ম্ কথিতো মুনিপুঙ্গবৈঃ।"

মধ্যমা, অনামিকা কুঞ্চিত হয়ে অঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং কনিষ্ঠা ও তর্জনী সোজা থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মৃগশীর্ষ বলে। সংযুক্তরূপে মৃগ, স্বর্গীয় বস্তু প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং মৃগশীর্ষ হস্তের কোনো অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

সর্পশীর্ষ : অঙ্গুষ্ঠস্তর্জনী পার্শ্বে সংস্পৃষ্টশ্চ ভাবত্যাদি
শেষাঃ কিঞ্চিদিন্ম্রাশ্চতু সর্পশীর্ষ করঃস্মৃতঃ।"

অঙ্গুষ্ঠ তর্জনীর পাশে যুক্ত হবে এবং সমস্ত অঙ্গুলিগুলি সংলগ্ন হয়ে সামনের দিকে অল্প কুঞ্চিত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে সর্পশীর্ষ বলে। সংযুক্তরূপে সর্পশীর্ষ হস্ত সর্প, প্রদান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। এর কোনো অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

বর্ধমানক : "স্পৃশেৎ প্রদেশিনী যত্র রেখামঙ্গুষ্ঠমধ্যগাম্
কিঞ্চিতোদঞ্চিতা শেষা স হস্তো বর্ধমানকঃ।"

চারি অংগ্লি মুষ্টিবন্ধ ও অংগুষ্ঠ সোজা হয়ে ওপর দিকে থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে বর্ধমানক হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে এই হস্ত যোগী, মাহুত, ভেরী, মুক্তামালা প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে কূপ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

অরাল ঃ "তর্জনী মধ্যমাম্ রেখাম্ অঙ্গুষ্ঠো যদি সংস্পৃশেৎ
কুঞ্চিতোদঞ্চিতাশ্চান্যা অরালঃ স করঃ স্মৃতঃ।"

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা—এই তিনটি অংগুলি কুঞ্চিত হয়ে মুষ্টির মতো হবে এবং তর্জনী সোজা হয়ে সামনের দিকে থাকবে এবং অংগুষ্ঠ তর্জনীর মধ্যভাগ স্পর্শ করবে, তাহলে হাতের যে রূপ হবে তা অরাল হস্ত। এই হস্ত সংযুক্তরূপে নির্বোধ, কুঁড়ি, নখর প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং কোনো অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

ঊর্ণনাভ ঃ "ঊর্ণনাভপদাকারাঃ পঞ্চাঙ্গুল্যশ্চ যত্র হি।
ঊর্ণনাভাভিধঃ প্রোক্তঃ স হস্তো মুনিপুঙ্গবৈঃ।"

হাতের পঞ্চাংগুলি কুঞ্চিত হয়ে সামনের দিকে থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে ঊর্ণনাভ বলে। সংযুক্তরূপে এই হস্ত অশ্ব, ব্যাঘ্র, পদ্ম, ফল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোনো অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

মুকুল ঃ "পঞ্চানামঙ্গুলিনাম্ চ যত্ত্বগ্রে মিলিতো ভবেৎ
সুষ্ঠম্ যত্র চ বিজ্ঞেয়ো মুকুলাস্ত্যঃ কর স্মৃতঃ।"

পঞ্চাংগুলি কুঞ্চিত হয়ে এক জায়গায় এসে মিলিত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মুকুল হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে এই হস্ত শৃগাল, হনুমান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোনো অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

কটকামুখ ঃ "মধ্যমানামিকামধ্যম্ অঙ্গুষ্ঠো প্রবিশেদ্যাদি
শেষাঃ সন্নমিতাঃ যত্র স হস্তঃ কটকামুখঃ।"

অংগুষ্ঠের অগ্রভাগ মধ্যমা ও অনামিকার মধ্য দিয়ে বাইরে চলে আসা অবস্থায় হাতের যে মুষ্টিবন্ধ রূপ তাকে কটকামুখ হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে ভৃত্য, বীর, অস্ত্রাগার মল্ল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোনো অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

এই সকল মূল হস্তগুলি সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রা ছাড়াও সমমুদ্রা ও মিশ্রমুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এই মুদ্রাগুলি আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, বিবর্তিত ও পরিবর্তিত—এই চার প্রকার পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়া পদার্থাভিনয়াত্মক অর্থাৎ বাক্যের অর্থ প্রকাশক।

কথাকলি নৃত্যে সম, আলোকিত সাচী, প্রলোকিত, মিলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত—এই আট প্রকার দৃষ্টি অর্থভেদে ব্যবহৃত হয়।

অক্ষিপুটেরও উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিত, সম, বিবর্তিত, স্ফুরিত, পিহিত, বিলোলিত—এই নয় প্রকার গতিতে প্রযুক্ত হয়। উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রূকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত, সহজ—এই সাত প্রকার ভ্রূকর্ম কথাকলি নৃত্যে ব্যবহৃত হয়। ভ্রমণ, বলন,

পাতন, সংপ্রবেশ, নিবর্তন, সমুদ্বৃত্তম, নিষ্ক্রাম, প্রাকৃত ও চলন—এই নয় প্রকার অক্ষি-গোলকের প্রয়োগ প্রচলিত।

সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত—এই নয় প্রকার শিরঃকর্ম কথাকলি নৃত্যে প্রয়োগ হয়।

নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছ্বাসা, বিকুণিতা, স্বাভাবিকী—এই ছয় প্রকার নাসাকর্ম ও ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ, কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম—এই ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম কথাকলি নৃত্যে প্রয়োগ হয়।

কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চুকিত, লেহ, সম, দষ্ট—এই সাত প্রকার চিবুককর্ম ও সমা, নতা, উন্নতা, ত্রস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা ও নিবৃত্তা—এই নয় প্রকার কণ্ঠ কথাকলি নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

এ ছাড়া বিকর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগূহন, সংদষ্ট, সমুদ্গক—এই ছয় প্রকার অধরকর্ম ও স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত, ও সাম্য—এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচলিত।

রসাভিনয় কথাকলি নৃত্যনাট্যের কঠিনতম ও শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রের মতে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই আটটি রস মন ও অনুভূতির সংঘাতে সৃষ্ট। রসই স্থায়ীভাবের উৎস। রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়—এই আটটি স্থায়ীভাব। পরবর্তীকালে 'শান্ত'কে নবম রসরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কথাকলি নৃত্যে নবরসেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রসনিষ্পত্তিই শিল্পকলার উন্নততম পর্যায়। কথাকলি নৃত্যশিল্পীর ভাবাভিনয়ে যে উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর।

কথাকলি অভিনয় পদ্ধতি পৃথিবীতে অতুলনীয়। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জায় কোনো পরিবেশ তৈরি করা হয় না। শুধুমাত্র অভিনয় কুশলতায় ও শিল্পকর্মের উৎকর্ষে নাট্যের রূপকর্ম ও চিত্রকর্মকে প্রস্ফুট করা হয়। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র রূপায়ণের সময় শিল্পীদের যেন এক অন্য জগতের ও আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী বলে ভ্রম হয়।

এই প্রসঙ্গে Dr Jung-এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

"It is not the world of the senses the body, colour and sound or human passions, which are born anew in transfigured form, through the creative power of the Indian soul ; but it seems as if there were an 'underworld' or an 'overworld' of a metaphysical nature, out of which strange forms emerge into the familiar earthly world. If one observes closely the tremendously impressive impersonation of the gods. performed by the Southern Indian Kathakali dancers, there is not a single natural gesture to be seen. Everything is bizarre, both subhuman and superhuman. The dancer-gods do not walk like people—they glide ; they do not seem to think with their heads—but with their hands. Even the human faces disappear behind enamelled masks. Our own world offers nothing which can be compared to such grotesque grandeur. When watching out of these spectacles one is

transported into the world of dreams, for that is the only place where we might conceivably meet anything similar. The representations of the kathakali dancers, or those depicted in the temple pictures, are however no nocturnal phantasms. They are tensely dynamic figures, logically constructed with the finest details or as if they had grown organically. These are no shadows or likenesses of a former reality, they are more like realities which have yet been, potential, potential realities, which can step at any moment over the threshold of existense."

কথাকলি অভিনয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ছবি এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যায়। কথাকলি নাট্যে দুটি প্রধান ভাগ। একটি তালাশ্রয়ী বা ছন্দবহুল অপরটি অভিনয়বহুল। মূলতঃ দৃশ্যকাব্য বলে কথাকলি অভিনয়প্রধান। আঙ্গিকাভিনয় ও রসাভিনয়ের মাধ্যমে কথাকলি-শিল্পীরা নাট্যের সকল অভিব্যক্তি দর্শকদের সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে সক্ষম। বেগুনফুলের ভিতরের অংশ রস করে শুকিয়ে চোখের নিচের পাতায় দিয়ে চোখের ভিতরের অংশ লাল করা হয়, কারণ লাল চক্ষু ভাবপ্রকাশে অধিক সাহায্য করে। এবং প্রসাধনের বিভিন্ন রং-এর উপকরণের অনিষ্টকারী ক্ষমতাকে এই রস নষ্ট করে, চোখ ও মুখের চামড়াকে সুস্থ রাখে।

কথাকলি নৃত্যে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কথাকলি গীতি পদম, শ্লোকম্ ও দণ্ডকম—তিন পর্যায়ে গীত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতশিল্পীরা সোপান ভঙ্গীতে গীতি পরিবেশন করেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে অষ্টপদীগুলি কথাকলি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কথাকলি নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁকে 'পোন্নান' বলা হয়। অপর শিল্পী যিনি প্রধান গায়ক কর্তৃক গীত হবার পর তার পুনরাবৃত্তি করেন তাঁকে 'সংকেটি' বলা হয়। কথাকলি নৃত্যে চাণ্ডা, মাদ্দলম্, চাংগালা ও এলাতালম বা কাইমনি এ চতুর্যন্ত্রই প্রধান। পোন্নান স্বয়ং চাংগালা এবং সংকেটি 'কাইমনী' বাজান। লক্ষণীয় যে তালযন্ত্রের প্রাধান্যই বিদ্যমান কারণ এগুলি সবই তালযন্ত্র। কথাকলি সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে কেশবন নায়ার, গোপালকৃষ্ণ ভগবতার, নীলকান্ত নাম্বেশন, মাধবন নায়ার, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কেশবন নাম্বুদ্রি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কথাকলিতে মূলতঃ পাঁচটি তাল প্রচলিত। যথা—চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়ান্দা, ত্রিপাড়া ও পঞ্চারী। কলাশম্ তালাশ্রয়ী নৃত্য, এই নৃত্যের দেহভঙ্গী ও পাদবিন্যাসগুলি বিচিত্র তালগুচ্ছ সহযোগে সুপরিস্ফুট হয়। এই তালগুচ্ছের প্রধান তাল গুচ্ছবিন্যাসের স্তরে স্তরে বিভিন্ন গুণারোপিত হয়ে একাধিকবার আবির্ভূত হয়ে যখন সমে এসে শেষ হয় তখন সমগ্র নৃত্যের এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক তৈরি হয়। সাধারণতঃ পদমের শেষেও অন্য পদম আরম্ভের আগে কলাশম্ ব্যবহৃত হয়। এড়া কলাশম্, অষ্ট কলাশম, এডিস্থ কলাশম, ওয়াট্টাম, বেচ্চা কলাশম্ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে কলাশম ব্যবহৃত হয়।

সারি কথাকলি নৃত্যের লাস্য ধরনের নৃত্যচ্ছন্দ। এই নৃত্যে নারীচরিত্র অথবা চরিত্রগুলি কোনো উদ্যানে নৃত্যের মাধ্যমে আত্মবিনোদন করে। রাজদরবারের দৃশ্যেও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সারি শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ চারীর সঙ্গে সম্পর্কিত। নাট্যশাস্ত্রের মতে

একে হস্ত চালনা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষম ভঙ্গী রচনা বলা যেতে পারে। ললিতা, চিত্রলেখা, ঊষা, রম্ভা প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্রে শিল্পীরা সারি নৃত্য করে থাকেন। সারি নৃত্যে মাদলম্, চ্যাংগালা ও কাইমনি ব্যবহৃত হয়। চান্দা এই নৃত্যে ব্যবহার হয় না। সারি নৃত্যে চাম্বাড়া (আট মাত্রা) তাল ব্যবহৃত হয়। মিনিক্কু জাতীয় রূপসজ্জা। স্ত্রীলোকের ভূমিকার উপযোগী লোকনৃত্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট লাস্য ধরনের সমবেত নৃত্য কুম্মিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে কথাগুলি নৃত্যশৈলীতে তাণ্ডব লক্ষণ-ই অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রযুক্ত হয়। যে জন্যে এই নৃত্য নিঃসন্দেহে পুরুষ শিল্পীদের অধিকতর উপযোগী।

তামিলনাদের প্রচলিত একক নৃত্য ভরতনাট্যমের মতো কেরলের মোহিনীঅট্যম নৃত্য মহিলাশিল্পীদের অনুষ্ঠানের জন্যে সৃষ্ট। কেউ কেউ বলেন প্রখ্যাত অপ্সরা মোহিনী যিনি শিবেরও তপোভংগ করেছিলেন, তিনি এই নৃত্য সৃষ্টি করেন। আবার কারো কারো মতে বিষ্ণু ভস্মাসুর বধের জন্যে মোহিনী মূর্তি ধারণ করে নৃত্যের প্রতিযোগিতায় যে নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন তাই মোহিনীআট্যম্। শৃংগাররসাত্মক লাস্য নৃত্য মোহিনী-আট্যমের সংগে ভরতনাট্যমের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই নৃত্যে সাধারণ রূপসজ্জা ও অলংকার ব্যবহৃত হয়।

কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ অথচ আড়ম্বরহীন ওট্টান তুল্লাল, কালী আটম্ প্রভৃতি নৃত্য কেরলে প্রচলিত। তুল্লালে শিল্পীরাই গান করে। কথাকলির মুদ্রাগুলি ব্যবহৃত হয়। পাচ্চা ধরনের রূপসজ্জা ব্যবহৃত হয়। শিল্পীর মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার মুকুট থাকে। শ্রীকুঞ্জন নাম্বিয়ার এই নৃত্যশৈলীর প্রবর্তক। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নৃত্যশৈলী অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কথাকলি নৃত্য শিক্ষাদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত। এই অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যেও এই নৃত্যকলার বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এগার থেকে চোদ্দ বৎসর বয়স্ক ছাত্ররা কালারীতে (গুরুর আশ্রম) গিয়ে গুরুকে অর্থ ও বস্ত্র দক্ষিণা দিয়ে ছয় হাত লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া মোটা কাপড়ের 'কাচ্চা' ও তৈল গ্রহণ করে। প্রত্যুষে চোখে তেল লাগিয়ে দুই ঘণ্টা ধরে অবিরাম দৃষ্টিকর্ম অভ্যাস করতে হয়। তারপরে সমস্ত দেহে ভাল করে তেল মাখতে হয়। তারপর বিভিন্ন অংগ সঞ্চালনের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হবার পর গুরু পায়ের বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দিয়ে ছাত্রের দেহের গ্রন্থিসমূহ মালিশ করে দেন। এতে মাংসপেশী ও গ্রন্থিসমূহের নমনীয়তা ও সঞ্চালনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর পর স্নান প্রাতরাশ গ্রহণের পর ছন্দের তালে তালে নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—চক্ষু, অক্ষিপুট, ভ্রূ, গ্রীবা ও অন্যান্য অংগপ্রত্যংগের সঞ্চালন পদ্ধতি। তৃতীয় পর্যায়ে—মুদ্রা, ভাবাভিনয় ও বিভিন্ন ভংগী প্রকাশের শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ পর্যায়ে চতুর্বাদ্যের সংগে অনুশীলন করানো হয়। এই সব শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছাত্রের অধ্যবসায় ও দক্ষতা অনুসারে তাকে কথাকলি অনুষ্ঠানের মহড়ায় উপস্থিত করা হয়। এই শিক্ষাক্রমের মোট সময় অন্যূন এগার বৎসর। এই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস অনুশীলন পদ্ধতিই কথাকলি শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনেতায় পরিণত করে।

কথাকলি শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মহাকবি ভাল্লাথোল নারায়ণ মেননের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির এই লুপ্তপ্রায় মহান ধারাটিকে

নবজীবন দান করেছেন। নিরলস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জীবনের দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর কেরালা কলামণ্ডলম স্থাপন করে এই মহান সাধনায় আত্মদান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে মালয়, চীন, সিংহল ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কথাকলি শিল্পীসম্প্রদায়-এর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে।

প্রখ্যাত কথাকলি নৃত্যগুরুদের মধ্যে চেঙ্গান্নুর রমন পিল্লাই, কুঞ্জ কুরুপ, কৃষ্ণান নায়ার, কুঞ্জ নায়ার, রামন কুট্টি নায়ার, কৃষ্ণকুট্টি, চম্পাকুলম, পাচু পিল্লাই প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীউদয় শংকরের কথাকলি নৃত্যগুরু শংকরণ নাম্বুদ্রি কথাকলি অভিনয়মের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে স্বীকৃত। বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় আচার্য গুরু গোপীনাথ কথাকলি নৃত্যধারার সংস্কারসাধনের অগ্রদূত। এই প্রাচীন নৃত্যকলার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে যুগোপযোগী পরিমার্জিত নবরূপায়ণে এই ধারাটিকে সার্থক প্রয়োগে সাম্প্রতিককালে কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন, কেলু নায়ার প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন।

মণিপুরী নৃত্য

সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্য স্মরণাতীত কাল থেকেই সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট গৌরবময় স্থানের অধিকারী। পর্বতমালাবেষ্টিত এই ক্ষুদ্ররাজ্যটি বিচিত্র মানস সংস্কৃতির সম্পদে, সহজাত শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের দীপ্তিতে রূপময় ভারতসংস্কৃতির অনির্বান শিখাটিকে উজ্জ্বলতর করেছে। সংগীত ও নৃত্যকলায় এরকম জাতিগত প্রবণতা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় না। মণিপুরী সংস্কৃতির বিকাশের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি নৃত্যকলায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। সমষ্টিগতভাবে একে মণিপুরী নর্তন বা 'মৈতে জগোই বলা হয়।

মণিপুর রাজ্যের উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনীটিও নিঃসন্দেহে মণিপুরীদের সংগীত ও নৃত্যে অনুরাগের পরিচয় বহন করে। মণিপুর রাজ্যে প্রচলিত বহু প্রাচীন গাথা ও পৌরাণিক উপকথাতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—মণিপুর অধিবাসীদের সংগীত ও নৃত্যেব প্রতি গভীর অনুরাগ। মণিপুর রাজ্য ও তার সংগীত ও নৃত্যকলার উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী বহুল প্রচলিত।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে একটি নির্জন স্থানে রাসলীলার অনুষ্ঠান কবেন। শিব রাসলীলা দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রাসমণ্ডলীর দ্বাররক্ষক নিযুক্ত কবেন। শিব যখন দ্বাররক্ষীরূপে রাসলীলার সুললিত সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত, তখন সেখানে পার্বতী এসে উপস্থিত হলেন। পার্বতী শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাসমণ্ডলীর দ্বার খুলে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত কবেন। এই রাসলীলা দেখবাব পর হতেই তিনি শিবের সঙ্গে রাসনৃত্য করবার জন্যে অধীর হয়ে শিবকে তাঁদের রাসলীলা করবার উপযোগী একটি স্থান নির্বাচন করতে বলেন। শিব ও পার্বতী তখন পৃথিবী পরিভ্রমণ করে হিমালয়ের পাদদেশে মণিপুরে অবতীর্ণ হলেন।

কথিত আছে শিবের ইচ্ছায় মণিপুরে স্বর্গ থেকে সাতজন দেবতা বা 'সানাজিঙ' আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরাই হলেন সপ্তগ্রহ অর্থাৎ 'নোঙমাইজিঙ' বা সূর্য, 'নিঙ্থোউকাবা' বা চন্দ্র, 'লেইপাক্পোকু' বা মঙ্গল, 'য়ুম-সাইকে-সা' বা বুধ, 'সাগোলসেল' বা বৃহস্পতি, 'ইবাই বা শুক্র ও 'খাঙ্জা' বা শনি। শিব ও পার্বতী 'কোউব্রু' বা কুমার পর্বতকে তাঁদের রাসলীলাব উপযোগী স্থান হিসাবে নির্বাচন করলেন। পর্বতের পাদদেশ জলমগ্ন। তখন শিব শ্রীকৃষ্ণকে স্থানটিকে রাসনৃত্যের উপযোগী জলশূন্য শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করার জন্যে অনুবোধ কবেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন 'হাওবা শোরারেল বা ইন্দ্র, 'মারজিঙ' বা কুবেব, 'রাঙব্রেল' বা যম, 'খোরিকাবা' বা বরুণ, 'ইরুমু-নিংথৌ' বা অগ্নি, 'থাঙজিঙ' বা অশ্বিনীকুমার, 'চিংথেই-নিঙ্থোই' বা ঈশান, 'লোইয়া লাকপা' বা বায়ু, 'নোঙসাবা' ও 'কোঙবা-মেইরোম্বা'—এই দশজন দেবতার সাহায্যে দেশটিকে জলশূন্য পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত করলেন। এখানে সাতদিন সাতরাত্রি ধরে শিবপার্বতীর রাসলীলা অনুষ্ঠিত হল। গন্ধর্ব ও অন্যান্য দেবতাগণ হলেন সংগীত সহযোগী। পাতালের নাগদেবতা অনন্তনাগ তাঁর মাথার উজ্জ্বল মণির সাহায্যে স্থানটিকে

আলোকিত করলেন। নাগদেবতার মণির আলোকে উজ্জ্বল বলে এই দেশের নাম হল মণিপুর।

অনন্তনাগই প্রথমে মণিপুরের রাজা হন। তার পরে রাজপদে অভিষিক্ত হন গন্ধর্ব চিত্রভানু। মণিপুরীরা নিজেদের এই নৃত্যগীত কুশল গন্ধর্বদের বংশধর বলে পরিচয় দেয়। এবং প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের বীর অর্জুন ও গন্ধর্বরাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর উল্লেখ করে। সর্পমূর্তিযুক্ত মণিপুরের পতাকা এখানকার প্রথম রাজা অনন্তনাগের পরিচয় বহন করে।

এ-ছাড়াও বহু বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনী থেকে হিন্দু-পূর্ব যুগের মৈতে জাতির উৎপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। জর্জ গ্রিয়ার্সন, চার্লস লয়েল, ডঃ ব্রাউন, টি সি. হডসন প্রভৃতি প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মণিপুরীরা মোঙ্গলীয় কুকি-চিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এদের কিরাতশ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে কিরাতদের কথা পাওয়া যায়।

মণিপুরী সংস্কৃতি সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'মণিপুরীরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, খ্রীস্টীয় ১৫০০-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম প্রসারলাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করেন ; আবার নিজেদের আদিকালের ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন ; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মণিপুরে হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট হইতে আগত বাঙালী হিন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন ; ইহাদের অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর নগর, মণিপুরে হিন্দুসংস্কৃতির একটি প্রাচীন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। মণিপুরী (বা মেইতেই) জাতি, বিরাট কিরাত-জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত কুকি (বা চিন, অথবা কুকি চিন) প্রশাখার একটি বিশিষ্ট উপজাতি সৌন্দর্যবোধে এবং কর্মকুশলতায়, তথা চিন্তাশীলতায় ও মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজেদের প্রাচীন দেবকথা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই ; ইহা একাধারে ইহাদের রক্ষণশীলতার ও জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আনুষঙ্গিক আত্মসম্মানজ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক। আবার ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় নিবন্ধ হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নিজেদের পুরাণকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টাতেও, অজ্ঞাতসারে আর্যানার্য-সম্মেলনের মহৎ কাজে ইহাদের অংশগ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায়।'

প্রকৃতপক্ষে জাতি ও ধর্মের এই বৈচিত্রপূর্ণ সমন্বয়ের ফলেই মণিপুরের উন্নত আর্য-কিরাত সংস্কৃতি মহত্তর হয়েছে। যে-কোনো জাতির সংস্কৃতির রূপই তার সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। মণিপুরী সমাজের গঠন ও সংস্কৃতির বিকাশ এর কারণ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্‌ধৃতি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় : 'কিন্তু তাহারই অন্যতম আঞ্চলিক শাখা মণিপুরীদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। যে-কোনো কারণেই হউক, একদিন নাগাজাতির মূলশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ইহা একটি বিশিষ্ট সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সামাজিক জীবনের একটি

প্রধান ধর্ম এই ছিল যে, ইহা নিজের মধ্যে নিশ্ছিদ্র হইয়া বাস করে নাই ; যে সকল উপকরণ দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্য পুষ্ট ও আয়ু বর্ধিত হইতে পারে, তাহা ইহারা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার ফলে ইহার প্রাণশক্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দুই ই বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ইহার আকৃতি ও প্রকৃতির মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় নাই। মণিপুর একদা ব্রহ্মদেশের অধীন ছিল ; সেই সময় ইহা ব্রহ্মদেশীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে ; তারপর একদিন যখন বাংলাদেশ হইতে বৈষ্ণবধর্ম গিয়া যেখানে প্রচার-লাভ করিয়াছিল, সেইদিনও সে তাহার সমাজ জীবনের মধ্যে তাহা বরণ করিয়া লইয়াছে ; কিন্তু ধর্মপালনের তাহার যে নিজস্ব আঙ্গিক, তাহাই ইহার উপর আরোপ করিয়া লইয়াছে। এইখানেই মণিপুর অন্যের উপকরণ গ্রহণ করিয়াও স্বকীয়তা রক্ষা করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ কিংবা বাংলার সংস্কৃতি ইহার নিজস্ব সংস্কৃতি গ্রাস করিতে পারে নাই, বরং উভয়ের নিকট হইতে দুই হাত পাতিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে নিজের মতো করিয়াই ব্যবহার করিয়াছে ; ইহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় কথা এই যে, ইহাদের চাপে পড়িয়া সে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির মৌলিক প্রকৃতি বিসর্জন দেয় নাই। সেইজন্যে মণিপুরবাসীগণ অর্জুনের বংশধর বলিয়া দাবী করিলেও মহাভারতের সংস্কৃতির মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া নাই, উৎসবে পার্বণে তাহারা নিজেদের জাতীয় চরিত্রসমূহের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকে ; রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী অপেক্ষাও মণিপুরে থৈবী ও খাম্বার প্রেমকাহিনী অধিকতর জনপ্রিয়। সঙ্গীতে ও নৃত্যে একদিক দিয়া ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী যেমন তাহারা নিজেদের মতো করিয়া রূপায়িত করিতেছে, আবার তেমনই নিজেদের জাতীয় আখ্যায়িকা সমূহকেও তাহাদের মধ্য দিয়া রূপ দিতেছে। অতএব মণিপুরীর সমাজ একটি আদর্শ সংহত সমাজ, অর্থাৎ ইহাই যথার্থ লোকসংস্কৃতি (folk culture)—তথা লোকসাহিত্যের জন্মস্থান হইতে পারে।'

এই উন্নত সামাজিক পরিবেশে উদ্ভূত বলেই শুধুমাত্র মণিপুরী নৃত্যকলা নয়—সকল মণিপুরী শিল্পকর্মই আদিম সারল্যপূর্ণ অথচ পরিশীলিত রুচিস্নিগ্ধ রূপময়তা ও রসসম্পদে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সৃষ্টি করে।

পুরাণ ও প্রাচীনগাথার কথা বাদ দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে মণিপুরের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৫৪ খ্রীস্টাব্দের একটি তাম্রফলক মণিপুরের সংস্কৃতির সব থেকে প্রাচীনতম নিদর্শন। ঐ তাম্রফলকে রাজা কোয়াই-থম্পককে সঙ্গীত ও নৃত্যের একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজা খো-লো-ফেও মণিপুর রাজ্য অধিকার করেন এবং তিনি আসাম ও মণিপুরের নৃত্যশিল্পীদের সমন্বয়ে একটি শিল্পীদল চীন-দেশে পাঠান। কথিত আছে ১০৭৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা লয়াম্বা খাম্বাথৈবীর প্রেমের করুণ কাহিনী অবলম্বনে 'লাইহারাউবা' নৃত্যের প্রচলন করেন। আনুমানিক ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে মণিপুর চীন সংঘর্ষে মণিপুরীরা জয়লাভ করেন। সেই যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের অনেকে মণিপুর উপত্যকার সুসারামেও নামক স্থানে বসবাস করে। এদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মণিপুরীগণ শিক্ষালাভ করেন। ১৪৬৭ খ্রীস্টাব্দে মণিপুরের রাজা কায়াম্বার রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশের রাজা পঙ মণিপুর থেকে সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী ও মৃদঙ্গবাদক ব্রহ্ম-দেশে নিয়ে যান। তার বিনিময়ে ব্রহ্মদেশীয় রণশিঙ্গাবাদক মণিপুরে আসে। রাজা

কারাম্বার সময় মণিপুরে শৈব ও বৈষ্ণব এই উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা পামহৈবার রাজত্বকাল থেকেই মণিপুরের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা। এবং এর পূর্বের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এব অন্যতম কারণ রাজা পামহৈবা যখন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন তখন পূর্বতন সমস্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মণিপুর রাজ্যের ইতিহাসের কিছু কিছু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজা পামহৈবা গোস্বামী শান্তি-দাস অধিকারীব প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এই বৈষ্ণবধর্ম ছিল রামানন্দী ভাবাদর্শে প্রভাবিত। বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের ফলে মণিপুর রাজ্যের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে। রাজা পামহৈবা প্রজাদের মধ্যে মৈতে ব্রাত্যধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণবধর্মের প্রচলনেব চেষ্টা করেন এবং তদনুযায়ী গুরু গোস্বামী শান্তিদাসের নির্দেশে মৈতে ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত নথিপত্র বিনষ্ট করা হয়। তিনি মৈতে দেবদেবীদের পূজা, মৈতে ভাষা ও বর্ণমালার প্রচলন নিষিদ্ধ করেন। স্বভাবতই ইহা মৈতে শিল্প সংস্কৃতির উপর বিশেষ আঘাত হানে। এর পর থেকেই মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। রাজা পামহৈবা 'গরীব নেওয়াজ' বা দরিদ্রের আশ্রয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্মকে মণিপুরের জাতীয় ধর্মে পরিণত করেন।

রাজা পামহৈবার পৌত্র চিঙ সাঙ্ খম্বা অথবা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ "কর্তা মহারাজা" নামে পরিচিত। ১৭৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৭৮৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল মণিপুরী সংস্কৃতির বিকাশের স্বর্ণযুগ। রাজা ভাগ্যচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশ থেকে চৈতন্যদেবের শিষ্য প্রেমানন্দ ঠাকুর মণিপুরে আসেন। ফলে ক্রমশঃ রামানন্দী ভাবাদর্শের পরিবর্তে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে প্রসার লাভ করে। এবং কালক্রমে মৈতে বর্ণমালার পরিবর্তে বাংলা বর্ণমালা মণিপুরে প্রচলিত হয়। মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় এর প্রভাব পড়ে। এবং চৈতন্য, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের পদাবলী মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুসৃত হতে থাকে।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র যে কেবলমাত্র বীর ও সুশাসক ছিলেন তাই নয়, তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে বার বার ব্রহ্মরাজের আক্রমণ প্রতিহত করেন। রাজা ভাগ্যচন্দ্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁর সময়েই মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। রাজা ভাগ্যচন্দ্রই মণিপুরের বিখ্যাত রাসনৃত্যের প্রবর্তক। তিনি নিজেও সঙ্গীত ও নৃত্যের একজন কুশলী ও দক্ষশিল্পী ছিলেন। রাসনৃত্যের প্রচলন সম্পর্কে মণিপুরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে মণিপুর রাজ্য ব্রহ্মদেশের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং রাজা ভাগ্যচন্দ্র পরাজিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে আত্মগোপন করে বেড়ান। তিনি যখন আসামের রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন মণিপুর রাজ্য হতে আসাম অধিপতির নিকট এক রাজকীয় সংবাদ এল যে, তিনি পত্র প্রাপ্তিমাত্র যদি ভাগ্যচন্দ্রকে হত্যা অথবা রাজ্য হতে বিতাড়িত না করেন তবে তাঁর রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে। আসামের রাজা তখন মহাবিপদে পড়লেন। একদিকে তাঁর মান্যবর অতিথি অপরদিকে নিরীহ

প্রজার মঙ্গল। রাজা গোপনে মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ভাগ্যচন্দ্রকে ডেকে বললেন যে তাঁর রাজ্যে এক মত্তহস্তী প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করছে। যদি বীরশ্রেষ্ঠ ভাগ্যচন্দ্র এই হস্তিটিকে বিনাশ করেন তবে রাজা বড়ই ব্যথিত হবেন। ভাগ্যচন্দ্র সবই বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি নিজের বীরত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলেন না। অবশেষে হস্তী শিকারের দিন সমাগত। আর মাত্র একদিন বাকী। ভাগ্যচন্দ্র অহরহ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে আরম্ভ করেন। ঐদিন রাত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন—'বৎস, তুমি ভয় পেও না। প্রভাতে হস্তীর নিকট যাবার সময় তুমি আমার কণ্ঠের এই তুলসীমালা নিয়ে হস্তীর সামনে উপস্থিত হবে। দেখবে তখন সে তোমাকে নতমস্তকে অভিবাদন করে নিজস্কন্ধে তুলে নেবে। সেই হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে তুমি মণিপুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে তা পুনরুদ্ধার করবে। তারপর কেয়ান পর্বতে যে কাঁঠাল বৃক্ষ আছে তার কাণ্ডের দ্বারা আমার মূর্তি নির্মাণ করে মর্ত্যে আমায় পুজার প্রচার করবে।

পরদিন প্রাতে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী হাতীর সামনে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত তুলসীমালা নিয়ে উপস্থিত হলেন। হাতী তাঁকে দেখামাত্র শুঁড় নেড়ে অভিবাদন করে নিজস্কন্ধে বসাল। প্রজামণ্ডলী তা দেখে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। রাজা ভাগ্যচন্দ্র হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে মণিপুর রাজ্য উদ্ধার করলেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে কেয়ান পর্বতের কাঁঠাল বৃক্ষের কাণ্ড আনিয়ে শিল্পীকে মূর্তি নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু শিল্পী বললেন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি কিরূপ তা তিনি জানেন না। যদি রাজা ভাগ্যচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ রূপ বর্ণনা করেন তা হলে তিনি মূর্তি নির্মাণ করতে পারেন। তখন রাজা ভাগ্যচন্দ্র সুললিত সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণনা করলে শিল্পী সেই বর্ণিত রূপ কাঠের মধ্যে জীবন্ত করে তুললেন।

মণিপুরে তখন ব্রাহ্মণ জাতি প্রায় বিলুপ্ত। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পুজা কিভাবে হবে এই সমস্যা উপস্থিত হল। ঐদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে পুনরায় স্বপ্নাদেশ দিলেন যে রাজার কন্যাকে শ্রীরাধা সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি মণ্ডলীর মধ্যে রেখে রাস-নৃত্যের মাধ্যমেই তাঁর পুজা ও প্রচার হবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রত্যহ রাত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের রাসনৃত্য প্রদর্শন করেন এবং পরদিন প্রাতে রাজা তাঁর কন্যাকে তা শিক্ষা দেন। এই-রূপে মণিপুরে রাসনৃত্যের সৃষ্টি ও প্রচার হল।

এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কোনো সঠিক প্রমাণ নেই। তবে একথা সত্য যে রাজা ভাগ্যচন্দ্রই রাসনৃত্যের প্রবর্তক এবং তাঁর কন্যা আজীবন কৃষ্ণপ্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করেন। মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত বহু গ্রন্থ আছে। ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা লাইরেশ্বী অথবা বিম্ববতীমঞ্জরী নবদ্বীপধামে অনুপ্রভু মন্দিরে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র আসামের যাত্রা, বাংলার কীর্তন ও মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের সমন্বয়ে ও সংমিশ্রণে রাসনৃত্য নবরূপে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করেন। এবং গুরু স্বরূপানন্দ ও রসানন্দ ঠাকুরের নির্দেশে রাজ্যের নৃত্যগুরুদের সহযোগিতায় রাসনৃত্যের আঙ্গিক, পোশাক, সঙ্গীত ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। ভাগ্যচন্দ্রই মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস ও ভঙ্গীপারেঙ প্রবর্তন করেন।

রাজা ভাগ্যচন্দ্রের পরবর্তীকালে তাঁর পৌত্র চন্দ্রকীর্তি সিংও ছিলেন মণিপুরী নৃত্যগীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এককথায় বলা যেতে পারে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময় থেকে চন্দ্রকীর্তি সিং-এর সময় পর্যন্ত এই একশো বৎসর মণিপুরী সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। চন্দকীর্তি সিং নর্তনরাস-এর প্রবর্তক। মণিপুরী নৃত্যের প্রাচীনতম ধারা 'লাইহারাউবা'র পুনরুজ্জীবনে চন্দ্রকীর্তি সিং-এর অবদান অসামান্য।

'লাইহারাউবা' শব্দের অর্থ দেবগণের উৎসব। লাই অর্থে দেবতা ও হারাউবা অর্থে আনন্দনৃত্য বোঝায়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তনের আগে মণিপুরে শৈবধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনার প্রচলন ছিল। লাই শব্দটি লিঙ্গ পূজার প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও মণিপুরী সমাজে প্রাকবৈষ্ণব যুগের দেবদেবীদের সমাদর ও আদিম ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন ব্যাহত হয় নি। হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে মৈতে দেবদেবীরাও সমান আসন লাভ করেছেন। বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সাধন-পদ্ধতির সাদৃশ্যও অনেক সময় চোখে পড়ে। লাইহারাউবা মৈতে নৃত্যধারার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। লাইহারাউবা শিবপার্বতীর মহিমা প্রচারের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরী অধিবাসীদের বিশ্বাস যে হরপার্বতীর পূজায় ভক্তিভরে নৃত্য করতে পারলে দেবতাগণ তুষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে লাইহারাউবার বিন্যাস নৃত্যনাট্যের মতো। 'মৈরাঙ লাইহারাউবা' ও 'উমঙ লাইহারাউবা' এই দুই শ্রেণীতে খাম্বাথৈবী, নঙপক্‌নিঙথৌপানথৈবী, থনজিঙ লাইরেম্বী প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বনে লাইহারাউবা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। লাইহারাউবা নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্য এই উভয় ধারাই প্রযুক্ত হয়। ইহা মূলতঃ শৈব নৃত্য হলেও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই নৃত্যপদ্ধতিতে রাসনৃত্যের অন্যতম উপাদান ভঙ্গীপারেঙ-এর প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে পনের-দিন ব্যাপী এক বিরাট লাইহারাউবা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মৈরাঙ-পুর্বার কাহিনী অবলম্বনে একক, দ্বৈত ও সমবেত—এই তিন পর্যায়ে এই নৃত্যনাট্যের রূপবন্ধ ও নৃত্যছক রচনা করা হয়।

লাইহারাউবা উৎসবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে মণিপুরের দেবদাস ও দেবদাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা জানা বিশেষ প্রয়োজন। মৈতে ভাষায় এদের মৈবা ও মৈবী বলা হয়। এরাও শিব-পার্বতীর আরাধনায় উৎসর্গীকৃত কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের দেবদাসী প্রথার সঙ্গে একমাত্র প্রভেদ এই যে মণিপুরে পুরুষেরাও এই জীবন গ্রহণ করে দেবদাস বা মৈবা রূপে গণ্য হতে পারেন। বর্তমানেও মণিপুর প্রাসাদে প্রায় পঞ্চাশজন দেবদাসী আছে। এঁরা সাধারণতঃ শাদা পোশাক পরে থাকেন। দেবদাসীর লক্ষণ সূচিত হলে তাঁদের এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অনেক সময় দেবার্চনায় নৃত্যকালে এদের 'ভর' হয়। তখন তাদের মৈবী লাইতোঙবা বলা হয় এবং তারা বাঁহাতে ঘণ্টাধ্বনি করতে করতে দৈবকথা বর্ণনা করেন।

মণিপুরী পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে জানা যায় নয়জন 'লাইবুঙথু' বা দেবতা এবং সাতজন 'লাইনুরা বা দেবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবী তখন জলমগ্ন ছিল, এবং এই সাতজন দেবী জলের উপর নৃত্য করছিলেন। নয়জন দেবতা স্বর্গ থেকে

মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং দেবীদের নৃত্যছন্দে ঐ মৃত্তিকা থেকে স্থলভাগের উৎপত্তি হয়।

লাইহারাউবা উৎসবের পারম্ভিক অনুষ্ঠানটিকে 'লাইএকাউবা' বলে। গ্রামের প্রধান অধিবাসী ও অন্যান্যদের সঙ্গে মৈবা ও মৈবীগণ হ্রদ বা নদীতীরে গিয়ে জলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে দৈবীশক্তি প্রার্থনা করে। তারপর শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে জলে ঝাঁপ দেয় এবং ভরগ্রস্ত অবস্থায় নৃত্য করে। এই দ্বিতীয় অংশকে 'লাইথেম্বা' বলা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় 'লাইকাবা' অর্থাৎ দেবদেবীদের আবির্ভাব অংশ। এইবার শোভাযাত্রা গ্রামের দিকে ফিরে আসে। দুটি মাটির কলসীতে করে দুজন দৈবশক্তির প্রতীক নিয়ে আসে। এইবার মৈবীরা নৃত্যছন্দে পূর্বোক্ত নয়জন দেবতা ও সাতজন দেবীকে জাগ্রত করার অভিনয় করে। এই অংশের নাম 'লাইহুম্বা'। কথিত আছে এই সময় চারিদিক থেকে মারজিঙ, থানজিঙ, কোউব্রু ও ওয়াঙবারেন—এই চারজন দেবতা অনুষ্ঠান দর্শন ও রক্ষণ করেন।

এর পর দুজন দেবদাসী গ্রামের সামনে ঢিমালয়ে দেববন্দনা নৃত্য করে। একে বলা হয় 'জগোই ওক্‌পা।' এই নৃত্যে মুষ্টি হংসাস্য ও অর্ধচন্দ্র মুদ্রাসহ বিভিন্ন করণ ও অঙ্গহার প্রযুক্ত হয়। এর পরে মৈবীরা 'লাইপো' বা দেবতার জন্ম এই অংশ অভিনয় করে। বিভিন্ন মুদ্রার সহযোগে এই অংশে সৃষ্টি রহস্য রূপায়িত হয়, স্বর্গীয় নবজাতকের আবির্ভাবে এই অংশের পরিসমাপ্তি।

এর পরের অংশ গৃহনির্মাণ। দুজন দেবদাসী বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিনয়ের সাহায্যে গৃহনির্মাণের খুঁটিনাটি পর্যন্ত রূপায়িত করে। এই গৃহ দেবদেবীদের উৎসর্গ করা হয়। এই অংশে পতাক, সূচী, অঞ্জলি, মুষ্টি, কর্তরী ও অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি সংযুক্ত ও অসংযুক্ত হস্তের প্রয়োগ হয়। এরপর শিবের অবতার 'নঙপকনিঙথু' ঐ গৃহ থেকে বেরিয়ে পার্বতীর অংশ 'পানথৈবীর' সঙ্গে মিলিত হন। এই অংশ সঙ্গীত সহযোগে শৃঙ্গার-রসাত্মক অভিনয়ে রূপায়িত হয়। এর পরের অংশে তুলা চাষ ও বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি অপূর্ব-নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। এই বস্ত্র দেবতাদের উৎসর্গ করা হয়। এইখানেই শোভা-যাত্রার বিরতি ও লাইপো অভিনয়-এর সমাপ্তি।

এর পরবর্তী অংশে মৎস্যশিকার পদ্ধতি রূপায়িত হয়। এই অনুষ্ঠান কয়েকদিন ধরে চলে। অবশেষে সমাপ্তিতে দেবদেবীরা কল্পিত নৌকারোহণ করে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিভিন্ন আঞ্চলিক ধারা অনুসরণ করে লাইহারাউবা নৃত্য উৎসবের তিনটি প্রধান রূপ প্রচলিত। এই তিনটি ধারার নাম- কঙেলি, মৈরাঙ ও চাকপা। শিব ও পার্বতী প্রত্যেক ধারাতেই বিভিন্ন নামে আবির্ভূত হন। বিভিন্ন ধারায় কিছু কিছু আঞ্চলিক প্রথাপুষ্ট ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠানের সংযোগ দেখা যায়।

মণিপুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকগাথা খাম্বা থৈবীর কাহিনী অবলম্বনে লাইহারাউবা নৃত্যের অনুষ্ঠান সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত। এই খাম্বাথৈবীর উপাখ্যানকে মণিপুরের জাতীয় উপাখ্যান বলা হয়। কথিত আছে রাজা লয়াম্বার রাজত্বকালে (১১২৭-৫৪ খ্রীঃ) খাম্বা ও থৈবী জীবিত ছিলেন। এই কাহিনী মণিপুরের বিখ্যাত মহাকাব্য মৈরাং পুর্বাতে লিপিবদ্ধ আছে। মণিপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গত

হিজ্‌ম আঙওংহাল সিং খাম্বাথৈবীর কাহিনী অবলম্বনে উনচল্লিশ হাজার ছত্রসমন্বিত বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলে লোককবিদের দ্বারা এই কাহিনীর বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়।

মণিপুর রাজ্যে খাম্বা ও থৈবীকে শিবপার্বতীর অংশরূপে কল্পনা করা হয়। খাম্বা ছিলেন মৈরাঙ গ্রামের এক দরিদ্র ও সাহসী যুবক। থৈবী মৈরাঙ বংশের রাজকন্যা। মৈরাঙ গ্রাম ইম্ফল শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজকন্যা থৈবী একদা নির্জন লোগতাক্‌ হ্রদে সহচরীদের সঙ্গে মৎস্যশিকারে যান। রাজার আদেশে ঐ সময়ে ঐ স্থানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কথিত আছে খাম্বা প্রভু থানজিং কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেই সময়ে লোগতাক্‌ হ্রদে গমন করেন। রাজকন্যা থৈবী এই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ যুবাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। খাম্বা ও থৈবী প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হলেন। উভয়ের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য স্বভাবতই তাঁদের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় হল। অবশেষে বহু বিপদ ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে হল তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন। থৈবীকে লাভ করবার জন্যে রাজরোষে খাম্বার বহুবার জীবন সংশয় হয় এবং থৈবীকেও কিছুকাল ক্রীতদাসীর জীবন স্বীকার করতে হয়। এই সকল ঘটনায় খাম্বাকে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করতে হয় এবং অবশেষে রাজা তাঁদের বিবাহে সম্মত হন। খাম্বা ও থৈবীর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক। কিন্তু মানুষের মন বড় বিচিত্র। বিবাহের কিছুকাল পরে থৈবীর প্রেমে খাম্বার সংশয় দেখা দেয়। মণিপুর রাজ্যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব পরীক্ষা করবার একটি প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। প্রণয়ী পরস্ত্রীর ঘরের মধ্যে তার বর্শার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয়। তখন যদি ঐ স্ত্রীলোক *বর্শাটি টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দেয়,* তাহলে বুঝতে হবে যে প্রণয়ীর অসৎ *প্ররোচনায় সম্মত হতে* তার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীলোকের তাতে আপত্তি থাকে তাহলে সে বর্শাটি বাইরে নিক্ষেপ করে প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে।

খাম্বা একদিন থৈবীকে বললেন যে তিনি একটি বিশেষ কাজে গ্রামান্তরে যাবেন এবং পরদিন প্রাতে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন। রাত্রে খাম্বা থৈবীর ঘরে তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে নিজের বর্শার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। থৈবী তা টেনে নিয়ে সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করে বললেন, 'কোন্‌ শয়তান আমার মতো সতী নারীকে অসম্মান করতে সাহস করে।' সেই বর্শার আঘাতে বাহিরে খাম্বার দেহ ভূলুণ্ঠিত হল। খাম্বার আর্তস্বর শুনে থৈবী বাইরে এসে শোকোন্মত্ত হয়ে ঐ বর্শা নিজবক্ষে বিদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন।

সাধারণত এই কাহিনীর মূল অনুষ্ঠান মৈরাঙ গ্রামে এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লাইহারাউবা নৃত্য উৎসবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীনিসিম এজেকিল-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

'The Lai Harauba (Khamba-Thaibi dance) is a dance of forces forces fully under lyrical control. It demonstrates convincingly how the stately and the signified can be controlled with the vigour to produce a human poetic blending of dance impulses which is

characteristic of Manipur. It comes closest to the classic manner. The shadow of contemplation falls on it and moves as slowly as the shades of the evening. Yet, nothing is lost in the massive rhythms of sound and colour. Shaking the spectator to the core by an inexhaustible primal appeal. The sweep and surge of emotion is powerful, but miraculously a detached awareness is brought to birth, It is conducive to a subtle pleasure, which is quite astonishingly civilised. A refined element pervades the movements. On this level folk dancing is transformed into art.'

যুগযুগান্তরের সংস্কৃতি সমন্বয়ে মণিপুরের লোকচিত্তকে অধিকার করে আছেন অনার্যদেবতা কৈলাসপতি শিব ও গোপীবল্লভ বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। নৃত্যে, গীতে বিভিন্ন ছন্দে মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয় সাধারণ মানুষ বিভিন্ন উৎসবে এই দুই দেবতার অর্ঘ্য রচনা করেছে। মণিপুরী অধিবাসীদের ধর্মপ্রাণে এই দুই দেবতার আসনই পাশাপাশি পাতা। বৈষ্ণব ও শৈবের ভেদাভেদ ভক্তপ্রাণের মিলনসঙ্গমে বিলীন হয়েছে, নৃত্যছন্দে মূর্ত হয়েছে প্রেম ও ধর্ম।

শিব পার্বতীর সম্মানে ওগ্রিহাঙেল ও ঊষাদেবীর সম্মানে থাবলচোংবী নৃত্যও অনুষ্ঠিত হয়। বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রে থাবলচোংবী উৎসব। এই অনুষ্ঠান মূলত নাট্যধর্মী। থাবলচোংবী অনুষ্ঠানে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য এই-চারপ্রকার অভিনয়ই প্রযুক্ত হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মণিপুরে এই নাট্য প্রচলিত বলে একে মণিপুরীয় থাবলচোংবী নাট্য বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের নৃত্যপদ্ধতিতে ঊষাকালের আলোকরশ্মি বিকাশের অনুকরণে নৃত্যছক রচনা করা হয়েছে। এই নাট্যে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত আঙ্গিকের প্রয়োগ আছে। কিন্তু ইহা নাট্যবেদ সৃষ্টির আগে থেকে প্রচলিত বলে পূর্বরঙ্গ প্রভৃতি নাট্যাঙ্গের প্রয়োগ নেই। এছাড়া রথযাত্রার উৎসবে খুবাক্‌ইশৈ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

শাস্ত্রমতে তালরাস, দণ্ডরাস ও মণ্ডলরাস -রাসনৃত্যের এই তিনটি প্রধান পর্যায়ই প্রাচীনকাল থেকে মণিপুরে প্রচলিত। বৈষ্ণবধর্মের মণিপুরে অভ্যুদয়ের আগেই শৈবধর্মের যুগে লাইহারাউবা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের বিভিন্ন নৃত্যাংশে রাসপদ্ধতিই অন্যরূপে অনুসৃত হয়েছে। পরে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে 'রাসলীলা' নৃত্যকল্পনা ভক্তি ও রূপময়তায় সুষমান্বিত হয়ে সংগীতে ও ভঙ্গীতে বৃন্দাবনের সেই চিরকিশোরের চরণে নিবেদিত হয়েছে।

"চক্রুর্হনৃত্যশ্চ তথৈব রাসম
তদ্দেশ-ভাবাকৃতি বেশযুক্তাঃ।
সহস্ততালং ললিতং সলিলং॥
বরাঙ্গনা মঙ্গল সম্ভুতাঙ্গয়ঃ।"

রাজা ভাগ্যচন্দ্র 'গোবিন্দ সংগীত লীলাবিলাস' গ্রন্থে নাট্যকে রূপক ও রাসক এই

পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। রূপক অর্থে প্রাচীন নাট্য ও রাসক অর্থে নৃত্যনাট্য। এই রাসক অধ্যায়ে রাসনৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহা-রাসক মঞ্জুরাসক, নিত্যরাসক, নির্দেশরাসক, গোপরাসক—এই পাঁচটি রাসলীলাই বর্তমানে মণিপুরে মহারাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস কুঞ্জরাস, গোপরাস, (গোষ্ঠ) ও উলূখল রাস রূপে প্রচলিত। এছাড়া বর্তমানে মণিপুরে দিবারাস বলে প্রচলিত আর একটি রাসনৃত্য সাধারণতঃ মধ্যাহ্নকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

রাধাকৃষ্ণ ভক্তিমার্গতত্ত্বই মণিপুরে পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে জনপ্রিয় হয়েছে। সেজন্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীকে আশ্রয় করে রাসনৃত্য রূপায়িত হয়েছে। শৃঙ্গার রসসম্ভূত বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—এই দুই পর্যায়ে নায়িকাভেদ অনুযায়ী অভিনয় নির্দেশিত হয়।

মহারাস কার্তিক পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত পুরাণের রাসপঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে কৃষ্ণ অভিসার রাধা গোপী অভিসার, মণ্ডল সাজন, গোপীগণের রাগ আলাপ, অচ্ছুবা ভঙ্গীপারেঙ, কৃষ্ণনর্তন, রাধানর্তন, গোপিনীদের নর্তন, কৃষ্ণের অন্তর্ধান, প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্জলি (প্রার্থনা ও আরতি), গৃহগমন—এই কয়টি পর্যায়ে মহারাসের উৎসব হয়। অচ্ছুবা ভঙ্গিপারেঙ ও বৃন্দাবন ভঙ্গিপারেঙ-এর মূল উপাদান।

বসন্তরাস চৈত্র পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে হোলিখেলা, কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর নৃত্য, রাধার ঈর্ষ্যা, ক্রোধ ও প্রস্থান, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার অনুসন্ধান, ললিতা ও বিশাখাসহ কৃষ্ণের রাধার কুঞ্জে গমন, মানভঞ্জন, খুড়ুম্বা ভঙ্গীপারেঙ, গোপিনীগণের নৃত্য, পুষ্পাঞ্জলি, গৃহগমন অভিনীত হয়। অচ্ছুবা ভঙ্গিপারেঙ ও খুড়ুম্বা ভঙ্গীপারেঙ এর মূল উপাদান।

বসন্তরাস চৈত্র পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে হোলিখেলা, কৃষ্ণ ও চন্দ্রা-বলীর নৃত্য, রাধার ঈর্ষ্যা, ক্রোধ ও প্রস্থান কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার অনুসন্ধান, ললিতা ও বিশাখাসহ রাধার কুঞ্জে গমন, মানভঞ্জন, খুড়ুম্বা ভঙ্গীপারেঙ, গোপিনীগণের নৃত্য, পুষ্পাঞ্জলি, গৃহগমন অভিনীত হয়। অচ্ছুবা ভঙ্গিপারেঙ ও খুড়ুম্বা ভঙ্গিপারেঙ-এর মূল উপাদান।

কুঞ্জরাস আশ্বিন মাসের অষ্টম দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও সখীদের অভিসার ও কুঞ্জে আগমন অংশ অভিনীত হয়।

গোপরাস বা গোষ্ঠ কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা গীত হবার পর কৃষ্ণের বাল্যলীলা রূপায়িত হয়। উলূখল রাসও কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণের বাল্যলীলাই রূপায়িত হয়।

নিত্যরাস যে কোনো উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। অভিসার ও রাস অংশই অভিনীত হয়।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত রাসলীলা প্রসঙ্গ নিচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এর থেকে রাসনৃত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ছবি পাওয়া যাবে।

"(জয়) বরজ কামিনা নবীন বালা
চলিল রঙ্গিয়া চন্দ্রিক মালা ॥

কুণ্ডল লম্বিত লম্বিত হার
চারু দলিত বেণী মনোহর ॥
বিকশিত কুসুম বনমায়ে
আমার বন্ধু গুণ গায়ে গায়ে ॥
কর্মাক কর্মাক নয়ন চায়
গহন কানন গমন তায় ॥
কুঞ্জর সদনে পছিয়া রঙ্গে
পাইলু শ্রীরাধাগোবিন্দ সঙ্গে ॥
সখীর অনুগা ললিন মানস
নরপতি ভাগ্যচন্দ্র এই আশ ॥ * ॥

আর একটি বর্ণনায় ঃ

"মৃদঙ্গ মুরুজ বাজে তাতাথৈ তাথৈয়া বাজে ॥
তাথৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গ মধুর বাজে ॥
সবহু যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আবে ॥
রাসমণ্ডলী মাঝে গোপাঙ্গনাগণ পদচালে
ভঙ্গি করি আরে ॥
কিবা সেই ভুরু যে কবি চালন মাধুরী।
কিবা সেই অঙ্গভঙ্গি গমন ভঙ্গিমা।
কিবা সেই নেত্রগতি বিজুরী উপমা ॥
তাথৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গ মধুব বাজে
সবহু যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আরে ॥'

মণিপুরী নৃত্যে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—নর্তনকলার এই ত্রিবিধ গুণই বর্তমান। তবে মণিপুরী নৃত্যে, নৃত্য অংশই প্রধান। ভাববিভাবের দ্যোতনায় তাণ্ডব ও লাস্য এই দুইকেই সমভাবে প্রকাশের ধারা মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মণিপুরী নৃত্যে আঙ্গিকাভিনয় অংশই প্রধান। এই অপরূপ নৃত্যছন্দে তনুদেহ লীলায়িত ব্যঞ্জনায় দেহভঙ্গীর সঙ্গীতে সৌন্দর্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে। এই সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা অন্য কোনো নৃত্যধারায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মদেশীয়, জাপানী ও বলিদ্বীপের প্রচলিত নৃত্যছকের সঙ্গে মণিপুরীদের নৃত্য পদ্ধতির রূপময়তার কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অবশ্য ব্রহ্মদেশের সঙ্গে মণিপুরের সংযোগের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। অনেক সময় মণিপুরী নৃত্যের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি দেখে আমাদের মনে হয় এই নৃত্য আয়ত্ত করা সহজসাধ্য। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। মণিপুরী নৃত্যের এই সকল জ্যামিতিক বিন্যাস ও দোলন/ দেহভঙ্গিতে সঞ্চালিত করা অত্যন্ত কঠিন। তার জন্যে প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। দেহরেখার ব্যঞ্জনা, ভাব বিভাবের দ্যোতনা ও তালের সমন্বয়ে, ভক্তিরস মাধুর্যে মণিপুরী নৃত্যছন্দ এমন একটি দুর্লভ সংযম ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে তা দর্শক চিত্তে পরিশ্রুত আনন্দের সৃষ্টি করে।

মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতিতে এই যে ভঙ্গী ও ভঙ্গীপারেঙ-এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে সে

সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। ভঙ্গী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ভঙ্গ থেকে এবং ভঙ্গিপারেঙ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভঙ্গাবলী অর্থাৎ বিভিন্ন ভঙ্গের সমষ্টি।

(১) "আভঙ্গ সমভঙ্গ-ত্রিভঙ্গমিতি ত্রিবিধং ভবতি।"

(২) "সর্বেষাং দেবদেবীনাং ভঙ্গমানমিহোচ্যতে।
আভঙ্গ সমভঙ্গশ্চ অতিভঙ্গস্ত্রিধাজগৎ॥"

শাস্ত্র অনুযায়ী সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ—এই চারটি ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সমভঙ্গ : এই ভঙ্গী ঋজু ও স্থিতিশীল। মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া এবং আবেদন সম্মুখবর্তিতায়। এই ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য নেই এবং আত্মিক বা দৈহিক শক্তির ভঙ্গীভূত রূপ প্রকাশ করে, সেজন্যে এই ভঙ্গীতে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা গৌণ।

আভঙ্গ : আন্তর প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশের মুহূর্তে দেহের যে চাঞ্চল্য তা এই ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়। এই ভঙ্গীতে মেরুদণ্ড় নমনীয় ও সক্রিয় এবং এই ক্রিয়ার প্রভাব অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চালিত। এই ভঙ্গী দেহকে বিশেষ সৌষ্ঠবযুক্ত করে।

ত্রিভঙ্গ : এই ভঙ্গীতে লাস্যভাব মনোহররূপে প্রকাশিত হয়। মেরুদণ্ডের গতি ক্ষিপ্র এবং এই ক্ষিপ্রতা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও সঞ্চালিত হয়। এই ভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধারী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী লক্ষণীয়।

অতিভঙ্গ : এই ভঙ্গীতে তাণ্ডবভাব প্রকাশিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উদ্দাম গতির সংঘাত ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়। ত্রিভঙ্গ অবস্থায় দেহের সামনের দিকে পিছনের জোর পড়লে অতিভঙ্গ ভঙ্গী হয়।

উপরোক্ত চার প্রকার ভঙ্গীর সমন্বয়ে ও মিশ্রণে ভঙ্গিপারেঙ গঠিত হয়েছে। পাঁচটি ভঙ্গিপারেঙ মণিপুরী নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। 'গোবিন্দ সঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থানুযায়ী লাস্যকে সীমিতাঙ্গ ও স্ফুরিতাঙ্গ—এই দুই পর্যায়ে ও তাণ্ডবকে গুণ্ঠন, চলন ও প্রসরণ—এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অছুবা ভঙ্গিপারেঙ ও খুড়ুম্বা ভঙ্গিপাবেঙ প্রধানতঃ সাতমাত্রা যুক্ত তাল রাজমেল-এর সাহায্যে ও বৃন্দাবনপারেঙ আটমাত্রা যুক্ত তিনতাল অছুবার সাহায্যে গঠিত হয়েছে। এগুলি লাস্যভাবের সীমিতাঙ্গ রূপ প্রকাশ করে এবং বিলম্বিত লয়ে চলে। সমাপ্তিতে চারমাত্রা যুক্ত তাণ্ডেপ (চতুরস্রজাতি একতাল) অথবা ছয় মাত্রা যুক্ত মেনকূপ (ত্রস্রজাতি একতাল) প্রযুক্ত হয়।

তান্ডব ভাব প্রকাশক গোষ্ঠভঙ্গিপারেঙ সাত মাত্রা যুক্ত তাল রাজমেল এর সাহায্যে ও গোষ্ঠ বৃন্দাবনপারেঙ আট মাত্রা যুক্ত তাল তিনতাল অছুবার (তৃতীয়ক সাহায্যে গঠিত। এরও সমাপ্তিতে তাণ্ডেপ ও মেনকূপ প্রযুক্ত হয়। এই দুটি ভঙ্গী নৃত্যবন্ধ মধ্যলয়ে চলে এবং তাণ্ডব ভাবের গুণ্ঠন রূপ প্রকাশ করে।

মণিপুরী নৃত্য সংগঠনে প্রাচীন ও প্রধানতম অঙ্গরূপে 'চালি'কে গণ্য করা হয়। উপরোক্ত পাঁচটি ভঙ্গিপারেঙ-এর গ্রন্থনায় এটি মূল উপাদান।

"কোমলং সবিলাসং চ মধুরং তাললাস্যযুক্তঃ।
নাতিদ্রুত নাতিমন্দ ত্রস্রতা প্রচুরং তথা ॥
পাদোরুকটি বাহুনাং যৌগপদ্যেন চালনম্।
চালিঃ সা শৈঘ্র সাংমুখ্যপ্রায়া চালিবরোজবেৎ ॥"

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চারি নৃত্যপদ্ধতিই মৈতৈ ভাষায় মণিপুরে চালিরূপে প্রচলিত।

"এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া ঊর্বো কটয়াস্তথৈব চ।
সমান করণাচেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ পদ, জঙ্ঘা, উরু ও কটিদেশ—ইহাদিগকে এক সরলরেখায় রাখিবার প্রচেষ্টাকে চারী বলা যায়। সঙ্গীতরত্নাকরের মতে গতিই চারী, আর স্থিতি অর্থে স্থান, তাই চারী স্থান দ্বারা ব্যাপ্ত।

মণিপুরী নৃত্যগুরুরা এই নৃত্য পরিকল্পনায় চালিকে প্রথম ও প্রধান অঙ্গ বলে মনে করেন। নৃত্যকল্পনাটিকে সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে মূর্ত করে তোলার কাজে চালির মাধ্যমে বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস রচনা করা হয়।

পায়ের গোড়ালী জোড়া থাকবে। পায়ের পাতা এক সমকোণে পরস্পরের থেকে আলাদা করে দাঁড়াতে হবে। এইরূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় মেরুদণ্ড, গ্রীবা, মস্তক এক সরলরেখায় থাকবে। দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। এই অবস্থায় পায়ের পাতা ভূমিতে সমকোণে রেখে দাঁড়ালে দেহভঙ্গীতে নৃত্যের ছন্দ স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রোক্ত সমশির ও সমদৃষ্টি প্রযুক্ত হয়েছে। উভয় হস্তের করতল বক্ষের সম্মুখে বাহিরের দিকে রাখতে হবে। অঙ্গুলী সমূহ পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় উপরের দিকে প্রসারিত থাকবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সমকোণে ভেঙে থাকবে। স্কন্ধ থেকে করতলের দূরত্ব ও দুই করতলের মধ্যের ব্যবধান সমান হবে। এইভাবে সমগ্র ভঙ্গীস্থাপনায় একটি সমবাহু চতুর্ভুজ গঠিত হবে। এই অবস্থান থেকে চালি নৃত্য সূচিত হয়। চালি নৃত্য করবার সময় মণ্ডলীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া নৃত্য করতে হয় এবং শরীরের বামপার্শ্ব মণ্ডলীর দিকে থাকে। এই নৃত্যের চলন ডান পা দিয়া আরম্ভ হয়।

চালি নৃত্যে প্রধানতঃ চারটি মুদ্রার ব্যবহার হয়। সূচনায় পতাকা হস্ত ও নৃত্যাংশে অর্ধচন্দ্র, হংসাস্য ও পদ্মকোষ হস্ত প্রযুক্ত হয়। নৃত্যগতিতে বুট্টন ও চাষগতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ভ্রমরী গতি বিশেষ করে অঙ্গভ্রমরী চালি নৃত্যের প্রধান উপাদান।

"বিতাস্তস্থিরিতৌ পাদৌ কৃত্বাঙ্গভ্রমণং তথা।
তিষ্ঠেদ যদি ভবেদঙ্গভ্রমরী ভরতোদিতা ॥"

অর্থাৎ দুই পায়ের ব্যবধান এক বিঘৎ অন্তরে রেখে সর্বাঙ্গ ভ্রামিত করে স্থিতি আশ্রয় করলে তাকে অঙ্গভ্রমরী বলে।

ঋগ্বেদে আদিত্যস্তুতিতে বর্ণিত আদিত্য পরিক্রমণের ধারা অনুসরণ করে মণিপুরী নৃত্যে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে পরিক্রমণ করা হয়। চালি নৃত্যপদ্ধতি ও পাঁচটি ভঙ্গীপারেঙ সমস্ত মণিপুরী নৃত্যের মূল উপাদান। মণিপুরী নৃত্যগুরুরা বিভিন্ন

তাল ও লয় আশ্রয় করে নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী নৃত্যপরিকল্পনা করতে পারেন, কিন্তু এই চালি বা মূল ভঙ্গীগুলি পরিবর্তন করতে পারেন না।

সকল মণিপুরী নৃত্যধারাই কোনো-না কোনো ধর্ম সংক্রান্ত উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মণিপুরীরা নৃত্যকে ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গ বলে মনে করায় নৃত্য অনুষ্ঠানকালে হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিধিনিষেধ পালন করে। মণিপুরী নৃত্য প্রধানত ভক্তিরসকে আশ্রয় করে রচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে সংকীর্তন ও চোলম্—এই দুই ভক্তিরসাত্মক নৃত্যধারা প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়। সংকীর্তন বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ রূপে প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে করতালচোলম্ ও পুঙচোলম্ নৃত্যধরাতেই মণিপুরী নৃত্যকলার চরম উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়। চোলম শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ 'চলনম্' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত 'গোবিন্দ সংগীত লীলাবিলাস' গ্রন্থ অনুযায়ী তাণ্ডব-এর তিনটি পর্যায় গুণ্ঠনম্, চলনম্ ও প্রসর্পম্। করতালচোলম্-এ করতাল সহযোগে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় এবং পুঙচোলম্-এ মৃদঙ্গ সহযোগে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যশিল্পীরাই মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যরত অবস্থায় নৃত্য করেন। পুঙচোলম্ ও করতালচোলম্ এই দুই নৃত্যধারাতেই অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ-পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। বিভিন্ন স্থান, গতি, মণ্ডল, শিরকর্ম, গ্রীবা, স্কন্ধ, কটি, জানু ও পাদকর্মেও শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়। স্থানককে মৈতৈ ভাষায় ফিরেপ্ বলা হয়। থঙখঙগাওয়াঙবা, থঙখঙ-আনেম্বা, করেঙেপতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রয়োগ করতালচোলম্ ও পুঙচোলম্-এ দেখা যায়।

মৈতৈ ভাষায় শিরকর্মকে কোকলেই বা কোখাই বলে। নিকপা, হৈবা, লৈবা, খটপা প্রভৃতি শিরকর্ম প্রচলিত। মৈতৈ ভাষায় গ্রীবাকর্মকে নাগক বলে। আখাকপা, আহুনবা, চটপা, আফৈবা, তমিনবা, হানবা, থাবা, চেপথা, আথেকপা, সেপচংনবা প্রভৃতি গ্রীবাকর্ম প্রচলিত। হিকথবা, ইংখটপা, খাম্পা প্রভৃতি স্কন্ধ বা লেইগুম প্রচলিত। হৈজিওবা, নম্বা, থাপা, হৈদকপা, হৈবা প্রভৃতি বাহু বা থুথাই প্রচলিত। আরঙবা, আউম্পা, তবা, চেম্পা, হুনবা, লৈবা প্রভৃতি বক্ষ বা থৈনমৈতেই প্রচলিত। নম্বা, তিঙবা ও থেকপা—এই তিন প্রকার কটি বা খোয়াঙ প্রচলিত। নম্বা, থাঙগৎপা, থঙগৎনা, লৈবা, নামলেই প্রভৃতি উরুকর্ম বা ফৈ প্রচলিত। বকলৈবা ও খুদাক কুনবা—এই দুই প্রকার জানু বা খুক্কি প্রচলিত। খঙপক নেৎপা, খঙচেপ, খঙদনকাঙবা, খুনিঙ, প্রভৃতি পাদকর্ম বা খঙ প্রচলিত।

উপরোক্ত তালি..া থেকেই সংকীর্তন ও চোলম নৃত্যধারার আঙ্গিকের জটিলতা ও উৎকর্ষ অনুমান করা যায়। এই অনুষ্ঠানে এক-একটি নৃত্যসম্প্রদায়ে অনেক সময় পঞ্চাশজন শিল্পী একত্রে এক-একটি পালা রূপদান করে। সঙ্গীতাংশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির সুললিত পদাবলী এবং সংস্কৃত ও মৈতৈ ভাষায় বিভিন্ন ভক্তিরসাত্মক গীতি পরিবেশিত হয়। করতাল চোলম্ ও পুঙচোলম্—এই দুই নৃত্যপদ্ধতিই মূলতঃ তাললয়াশ্রয়। তিনতাল, মেল (বেদীঘাট, লম্বীঘাট, সেতু, কটা) ও মেনকুপ আশ্রয় করে বিভিন্ন তালগুচ্ছের সমন্বয়ে অপরূপ ছন্দ ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়।

শিল্পীরা অনুষ্ঠানের সময় ধুতি, পাগড়ি, উপবীত ও উত্তরীয় পরিধান করেন।

কপালে ঊর্ধ্বতিলক ও অনেক সময় পুরুষ শিল্পীগণ শরীরের দ্বাদশস্থানে চন্দনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদাবলী অংকিত করেন।

সুর, তাল, ছন্দ ও লয়ের বিশিষ্ট বিভঙ্গে সাজানো পুঙচোলম্ ও করতাল চোলম্ নৃত্য প্রাণবন্ত ও অখণ্ড যূথবদ্ধ শিল্পসুষমার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। অন্য কোনো ভারতীয় নৃত্যধারায় এই ধরনের একই ব্যক্তিকে এক সঙ্গে সঙ্গৎ ও রূপকার্যের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় না। এই নৃত্যপদ্ধতি ও প্রকরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে একদল সুষম ও গোষ্ঠীবদ্ধ রূপকার একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পদাবলীর আবেগ ও ভাবনাটিকে কত অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে দর্শকমনে আস্বাদ্য করে তুলছেন।

মণিপুরে প্রচলিত দুটি গ্রন্থে বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'লেইথক লৈখা ও জগোই' গ্রন্থে লাইহারাউবা ও অন্যান্য নৃত্যে প্রযুক্ত প্রতীকধর্মী আদিম মুদ্রার বর্ণনা আছে। রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত 'গোবিন্দসঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থে রাসনৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'গোবিন্দসঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থে পতাকা, ত্রিপতাক, অর্ধপতাক, কটকামুখ, সন্দংশ, মৃগশীর্ষ, হংসাস্য, অলপল্লব, ভৃঙ্গ, অংকুশ, অর্ধচন্দ্র, কোরক, মুষ্টি, অংকুর, শার্দুলাস্য, কাঙগুল, ত্রিশূল, কর্তরীমুখ, সূচীমুখ, পদ্মকোশ, শিখর, হংসপক্ষ, অহিতুণ্ড, চতুর ও ধেনু—এই পঁচিশটি অসংযুক্ত হস্ত ও শংখ, চক্র, পাশ, অঞ্জলি, কর্কট, তার্ক্ষ্য ও সম্পুট, পুষ্পপুট, রম্ভাসুমা, কোকিল, স্বস্তিক ও শুক এই বারটি সংযুক্ত হস্তের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মণিপুরে নৃত্যধারায় নৃত্যের সংগে সংগীতের যোগসূত্র অতি নিবিড়। নৃত্যের প্রয়োজনেই সংগীত তার রূপ ও উৎকর্ষ অর্জন করেছে। আবহসংগীতে অনদ্ধ বা তালযন্ত্রের মধ্যে পুঙ, ইয়াবুঙ, হারাপুঙ, তানাইবুঙ, নাগনা, খোল, ঢোলক, দফত, খঞ্জরী, পাখোয়াজ ও ঢোল ব্যবহৃত হয়। ঘনবাদ্য বা ধাতবযন্ত্রের মধ্যে সেমবুঙ, ঝালারি, মঙগঙ, জাল, মন্দিলা, করতাল, রমতাল ব্যবহৃত হয়। সুষিরবাদ্যের মধ্যে বাঁশী, ময়বুঙ, পেরে ও খঙ ব্যবহৃত হয়। তত বা তারযন্ত্রের মধ্যে মধ্যে পেনা, এস্রাজ, তানপুরা ব্যবহৃত হয়।

নৃত্যে ও সংগীতে তাল ও লয় প্রধান আশ্রয়। সংগীতরত্নাকরের মতে :

"তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘঞ স্মৃতঃ।

গীতংবাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম॥"

শাস্ত্রমতে তাল-এর যে দশটি প্রাণ প্রচলিত মৈতৈ সংগীতেও তা স্বীকৃত। মণিপুরী নৃত্যে প্রধানতঃ তাণ্ডেপ, মেনকূপ, রূপক, দশকোশ, তিনতাল দশকোশ, তিনতাল মাচা, তেবড়া, রাজমেল, দুতাল অছুবা, যাত্রারূপক, তিনতাল অছোবা, তিনতাল মেল, ভংগদাস, গাজন, মদন, মৈতৈ সুবফাঁক, ঝাঁপতাল, রাসতাল চারতাল প্রভৃতি তাল প্রচলিত। চারমাত্রা থেকে আটষট্টি মাত্রা পর্যন্ত বিভিন্ন ভাগে অলংকার পুংলোন বা প্রস্তর ছন্দিত হয়। দুই বা ততোধিক তাল এবং নৃত্যালংকার সমন্বয়ে তালপ্রবন্ধ ও নৃত্যপ্রবন্ধ গঠিত হয়। মৃদঙ্গের ছন্দ মূলে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথম পদ্ধতিতে বোলগুলিকে সুস্পষ্ট-রূপে অনুসরণ করে মৃদঙ্গের ছন্দে শব্দিত করা হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ঐভাবে

অনুসরণ না করেও বাদক স্বাধীনভাবে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন স্বরের জটিল বিন্যাস ও সংগতিপূর্ণ গীতি সহযোগে স্বরমালা নৃত্যপদ্ধতি রচিত হয়। এছাড়া কবিতা, গীতি, স্বরমালা ও নির্গীত সমন্বয়ে চতুরঙ্গ গঠিত হয়। এগুলির সমন্বয়ে নায়ক নায়িকার প্রশংসাসূচক 'কীর্তিপ্রবন্ধ' নৃত্তপ্রধান পদ্ধতিও অনুসৃত হয়। নৃত্যের সঙ্গে কবিতা যখন গীতিরূপে প্রযুক্ত হয় তাকে 'সেইগোন্নাবি' বলে। আবার মুখবোল রূপে অর্থাৎ কবিতা ছন্দে আবৃত্তি সহযোগে প্রযুক্ত হলে 'চিনগোন্নাবি' বলে। সংগীতাংশে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রাগের প্রচলন আছে।

কথিত আছে মণিপুরী নৃত্যে রাসলীলার পোশাক মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে প্রবর্তন করেন। মণিপুরী নৃত্যে শিল্পীরা কোনো প্রকার অস্বাভাবিক রূপসজ্জা করেন না। স্বাভাবিক রূপকে সামান্য প্রসাধনে উজ্জ্বল করা হয়। মাথায় চূড়া বাঁধা হয়। চূড়ার উপরে 'কোকতুম্বি'—বিচিত্র জরির কাজ করা। এর তিনটি অংশ। মুখের উপর জালের মতো সাদা বসনের আবরণ 'মাইখুম'। ঘন সবুজ ভেলভেটের ব্লাউজ বা রেশম ফিরুৎ। সবুজ শাটিনের পেটিকোট, এর জমির মাঝে অজস্র চুমকি এবং নিম্নভাগে পিতলের তবকমোড়া বিভিন্ন গোলাকার আরশি সমান্তরালভাবে বসান থাকে। নিম্নভাবে কাপড়ের মধ্যেই বেত দিয়ে শক্ত করা থাকে। এই বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র পোশাককে 'কুমিন' বলে। ওপরের রূপোলী কাজকরা আয়না বসানো শাদা স্বচ্ছ ঘাঘরাটিকে 'পোশওয়ান' বলে। কাঁধের ওপর থেকে পাশে ঝোলানো, নিম্নভাগে সোনালী ও রূপোলী জরির কাজকরা অংশটিকে 'খাওন' বলে। অর্ধচন্দ্রাকার, গোল ও চৌকা কাঁচে খচিত মখমলের বে-টগুলিকে খবানপ বলে। অলংকার-এর মধ্যেও প্রচুর বৈচিত্র্য। তাল, তানথাক, তাংখা, রতনচূড়, অনন্ত, সেনাখুজি, খুড়পা, কুণ্ডলীন, পারেঙ, ঝাপা প্রভৃতি বহু বিচিত্র অলংকার প্রচলিত। কৃষ্ণের পোশাকের নাম কৃষ্ণাগীফিজেৎ। মাথায় চূড়ায় শিখীপুচ্ছ ও বর্ণাঢ্য আভরণ। রেশম ফুরিৎ, কাজেঙলেই, খাওন, খুনেপ, ধোরা, নূপুর, ঘুঙুর প্রভৃতি অংশে পোশাকের বর্ণাঢ্যতা ও বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে।

লাইহারউবা নৃত্যে 'ফনেক' ব্যবহার হয়। ফনেক-এর পাড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনুকরণে পদ্মফুল ও মৌমাছির নকশা অঙ্কিত থাকে। ফনেকের মধ্যে লাল ও কাল স্যার থাকে। এই কাল ও লাল রং যথাক্রমে রাত্রি ও ঊষাকালের প্রতীক। পুরুষ শিল্পীরা মহাভারতের ক্ষত্রিয়দের অনুকরণে বেশভূষা পরিধান করেন। বেশ পরিধানের এই পদ্ধতিকে ত্রিকৎস ভঙ্গী বলা হয়। নাগাদের নৃত্য ধারায় আদিবাসী পোশাক প্রচলিত। মণিপুরী নৃত্যের পোশাক পরিকল্পনায় মণিপুরীদের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ললিত নৃত্যে মণ্ডলী পরিক্রমার সময় বর্ণাঢ্য দোলায়মান বসনে খচিত চুমকি, আরশি ও জরিতে উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হয়ে এক আলোকসুন্দর রূপলোক সৃষ্টি করে।

মণিপুরী নৃত্যে কোনো বাহুল্য দেখা যায় না। এই নৃত্যছন্দ প্রকৃত সৌন্দর্যের রূপায়ণ করে, কোনো স্থূল আকর্ষণের প্রয়াস থাকে না। প্রধানতঃ ভক্তিরসাশ্রিত এই নৃত্যধারা গঠনপারিপাট্যে, ভাব বিভাবের দ্যোতনায় একটি সর্বাঙ্গীন অখণ্ডতা সম্পাদন করে। সুশোভিত নৃত্যমণ্ডপ ও মণিপুরীদের সহজাত সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে। বৈষ্ণবধর্ম ও মৈতৈ আদিম ধর্মের সমন্বয়ে মণিপুরের মানস সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম

সম্পদ মণিপুরী নৃত্যধারা ভারতের নৃত্যকলার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

আধুনিককালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় মণিপুরী নৃত্য ধারা ভারতের—তথা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও আগরতলা ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ রাসনৃত্য দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। তিনি ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে নবকুমার সিংকে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা দেবার জন্যে নিয়ে আসেন। নবকুমার সিং-এর প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে প্রথম মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতিতে 'নটীর পূজা' ও 'ঋতুরঙ্গ' অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে কবিগুরু সিনারিক সিং রাজকুমার ও নীলেশ্বর মুখার্জিকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করবার জন্য নিয়ে আসেন। এই সময়েই 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা'—এই তিনটি নৃত্যনাট্য শান্তিনিকেতনে প্রযোজিত হয়। পরিশেষে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কবিগুরুর বিশেষ আগ্রহে গুরু আতম্বা-সিং শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের জন্যে আসেন। তাঁর সময়েই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। রবীন্দ্র সংগীতের সুর ও ভাবের গভীরতা ও কাব্যময়তার সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের স্বচ্ছন্দ বিন্যাস, সাবলীল গতি ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের বিশেষ সামঞ্জস্য থাকায় শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য সর্বাপেক্ষা সমাদৃত হয়। শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের প্রচলন ও প্রসারের ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং পরে সারা ভারতে প্রসার লাভ করে।

মণিপুরী নৃত্যের প্রসারে রাজন্যবর্গের মধ্যে ভাগ্যচন্দ্র, চৌরজিৎ, মারজিৎ, গম্ভীর সিং, নরসিং, চন্দ্রকীর্তি সিং, সুরচন্দ্র, চূড়াচাঁদ, বোধচন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা ও অনুশীলন প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালের গুরু ও শিল্পীদের মধ্যে গুরু আমুবি সিং, আমুদন শর্মা, আতম্বা সিং, বিপিন সিং, প্রিয়গোপাল সিং, নদীয়া সিং প্রভৃতির অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভরতনাট্যম

ভারতের মার্গনৃত্যধারার পূর্ণাঙ্গরূপের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ভরতনাট্যম। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে ভরতনাট্যম সারস্বত চেতনাসমৃদ্ধ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারাগুলিতে এই সম্পূর্ণতা নেই, সেজন্যে অন্যান্য নৃত্যধারা অপেক্ষা ভরতনাট্যম প্রাণময়তায় প্রবহমান ও গতিশীল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ধ্রুবরীতির ছন্দোময় রূপ ভরতনাট্যম। গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে সংস্কৃতির প্রবহমান অভিযাত্রায় নিজস্ব মৌলিকতা বজায় রেখে ভরতনাট্যম তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছে। প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য প্রশান্তি ও আশা-মানবতার এই মহৎ ধারাগুলি ভরতনাট্যমের ছন্দে ভাব বিভাবের দ্যোতনায় আধারীকৃত।

ভাব, রাগ ও তাল—এই তিনের সমন্বয়ে নৃত্যের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন এই ভাব, রাগ ও তালের প্রথম তিনটি বর্ণকে কেন্দ্র করেই ভরতনাট্যম নামের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন ভরতমুনি প্রবর্তিত নৃত্য বলেই এর নাম ভরতনাট্যম। এ বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায় নি।

ভরতনাট্যম নৃত্যকলা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এই নৃত্যকলা সম্পর্কে যাদের প্রকৃত ধারণা নেই তারা অনেকেই ভরতনাট্যমকে দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক নৃত্যধারা বলে মনে করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতা সংকীর্ণতাবোধ থেকে এটি প্রচারিত হয়েছে। আসলে ভরতনাট্যম একটি নৃত্যধারা মাত্র নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি যা অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারাতেও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি ভরতনাট্যম অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই কেবলমাত্র দক্ষিণ-ভারতে নয়, সমগ্র দেশে প্রচলিত ছিল। অবশ্য একথা সত্য যে দক্ষিণ ভারতে এই নৃত্যকলার প্রসার ও অনুশীলন হয়েছে। এর অন্যতম কারণ এই যে উত্তর ভারতে দীর্ঘ কালব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক কলহ, মুসলমান আক্রমণ ও পাঁচ শতাব্দী-ব্যাপী মুসলমান রাজত্বকালে উত্তর ভারতে এই ধর্মভিত্তিক শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার প্রসার ব্যাহত হয়, এবং সমগ্র উত্তর ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ হয়। স্বভাবতই দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে এই ধর্মভিত্তিক নৃত্যকলার বিকাশ অব্যাহত থাকে। এবং পরবর্তীকালে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ নৃত্য এই নৃত্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইতিহাসের গতিকে অনুসরণ না করলে ভরতনাট্যম নৃত্যধারার বিবর্তনের রূপটিকে যথার্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। শিব করণ ও অঙ্গহারযুক্ত নৃত্যবিধি পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানে যোজনা করার পর থেকে আজ পর্যন্ত নৃত্যকলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত না হলে এর ক্রমপরিণতির রূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও ছিন্নসূত্র হওয়ার জন্যে ভারতের নৃত্যকলার ক্রমবিকাশের ইতিহাসও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

প্রাচীনতম নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের রচনাকালের আগেও আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহেনজোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাক্‌বৈদিক যুগের নৃত্যকলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত ঊর্ধ্বতাণ্ডব ভঙ্গীযুক্ত নটমূর্তি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ নৃত্যপদ্ধতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এ ছাড়াও বহু সংগৃহীত মূর্তি, প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতি থেকে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই সব বহু বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত উপাদান-গুলিকে কেন্দ্র করে গবেষণা আরম্ভ না করলে ভরতনাট্যম নৃত্যকলার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে না।

ভারতের নৃত্যকলার অন্যান্য ধারার মতো ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতির মূল ভাবধারাও ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যাত্রার সূচনা। দেবতাকেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতা, নৃত্যকলার উত্তরণের এই পথপরিক্রমার মধ্যেই ভরতনাট্যম নৃত্যধারার ইতিহাসকে অনুসরণ করতে হবে।

নৃত্যকলার উৎস সন্ধানে ভারতের মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে সেজন্যে এই নৃত্যধারাকে পূর্বে দাসীআট্যম্‌ নামে অভিহিত করতেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবমন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেবতার প্রীতির জন্যে দেবদাসীদের নৃত্যগীত প্রদর্শনের প্রথা প্রচলিত ছিল। চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত পদ্মপুরাণে স্বর্গে পুণ্য ফললাভের জন্যে দেবতাকে সুন্দরী স্ত্রী উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণেও দেবতার প্রীতির জন্যে নৃত্যগীতের আয়োজনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"তদাপূজোপহারশ্চ ভক্ষ্যাভোজ্যা দিকৈস্তথা।
পূজয়িত্বা জগন্নাথ তোষয়েৎ গীতনৃত্যকৈঃ॥"

ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের উপাসনায় নৃত্যগীতিকুশলা স্ত্রীলোকদের উৎসর্গ করার বিবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবমন্দিরে নৃত্যগীতানুষ্ঠানের রীতির উল্লেখ পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। শিবপুরাণে শিবমন্দির নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য নির্দেশের সঙ্গে নৃত্য ও গীত এই উভয় কলায় নিপুনা শত সুন্দরী স্ত্রীলোক দেবমনোরঞ্জনের জন্যে নিয়োগের নির্দেশ আছে।

কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে দেবদাসী সম্প্রদায়ের ব্যাপক অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রখ্যাত চোল নৃপতি প্রথম রাজরাজ-এর রাজত্বকালে (৯৮৫--১০১৪ খ্রীঃ) তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে চারশত দেবদাসীর অবস্থিতির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। গজনীর সুলতান মামুদ যখন ১০২৪ খ্রীস্টাব্দে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন তখন সেখানে পাঁচশত দেবদাসীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বৈদেশিক পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেও দেবদাসী সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। কেবলমাত্র দক্ষিণভারতে নয় ভারতের সর্বত্রই দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল। ভিনিসীয় পর্যটক মার্কোপোলো (১২৫০ খ্রীঃ) মালাবার উপকূলের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবদাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। ফরিস্তার বিবরণী থেকে জানা যায় যে সুলতান

আলাউদ্দিন বাহমনীর রাজত্বকালে (১৩৫১–১৩৫৮ খ্রীঃ) তিনি কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করে মন্দির থেকে সুন্দরী দেবদাসীদের হারেমে নিয়ে আসেন। এই দেবদাসীদের মুরলী বলা হত। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনোর বিজয়নগর পরিভ্রমণের বর্ণনায় দেবগণের প্রীত্যর্থে দেবদাসীদেব উৎসর্গের কথা পাওয়া যায়। ফরাসী পর্যটক টাভার্ণিয়রের (১৬৪১ খ্রীঃ) একটি মন্দিরের বর্ণনায় উল্লেখ আছেঃ

'When the courtesans have got together a good sum of money in their youth, they buy young slaves whom they teach to dance and sing. And when the young girls are eleven or twelve years old, their mistresses send them to this temple, believing it will bring them good-fortune to offer and surrender to this idol.'

শিলপ্পাদিকারম্ গ্রন্থেও আমরা নাট্টুয়াঙ্গম ও দেবদাসীদের কথা পাই। নট, আভই ও আঙ্গম—এই তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত নাট্টুয়াঙ্গম শব্দের অর্থ নৃত্যসম্প্রদায়ের নেতা। সাধারণ নৃত্যশিক্ষককে নাট্টুবান বলা হয়ে থাকে। নাট্টুবানগণ বংশপরম্পরায় নিজেদের পেশার অধিকারী হন এবং এই পেশা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নাট্টুবানগণ চুক্তিবদ্ধভাবে মন্দিরে দেবতার চরণে নিবেদিত দেবদাসীদের বিনা পারিশ্রমিকে নৃত্যশিক্ষা দিতেন। বিনিময়ে দেবদাসীদের আজীবন তাদের উপার্জনের অর্ধাংশ নাট্টুবানদের দিতে হত। নাট্টুবানদের অনুমতি ব্যতিরেকে দেবদাসীরা কোনো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। এই দেবদাসী ও নাট্টুবানগণ ভরতনাট্যম নৃত্যধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ছিল।

দেবদাসীগণ সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে মন্দিরের সেবায় আত্মনিবেদন করত। শিক্ষা শেষ হলে মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার নিকটে তাদের প্রথম নৃত্যানুষ্ঠান 'আরেংদেআট্যম' অনুষ্ঠিত হত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়। এবং পরবর্তীকালে দেবদাসী, রাজদাসী ও স্বদাসী—এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হয়। রাজদাসীরা মন্দিরে ধ্বজস্তম্ভের সম্মুখে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাবেশে নৃত্যপ্রদর্শন করত। স্বদাসীরা দাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে নিম্নস্তরের বলে গণ্য হত। এরা তাঞ্জোরের বিখ্যাত উৎসব কুম্ভাভিষেক-এর সময় ছাড়া দেবতার সামনে নৃত্য করতে পারতে না। সাধারণ লোকের মনো রঞ্জনে এরা নৃত্য করত।

নাট্টুবানগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন এবং স্বভাবতই বংশপরম্পরায় এই শিক্ষাদাতার ভূমিকা তাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকায় যথাযথ শিক্ষাদান বা এই নৃত্যধারার নবরূপায়নে তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। সমাজপতিদের চক্রান্তে ও নাট্টুবানদের অর্থলালসায় দেবদাসীদের পবিত্র জীবন ক্রমশঃ ব্যাভিচার ও কলুষতায় পর্যবসিত হয়। এই প্রথার অপব্যবহারে সমগ্র দেশে গণিকাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সংগৃহীত হতে থাকে। পিতামাতার দারিদ্র্য ও ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিত ও নাট্টুবানদের চক্রান্তে মাতৃক্রোড় থেকে মন্দির এবং পরে মন্দির থেকে গণিকালয়ে অসংখ্য দেবদাসী সংগৃহীত হতে থাকে। অবশেষে সরকার 'দেবদাসী বিল' প্রণয়ন করতে বাধ্য হন।

এই প্রাচীন ও পবিত্র প্রথা কিভাবে কলুষতা ও শোষণের মাধ্যমরূপে প্রয়োগ হতে থাকে তার বিবরণ বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় :

'The Devdasi system has a significant role in the history of prostitution of India. The system requires that a girl should be dedicated before she attains puberty. The growing girl is then repeatedly told that she could not marry and if even she broke the sacred vow, her deity would punish and curse her family. In return for their services in the temple they received 'Inama' lands and cash allowances, which tempted the needy parents to dedicate their daughters to prosperous temples. The young woman, thus forced into a life that offered no opportunity for the fulfilment of their natural urges and desires, could be easily induced to lead an immoral life by their exploiters.'

পরবর্তীকালে অর্থলালসা ও শোষণের মাধ্যমরূপে বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান এই প্রথার সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং সেইসব ক্ষেত্রে মন্দিরে কিছু দক্ষিণা দিয়ে পিতৃগৃহেই দেবদাসীদের 'রক্ষিতা' জীবন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

'When the Devdasi girl attains puberty the formal ceremony of initiation takes place either at home or at the temple to which she is dedicated. The parents then find a suitable man—possibly the highest bidder for their daughter to cohabit with. At the ceremony initiating the Devdasi into Sexual life, the chosen man fills the free end of her saree with coconut, rice, flowers and applies kumkum and haldi on her forehead and offers her new clothes and money. So she becomes his mistress.

Thus, the Devdasi system is an insitution based on native supersitions, serving the brutally selfish ends of its exploiters and victimising and ruining the lives of many innocent women.'

এই প্রথার যারা শিকার হয়েছেন এমন অসংখ্য দেবদাসীরা ভারতের বিভিন্ন গণিকালয়ের এখনো অন্যতম প্রধান অংশ। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও সরকারী প্রচেষ্টায় আইন বিধিবন্ধ করে অবশেষে এই প্রথার অবসান ঘটেছে।

বর্তমানে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠান বলতে সাধারণভাবে আল্লারিপু, যতিস্বরম, শব্দম, বর্ণম, পদম, তিল্লানা–এইগুলিই প্রচলিত। কিন্তু এই ধারাগুলি বহুপরে ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতিতে সংযোজিত হয়েছে। সাদিরনাট্যম, ভগবতমেলা নাটক, কুরুভাঞ্জি ও কুচিপুড়ি–এই চার পদ্ধতিতেই পূর্বে ভরতনাট্যম প্রচলিত ছিল।

ভরতনাট্যম নৃত্যের শুদ্ধমৌলিক রূপ সাদিরনাট্যম। বহু শতাব্দী ধরে মন্দিরে ও রাজদরবারে দেবদাসীদের দ্বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। সাদিরনাট্যম, দাসীআট্যম, চিন্নমেলন, ভোগমেলম, তাঞ্জোরী নাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই নৃত্যধারা বিভিন্ন অঞ্চলে

জনপ্রিয় হয়। এর গঠনে নৃত্ত ও নৃত্য দুইই সমভাবে প্রযুক্ত হত। শৃঙ্গার রসাত্মক অভিনয়ে এই নৃত্য সাধারণভাবে স্ত্রীশিল্পীদের মাধ্যমেই পরিবেশিত হত।

ভগবতমেলা নাটক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণজাতির প্রাচীন ধর্মভিত্তিক নৃত্যনাট্য। এই গোষ্ঠী নিজেদের ভরতমুনির প্রত্যক্ষ বংশধর বলে দাবী করে এবং নিজেদের ভগবতা বলে পরিচয় দেয়। ভগবত উপাসনার মাধ্যমরূপেই এই অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। যোগ, ধ্যান, কর্ম ও ভক্তি, ঈশ্বর আরাধনার—এই চারটি আশ্রয়ের মধ্যে ভক্তিসাধনা করার জন্যে এই অনুষ্ঠান। দর্শক ও শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রবণ, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, যজ্ঞ ও আত্মনিবেদন, ভক্তিসাধনার এই নয়টি ধর্ম পালন করতেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে সাধারণত এই নৃত্যনাট্য রচিত হত। ভগবতমেলা নাটক যখন কোনো অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত তখন ঐ অঞ্চলের সকল ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্ততঃ একজনকেও এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হত। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সামাজিক রীতি ও বিশেষ সম্মানজনক বলে বিবেচিত হত।

ভগবতমেলা নাটকের সঙ্গে কথাকলি নৃত্যনাট্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। কথাকলির মতো সারারাত্রি ধরে অভিনয় হয় এবং শিল্পীসম্প্রদায়ে কেবলমাত্র পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে। এই অভিনয়েও মুক্তাঙ্গন অভিনয় মঞ্চ এবং কোনো দৃশ্যসজ্জাব ব্যবহার ছিল না। কিন্তু কথাকলি নৃত্যনাট্যের সঙ্গে এর পার্থক্যও অনেক বিষয়ে স্পষ্ট। যেমন কথাকলি নৃত্যনাট্যে অভিনয়শিল্পীরা গান করে না বা সংলাপ আবৃত্তি করে না, কিন্তু ভগবতমেলা নাটকে শিল্পীদের সংলাপ আবৃত্তি বা গান করার রীতি আছে। ভগবতমেলা নাটকে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সৌষ্ঠবরচনার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভাবাভিনয় ও আঙ্গিকাভিনয়ে কথাকলি নৃত্যনাট্য অপেক্ষা ভগবতমেলা নাটক সূক্ষ্ম শিল্পসমৃদ্ধ উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহন করে। ভগবতমেলা নৃত্যনাট্যে বেহালা ও মৃদঙ্গম আবহসঙ্গীতে প্রধান বাদ্যযন্ত্ররূপে প্রচলিত।

এই নাট্য পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হত, পরবর্তীকালে তেলেগু ভাষায় বহু নাট্য রচিত হয়েছে। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ভেংকটরমণ শাস্ত্রী রচিত নাটকগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেও একথা সত্য যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভগবতমেলা নাটকের ধারা প্রচলিত ছিল। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিণী' গ্রন্থ প্রণেতা প্রখ্যাত শিল্পী তীর্থনারায়ণ স্বামী রচিত 'পারিজাত হরণম' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। শ্রীভেংকটরমন শাস্ত্রী রচিত 'মার্কণ্ডেয়,' 'প্রহ্লাদ', 'সীতা কল্যাণম', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটক বিশেষ জনপ্রিয়।

ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও অষ্টম শতাব্দী থেকে ভগবতমেলা নাটকের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়নগর রাজবংশের সময় থেকে তাঞ্জোরের মারাঠা রাজবংশের সময় পর্যন্ত এই শিল্পকলায় রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এই নৃত্যনাট্যের উৎকর্ষ প্রসঙ্গে শ্রীকে. ভি. রামচন্দ্রন-এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য ঃ

'Though verse seeks a composite expression in unison with the fully developed arts of music and dance in the drama, it is dance which triumphs and dominates-dance in its infinite variety as a

decorative unit that twines in and out of every speech and song as the basis and supreme resource of abbinaya dance that conditions everything from the simplest courtesy to the most elaborate ritual and helps to recapture the epicalmost sphere of the stories.'

কুরুভাঞ্জি ব্যালে ধরনের নৃত্যপদ্ধতি। এতে ছয় থেকে আটজন স্ত্রী-শিল্পী অংশ গ্রহণ করে। নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগের কাহিনী পদ্যছন্দে রচিত হয় এবং সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশিত হয়। ভারতের নৃত্যপদ্ধতিতে ব্যালে নৃত্যধারার এটি একমাত্র উদাহরণ। কান্তিবিদ্যার রীতি অনুসরণ করে বর্ণনাত্মক কাহিনীর শুদ্ধ ভাবরূপ সঙ্গীতকে আশ্রয় করে কুরুভাঞ্জি অনুষ্ঠানে ছন্দিত হয়। সব থেকে প্রাচীন কুরুভাঞ্জি নাট্যের নাম কুত্রল কুরুভাঞ্জি। তিরুকূড়া রাজাপ্পা কবিরায়ার এটি রচনা করেন। সাম্প্রতিকালে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী কলাক্ষেত্রের শিল্পীদের দ্বারা কুরুভাঞ্জি নৃত্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারের প্রয়াস করছেন।

কুচিপুড়ি নৃত্যধারা অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণানদীর তীরে কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। সিদ্ধেন্দ্র যোগী এই নৃত্যপদ্ধতির প্রবর্তক। কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে আঙ্গিকের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়। এই নৃত্যধারায় বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরা অংশ গ্রহণ করে না, পুরুষেরাই স্ত্রী-ভূমিকা রূপায়ণ করে। বিজয়নগর রাজবংশ এই নৃত্যধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই অভিনয়ও সারারাত্রি ধরে অনুষ্ঠিত হয় এবং মঞ্চসজ্জার কোনো প্রয়োজন হয় না। নাটকের চরিত্রগুলি মঞ্চে প্রবেশ করে সংগীতের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পরিচয় দান করে। আবহসংগীতে মৃদঙ্গম, বীণা, তম্বুরা, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত। কুচিপুড়ি নাটকের মধ্যে ভামকলাপম্, গোল্লা-কলাপম্, ঊষা পরিণয়ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানের যে রীতি প্রচলিত তা তাঞ্জোরের রাজা সারফোজির রাজত্বকালে তৎকালীন সময়ের সংগীত ও নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠ বিশারদ চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম ও ওয়াড়িভেলু—এই চার ভ্রাতা কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ওয়াডিভেলু দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের একজন প্রতিভাবান স্রষ্টা। এবং তিনিই প্রথম দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে বেহালার প্রচলন করেন। ইতিপূর্বে অবশ্য কৌস্তভম্ নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

প্রকৃত শিল্প কোনোক্রমেই স্থাবর নয়, গতিশীলতাই তার ধারাকে সমৃদ্ধ করে। ভরতনাট্যম নৃত্যধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নবরূপে মহত্তর কলেবর ধারণ করেছে। এই নৃত্যধারার দুই হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও এর মৌলিক শুদ্ধ রূপটি বিভিন্ন পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত ও ভরতনাট্যম্ উভয়ের পরিবর্তন পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তাঞ্জোরের রাজা অচ্যুথাপ্পা নায়ক (১৫৭২-১৬১৪ খ্রীঃ), রঘুনাথ নায়ক ও বিজয়রাঘব নায়ক (১৬১৪-১৬৭৩ খ্রীঃ)—এদের রাজত্বকালে ভরতনাট্যম্-এর বিকাশের স্বর্ণযুগ। এই পর্যায়ে ভেঙ্কটমুখী, ক্ষেত্রায়া ও তীর্থনারায়ণ স্বামীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে রাজা প্রতাপসিংহ ও তুলাযাজীর রাজত্বকালে ভেংকটরাম শাস্ত্রী, মহাদেব অন্নাভি, প্রখ্যাত তাঞ্জোর ভ্রাতৃচতুষ্টয়-এর পিতা সুব্বরায়া নাট্টুবান, দীক্ষিতার, শ্যামশাস্ত্রী প্রভৃতির অবদানে ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারা সমৃদ্ধ হয়। অবশেষে এই ধারা চিন্নাইয়া পুন্নাইয়া, ওয়াডিভেলু ও শিবানন্দ—এদের প্রচেষ্টায় বর্তমান রূপ ধারণ করে।

আল্লারিপু ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানের প্রথম নৃত্য। তেলেগু শব্দ আল্লারিম্পু থেকে এই শব্দটির উদ্ভব। আল্লারিম্পু শব্দের অর্থ পুষ্পিত বা প্রস্ফুট হওয়া। এই পর্যায়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশুদ্ধ নৃত্যের জন্যে দেহভঙ্গির সুষম সৌন্দর্যে পুষ্পিত ও প্রস্ফুটিত করা হয়। শিল্পী মাথার ওপর দুটি হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে রেখে বোলের সংগে দৃষ্টি ও গ্রীবাকর্মের মাধ্যমে এই নৃত্য আরম্ভ করেন। এটি পূর্বরংগ বা বন্দনা সূচক অনুষ্ঠান। নৃত্যের মাধ্যমে শিল্পী রংগদেবতা, দর্শক, সংগীত-শিল্পী সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই নৃত্যে সাবলীল ও সহজ ভংগি অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে অনেক শিল্পী আল্লারিপু নৃত্যসংগঠনে বিভিন্ন আড়াউ ও যতি প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস করেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত অনুচিত। সাধারণভাবে এই পর্যায়ে নৃত্য প্রদর্শনে সময় লাগে তিন থেকে পাঁচ মিনিট।

আল্লারিপুর পর অনুষ্ঠিত হয় যতিস্বরম। ইহা শোভাসম্পাদক নৃত্ত প্রধান অংশ। দেহভংগির সংগীতে সুষম সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এই পর্যায়ে প্রধান লক্ষ্য। এই নৃত্য-সংগঠনে সাধারণভাবে পাঁচ থেকে সাতটি জটিল যতি রাগাশ্রয়ী সরগম ও তাল সমন্বয়ে মৃদংগ ও মন্দিরার সাহায্যে পরিবেশিত হয়। এতে দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত ও পাদকর্ম প্রধান এবং কোনও বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হয় না। এই নৃত্যে শিল্পী বিশেষ দক্ষতার সংগে এক-একটি যতি শেষ করে সমে আসে ও অপর একটি যতি আরম্ভ করে। যদিও সৌন্দর্য সৃষ্টিই এই পর্যায়ে মূল লক্ষ্য তবুও সংযমের কঠিন ভিত্তির ওপর এই সৌন্দর্য সৃষ্টির রচনাকে স্থাপন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীরা সৌন্দর্য সৃষ্টির উত্তেজনায় সংযমের আবেগমুক্ত অতিক্রম করে রঞ্জনাসৃষ্টির প্রয়াস করেন। তাতে দর্শকের স্থূলরুচি পরিতৃপ্ত করে সহজে জনপ্রিয় হওয়া যেতে পারে, কিন্তু মনের সূক্ষ্মতর আনন্দোপলব্ধির বিঘ্ন ঘটে। ভরতনাট্যম নৃত্যধারার এই পর্যায়ের অনুষ্ঠান প্রসংগে এই সতর্কতা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ নিম্নতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পসৃষ্টির সংগে মহত্তর শিল্পসৃষ্টির দ্বন্দ্ব এই নৃত্যধারার ইতিহাসে বার বার ঘটেছে। বর্তমান যুগেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার ওপরেই শিল্পীর সৌন্দর্য রচনার সার্থকতা নির্ভর করে।

যতিস্বরম-এর পর অনুষ্ঠিত হয় শব্দম। তেলেগু ভাষায় রচিত ভক্তিমূলক সংগীতকে অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই এই পর্যায়ে নৃত্যের লক্ষ্য। সংগীতের মাধ্যমে দেবতা অথবা রাজার শৌর্য, বীর্য ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয় এবং সংগীতের শেষে অভিবন্দনা করে নৃত্যের সমাপ্তি। সংস্কৃতে এই ধরনের সংগীতকে 'যশোগীতি' বলা হয়। এতে সঞ্চারী ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

শব্দমের পরে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণম। বর্ণম ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা জটিল ও আকর্ষণীয় পর্যায়। এতে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের সমন্বয় দেখা যায়। ভাব, রাগ ও তালযুক্ত এই অনুষ্ঠান প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে। আবহসংগীত প্রণয়ের অভিব্যক্তিতে রচিত হয়। যতিগুলি অত্যন্ত জটিল ও দ্রুত হয়ে থাকে; একে থিরমণম্ বলে।

এর চরণমগুলি অত্যন্ত সুন্দর। সংগীতাংশে কল্যাণী, নবরত্নমালিকা প্রভৃতি অপ্রচলিত রাগের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সংগীত ভাবোচ্ছল ও ভক্তিমূলক। প্রতিটি যতির সমাপ্তিতে শিল্পী সংগীত সমন্বয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এই পর্যায়ে সুর ও ভাব, ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে দেহভঙ্গির সুষম স্থাপনা সচল স্থাপত্যের কারুকৃতি রচনা করে।

পরবর্তী অনুষ্ঠান পদম। বর্ণম অনুষ্ঠানের শ্রমবিনোদনের জন্যে এই পর্যায়ে প্রেম-গীতিমূলক পদগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সংগীতাংশে অধিকাংশক্ষেত্রেই জনপ্রিয় কবি জয়দেব, পুরন্দর দাস, ক্ষেত্রায়া রচিত মধুর পদাবলী পরিবেশিত হয়।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান তিল্লানা। ভরতনাট্যম নৃত্যধারার ছন্দ, লাস্য, মাধুর্য ও গভীরতার সমন্বয়ে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই পর্যায়ে ছন্দিত হয়। এই নৃত্যে প্রত্যেকটি যতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতলয়ে পরিবেশিত হয়। এই পর্যায়ে শিল্পী মাঝে মাঝে ক্ষিপ্রচটুল পাদবিন্যাসে ও বিভিন্ন মুদ্রা প্রয়োগে বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা মূর্ত করেন। বিভিন্ন আলাপে ও বিস্তারে, লাবণ্যযুক্ত নৃত্যবিন্যাসে, বিভিন্ন অংগহার ও করণের প্রয়োগে শিল্পী এই পর্যায়ে মাঝে মাঝে নিজের দেহসৌষ্ঠবকে স্থাপত্যের অপরূপ ভঙ্গিমায় রূপায়িত করে। শিবকর্ম, দৃষ্টি, নাসাকর্ম, গণ্ডভেদ, ভ্রূকর্ম, পাদকর্ম ও সুললিত আবহসংগীতসমৃদ্ধ এই নৃত্য ভাবসৌষাম্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

ভরতনাট্যমের আশ্রয়রূপে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য-এই চার প্রকার অভিনয়। দুটি ধর্ম—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। চারটি বৃত্তি -ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। দুই প্রকার সিদ্ধি দৈবী ও মানুষী। পাঁচটি আসন--পদ্মাসনম, সিংহাসনম, যোগাসনম,, বীরাসনম ও সিদ্ধাসনম। চারটি মণ্ডলা- মণ্ডলা, অর্ধমণ্ডলা, সমমণ্ডলা ও নৃতমণ্ডলা। তিনটি পদসংস্থান—অঞ্চিতা, কুঞ্চিতা ও অর্ধাঞ্চিতা। তিনটি ভঙ্গি—সম, ললিতা ও বলিতা। তিন প্রকার অংগভেদ-এর মধ্যে করণ, অংগহার ও মুদ্রা প্রধান।

ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানে মূলরস শৃংগার। এই নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত তাণ্ডব ও লাস্য উভয়ই শৃংগার রস থেকে উদ্ভূত। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাণ্ডব নৃত্যে অধিকার আছে, যদিও পরবর্তীকালে রক্ষণশীল গুরুরা নৃত্যভেদে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্যকে স্ত্রীলোকের জন্যে নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয়। কারণ শৃঙ্গার রস থেকে উদ্ভব বলেই তাণ্ডবের প্রয়োগেও সৌকুমার্য ও লীলায়িত গতি আছে এবং এতে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। 'নটনাদী বাদ্যরঞ্জনম' গ্রন্থানুসারে আনন্দ তাণ্ডবম (সন্ময় যতিনাট্যম), সান্ধ্য তাণ্ডবম (গীতিনাট্যম), শৃঙ্গার তাণ্ডবম (ভরত-নাট্যম), ত্রিপুর তাণ্ডবম (পেরানি নাট্যম), ঊর্ধ্ব তাণ্ডবম (চিত্রনাট্যম), মুনি তাণ্ডবম (লাস্য বা লয়নাট্যম), সংহার তাণ্ডবম (সিমুহলা নাট্যম), উগ্র তাণ্ডবম (রাজনাট্যম), ভূত তাণ্ডবম (পট্টাসা নাট্যম), প্রলয় তাণ্ডবম (পাবই নাট্যম), ভুজঙ্গ তাণ্ডবম (পিথা নাট্যম) ও শুদ্ধ তাণ্ডবম (পদশ্রী নাট্যম)—এই বারো প্রকার তাণ্ডবের কথা পাওয়া যায়।

নাট্যশাস্ত্রের 'তাণ্ডব লক্ষণ' অধ্যায়ে একশত আটটি করণের উল্লেখ আছে। হস্ত ও পদের পারস্পরিক সহযোগ করণের রূপকে বিকশিত করে, আবার কয়েকটি করণ একত্র মিলিত হয়ে অঙ্গহার সৃষ্টি করে, এই করণ ও অঙ্গহারগুলি নৃত্যের সৌন্দর্যের মূল

উৎস। চিদাম্বরম-এ নটরাজ মন্দিরে খোদিত ভরতনাট্যম নৃত্যে প্রযুক্ত একশত আটটি করণের অনুকৃতি এই নৃত্যকলার বিস্ময়কর উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহন করে। ভরতনাট্যম নৃত্যকলায় সাধারণত আটাশটি অসংযুক্ত মুদ্রা ও চব্বিশটি সংযুক্ত মুদ্রার প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ভরতনাট্যম নৃত্যকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ সংগীত। সংগীতাংশে একজন সুকণ্ঠ শিল্পীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবহসংগীতে বীণা, তম্বুরা, বাঁশী, নফরী, সারাংগী, বুদবুদিকা, মৃদংগম, করতাল, বেহালা, সুরশৃংগার, পুংগী, নাগেশ্বরম ও মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। মার্গসংগীতের প্রায় সকল সমৃদ্ধ রাগরাগিণী সংগীতাংশে প্রযুক্ত হয়।

সাধারণভাবে ভরতনাট্যম নৃত্যে রুবকম, জাম্বাই, এরাবম, তিরুপড্ডাই, আড়াতালম, মিট্রিয়াম, একতালম প্রভৃতি নয়টি তালের ব্যবহার হয়। তালের পাঁচটি মাত্রার নাম সাধুশ্রম (চার মাত্রা), তিশ্রম (তিনমাত্রা), মিশ্রম (সাতমাত্রা), কাণ্ডম (পাঁচমাত্রা) ও সংগীর্ণম (নয়মাত্রা)। তালগুলি বিভিন্ন মাত্রা ও যতি সহযোগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

ভারতের নৃত্যকলার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ভরতনাট্যম। মহৎ শিল্পের সবকটি গুণই এই নৃত্যধারায় বিদ্যমান। কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সমন্বয়ে ভরতনাট্যমে যে চতুরংগ রীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা অন্য কোনো নৃত্যে বিরল। এই চতুরংগ রীতির সম্মিলিত ছন্দবিভংগে বিশ্বব্যাপী অনন্ত রূপের লীলার অখণ্ড রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীমানসের প্রকাশ-উন্মুক্ত রূপ ভাবনা ললিতছন্দে ও ভাবাভিনয়ের উৎকর্ষে দর্শকমনে সহৃদয় হয়ে ওঠে। কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভংগে লীলায়িত একটি অনন্য রূপ-ভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধিত করে।

এখানে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে, দেহভঙ্গির বিচিত্র সংগীতে সিন্ধু-তরংগের হিল্লোল লীলায়িত হয়, গ্রীবাবিভংগে গর্ব ও নিবেদন বিচিত্ররংগে মূর্ত হয়, আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত হয়—প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয়। এতগুলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভংগে শরীরী করে তুলে দর্শকমনে আস্বাদ্য করার ক্ষমতা অন্য কোনো শিল্পধারায় বিরল।

বিস্ময়ের কথা এই যে কালের বিবর্তন সহ্য করেও এই ধারা দীর্ঘ দু-হাজার বছর ধরে আপন সঞ্জীবনী শক্তির মাধুর্য নিয়ে বেঁচে আছে। পরিতাপের বিষয় এই শিল্প-কলার সার্থক অনুশীলন ও সমাদরের অভাব ঘটেছে। আংগিক সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থাই প্রধান হয়ে উঠছে ; ভাবসঞ্চার ও রসোপলব্ধির দিকে যথাযথ দৃষ্টি না থাকায় শিল্পীমনে অপূর্ণতার গ্লানি জমে উঠছে।

'নটবাদীবাদ্যরঞ্জনম' ও 'শিলাপ্পদিকারম' এই দুটি গ্রন্থে ভরতনাট্যম নৃত্যধারার ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায়, অনেকে মনে করেন ভরতনাট্যম অন্ধ্র প্রদেশ থেকে মাদ্রাজ ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশের বিখ্যাত কবি ও সংগীত স্রষ্টা ঋষি ত্যাগরাজ-এর তেলেগু ভাষায় রচিত অপূর্ব সংগীতের মাধ্যমে ভরতনাট্যমের নাট্যধর্মী নৃত্য রূপায়িত হয়ে থাকে। তাঞ্জোরের মহারাজা স্বোয়াদী থিরুমল সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুবন্দনা সংগীত রচনা করেন।

তাঞ্জোর রাজদরবারের চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দন ও ওয়াডিভেলু—এই চারিভ্রাতা

এবং মাদ্রার শ্রীস্ভারায়া আম্মাভি, কল্যাণী স্ন্দরম পিল্লাই, পোরিয়াতাম্বি আম্মাভি, প্ণ্যস্বামী আম্মাভি প্রভৃতি আচার্যদের ভূমিকা ভরতনাট্যম ন্ত্যকলায় চিরস্মরণীয়। সাম্প্রতিক কালের ন্ত্যগ্র্দের মধ্যে গ্র্ মীনাক্ষীস্ন্দরম পিল্লাই, কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই, টি. কে. মর্থাপ্পা পিল্লাই প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভরতনাট্যম্ ন্ত্যকলাকে প্নর্জ্জীবন ও সম্দ্ধ করার জন্যে যাঁরা আত্মনিবেদন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আয়ার ও শ্রীমতী র্ক্মিণী দেবী আর্ণ্ডেল-এর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে যখন নাচের বিরোধী জনমত সংগঠিত করা হচ্ছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ আয়ার এর বিরোধিতা করেন এবং সংবাদপত্রের সহযোগিতায় ভরতনাট্যম্ ন্ত্যকলার প্নর্জ্জীবনের আন্দোলন শ্র্ করেন। তিনি নিজে এই ন্ত্যকলা শিক্ষা করেন ও বিভিন্ন অন্ষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং এই ন্ত্যকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শ্রীমতী বালাসরস্বতী বেনারসে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলন'-এ ভরতনাট্যম্ ন্ত্য প্রদর্শনের স্যোগ পান। ভরত-নাট্যম্ ন্ত্যধারা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ বিশেষ ম্ল্যবান।

শ্রীমতী র্ক্মিণী দেবীর নাম ভারতের ন্ত্যকলার গবেষণা ও প্রসারের ইতিহাসে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। তিনি কেবলমাত্র একজন কুশলী শিল্পী হবার প্রয়াসেই আবদ্ধ থাকেন নি, তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতা ও বিধিনিষেধ তুচ্ছ করে ন্ত্যকলাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। আধ্নিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কারম্ক্ত ব্দ্ধিগতভাবে ন্ত্যকলার চর্চার তিনিই প্রবর্তন করেন। 'কলাক্ষেত্র' প্রতিষ্ঠা করে ভগবতমেলা নাটক, কুর্ভাঞ্জি, কুচিপ্ড়ি, যক্ষগণ প্রভৃতি বিল্প্তপ্রায় ধারাগ্লির প্নর্জ্জীবন তাঁর শিল্পসাধনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শ্রীমতী বালাসরস্বতী ভরতনাট্যম্ ন্ত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর অভিনয়বহ্ল পদম এই ন্ত্যধারায় নবয্গের স্চনা করেছে। শাস্ত্রীয় ন্ত্যের মৌলিক শ্দ্ধ র্পটিকে অক্ষ্ণ্ণ রেখে এই ন্ত্যগীতময় বিরলশিল্পী দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে শিল্পসাধনার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। শ্রীমতী বালাসরস্বতী শ্ধ্মাত্র ন্ত্যেই পারদর্শিনী নন। মার্গ সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা ও কণ্ঠসম্পদ যে কোনো প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পীর ঈর্ষ্যার বস্তু। সঙ্গীত ও ন্ত্যকলায় এই দক্ষতা তিনি প্রায় উত্তরাধিকার স্ত্রেই পেয়েছেন। তাঁর প্রমাতামহী তাঞ্জোর দরবারের রাজনর্তকী ছিলেন, মাতামহী বীণাধনম ছিলেন প্রখ্যাত বীণাবাদিনী। মাতা জয়াম্মা সঙ্গীতে ও ন্ত্যে পারদর্শিনী ছিলেন। ন্ত্য ও সঙ্গীতোচ্ছল এই পারিবারিক পরিবেশে শিশ্কাল থেকেই বালাসরস্বতীর শিল্পীমানস প্ষ্ট হয়েছে।

প্রখ্যাত গ্র্ কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই-এর কাছে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষা শ্র্ হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে কাঞ্চীপ্রমের আম্মানাক্ষী মন্দিরে তাঁর "আরেঙ-দে আট্যম" অর্থাৎ প্রথম অন্ষ্ঠান স্চিত হয়। পরবর্তীকালে গৌরী আম্মাল, বেদান্তম লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী ও চিন্নায়া নাইডুর কাছেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে নিখিল ভারত সংগীত মহাসম্মেলনে ন্ত্য প্রদর্শনের পর তাঁর খ্যাতি সারা দেশে প্রসারিত হয়। কবিগ্র্ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অন্ষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর শ্র্ হল দেশে ও বিদেশে শ্রীমতী বালাসরস্বতীর সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা।

তাঁর রূপায়িত প্রাণবন্ত বর্ণম ও পদম অনুষ্ঠান শুধুমাত্র ভারতের নৃত্যধারায় নয়, পৃথিবীর যে কোনো শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভাবাভিনয়ের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। কাহিনী-আত্মক সংঘাত-জনিত ভাবটিকে সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে শরীরী করে তুলে দর্শক মনের আবেগবৃত্তে সঞ্চারিত করার এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য আর কোনো শিল্পী আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যকলার ক্ষেত্রে শ্রীমতী শান্তারাও এর অবদানের কথাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র ভারতীয় নৃত্যের একজন শ্রেষ্ঠশিল্পীরূপেই নয়, 'মোহিনী আট্যম্' নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে তাঁর গৌরবময় ভূমিকার জন্যে তিনি শিল্পী ও সংস্কৃতি-ব্রতীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যে তার সমতুল্য কুশলী শিল্পী বিরল। কথাকলি নৃত্য সাধারণত তৎকালীন সময়ে পুরুষ শিল্পীরাই অনুশীলন করতেন। শ্রীমতী শান্তারাও মাত্র বারো বৎসর বয়সে কথাকলি নৃত্যশিক্ষা আরম্ভ করেন। এবং মাত্র চার বৎসর শিক্ষালাভ করার পর প্রতিযোগিতায় পুরুষশিল্পীদের পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী-কালে রক্ষণশীল সমাজের বিধিনিষেধ অমান্য করে তিনি কথাকলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের পরিবেশে লালিত হয়েও নৃত্যশিক্ষার জন্যে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

কথাকলি নৃত্যশিক্ষা সমাপ্ত করে শ্রীমতী শান্তারাও প্রখ্যাত গুরু মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই-এর নিকট ভরতনাট্যম্ নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমতী শান্তারাও গুরুর নিকট অত্যন্ত জটিল ও কঠিন 'থানা বর্ণম্' অনুশীলন করেন। এই নৃত্যপদ্ধতি এর আগে দীর্ঘকাল অন্য কোনো শিল্পী অনুশীলন করতে সাহস করেন নি। শ্রীমতী শান্তারাও গুরুগৃহে থেকে কঠোর পরিশ্রম করে এই নৃত্যে সাফল্য অর্জন করেন।

প্রখ্যাতশিল্পী শ্রীকৃষ্ণ পানিক্করের নিকট শ্রীমতী শান্তারাও মোহিনী-আট্যম নৃত্য-শিক্ষা করেন। তৎকালীন সময়ে দীর্ঘকাল ধরে এই নৃত্যের অনুশীলন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ ছিল। শ্রীমতী শান্তা সামাজিক বিধিনিষেধ গ্রাহ্য না করে এই শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজে এই নৃত্যের প্রচলনের জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবং একথা অনস্বীকার্য যে তার প্রচেষ্টার ফলেই এই নৃত্য আবার প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

শ্রীমতী শান্তারাও সিংহলে নৃত্যচর্চার জন্যে কিছুদিন বসবাস করেন। কারণ দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের রীতিই বিভিন্ন পরিবর্তিতরূপে সিংহলে প্রচলিত। বুদ্ধের বাণী অবলম্বনে শ্রীমতী শান্তারাও প্রযোজিত "আম্রপালী নৃত্যনাট্য দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। শুধুমাত্র নৃত্যকলায় নয়, সাহিত্যে ও চিত্রকলায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের সংগীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ মূল্যবান।

সাম্প্রতিককালের শিল্পীদের মধ্যে ইন্দ্রাণী রহমান, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, কুমারী কমলা, চন্দ্রকলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণরূপ ভরতনাট্যম। তদানীন্তন দেশীয় রাজাদের আত্মকলহ, শৈববাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘর্ষ, মুসলমান আক্রমণ, অষ্টদশশতকে শৈবধর্মের আত্মিক আদর্শের অবলুপ্তি-এ সকলের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এই নৃত্যধারার

বিকাশ ব্যাহত হয়। দেবদাসী প্রথার পাদপীঠ যখন কর্দমাক্ত হল তখন এমন কি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও অলংকারদাসীদের আমন্ত্রণ নিষিদ্ধ হল। প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, ধর্মসংস্কারক ও রক্ষণশীল নৃত্যগুরুদের অনুদার মনোবৃত্তি এই নৃত্যকলার পূর্ণ-বিকাশের প্রতিবন্ধক। একদিকে প্রাচীন দর্শন, দেবতাকেন্দ্রিকতা ও আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রয়াস ও অন্যদিকে শুধুমাত্র এই নৃত্যের সৌন্দর্যপ্রসবিনী রূপকে নিছক প্রদর্শন বিলাসে পরিণত করা, এই দুই প্রচেষ্টাই নিঃসন্দেহে পথচ্যুত হওয়ার লক্ষণ। আজকের এই অবিশ্বাস ও অর্থসর্বস্ব যুগের মাঝে শুধুমাত্র ধর্মীয় আবহাওয়ায় নৃত্যের পরিবেশন বোধ হয় বিফলতাই ডেকে আনবে। যুগোপযোগী করার জন্যে দেবতা-কেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতায় নৃত্যকলার আন্তররূপের পরিবর্তন প্রয়োজন।

আশার কথা এই যে দেশের বিভিন্ন অংশে নৃত্য নাটক সঙ্গীত আকাদেমীর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কলাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সমাজে কলাকেন্দ্রের প্রভাব গড়ে উঠলে তার মাধ্যমে এই নৃত্যশিল্পের দার্শনিক সম্পদ নিশ্চয়ই জাতিগঠন ও জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হয়ে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। হয়তো সে রূপ শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে ভাবতের নিজস্ব যুগোপযোগী পরিবেশে ভারত সংস্কৃতির অখণ্ডতা ও সংহতির উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে পরিচিত হবে।

কত্থক

বর্তমান কালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নৃত্যধারা কত্থক। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যে, বিভিন্ন শিল্পধারার যোগসূত্রে, বহিরাগত শিল্পসংস্কৃতির প্রভাবে গীতিরূপ, বাদনপদ্ধতি ও নৃত্যছন্দের আবয়বিক ও আন্তর রূপের বার বার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই সমন্বয়ে ও যুগ যুগ ধরে সঞ্চয়ের অবদানে ভারতের ললিত সম্পদ অলংকৃত ও মহিমান্বিত হয়েছে। অবশ্য ভারতীয় মার্গ নৃত্যধারাগুলি সাধারণভাবে বৈদেশিক প্রভাব-গুলিকে বিশেষ গ্রহণ করে নি। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কঠিন রক্ষণশীলতার মধ্যে প্রাচীন ধারাটিকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রসাস পেয়েছে।

কত্থক নৃত্যে এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। উত্তর ভারতের সঙ্গীত ও কত্থক নৃত্যপদ্ধতিতে পরবর্তীকালে আরব ও পারসিক সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় কত্থকনৃত্য প্রাসাদ ও দরবারের আড়ম্বরের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। এমনকি এই নৃত্যধারার প্রাচীন রূপ ও রীতির প্রায় সর্বাঙ্গীন বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি কৌতূহলজনক বিষয় লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যশৈলী, পোশাক, অলংকারে, ইসলামীয় প্রভাব, কিন্তু কাহিনী অংশে প্রখ্যাত মুসলমান শিল্পীরাও রাধাকৃষ্ণলীলা, রাস রচনা ও রূপদান করেছেন। মার্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। ধর্মান্ধতা সে সময়েও সমাজে প্রবল ছিল, তবুও এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্ম ও সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে সংস্কৃতিই মানব-সমাজে প্রকৃত মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করে।

কথিকা শব্দটি থেকে কত্থকের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে দেবতাদের লীলা ও পৌরাণিক উপকথার বর্ণনা করার জন্যে কথক, গ্রন্থিক, গাথাকার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। তারা সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে এই কাহিনী প্রচার করত। তারা কাহিনী অংশটি প্রথমে বর্ণনা করত, এবং তারপরে ভাবাভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই কাহিনীটি রূপায়িত করত। শব্দের ধ্বনিঝংকার ও মাধুর্যের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হত। কারণ সে যুগে বাক্ অথবা অক্ষর বা স্বরকে জড় বা অচেতন মনে করা হত না। "বাণীজিহ্বা দেবী সরস্বতী"কে সব কিছুর কারণস্বরূপ চৈতন্যময় প্রণবরূপে এবং বাক্, অক্ষর ও স্বরসমৃদ্ধ কথিকাকে সেই চৈতন্যময় প্রণবের অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করা হত।

কত্থক নৃত্যধারার প্রথম শিল্পীরূপে দেবর্ষি নারদকে কল্পনা করা হয়। ত্রিভুবনে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে নারদ হরিগুণগান প্রচার করতেন। ব্রহ্মমহাপুরাণে কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। লব ও কুশের মাধ্যমে রামায়ণ কথা প্রচারের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পানিনি রচিত 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' গ্রন্থে ও 'শব্দার্থ-চিন্তামণি', 'বাচস্পত্যকোষ', শব্দকল্পদ্রুম কোষ' প্রভৃতি অভিধানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে কথিকাশ্রয়ী কথক শিল্পধারা-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থ 'অভিধান রাজেন্দ্র' ও 'কল্পাদ্রিকোষ'-এ কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তুলসীদাস রচিত 'বিনয় পত্রিকা'য় কথক সম্প্রদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতের শিল্পধারায় বংশানুক্রমিক ও গোষ্ঠীগত

ধারাবাহিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপে বহু কথক নৃত্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে কথক, সূত, মাগধ, বৈতালিক প্রভৃতি কথক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে কবি বিদ্যাপতির সংগীত সহযোগী জয়ত একজন নিপুণ কথক-শিল্পী ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ ভক্তিবাদ-এর প্রভাবে কথক নৃত্যধারা পরিপুষ্ট হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক নৃত্যপদ্ধতির যে রূপ আমরা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত হল্লীসক, চর্চরী, নাট্যরাসক প্রভৃতি থেকে পাই, সে রূপের ছায়া পরবর্তীকালে কথক নৃত্যধারায় দেখা যায়। কাব্য, সংগীত ও অভিনয় এই ত্রিধারার সমন্বয়ে তৎকালীন সময়ে কথক নৃত্য রাসনৃত্যধারার অনুরূপ সাদৃশ্যযুক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীআওয়াস্থির উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

'The main reason for these resemblances is obviously the common thematic material—the Krishna lore, which demands the portrayal and expression of similar sentiments and stimulations from both these dance styles. So, the dance creators ; both the Lila type and the Kathak. conceived similar dance gestures and movements in their imaginative visualisations of the Krishna legend.'

এছাড়াও প্রয়োগরীতি ও আঙ্গিকে মুরলীগৎ, পনঘাট গৎ, কবিতা বোল, নটবরী বোল প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাসলীলা নৃত্যধারা ও কথক নৃত্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী সঙ্গীত ও কথক নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। কথিত আছে রাজা লক্ষ্মণ সেন কবি জয়দেবের নিকট পদ্মাবতী অভিনীত 'গোবিন্দলীলা' নৃত্য দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পদ্মাবতী তখন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেন। গোবিন্দলীলা কথিকা অভিনয়ের সময় রাজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে ঋতু ও কাল পরিবর্তনের বর্ণনার সময় প্রাকৃতিক পরিবেশও পরিবর্তিত হচ্ছে। গৃহসংলগ্ন পিপ্পলবৃক্ষ কথিকার কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখনও বসন্ত সমাগমে পুষ্পিত হচ্ছে, আবার কখনও নবোদ্গত সমুদয় পত্রপল্লব ঝরে পড়ছে। প্রকৃতিও সামঞ্জস্য রেখে কখনও জ্যোৎস্নাবিধৌত বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি, আবার কখনও বিরহ বর্ণনায় নিবিড় ঘন কাল মেঘে আচ্ছন্ন হচ্ছে। বিমুগ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন শিল্পীকে সম্মানিত করলেন।

এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও সে সময় কথক নৃত্যের সমাদর ও উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দের রচিত "গীতগোবিন্দ"-এর ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গীতাংশে বিশেষ ভূমিকা আছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে কথাকলি, কথক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী–এই চারটি মার্গনৃত্য ধারাতেই বিভিন্নভাবে 'গীতগোবিন্দ' এর সঙ্গীতাংশ প্রযুক্ত হয়েছে। পদ্মাবতী 'গীতগোবিন্দ'-কেও নৃত্যে রূপায়িত করেছেন। কামতা কামরূপের রাজসভা-কবি রামসরস্বতীর গীতগোবিন্দ অবলম্বনে রচিত একটি কাব্যে পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণের গীতক জয়দেব নিগদতি
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মবতী।"

অর্থাৎ কবি জয়দেব গান করিতেছেন আর সেই গানের রাগ ও তাল আশ্রয় করে পদ্মাবতী নৃত্য করিতেছেন। অনেক বলেন জয়দেব স্বয়ং কাব্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যসমৃদ্ধ "গীতগোবিন্দ" অভিনয় সম্প্রদায়ের অধিকারী ও মূল গায়েন ছিলেন। পরাশর প্রভৃতি অন্যান্য সকলে দোহার ও বায়েন। নৃত্যশিল্পী ছিলেন কবিপত্নী পদ্মাবতী। এক পদের ভণিতায় জয়দেব নিজেকে "পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী" অর্থাৎ পদ্মাবতীর চরণ চালকদের অধ্যক্ষ বলে পরিচিত করেছেন।

রাজা লক্ষণ সেনের সভায় বিদ্যুৎপ্রভা, শশীকলা প্রভৃতি প্রখ্যাতা কথক শিল্পীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য নৃত্যধারার মতো কথক নৃত্যধারাও ধর্মমূলক ও বিভিন্ন মন্দিরকে কেন্দ্র করেই প্রথমে প্রসার লাভ করে। বর্তমানে প্রচলিত কথক নৃত্য পদ্ধতির সঙ্গে তৎকালীন সমাজের কথিকাশ্রয়ী ধর্মভিত্তিক কথক নৃত্যের গুণগত ও চরিত্রগত পার্থক্য আছে। আগে কথক নৃত্যধারায় ভাবাভিনয়প্রধান নৃত্যাংশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, কিন্তু বর্তমানে কথক নৃত্যে নৃত্তাংশই (ভাবাভিনয়হীন নটন) প্রধান, এবং একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারার সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা করলে কথক নৃত্যের আবেদন ও সম্পদ অনেক নিম্ন পর্যায়ে এসে পড়েছে।

অন্যান্য নৃত্যধারায় ভারতীয় নৃত্যের বাহ্যতঃ স্থির প্রসন্ন রূপকল্পনার রেখাই ছন্দসৃষ্টি ও গতিসঞ্চার করে কিন্তু কথক নৃত্যপদ্ধতিতে ইসলামীয় প্রভাবে মূলত তালাশ্রয়ী রঞ্জনাশক্তিরই বেশি প্রয়োগ দেখা যায়। লঘু, গুরু, প্লুত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন তালের জটিল ও কুশলী প্রয়োগে এই নৃত্যে মনোরঞ্জক চমকের সৃষ্টি করা হয় যা সহজেই দর্শকমনকে রঞ্জিত ও উত্তেজিত করে। স্বভাবতই এই রঞ্জনা ভাবাভিনয়ের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এবং ইসলামীয় প্রভাবে ভারতীয় নৃত্যের সাত্ত্বিক ও দার্শনিক ধারা থেকে বিচ্যুত-হয়ে কথক নৃত্য স্থূল ইন্দ্রিয় আবেদনে পর্যবসিত হয়।

কথক নৃত্যধারায় বৈষ্ণব দর্শন ও ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়। এর ক্রমবিকাশ বৈদিক ও ক্লাসিকাল যুগ অতিক্রম করে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ শাসনের বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এর আবেদন ও ভাবধারার পরিবর্তনের ইতিহাসও বিচিত্র।

বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারে কথকনৃত্যের যে নূতন রূপ তা মূলতঃ শুদ্ধরূপ। ধ্রুপদ ও ধামার সংগীতপদ্ধতিকে অনুসরণ করে নৃত্যসংগঠন রাজপুত এমনকি মুঘল আমলেও প্রচলিত ছিল। স্বামী হরিদাস, সুরদাস, তানসেন, গোবিন্দস্বামী, নন্দদাস প্রভৃতি প্রখ্যাত সুরকারদের রচিত সঙ্গীত এই নৃত্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হত। দধি, নাটুয়া, চরণ, কলাবন্ত, রসধারী প্রভৃতি বিভিন্ন নর্তক সম্প্রদায়ের মধ্যে কথক নৃত্যের এই শুদ্ধরূপ বিদ্যমান ছিল। হোলি উৎসবে অনুষ্ঠিত হত চর্চরী। ধামার তালে সংগঠিত এই নৃত্যছক শুদ্ধ কথক নৃত্যপদ্ধতির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সময় এই শুদ্ধ কথক নৃত্যের ধারা মন্দির ও ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই প্রবাহিত হত। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী 'নটনাট্যরসিকবর' নটবররূপে কল্পনা করা হত। কথক নৃত্যপদ্ধতিতে এই নটবরী অন্যতম প্রধান অংগ।

মুসলমান আমলে মন্দির থেকে দরবারে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কথক নৃত্যের

গুণগত ও চরিত্রগত পরিবর্তন সূচিত হল। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নৃত্যসম্প্রদায় ও নর্তকী ছিল কিন্তু মুসলমান আমলেই প্রথম নাচ ও নাচওয়ালী এই শ্রেণীর আবির্ভাব। একথা অনস্বীকার্য যে শিল্পসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান সম্রাটদের অবদান অসামান্য। মুসলমান সম্রাটগণ নৃত্যগীতের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এর বিলাস ও মনোবিনোদনের রূপটিকেই প্রধানভাবে দেখতেন। ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ও দার্শনিক রূপসম্পর্কে তাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তারা পারস্য থেকে দরবারের প্রমোদানুষ্ঠানের জন্যে বিভিন্ন পেশাদারী "নাচওয়ালী" সম্প্রদায় ভারতে নিয়ে আসেন। প্রধানতঃ হার্কেনিজ, ডোমনিজ, লোলনিজ ও হেঞ্জিনিজ—এই চার সম্প্রদায়ের পেশাদারী নাচওয়ালী ভারতে আসে। এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় কথক নৃত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয় এবং পারসিক নৃত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে কথক নৃত্য নূতনরূপ ধারণ করে। স্বভাবতই এই পর্যায়ে কথক নৃত্য ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ও দার্শনিক শুদ্ধ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিছক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও যৌন আবেদনে পর্যবসিত হয় এবং নাচওয়ালীরা পেশাদারী গণিকা শিল্পীতে পরিণত হন।

ফরিস্তার বিবরণী থেকে জানা যায় দাস রাজবংশের রাজত্বকালে সুলতান বলবন (১২৬৬–৮৬ খ্রীঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র কারা খাঁন নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের একটি হারেম স্থাপন করেন। বাহমনীরাজ দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ (১৩৭৮–৯৭ খ্রীঃ) লাহোর, দিল্লী, পারস্য ও খোরাসান থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে সুন্দরী নাচওয়ালী সংগ্রহ করেন এবং তাদের নিয়ে বিলাসব্যসনে উন্মত্ত হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করেন। এমনকি তাঁর সময়ে রাজ্যের অমাত্য ও বিদ্বান মণ্ডলীও এই বিলাসিতার স্রোতে মগ্ন হন।

মুঘল আমলেও নাচওয়ালী ও কথক নৃত্যের যে নতুন রূপ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) আবুল ফজল রচিত "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে নাটুয়া, সেজেতালি, কঞ্জরী, ভোগেলি প্রভৃতি নৃত্যসম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। দরবারের নাচের মধ্যে শুদ্ধ কথক নৃত্যের আবয়বিক ও আন্তর রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটলেও বৈষ্ণব পদ্ধতির অবশেষ তখনো তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

'The Akhara is an entertainment enjoyed by the rich. The performers are dancing-girls. A set consists of four dancers, four singers and four instrument artists (who play the pakhawaj, owpunk, rabab and junter), an l there are also two others who stand by with lighted torches.'

এছাড়াও সাধারণ লোকের জন্যেও পেশাদারী নটনটীরা পথে পথে ঘুরে নাচ-গান করত। ঢাঢী প্রভৃতি এই ধরনের নটচারণ সম্প্রদায়ের কথা "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে পাওয়া যায়। সংগীত ও নৃত্যের কিছু কিছু বিবরণ অল-বাদাওনী রচিত "মুন্তেখব উৎতওয়ারীখ" গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইনিও সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। সুলতান মুহম্মদ আদিল নৃত্যগীতে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন এবং স্বয়ং তানসেন তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনিও কথক নৃত্যপদ্ধতিতে বিশেষ উৎসাহী ও দক্ষশিল্পী ছিলেন।

মুসলমান আমল থেকেই এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনে এই সময়ে অনেক শিল্পীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমীর, ওমরাহ, বিভিন্ন সামন্তরাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের অন্য দেশের রাজা ও আমীরদের "নাচওয়ালী" উপঢৌকন দেবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

শুধুমাত্র মুসলমান দরবারেই নয় হিন্দুশাসকদের মধ্যেও এই নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের সমাদর ও প্রভাবের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। মারাঠা শাসক ছত্রপতি শাহু (১৭০৭-২৯ খ্রীঃ) বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্দরী নাচওয়ালী প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করে "নাচওয়ালী-মহল" স্থাপন করেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭২০ ৪০ খ্রীঃ)-এর রাজত্বকালে 'মস্তানী" নামে এক সুন্দরী নাচওয়ালীর জীবনে ও রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রেও অপ্রতিহত প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংও এই নাচওয়ালী সম্প্রদায়েব একজন বিশেষ অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও কাশ্মীর, পারস্য, খোরাসান ও দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে দেড়শত সুন্দরী নৃত্যকুশলা নাচওয়ালী সংগ্রহ করেন। তাঁর জীবন ও কার্যের মধ্যে এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেদের তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। লোটাস নামে এক নাচওয়ালীকে তিনি সাতখানি জায়গীর ও প্রচুব ধনসম্পত্তি দান করেন।

এই সব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও সামন্ত-রাজগণও নাচওয়ালী রাখতেন। রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেও স্বভাবতই বিলাস ও প্রমোদের উপকরণ হিসাবে এই সম্প্রদায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে। পরবর্তীকালে এইসব নাচওয়ালীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রমজানী, মিরাশী, বাঈ, ডোমনী, খেলানী, নারীয়ালী, মস্তানী, ঝুমারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়।

মন্দির ও ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ থেকে দরবার ও প্রমোদবিলাসের উপকরণে পরিণত হওয়া—এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানবমনের মহৎ আনন্দের উপকরণ কথিকাশ্রয়ী কত্থক নৃত্য দেহ-সর্বস্ব লীলাবিলাসের উপকরণ হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী শুদ্ধ কত্থক নৃত্যের শাস্ত্রীয় আঙ্গিক, করণ ও অঙ্গহার সমৃদ্ধ ভাবব্যক্তির সূক্ষ্মতা, চারুতা ও রূপ কল্পনার রসরঞ্জনার পরিবর্তে পারসীয় প্রভাবে রূপান্তরিত কত্থক নৃত্য পদ্ধতি শুধুমাত্র মনোবিনোদনের প্রকরণ হিসাবে এই নৃত্যের সৌন্দর্যপ্রসবিনী রূপকে স্থূলরঞ্জনা দ্বারা উত্তেজনা ও মনোরঞ্জক চমক্ সৃষ্টির উপকরণে পরিণত করে। কত্থকনৃত্যের গুণগত ও চরিত্রগত পরিবর্তনের এই ইতিহাস বিচিত্র ও অনুধাবনযোগ্য।

মন্দির থেকে দরবার—এই পরিক্রমায় কত্থকনৃত্য মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ—এই তিনটি কেন্দ্রে ও হিন্দুরাজাদের আনুকূল্যে রাজস্থানে প্রধান শিল্পকলারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এই দুইস্থানেই আড়ম্বর ও বিলাসের প্রকরণরূপে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে আঙ্গিক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামান্য প্রভেদ থাকলেও চরিত্রগত পার্থক্য ছিল না।

সাধারণভাবে কত্থক নৃত্যধারায় লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর—এই ঘরানা প্রচলিত। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত কত্থক শিল্পী ঠাকুরপ্রসাদ লক্ষ্ণৌতে অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব

ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে প্রধানশিল্পী রূপে যোগদান করেন। তখন থেকেই লক্ষ্ণৌ ঘরানার সূচনা। অবশ্য অনেকের মতে ঠাকুরপ্রসাদের পিতা কথকশিল্পী প্রকাশজী নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে যোগ দিয়ে লক্ষ্ণৌ ঘরানার সূত্রপাত করেন। এ'রা "রসধারী" সম্প্রদায়ের কথক শিল্পী এবং রাজস্থান থেকে (মতান্তরে এলাহাবাদ থেকে) লক্ষ্ণৌতে আসেন।

নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ নৃত্যগীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং ঠাকুরপ্রসাদের নিকট নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং দরবারে নবাবের পাশেই ঠাকুরপ্রসাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়। ঠাকুরপ্রসাদ শুধুমাত্র একজন দক্ষশিল্পী ছিলেন না, নাট্যশাস্ত্রে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কথিত আছে তিনি নাট্যশাস্ত্রের একটি ভাষ্য রচনা করেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর গৃহে অগ্নিকাণ্ডে এই গ্রন্থটি ভস্মীভূত হয়। ঠাকুরপ্রসাদের তিনপুত্র —বিন্দাদিন, কালকাপ্রসাদ ও ভৈরবপ্রসাদ। ঠাকুরপ্রসাদের ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদও নবাব-এর দরবারে শিল্পীরূপে যোগদান করেন। বিন্দাদিন ও কালকাপ্রসাদ এই দুটি নাম কথক নৃত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এরা দুজনেই নবাব ওয়াজিদ আলী সাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। দুই ভ্রাতাই দক্ষশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। বিন্দাবিন সুকবি ছিলেন এবং সঙ্গীতেও তাঁর অসামান্য দখল ছিল, কালকাপ্রসাদ ছিলেন তালবাদ্যে অদ্বিতীয়। এই দুই ভাই একত্রে আজীবন কথক নৃত্যের কাব্যিক সুষমা, রূপকর্মের পুনরুজ্জীবন ও নতুন সৃষ্টিকর্মে গভীর নিষ্ঠা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিন্দাদিন ছিলেন পরমবৈষ্ণব। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নটবর নৃত্যলীলা প্রচারের আদেশ দেন। কথক নৃত্য-পদ্ধতিতে তিনি কয়েকটি নূতন আঙ্গিক সংযোজন করেন। নৃত্ত প্রধান কথক নৃত্যধারায় বিন্দাদিন ভজন, ঠুংরি, দাদরা, কবিতা প্রভৃতি সহযোগে ভাবসমৃদ্ধ নৃত্যাংশ সংযোজনা করেন।

কথক নৃত্যধারার উন্নতি ও প্রসারে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের অবদানও অসামান্য। নবাব সুকবি ছিলেন এবং সঙ্গীত ও নৃত্যে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। তিনি অত্যন্ত বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। ছত্রমঞ্জিলে অনুষ্ঠানের জন্যে তিনি চারশত সুন্দরী নর্তকী নিযুক্ত করেন। সেখানে দশদিন দশরাত্রি ধরে নৃত্যোৎসবের আয়োজন হত এবং সমাপ্তিতে নবাব স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন। অনেকের মতে সঙ্গীতে ও নৃত্যে ঠুংরি রীতির তিনিই প্রবর্তন করেন। কথক অনুষ্ঠানের জন্যে তিনি অনেক সুললিত গীতি রচনা করেন। তাঁর উৎসাহেই কথকনৃত্যে গজল ও ঠুংরীর প্রয়োগ হয়। এই শিল্পের প্রসারের জন্যে নবাব অজস্র অর্থব্যয় করেছেন। ইংরাজ শাসকদের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হয়ে যখন তিনি কলকাতায় আসেন, তখনও তাঁর বাৎসরিক ভাতার একটি প্রধান অংশ তিনি এর জন্যে ব্যয় করতেন। এদিকে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু বিন্দাদিন ছিলেন ধর্মানুরাগী বৈষ্ণব। এই দুই বিপরীত ধর্মী প্রতিভার সংযোগে কথক নৃত্য এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করল। "রাধা-কৃষ্ণলীলা" কাহিনী অংশে ভাবাভিনয় যুক্ত হল, অবশ্য লাস্য ভাবযুক্ত শৃঙ্গার রসই প্রধান স্থান অধিকার করল। আঙ্গিক-এর জটিল নৈপুণ্যের থেকে রস ও ভাব সৃষ্টি এবং রঞ্জনা নবাবের প্রিয় হওয়ায় লক্ষ্ণৌ ঘরানায় ভাবাভিনয় ক্রমশঃ একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। ঠুংরী, দাদরা ও গজল সহযোগে কথক নৃত্য পরিবেশন এজন্যে অধিক জনপ্রিয় হয়।

বিন্দাদিন নিঃসন্তান ছিলেন। কালকাপ্রসাদের তিনপুত্র—অচ্ছন মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজ পিতৃব্য বিন্দাদিনের কাছে নৃত্যশিক্ষা করেন এবং পরবর্তীকালে যশস্বী শিল্পীরূপে পরিচিত হন। কথক নৃত্যে বিন্দাদিন-এর পরে অচ্ছন মহারাজের অবদানই সর্বাধিক স্বীকৃত। অচ্ছন মহারাজের পুত্র বিরজু মহারাজ সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

কেবলমাত্র ভাবসমৃদ্ধ নৃত্যাংশ রচনা করাই লক্ষ্ণৌ ঘরানার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ভাবাভিনয়ের নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি এই ঘরানার শ্রেষ্ঠ অবদান। লক্ষ্ণৌ ঘরানার নৃত্তাংশকেও অবহেলা করা হয়নি। বিভিন্ন তোড়া, টুকরা প্রভৃতিও এর নৃত্তাংশে প্রযুক্ত হয়। লক্ষ্ণৌ ঘরানায় পাখোয়াজ এর পরিবর্তে তালযন্ত্র রূপে তবলার প্রচলন হয়।

জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানুজী শিবভক্ত ছিলেন। কথিত আছে তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে শিবতাণ্ডব নৃত্যশিক্ষা করেন। তাঁর পুত্র মালুজী ও পৌত্র লালুজী ও কানুজীর মাধ্যমে বংশপরম্পরায় শিবতাণ্ডব নৃত্যের এই ঘরানা প্রচলিত থাকে। কানুজী বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন ও লাস্য ভাবযুক্ত "রাধাকৃষ্ণলীলা" নৃত্য রচনা করেন। জয়পুর ঘরানার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে হরিপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, শ্যামলাল, হনুমানপ্রসাদ, জয়লাল, মোহনলাল, নারায়ণপ্রসাদ, সুন্দরপ্রসাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সুন্দরপ্রসাদ জয়পুর ঘরনার ধারাবাহী হলেও লক্ষ্ণৌ-এ গুরু বিন্দাদিনের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

জয়পুর ঘরানা রাজস্থানের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে গুণগত বিচারে ও উৎকর্ষে লক্ষ্ণৌ ঘরানা অনেক সমৃদ্ধ। জয়পুর ঘরানায় আঙ্গিক সর্বস্ব জটিল তালগুচ্ছ রচনার দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। স্বভাবতই ভাবাভিনয়কে প্রাধান্য না দেওয়ার ফলে সৃজনশীল নতুন রূপকর্মের গতি রুদ্ধ হয়। এর ফলে জয়পুর ঘরানার অনেক শিল্পী লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রতি মনোযোগী হন। জয়পুর ঘরনার শিল্পীদের মধ্যে অসংযত জীবনযাত্রা ও আরক ও মাদদদ্রব্যে আসক্তির ফলে এই ঘরানা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত।

অনেকে বেনারস ঘরানা বলে জানকীপ্রসাদ প্রবর্তিত কথক নৃত্যধারার উল্লেখ করেন কিন্তু এই পদ্ধতিও লক্ষ্ণৌ ঘরানার অনুরূপ। লক্ষ্ণৌ ঘরানার শিল্পীরাই কথক নৃত্যজগতে অধিক খ্যাতিমান। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন ঘরানার নৃত্যশৈলীর এই যে পার্থক্য সেটা ক্রমশঃ কমে আসছে। কারণ এই দুই ঘরানার সমন্বয়ের সাধনায় অনেক শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান ব্রতী হয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ের রাজা পরমবৈষ্ণব চক্রধর সিংয়ের নাম কথক নৃত্যের পুনরুজ্জীবন ও উৎকর্ষের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। তিনি লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর এই দুই ঘরানারই সমন্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জয়লাল, অচ্ছন মহারাজ, মোহনপ্রসাদ, নারায়ণপ্রসাদ, দুই ঘরানার এই প্রখ্যাত শিল্পীরা তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছেন। রাজা চক্রধর সিং স্বয়ং অত্যন্ত সুদক্ষ তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রখ্যাত যন্ত্রী ও বাদকদের তিনি রায়গড়ে নিয়ে আসেন। পরমবৈষ্ণব এই রাজার প্রাসাদের প্রায় সকল কক্ষেই নৃত্য ও গীতের অনুশীলন হত। তিনি গোপনে কথক নৃত্যের অনুশীলন করতেন। কথিত আছে একদিন যখন জয়লাল ও অচ্ছন মহারাজ

বিভিন্ন গৎ সম্পর্কে আলোচনা করছেন তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের গাগরীভরণের একুশটি ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ অচ্ছন মহারাজকে নটবর কৃষ্ণের অবতার বলে আলিঙ্গন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। শুধু কথক নৃত্যের ক্ষেত্রেই নয়, মার্গ সঙ্গীতের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল।

কথক নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পীর নির্দেশ অনুযায়ী সারেঙ্গী ও তবলা বা পাখোয়াজ-বাদক প্রথমে সুর সহযোগে লহরা বাদন করেন। এই রীতি থেকেই তালাশ্রয়ী নৃত্ত-পদ্ধতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কথক নৃত্যে নৃত্তাংশ প্রধান। বহুবিচিত্র ছন্দপ্রয়োগে বিভিন্ন তালগুচ্ছ রচনা করে শোভাসম্পাদক রঞ্জনা সৃষ্টি করা নৃত্তাংশের প্রধান কাজ। সাধারণ-ভাবে এই ছন্দপ্রয়োগগুলিকে "বোল" বলা হয়।

নৃত্যসংগঠন ও প্রয়োগবৈচিত্র্য অনুসারে কথক নৃত্যধারার নৃত্তাংশে এগুলিকে সাধারণভাবে বারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। গণেশবন্দনা, আমাডা, থাতা, নটবরী, পরমেলু, পারান, ক্রমলয়, কবিতা, তোড়া, টুকরা, সঙ্গীত ও পাধান—এই বারটি পর্যায়ে নৃত্তাংশ গঠিত হয়।

ভারতীয় নৃত্যে রঙ্গবিঘ্নশান্তির জন্যে গণেশবন্দনা ও রঙ্গাধিদেবতাস্তুতি অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে আচরিত হয়। শাস্ত্রমতে এই বন্দনা ও প্রার্থনা ব্যতীত যে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় তাকে নীচনৃত্য বলে এবং এই নীচনৃত্য যারা দর্শন করে তারা বংশহীন হয় ও তির্যগ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কথক নৃত্যেও এই গণেশবন্দনা অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় রীতি অনুসরণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করে।

"আমাডা" শব্দটি পারসীয় ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ হল প্রবেশ। অর্থাৎ এই পর্যায়ে তালবাদ্য সমন্বয়ে নটবরী বোল সহযোগে শিল্পীর প্রাথমিক অনুষ্ঠান। আমাডা অনুষ্ঠানের আগে দেহভঙ্গির সুষম বিন্যাসকরণ পদ্ধতিটিকে "থাতা" বলা হয়। এই অংশে শিল্পী তালসহযোগে দৃষ্টি, গ্রীবা ও শিরকর্মের প্রয়োগে বিভিন্ন ভঙ্গির সঙ্কেত সৃষ্টি করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'নর্তককুলচূড়ামণি নটবর'-রূপে কল্পনা করা হয়। কথিত আছে কালীয়দমনের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নৃত্য করেন তখন তা, থেই ও তাৎ—এই ধ্বনি-গুলির সৃটি হয়। সেজন্যে পরবর্তীকালে কথক নৃত্যগুরুরা এই ধ্বনিগুলি ও এই মূল ধ্বনিসম্ভূত ছন্দ সৃষ্টি করেন এবং এগুলিকে 'নটবর' আখ্যা দেন।

'পরমেলু' শব্দের অর্থ বিভিন্ন ধ্বনির মিলনে ছন্দসৃষ্টি করা। এই অংশে ধ্বনি-শিল্পের দুটি প্রধান অঙ্গ ছন্দ ও সঙ্গীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ মিলন ঘটেছে। বিভিন্ন তালযন্ত্র সহযোগে বিভিন্ন ধ্বনিপ্রকৃতিকে বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তরঙ্গিত করা হয়।

পাখোয়াজ-এর সাহায্যে গাম্ভীর্যপূর্ণ যে ধ্বনিসংগঠন তাকে 'পারান' বলে। 'ক্রমলয়' পর্যায়ে শিল্পী বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত ভেদে তালবাদ্যসহযোগে পাদকর্মের কুশলী প্রয়োগে চমক সৃষ্টি করেন। এই অংশে শিল্পীর আপন সামর্থ ও কুশলতা অনুযায়ী দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ আছে। এই অংশে বাঁধাধরা নৃত্যছক অতিক্রম করেও শিল্পী স্বাধীন-ভাবে নৈপুণ্য দেখাতে পারেন।

'কবিতা' পর্যায়ে তালবাদ্যসহযোগে কবিতার আবৃত্তিতে সতর্কভাবে ও সুকৌশলে

যুগ্মধ্বনির প্রয়োগ করে ছন্দ ও ধ্বনিকে তরঙ্গিত করা হয়। কবিতার ভাব বিভিঙ্গ ভঙ্গী ও অভিব্যক্তির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং পদন্বয়ে তালরক্ষা করা হয়।

'তোড়া' ও 'টুকরো' হচ্ছে বিভিন্ন তালগুচ্ছ সমন্বয়ে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী নৃত্তপদ্ধতি। বিভিন্ন বোলের সঙ্গীতরীতিতে পরিবেশন করার পদ্ধতিকে 'সঙ্গীতা' বলে। সাধারণতঃ কত্থক নৃত্যে গীতি সঙ্গীতকে অনুসরণ করে।

'পাধান' শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ পাঠান থেকে উদ্ভূত। কত্থক অনুষ্ঠানে করতালি দিয়ে তাল নির্দেশ করে বোল আবৃত্তি করার পদ্ধতিকে পাদান বলে।

কত্থক নৃত্যধারায় নৃত্তাংশই প্রধান, এব নৃত্যাংশ সহযোগী সঙ্গীতের ধাবা অনুযায়ী রচিত হয়েছে। ধ্রুপদ, ধামার, কীর্তন, ভজন, ঠুংরি, দাদরা, গজল প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার সংগীত সহযোগে নৃত্যাংশ রচিত হয়েছে এবং গীতিপদ্ধতি অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে। স্বভাবতই নৃত্যাংশ ভাবাভিনয়যুক্ত সেজন্যে মুদ্রাও প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার মতো কত্থক নৃত্যে বিভিন্ন হস্তের বাঁধাধরা নিয়ম নেই। শিল্পী অনেকক্ষেত্রেই অভিনয়ের উপযোগী হস্তপ্রয়োগ ভংগীর সংগে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনভাবে করতে পারেন।

ধ্রুপদ, ধামার ও কীর্তন সহযোগেই কত্থক-এর নৃত্যাংশ রচনার প্রথা প্রথমে প্রচলিত ছিল। এছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, কবির প্রভৃতির পদ ও ভজনের সহযোগেও কত্থক এর নৃত্যাংশ রচিত হয়েছে।

মুসলমান দরবারে এসে যুক্ত হল ঠুংরী, দাদরা ও গজল। রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনী সহযোগে ভাবাভিনয় প্রধান নৃত্যাংশে গাগরী, পনঘট, যমুনাতট, কালীয়মর্দন প্রভৃতি রূপায়িত হয়। নায়িকাভেদ অনুযায়ী ভাবাভিনয় কথক-এর নৃত্যাংশে রূপায়িত হয়।

কত্থক নৃত্যে মুসলমান আমলে ভাবাভিনয়প্রধান বিভিন্ন নৃত্যাংশ রচিত হয় এবং নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ ও বিন্দাদিন শাস্ত্রীয় অংগহারগুলির সমধর্মী বিভিন্ন ভংগী (গৎ) রচনা করেন। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে রচিত এই ভঙ্গিগুলির সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না, তবে 'মদন-অল-মাশুকী', 'শাত-অল-মুবারক', 'নাজমল-অল হিন্দ' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে এই ভঙ্গিগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরী, সালামি, ফরিয়াদ, মুকুট, অঞ্চল, মুস্করাতি, মুয়াদ্দব, হাস্নু, ঘুংঘট, মেহবুব, নাজ, গমজা, আদা, কৃষ্ণকানাইয়া, গৎ, মেহবুব, জাদু বার্ক প্রভৃতি ভঙ্গিগুলি হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের স্বাক্ষর বহন করে। বহু ভঙ্গীতেই নামকরণে ও প্রদর্শনরীতিতে ইসলামীর প্রভাব, আবার বিভিন্ন হস্ত ও অঙ্গসঞ্চালনে শাস্ত্রীয় মুদ্রা ও অঙ্গহারের সাদৃশ্যও চোখে পড়ে।

তাণ্ডব ও লাস্য ভাবযুক্ত কত্থক নৃত্যে সারেংগী, হারমোনিয়াম, তবলা, পাখোয়াজ, রবাব প্রভৃতি যন্ত্র আবহসংগীতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন সময়ে এই নৃত্যধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পোশাক ও অলংকারেরও ঘটেছে। সাধারণভাবে উত্তর ভারতের দরবারী পোশাক প্রচলিত।

কত্থক নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমত কত্থক মূলত তালাশ্রয়ী নৃত্য এবং দ্বিতীয়ত এই নৃত্যে শিল্পীর বাঁধাধরা নৃত্যছক অতিক্রম করে নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রায় অবাধ স্বাধীনতা আছে। একথাও মনে রাখা দরকার যে

কথক নৃত্যধারা বর্তমানে যে রূপ ও রীতিতে প্রচলিত, এই নৃত্যের প্রাচীন ধারার সঙ্গে তার গুণগত ও চরিত্রগত প্রভেদ ঘটেছে।

কথক নৃত্যপদ্ধতি ব্যালে ও নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়) নাটকীয় চমক সৃষ্টি করার পক্ষে যথাযথ প্রযুক্ত হলে বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারে। এই নৃত্যপদ্ধতি যখন গত শতাব্দীতে পর্যন্ত সংস্কৃত হয়েছে (যা ভারতের আর কোনো মার্গনৃত্যধারায় হয়নি), তখন বর্তমানকালেও এই নৃত্য-পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও প্রদর্শনরীতিতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ আছে।

সাম্প্রতিককালে কথক নৃত্যধারার গবেষণা ও শিল্পকর্মে স্বর্গতা শ্রীমতী মেনকার অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতের নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী মেনকার মতো প্রকৃত বিদুষী কলাবতী মহিলা বিরল। ভারতীয় পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ ব্যালে প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বরিশালের এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। লরেটোতে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে যান, এবং বেহালাবাদনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে ভারতীয় নৃত্যের গভীরতা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সীতারাম মিশ্র, গুরু করুণাকর মেনন, নবকুমার সিং, কৃষ্ণ কুট্টি, রামনারায়ণ মিশ্র, বিপিন সিং, দময়ন্তী, শিরীণ ভাজিফদার প্রভৃতির সহযোগে তিনি নৃত্যসম্প্রদায় গড়ে তোলেন এবং ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করেন। শ্রীমতী আনা পাভলোভা মেনকার নৃত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শ্রীআনন্দ কুমারস্বামীর সহযোগিতায় কথক নৃত্য সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান গবেষণা জাতির সম্পদ। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমতী মেনকা পরলোক গমন করেন। বর্তমান বিস্মৃতপ্রায় এই বিরল মহিলাশিল্পীর গবেষণা ও প্রযোজিত শিল্পকলা সম্পর্কে অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমানে কথক নৃত্যধারার লক্ষ্ণৌ ঘরানার উত্তরসাধকের মধ্যে শ্রীবিরজু মহারাজের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাত্র দশ বছর বয়সে পিতা প্রখ্যাত শিল্পী অচ্ছন মহা-রাজের মৃত্যুর পর তিনি লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজের নিকট নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। শৈশবেই তাললয়ে তার অপূর্ব দক্ষতা প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে তিনি তবলা ও পাখোয়াজ বাদনে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেন। বিভিন্ন নৃত্যাংশে তালবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তাঁর সমতুল্য শিল্পী বিরল। কথক নৃত্যপদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ ব্যালে রচনা করার প্রয়াসে গত কয়েক বছর ধরে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর প্রযোজিত 'মালতী মাধব', 'কুমারসম্ভব', 'ফাগলীলা', 'গোবর্ধনলীলা ও নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের স্মৃতিতে 'অযোধ্যার নবাব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিন্দাদিন মহারাজ ও অচ্ছন মহারাজের সার্থক উত্তরসাধক বিরজু মহারাজ বর্তমানে দিল্লীতে কলাকেন্দ্রে প্রযোজনা ও অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন।

সাম্প্রতিককালে কথক শিল্পীদের মধ্যে গোপীকৃষ্ণ, শ্রীমতী সিতারা, দময়ন্তী যোশী, রামগোপাল, শোহনলাল, শ্রীমতী বেলা অর্ণব, বন্দনা সেন, চিত্রেশ দাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লোকনৃত্য

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই আদিম জীবনে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিশ্বছন্দের চাঞ্চল্যে, জীবনছন্দের স্বতস্ফূর্ত আবেগে কখনও শিকারের উন্মাদনা জাগাতে, কখনও বা অপদেবতাকে তুষ্ট করতে উৎপ্লাবনপূর্ণ সহজ আনন্দে মানুষ দলগতভাবে রচনা করেছে নৃত্যছন্দ। শ্বাপদসংকুল আরণ্যক পরিবেশে প্রথম পর্যায়ে নৃত্যভঙ্গি ছিল হিংস্র, আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষার উৎপ্লাবনে পূর্ণ। সমতল ভূমিতে নেমে এসে সেই মানুষ যখন ঘর বাঁধল, শিখল চাষ আবাদ, তখন সংঘবদ্ধ হল, সমাজবদ্ধ হল। নৃত্যছন্দের আবয়বিক ও আন্তর রূপেরও এল পরিবর্তন ; নতুন সামাজিক পরিবেশে জীবনচর্যার অঙ্গরূপে মধুর, বলিষ্ঠ ও সরল ভঙ্গিতে এল লোকনৃত্য।

লোকনৃত্য এই সংহত সমাজের সৃষ্টি। অনেকে আদিম নৃত্য (Primitive Dance) ও লোকনৃত্য (Folk Dance)-কে একই পর্যায়ে ফেলেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। আদিম সমাজ থেকে উন্নত ও অগ্রসর সমাজ অর্থাৎ যে সমাজে বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত আচার আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও জীবন অভিব্যক্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, লোকনৃত্য সেই সংহত, উন্নত সমাজের সৃষ্টি।

আদিম সমাজে নৃত্যের জন্ম হয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রেরণায়। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংহত সমাজে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা যেমন দীপ্ত হয়েছে তেমনি আবার সামাজিক সম্বন্ধগুলির মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাব ফলেই প্রত্যেক শিল্পরূপই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করেছে। জন্ম নিয়েছে আদিম নৃত্য থেকে লোকনৃত্য।

লোকনৃত্যে আদিমনৃত্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য পুরোপুরি বজায় না থাকলেও আবেগ প্রকাশের ধারা অবিকল অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। আদিম নৃত্যের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক রূপটি ক্রমশঃ লোকনৃত্যে এসে প্রতীকধর্মী হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে আদিম আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান, কিন্তু সংযত সমাজের দৃঢ়ভিত্তির জন্য তার মধ্যে লৌকিক উপকরণের ক্রমশঃ আবির্ভাব ঘটেছে। এককথায় বলা যেতে পারে সংহত সমাজে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় জীবনছন্দের রূপসৃষ্টিশক্তির স্বতস্ফূর্ত অবারিত প্রকাশ হচ্ছে লোকনৃত্য। পরে অঞ্চল ও রুচিভেদে এল বৈচিত্র্য, সৃষ্টি হল লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারা।

লোকনৃত্য সামগ্রিক সমাজের সৃষ্টি। কারণ সংহত সমাজের সকল সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবই দলগতভাবে পালন করা হয়। সুতরাং সাধারণভাবে লোকনৃত্যকে "collective creation of the folk" এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যদিও সাধারণভাবে লোকনৃত্যে ব্যক্তিপ্রতিভা অস্বীকৃত তবুও অনেকে বলেন ইহা ব্যক্তিচেতনার কোনো স্বাক্ষর বহন করে না এ কথা সর্বাংশে ঠিক নয়, তবু ব্যক্তিচেতনা সম্প্রদায়গত সৃষ্টির মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি। লোকনৃত্যের আঙ্গিক রূপান্তরিত ও

শোধিত হয়ে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। শার্ঙ্গদেব-এর মতানুসারে আহার্যাভিনয় বর্জিত আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্তনকে "মার্গ" বা শাস্ত্রীয় নৃত্য বলা হয়। এবং আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য—এই চতুর্বিধ অভিনয় বর্জিত গাত্রবিক্ষেপকে দেশি (folk) নৃত্ত বলে। অবশ্য প্রচলিত অনেক লোকনৃত্যের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের পার্থক্য সম্পর্কে "Folk Dance of India" গ্রন্থের ভূমিকায় সুন্দর আলোচনা আছে ঃ

'The difference between folk dancing and classical dancing, of which the former is the mainspring, is largely one of attitude. There is no deliberate attempt at artistry in the folk dance. The very existence of the dance is adequate justification for it, unless it be the pleasure of the dancers. No audience, in the usual sense of the term, is implied, and those who gather round to watch are as much a part of the collective self-expression as the dancers themselves. Moreover, the concept of the "portraying" emotion is generaly speaking, foreign to the folk dance in as much as what is expressed is natural and original. What is important is not the grace of the individual dancer or virtuosity of the isolated pose, but the total effect of overwhelming buoyancy of spirit, and the eloquent, effortless ease with which it is expressed. It is clear, therefore, that here the question of a clevage between the entertainer and the entertained does not arise as in the more sophisticated classical dance forms.'

শিল্পবিষয়ে স্রষ্টা যখন আত্মসচেতন হন তখনই উচ্চতর শিল্পের সৃষ্টি হয় এবং যখনই নৃত্যে এই আত্মসচেতনতা আসে তখনই তা লোকনৃত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে শাস্ত্রীয় নৃত্যে পরিণত হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় সেজন্যে ব্যক্তি প্রতিভার অবদানই অধিক স্বীকৃত। সচেতন মনের প্রথাপুষ্ট রুচি রূপায়ণ ধারা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিক, রূপবন্ধ ও প্রয়োগরীতিতে সেজন্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য এই সকল শাস্ত্রীয় নৃত্যই বিভিন্ন আদিবাসী, প্রান্তিক উপজাতি ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও মনে রাখতে হবে যে পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকে পুষ্ট ও অলংকৃত হয়েও অনেক লোকনৃত্যের রূপবন্ধ ও নৃত্যকল্পনা রচিত হয়েছে। কারণ লোকনৃত্য সক্রিয় প্রাণশক্তির অধিকারী।

উন্নত সভ্যতর সমাজে রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ আঙ্গিকপুষ্ট হলেও এর স্বতস্ফূর্ততা ও সৌন্দর্য দলগত অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীজীবনের কেন্দ্রগত ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখে। লোকসঙ্গীত সম্পর্কে এই উক্তিটি লোকনৃত্য সম্পর্কেও বিশেষ প্রযোজ্য ঃ

'It is like a forest tree with its root deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits.'

প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে দেখা যায় যে স্মরণাতীত কাল থেকেই পুরুষানুক্রমে তাদের মধ্যে লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারা চলে আসছে। ঠিক কোন্ সময় এগুলির উৎপত্তি বা কারা এর স্রষ্টা সঠিকভাবে তা নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। এগুলি যুগ যুগ ধরে সংশিলষ্ট জনসমষ্টির যৌথ উত্তরাধিকার রূপে প্রবহমান এবং সমাজের সমবেত সৃষ্টি রূপে বিবেচিত। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নব নব আঙ্গিক ও রূপ-কর্মে সমৃদ্ধ হয়ে এই সকল লোকনৃত্যের অনেক ধারাই নবপল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠেছে।

আবহমানকাল প্রচলিত লোকনৃত্যের এই প্রবাহই দেশের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার মূল উৎস। অবশ্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় লোকনৃত্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নয়, সেজন্যে এর আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও শোধিত রূপ ধারণ করে।

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যধারায় নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মধ্যে অনেক সময় বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সব জনসমষ্টির পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অতীত যোগাযোগের সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই সংযোগ না ঘটলেও সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এ বিষয়ে গবেষকদের মত এই যে অনুরূপ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবমন একইভাবে চিন্তা করে ও শিল্পসৃষ্টি করে; পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে লোকনৃত্য ও লোকসংস্কৃতির বিস্ময়কর সাদৃশ্যের এও অন্যতম কারণ।

লোকনৃত্যের মধ্যে ধর্মীয় ধারণা, কাব্যময় কল্পনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের মূলে আদিম মানুষের ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা, ব্যবহারিক প্রয়োজন প্রভৃতির ভূমিকা স্পষ্ট প্রতিফলিত। একথা সত্য যে বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠী সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ার অনুরূপ স্তরগুলির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয় বলেই লোকনৃত্যে এখনও আদিমযুগে প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উপজাতির লোকনৃত্যের মধ্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

লোকেনৃত্যের মধ্যে পুরাতন যুগের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় একথা সত্য, কিন্তু এ শুধুমাত্র পুরাতনের প্রতিচ্ছবি নয়। চলমান জীবনের ছন্দে সমসাময়িক সমাজজীবন ও ইতিহাসের প্রবাহ লোকমানসের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে লোকনৃত্যে শিল্পায়িত হয়েছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বিভিন্ন লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের কিছু প্রয়াস সূচিত হলেও এ বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা ও তত্ত্বগত বিশ্লেষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। কারণ লোকনৃত্যের ধারা শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ বা সংগ্রহশালার বিষয় নয়; এই শিল্পকলা অতীতেও যেমন সমাজজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছে, তেমনই উপযুক্ত অনুশীলনে ও লালনে মহাভবিষ্যৎ রচনার ভূমিকাও গ্রহণ করতে সক্ষম।

ভারতীয় গ্রামীণ লোকনৃত্যের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে কি নিবিড় সংযোগ ছিল শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

'ভারতীয় গ্রামীণ-নৃত্যের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হলো দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্য। মানুষ চায় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তেমনি মানুষের সমষ্টি যে সমাজ সেও চায় নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে। সমাজের সুন্দর হওয়ার অর্থ হলো বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করা, নানা বিপরীতগামী

মনোবৃত্তিকে একটি ছন্দোময় শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রথিত করা। একত্রে এক গ্রামে বাস করতে হলেও মানুষকে অনেক রকম নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। এমন কি গ্রামের বাসস্থানগুলিকে, চলাফেরার রাস্তাঘাটকে এমনভাবে সাজাতে হয় যেন সমগ্র গ্রাম্য-রচনার মধ্যে একটা ছন্দ থাকে। কোথাও যেন বিরোধ না দেখা যায় কোন দিক থেকে। সমাজের ঐ বস্তুর মধ্যে ঐক্য রচনার প্রধান ও সুন্দর উপায় হোলো নৃত্যগীতবাদ্য। সেই জন্যেই সামাজিক নাচ হোল সমাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার একটি প্রধান অবলম্বন। সামাজিক নৃত্যের এই হোল প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভারতের পল্লীগ্রামে এর কাজ আরো সার্থক হয়ে মানব সমাজের কল্যাণকে পরিস্ফুট করেছে।'

লোকনৃত্যের এই ভূমিকা অবশ্য ইংরাজশাসনের নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হল। কারণ উনবিংশ শতকের নবজাগৃতির প্রেরণা মূলতঃ ইউরোপ থেকে এসেছে; গ্রামীণ জীবনের ভাব-চৈতন্যের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। স্বভাবতই গ্রামগুলি এই নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হল না এবং তার ফলে নগর ও গ্রামজীবনের সংস্কৃতির কোনো যোগ বজায় রইল না। ভারতের লোকনৃত্যের বলিষ্ঠ মাধুর্য, সহজ ভাবুকতা, শ্যামস্নিগ্ধ পরিপূর্ণ প্রাণময়তার উৎস কৃষিনির্ভর পল্লীজীবনে। এই কৃষিনির্ভর জনসাধারণের কাছে নগর-কেন্দ্রিক নতুন শ্রেণীর বস্তুবিচ্ছিন্ন নিরবয়ব মননশীল শিল্পপ্রচেষ্টার কোনো সেতুবন্ধ গড়ে উঠল না। ফলে স্বভাবতই গ্রামীণ লোকনৃত্যধারার নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা ব্যাহত হল।

লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের নামে শহরে বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা পরিবেশন করেন তা লোকনৃত্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকনৃত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক স্বকীয়তার দিকে দৃষ্টি না রেখে আধুনিক মনের উপযোগী বহিরঙ্গ আঙ্গিক সমৃদ্ধ এই তথাকথিত লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক, কৃত্রিম ও স্বতস্ফূর্ততাবর্জিত। ফিল্মে, মঞ্চে, লোকনৃত্যের বলিষ্ঠ উৎপ্লাবন ও সৌন্দর্যকে মনোরঞ্জনের প্রকরণ রূপে প্রয়োগ করতে গিয়ে তা অনেক ক্ষেত্রেই শালীনতার সীমা অতিক্রম করে রসবিকৃতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

লোকনৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার জন্যে বহু কৃত্রিম ও হাস্যকর প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে লোকসঙ্গীতে 'হারমোনাইজেশন' বা স্বরসঙ্গতির যৌথ প্রয়োগের অত্যাচারে ও লোকনৃত্যে স্বতস্ফূর্ততার পরিবর্তে আধুনিক রূপবন্ধ ও কল্পিত নৃত্যছক রচনা করে বৈচিত্র্য আনার যে অপপ্রয়াস সূচিত হয়েছে তা সত্যই বেদনাদায়ক।

লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবন বা তার সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা দরকার। শুধুমাত্র তত্ত্বনির্ভরতা থেকে লোকসংস্কৃতিচর্চা সম্ভবপর নয়, তার জন্যে তথ্যনির্ভরতাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রচলিত লোকনৃত্যের ধারা সম্পর্কে অনুশীলন করতে গেলে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী বা সমাজজীবনের ধারাটিকে বুঝতে হবে; প্রচলিত সংস্কার, প্রথা ও সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, তা না হলে লোকনৃত্যের মৌলিক শুদ্ধরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্বদেশ ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে জাতীয় সংহতি রচনার

শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত-এর নতুন ভূমিকা রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। জাতির শতকরা নব্বই জন গ্রামের অধিবাসী কাজেই বৃহত্তর শক্তি সেখানেই সংহত। সেই শক্তিকে জাতিগঠন ও বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক প্রয়াসে উদ্বোধিত করার প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত। কাজেই শুধুমাত্র জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুরাতন মূল্যবোধগুলির পুনরাবিষ্কারের জন্যে নয়,—জাতির ভবিষ্যৎ রচনার জন্যেও লোকনৃত্যের প্রসার ও নবমূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণভাবে লোকনৃত্যকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১. বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পালনীয় গোষ্ঠীনৃত্য ২. বংশগত ধারাবাহী বিভিন্ন পরিবার বা সম্প্রদায়ের নৃত্য—যা জন্ম, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় ৩. উপজাতীয় জনসমষ্টির লোকনৃত্য যা প্রাচীন জাদুতান্ত্রিত প্রথাপুষ্ট। প্রয়োগ অনুযায়ী অবশ্য লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে লোকধর্মী স্বতস্ফূর্ত গোষ্ঠীনৃত্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে পুষ্ট নাট্যধর্মী লোকনৃত্য দেখা যায়।

বারো মাসে তের পার্বণের দেশ বাংলা দেশেও লোকনৃত্যের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সম্প্রদায়গত লোকনৃত্যের মধ্যে বাউল নাচ ও ত্রিনাথের নাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধর্মের সাধনরীতির সমন্বয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত এই বাউল সম্প্রদায়ের নৃত্য শান্ত মধুর রসেব দ্যোতনায় ভাবরূপায়ণের অপূর্ব নিদর্শন। বাউল সম্প্রদায়ের নৃত্য লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত হলেও এর বিনিয়োগ ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বাউল নৃত্যেও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মতো নৃত্য ও নৃত্ত এই দুই-এরই প্রয়োগ আছে। গানের সঙ্গে ভাবরূপায়ণের সময় নৃত্যাংশ ও গানের বিরতিতে একতারা বা দোতারা সহযোগে নৃত্তাংশের প্রয়োগ হয়। দেহতত্ত্ব, গুরুবাদ, সাধন রহস্য প্রভৃতি বিষয়ক গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে বাউল নৃত্যে যেসব অঙ্গাভিনয় প্রযুক্ত হয় তার মধ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাদকর্ম, শিরকর্ম, গ্রীবাভেদ, অক্ষিকর্ম ও বিভিন্ন গতি ও ভ্রমরীর সাদৃশ্য দেখা যায়।

ধর্মানুসরণের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত লোকনৃত্যের মধ্যে গাজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণত চৈত্রমাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেহহত্ত্ব গাজনের দেবতা শিব। বিভিন্ন দেবদেবীদের বেশে নৃত্য, সং-এর নাচ, মুখোস নাচ, দশাবতার, কালীকাচ, তামাশামূলক ঘোড়া নাচ, বুড়াবুড়ীর নাচ, পরী নাচ প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। এই সব নাচের অধিকাংশেরই নৃত্যছকের কোনো বাঁধাধরা রূপ নেই। ঢাকের বাজনার সঙ্গে এই নাচে উৎপ্লাবনেরই প্রধান্য। অবশ্য কালীকাচ নৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্য আঙ্গিকের কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গম্ভীরা উৎসবেও নাচগানের মাধ্যমে শিবের বন্দনা করা হয়। শিবকে উপলক্ষ করে নিজেদের সুখদুঃখ জানাবার ছলে সারা বছরের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক সমালোচনা নাচ-গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। গম্ভীরা উৎসবে মুখোস নৃত্য অত্যন্ত আকর্ষণীর, সমগ্র মালদহ জেলায় গম্ভীরা অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়।

'আলকাপ' গান ও নাচে গম্ভীরার মতো শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক দুর্নীতির সমালোচনা করা হয়। অবশ্য আলকাপের ব্যাখ্যান ও প্রয়োগ-পদ্ধতি স্থূল ও অনেকক্ষেত্রে শালীনতাবর্জিত। আলকাপে মুখোস নাচের প্রচলন নেই।

দশাবতার নৃত্য সাধারণতঃ স্বাভাবিক বেশভূষা পরেই অনুষ্ঠিত হয়। দশাবতার

গানের সঙ্গে নৃত্যনাট্যের আকারে অনুষ্ঠিত এই নাচেও কিছু কিছু শাস্ত্রীয় ও তান্ত্রিক মুদ্রা ও করণের প্রয়োগ দেখা যায়।

এইসব লোকনৃত্যে ধর্মমত, রাজনীতি, সমাজনীতির অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। উৎসবের দেবতা শিব অথচ গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতিতে মুসলমান শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করে। সংলাপে, গানে, অভিনয়ে, নাচে, নানাভঙ্গীতে লোকনৃত্যের বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে কালিকাপাতারী, ধাইচণ্ডীর নৃত্য, গৃধিনীবিশাল নৃত্য, শবখেলা নৃত্য, রাবণকাটানৃত্য প্রভৃতি বহু বিচিত্র লোকনৃত্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

বীর, রৌদ্ররসাত্মক রণনৃত্যের ধারাও লোকনৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। ঢালিনৃত্য, রায়বেঁশে, পাইকান প্রভৃতি নৃত্য শক্তিচর্চার মাধ্যম ও প্রদর্শনীর অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। মাথায় লাল কাপড়, পরনে মালকোঁচা, হাতে ঢাল ও বল্লম নিয়ে ঢালী নাচে তিন জনকে নিয়ে দল গঠন করা হয়। দুই দলে প্রদর্শনীমূলক নৃত্য চলে। এক সময় বাংলাদেশের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢালী নৃত্যের বিশেষ প্রসার ছিল। পাইকান নৃত্যে হাতে লাঠি থাকত। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। বীরভূমের রায়বেঁশে নৃত্য গতির উদ্দামতা ও বলিষ্ঠতার সমন্বয়ে ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে।

লোকনৃত্যের আর একটি ধারা বাংলা দেশে মেয়েদের ব্রতকথা, বিবাহ উৎসব, বিভিন্ন স্ত্রী আচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত। এই নৃত্যলোকের ছন্দ যেন বন্য সৌন্দর্যে সুরভিত। নদী যেমন আপন আবেগে কলকল স্বরে ছন্দ সৃষ্টি করে, বনফুল যেমন আপন খুশিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, মেয়েলী উৎসব ও ব্রতপার্বণকে কেন্দ্র করে তেমনি বহু বিচিত্র লোকনৃত্য রচিত হয়েছে। ফসল বোনা ও তোলার সময়ে, ঋতু উৎসবে, গ্রামদেবতার পূজায়, পুত্রকন্যার জন্ম ও বিবাহে, শান্তিস্বস্ত্যয়নে ও বিভিন্ন মঙ্গলসূচক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে এই সব লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হত।

ভাদ্র ও পৌষ মাসে ফসল ওঠার সময়ে গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়ত ও তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হত। ভাদু ও টুসু পরবে এখনো এ ধারা বজায় আছে। ভাদু ও টুসু পরবে অবশ্য গানের অংশই প্রধান, তবে স্বতস্ফূর্ত ভঙ্গিতে এর সঙ্গে আনন্দসূচক নাচও প্রচলিত।

পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ছৌনৃত্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেল্লা অঞ্চলের ছৌনৃত্যের সঙ্গে বাংলা দেশের ছৌনৃত্যের পার্থক্য আছে। বাংলা দেশে ছৌনৃত্যের ধারা বহু প্রাচীন। সেকালে সাধারণত নাচ, গান ও অভিনয় একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। নৃত্যাভিনয়ে "পাত্র নৃত্য" ও "প্রেরণ নৃত্য" এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পাত্র নৃত্যে বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী মুখোস সাজসজ্জা ব্যবহার করা হত এবং প্রেরণ নৃত্যে স্বাভাবিক বেশভূষা ব্যবহার করা হত। ছৌনৃত্যে পাত্র নৃত্যের পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন মুখোস ও অংগসজ্জা, বিচিত্র অলংকার ব্যবহার করা হয়। ছৌনৃত্য বছরে যে কোনো পালপার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাজনের সময়েই বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাচের সময় কোনো গান থাকে না, আবহসংগীতে ঢাক, ঢোল, কাঁসর প্রধান। নারীচরিত্রে পুরুষরাই

অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের নৃত্য ও মূকাভিনয়কে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে "শৌভিক" আখ্যা দিয়েছেন। সেজন্যে অনেকে বলেন যে ছৌ শব্দটি "শৌভিক" থেকেই উদ্ভূত।

প্রেরণ নৃত্য পদ্ধতি অনুযায়ী পুতুলনাচের ধারাটিও বাংলাদেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত। সে কালে পাত্রপাত্রীর পঞ্চালিকা বা পুতুলরূপ-এর নাচের রীতি ছিল। সংস্কৃতে "পঞ্চালিকা" শব্দের অর্থ কাঠ, কাপড়, হাতির দাঁত, চামড়া প্রভৃতির দ্বারা তৈরি পুতুল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সঙ্কলিত "বৃহৎ ধর্মপুরাণ"-এ পাঞ্চালী নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমান পুতুলনাচের যে ধারা প্রচলিত তাতে পুতুলগুলি দু-ফুট থেকে আড়াই ফুটের মতো উচ্চ, এদের হাত, মুখ ও পায়ের সঙ্গে কালো সুতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পুতুল নাচানোর জন্যে একজন আলাদা লোক নির্দিষ্ট থাকে, সে পরদার আড়াল থেকে পুতুল নাচায়। সানাই, ঢোল, কাঁসির ছন্দে চলে নৃত্য ও অভিনয়।

ঝুমুর, খেমটা, ঘাটু, লেটো প্রভৃতি লোকনৃত্যগুলি সাধারণভাবে মেদিনীপুর, রাঢ় অঞ্চল, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ঝুমুর নৃত্যের পদ্ধতির সঙ্গে সাঁওতালী নাচের মিল আছে। প্রেমবিষয়ক গানের সঙ্গে স্বতস্ফূর্তভাবে মাদল ও বাঁশির সহযোগে নাচ হয়।

খেমটা নাচের সঙ্গে বাইজী নাচের সাদৃশ্য দেখা যায়। মোগলযুগে নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের যে সব শাখা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মাধ্যমেই খেমটা নাচের প্রচলন। নৃত্যের ভঙ্গি চটুল ও আদিরসাত্মক।

ঘাটু নাচে পুরুষেরা শাড়ী, ঘাঘরা ও গহনা পরে নারীবেশে হারমোনিয়াম ও তবলা সহযোগে চটুল নৃত্য করে। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ঘাটু নৃত্যগীতের বিশেষ প্রচলন ছিল। লেটো নাচও ঘাটুর অনুরূপ তবে এর মাঝে পালাগান ও সংলাপ থাকে।

এছাড়াও সারি, জারি, পাতা, ঢোলি, মেচেনী প্রভৃতি বহু বিচিত্র লোকনৃত্যের ধারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

আসাম ও মণিপুরেও লোকনৃত্যের অসংখ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। আসামের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রচলিত লোকনৃত্য বিহু। বিহু উৎসবে সমাজের সব স্তরের লোকেরাই অংশগ্রহণ করে। একত্রিশে চৈত্র অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিনে বিহু উৎসব সূচিত হয় এবং প্রায় একমাস ধরে এই উৎসব চলে। বিহু নৃত্যের দুটি অংশ—বিহু ও হুচারী। বিহু নৃত্য শ্যামল প্রান্তরে বৃক্ষছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিহু ঢোল, গাগনা, বাঁশী, সিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও গানের সহযোগে এই অনুষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা তোকা (চেরা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত) দ্বারা সমবেতভাবে তালরক্ষা করে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে চক্রাকারে মণ্ডলরচনা করে এই নৃত্যের স্বতস্ফূর্ত সাবলীল ছন্দ মাধুর্য রচনা করে।

হুচারী অংশ গ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের বাড়ির সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে কেবলমাত্র যুবক সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম অংশে ভক্তিমূলক গানের (হুচারী কীর্তন) মাধ্যমে শুভ নববর্ষের জন্যে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। তারপরে বিহুগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

আসামের রণনৃত্যের মধ্যে ঢুলিয়া ও ভাওয়ারিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। জয়ঢাক, শিঙা ও বাঁশী সহযোগে অসিনৃত্যের মতো যুদ্ধের মহড়ার ভঙ্গিতে নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

দেওধনি বা নাগকন্যার নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যের শিল্পীকে আজীবন কুমারী থাকতে হয়। খোলাচুলে, একটি ঘুঘুপাখির রক্ত পান করে জয়ঢাক ও বাঁশীর সহযোগে এই নৃত্য প্রচণ্ড উন্দামতা সৃষ্টি করে। শিল্পী মূর্ছিত হয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই নৃত্যের বিরতি হয় না।

আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ভাটিয়ালী, ধামাইল, ঝুমুর ভঙ্গিযুক্ত বিভিন্ন লোকনৃত্যের প্রচলন আছে।

বিচিত্র মানবগোষ্ঠী অধ্যুষিত আসাম প্রদেশের মতো জাতিবৈচিত্র্য ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে দেখা যায় না। সে জন্যে বিভিন্ন ধর্ম, উপজাতির সংস্কার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। লুসাই, জয়ন্তিয়া, খাসিয়া, মিরি, সারুদুকপেন, কাচেরী, আবর প্রভৃতি পার্বত্য ও সমতলবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে লোকনৃত্যের ধারায় সাধারণভাবে রণনৃত্যের প্রভাব বেশি দেখা যায়। সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক গোষ্ঠীনৃত্যও প্রচলিত।

নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। বড় বড় ঢাকের বাদ্য, শিঙা ও কর্ণপটহভেদী সঙ্গীতের সঙ্গে উন্দাম নৃত্যে ও কলহাস্যে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। নাচের পোশাক খুব আকর্ষণীয়। কোমরে লাল কাপড়ের টুকরা, মাথায় ধাতুনির্মিত ভূষণ, তাতে দীর্ঘ পাখির পালক। কানে বিচিত্র কর্ণভূষণ। হাতে নকশাকাটা দা বা বর্শা থাকে। এছাড়া কোমরে হাতে ও মুখে বিভিন্ন উলকিযুক্ত প্রসাধন। গলায় ভাল্লুকের দাঁতের হার, কোমরে দড়ি দেওয়া বন্ধনী থাকে। পায়ের বিচিত্র ছন্দে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মাটি কাঁপিয়ে এদের অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা শুধুমাত্র উন্দামতা নয়, মনোমুগ্ধকর শক্তির মাধুর্যে অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

ফাইকিৎলীম, মৈগেন্যুহ, বাগরোম্বা, হুরাইরঙ্গিলী, অফিলাকুব, তপুকিখিলে, মিরি, খুয়ালাম প্রভৃতি অসংখ্য লোকনৃত্য আসামের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত।

বিহার প্রদেশের লোকনৃত্যধারায় আদিবাসী ও মিথিলা অঞ্চলের ভক্তিমূলক লোকনৃত্যের অংশই প্রধান। ধর্মমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে রামলীলা, কীর্তনীয়া, কুঞ্জবাসী, নারদী, ভগতা, বিদ্যাপত, পুজারতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যে ঝিঝিয়া, যাতা-যাতিন, সমা-চাকুয়া প্রচলিত। এছাড়া বংশীলীলা, কদমলীলা, নাগলীলা, প্রভৃতি ধর্মমূলক নাচেরও প্রচলন দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে চামর নাটুয়া, কমলামাই নাচ, দম্ফাবাসুলী ও মুসলমানদের মধ্যে ঝারণী নাচ প্রচলিত।

দক্ষিণ বিহারের অধিবাসীদের মধ্যে বুবু, দশাই, হোলি উপলক্ষে ঝিকা ও ডাঙ্গা নাচ, পাইকা, লাঝুরি, যাদুর, লুরিম্বরায়ু, ঝুমুর, শিকার, ছৌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রসিক, নাটুয়া ও নাচনী—এই তিন প্রকারের চটুলনৃত্যের প্রচলন আছে। এগুলি বাইজী নৃত্যের অনুকরণযুক্ত আদিরসাত্মক নাচ। সেরাইকেল্লা খারসোয়ান অঞ্চলের ছৌনৃত্য লোকনৃত্য ধারার অন্তর্ভুক্ত হলেও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

গুজরাট প্রদেশের লোকনৃত্যকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—গরবা, গরবী ও রাস। এ ছাড়াও দধিলীলা নামে যাত্রা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে

যাতে নাটক ও নাচের সমন্বয় দেখা যায়।

গরবা নৃত্য শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট। অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষে নবরাত্রির সময় প্রকৃতপক্ষে সারা প্রদেশেই গরবা নাচ ও গানের সমারোহ দেখা যায়। গরবা নাচে শিল্পীসংখ্যার কোনো বিধিনিষেধ নেই। হাতে তাল, তুড়ি দিয়ে বা মাথায় কলসী নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

গরবী নৃত্য শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট। গরবী নৃত্যও অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষে নবরাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। ধুতি ও শার্ট পরা সাধারণ পোশাকেই সঙ্গীত সহযোগে সহজ স্বচ্ছন্দ ভংগিতে নাচ হয়।

রাসনৃত্য সাধারণভাবে পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় এতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই একত্রে যোগদান করে। পুরাণে উল্লিখিত "হল্লীসক" নৃত্যের সঙ্গে রাসনৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই রাসনৃত্য তিন প্রকারের-লাঠি সহযোগে দণ্ডরাস, তালি সহযোগে তালরাস ও ভাব সহযোগে ললিতরাস।

অন্ধ্র প্রদেশের লোকনৃত্যের মধ্যে দপ্পু বাদ্যম, মাথুরী, বথকম্ম, কুম্মি, কোল টুম, লাম্বাডি ও সিদ্দি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিমাচল প্রদেশে ডাণ্ডিগ, দীপক, ঝাঁঝর, পাঙ্গি, সাংলা প্রভৃতি লোকনৃত্য প্রচলিত।

কেরলের লোকনৃত্যের ধারায় দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। তিয়াট্টম, থেরায়ট্টম ভেলাকলি, কোলকলি প্রভৃতি প্রচলিত।

জম্মু ও কাশ্মীরে হাফিজা, বচা নজমা, ধুমল রৌফ, হিকাত্ পাঠের প্রভৃতি লোকনৃত্য বিশেষ জনপ্রিয়।

মহারাষ্ট্র অঞ্চলে গাওলিচা, বোলিয়াছা, লাজিম, দহিকল, দশাবতার, গোলন, তামাশা বিশেষ জনপ্রিয়।

পঞ্জাব প্রদেশের লোকনৃত্যধারার মধ্যে লুড়ি, ঝুমার ভাংড়া ও গিধ্‌হা বিশেষ জনপ্রিয়। বলিষ্ঠতা ও মাধুর্যের সমন্বয়ে ভাংড়া ও গিধ্‌হা ভারতের লোকনৃত্যের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

রাজস্থানের লোকনৃত্যের মধ্যে গীদার, রসিয়া, ঝুমার, ডাণ্ডিয়া, কাছি খোড়ি, ভালার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উত্তর প্রদেশে নৌটাঙ্কি, নাচুয়া, কাজরী, ঝুলা প্রভৃতি ও পার্বত্য অঞ্চলে চাউলিয়া, চঞ্চরী, যাদ্দা ঝেণ্তিয়া, ছাপেলী, খাসিয়ারা, শোথী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যুগযুগান্তের সংস্কৃতির সমন্বয়ে রসবৈচিত্র্যে অনুরঞ্জিত লোকনৃত্যধারা যথাযথ অনুশীলনে ও প্রয়োগে শুধুমাত্র লোকরঞ্জনে নয়, লোকশিক্ষা প্রচারের অন্যতম মাধ্যমরূপে প্রযুক্ত হতে পারে।

রবীন্দ্র নৃত্যধারা

সুদূর অতীতের দিকে চেয়ে আমরা দেখি মানুষ যেদিন স্পন্দিত হল ছন্দে, সেইদিনই তার জীবনে এল গতিবেগ। সূচিত হল তার জয়যাত্রা। জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ কর্মশক্তির অপব্যয় হয় না। ছন্দের ধর্ম হল শক্তিকে সংযত, সংহত ও একাগ্র করে তোলা। বিদ্রোহী মানুষ বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতির সঙ্গে দ্বিমুখী সংগ্রাম করে মনুষ্যত্বকে মহিমান্বিত করার পন্থার সন্ধান পেয়েছে। এই বিশ্বছন্দের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনে ভাষা সৃষ্টি হবার আগেই নৃত্য হয়ে উঠেছে মানুষের ভাবের বাহন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রায় বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে নৃত্যধারাও পরিবর্তিত হল বিভিন্ন ভাবাদর্শে। অবশেষে ইংরাজশাসনের বৃত্ত পরিধিতে এসে তার গতিবেগ হল মন্থর সংকীর্ণ। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পরে বাংলাদেশের যে নবজাগৃতি কাল—সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাব যুগে যখন বিভিন্ন সামাজিক প্রগতি সূচিত হল, নাট্যশালা ও নাটকের পথ উন্মুক্ত হল, তখনও নৃত্যকলা রইল অবহেলিত। গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে নৃত্য রইল বেঁচে, শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর সমাজ থেকে নৃত্য বর্জিত হল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রচেষ্টার পূর্ব পর্যন্ত নৃত্যকলার শিক্ষিত সমাজে কোনো শ্রদ্ধার আসন ছিল না। স্বভাবতই তার ফলে এর মানও নিম্নগামী হয় এবং মনোবিনোদনের প্রকরণ রূপে এর প্রদর্শন পণ্যশুল্কো বারবধূ শিল্পীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অন্যতম বাহনরূপে ললিতকলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন:

'আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।'

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই যথার্থ মূল্যবোধই কবিগুরুকে সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা, মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান নৃত্যকলার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংকীর্ণ সীমা শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করছে তা তিনি বুঝেছিলেন, তাই বললেন:

'ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির

মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারু-কার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই অনেক কাল ধরে চিন্তা করেছি।'

এ কথা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন সমাজে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার অঙ্গরূপে নৃত্য-কলার স্বীকৃতি—এই প্রয়াসই আজকের নৃত্যকলার অনুশীলন ও প্রসারের কারণ।

ভারতের নৃত্যধারার আত্মিক ভাবাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের কোনো অসামঞ্জস্য নেই।

'আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ম্।
আহার্যং চন্দ্রতারাদি তং নুম সাত্ত্বিকং শিবম্।'

অভিনয় দর্পণে উল্লিখিত নটরাজ মূর্তির এই উদাত্ত কল্পনার সঙ্গে কবিগুরুও একাত্ম।

'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।'

আহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার মহৎ ব্যক্তিত্ব তার সুদূর প্রসারী চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল কালের সকল মানুষের চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করে শিল্পতত্ত্বের সত্যকে পরিস্ফুট করেছে।

মানুষ নিজের প্রকাশে তার নিজের মধ্যকার অনন্ত বৈচিত্র্যকে নব নবরূপে আবিষ্কার করতে চায়। এই প্রচেষ্টাই সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আত্মপ্রকাশের এই পিপাসাই আত্মীয়তার প্রেরণা—আত্মোপলব্ধির বাহন।

'সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোল-বার জো কি! সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা! সে বলছে আমাকে বাইরে প্রকাশ করো, রূপে, রঙে, সুরে, বাণীতে, নৃত্যে।'

আর সেই সত্য সুন্দর, মঙ্গলের প্রকাশের আবেগেরই আর একটি সার্থক প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্র নৃত্যধারায়। মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান এই নৃত্যকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রকল্পনা এক অনির্বচনীয় মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে।

'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সুখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে

লীলায়িত হয়ে চলেছে ; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র সঙ্গীত হয়ে ওঠে ; তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদেব চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়।'

আবার নৃত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আব তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নৃত্য। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে.—জীবিকার প্রয়োজনে নয়—, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।'

এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নৃত্যের শিল্পরূপের মূল দৃষ্টিভঙ্গি কত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এই শিল্পরূপে ছন্দের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

'রূপসৃষ্টির প্রবাহই তো বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে. আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সেকথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎ প্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা যায় না। কিন্তু বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনি আমাদের কাছে পকাশ পায় রূপ, কোনটা দেখা যায় গোলা হয়ে, কোনটা হয় সীসে। বিশেষ সংখ্যক মাত্রা ও বিশেষ বেগের গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ .থাকে অব্যক্ত। বিশ্বসৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্প-সৃষ্টিতে!'

আবার এই চৈতন্যকে বেগবতী করার সাধনায় ছন্দোপ্রয়োগের প্রথম প্রয়াসেই যে নৃত্যের উৎস তাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দ বচনার উপযোগী। আবার নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহসঞ্চালনের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ।'

কবিগুরুর এরকম অনেক উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যে তিনি ভারতীয় নৃত্যের গতি ও প্রকৃতিটিকে উপলব্ধি করেছিলেন। এবং তাকে চলমান শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসেই রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে মুক্তি দিলেন তাত্ত্বিক ও জ্যামিতিক আবেগবৃত্তের পরিধি থেকে। ছড়িয়ে দিলেন সহজরূপে, সরল ছন্দে, পরিমুক্ত প্রাণময়তায় জীবনে।

রবীন্দ্র নৃত্যধারা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি সত্য উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন যে কবিগুরুর বিভিন্ন সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মূলে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান। এই প্রেরণাই তার সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নৃত্যকল্পনায় সুষম সৌন্দর্যে প্রস্ফুট হয়েছে।

'মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্‌শা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কি। আমাদের প্রতিদিনটা দাগধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিতব্রতী-পরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব

সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে "দরিদ্রনারায়ণ" তো নাচ শেখেননি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলই ছটফট্ করে বেড়ান তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভাল লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চারদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধুলো লাগছে, পরিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলই অপ্রমাণ হচ্ছে—একেই বলে বাস্তব। কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অম্লান, সে অপরূপ। তাই যদি না হবে তবে গোলাপ ফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে, কোন্ গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানুষের কলহ কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লীলা। অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দাটার এক কোণা উঠে গেল—"দরিদ্রনারায়ণ"কে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে। তাকেই অসত্য বলে উঠে চলে যাব, মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে। তাকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তার ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুই-এর মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ", যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।'

এইরকম তাঁর বহু পত্রের উদ্ধৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যধারার মূল চিন্তাগুলি এবং কাব্যিক প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্যকলার রসনিষ্পত্তি ও আশ্রিতভাবের প্রসঙ্গেও তার উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য।

'মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয় এমন আর কোন জীবেই দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গীর মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করেনি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই।

কিন্তু এ যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখ, দুঃখ, রাগ, বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। "আমি ভালবাসি" এই কথাটি ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করার কাজে। আবার "আমি ভালবাসি"—এই কথাটিকে "আমি" থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে—যে সৃষ্টি সর্বজনের সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহ শোক দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ চাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ।...গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালের একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল তালের নেশা জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই কেবল লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য। সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।'

নৃত্য সম্পর্কে কবিগুরুর এই সব বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তার সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকাশগুলির মূলে যে কাব্যগত প্রেরণা প্রধান, সেই প্রেরণাই সঙ্গীত ও নৃত্য-কল্পনায় কাব্যের সুষম উপলব্ধিকে সুর ও ছন্দের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে। সঙ্গীত ও নৃত্যের যুক্ত দ্বৈত প্রণামে অন্তরঙ্গ হয়েছে কবিকল্পনা। সূর্যাস্তের রংলাগা পশ্চিম দিগন্তে হংসবলাকা যে আকুলতায় কবিহৃদয়কে আন্দোলিত করেছে, সেই স্পন্দনই সুর ও ছন্দে অবগাহন করে কবিগুরুর সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় এনেছে পরিশ্রুত সৌন্দর্য। শিল্প ও সংস্কৃতি জীবনের উপস্থাপনা। তাই এর আনন্দের বৃত্তে রূপ ও রসের অজস্র বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের মধ্যেই যে মুক্তি, সেই মুক্তিই কবিগুরু সঞ্চারিত করেছেন তাঁর নৃত্যধারায়।

অনেক সময় আমরা "রবীন্দ্র নৃত্য পদ্ধতি" বলে একটা কথা শুনে থাকি। আসলে সেটা কি তার কোনো অর্থ আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ কি বিশেষ কোনো মৌলিক নৃত্যপদ্ধতি রচনা করেছেন? এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন, কারণ আজ কাল প্রায়ই সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গি রাবীন্দ্রিক হয়েছে-কি-হয়নি এই নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। নৃত্যকলা সম্পর্কে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল। কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী কোনো বিশেষ নৃত্যপদ্ধতি রচনা করেন নি। এই আলোচনা কালে অত্যন্ত সতর্কভাবে নৃত্য সম্পর্কে তার চিন্তা ও শান্তিনিকেতনে নৃত্য প্রযোজনার ইতিহাস অনুসরণ করতে হবে। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ-এর রচনা থেকে আমরা জানতে পারি—

'এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিকমতো বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাব শান্তিনিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে তৈরী করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সমাজজীবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে।'

এই উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বিশেষ কোনো ব্যাকরণসিদ্ধ-পদ্ধতি কবিগুরু নির্দিষ্ট করতে চান নি।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে কবিগুরুর জীবিতকালে তিনি ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার প্রখ্যাত গুরুদের এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে প্রযোজিত নৃত্যধারায় ভারতীয় ঐতিহ্যের ও বিদেশীয় ভাবধারায় সমন্বয় ঘটেছে, শাস্ত্রীয় নৃত্যের জটিলতা মুক্ত হয়েছে সহজ ছন্দে। নৃত্যপ্রয়োগের প্রথম পর্যায়ে দক্ষশিল্পী না থাকায় কবিগুরু অনেক সময় নিজেই সহজভাবে সঙ্গীতের ভাব প্রকাশের উপযোগী নৃত্যশিক্ষা দিতেন। প্রথমেই মূকাভিনয়, গীতাভিনয় ও দেহভঙ্গিতে একটু ছন্দ লাগিয়ে অভিনয় করা হত। গুজরাটী ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সেখানকার

লোকনৃত্যও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কথাকলি ভরতনাট্যম্, মণিপুরী ও কথক নৃত্যও শান্তিনিকেতনে প্রচলিত হয়েছে। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় ভারতের চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার সমন্বয় ঘটেছিল। বজ্রসেন চরিত্র রূপায়িত হয়েছিল ভরতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্যধারায়, উত্তীয় কথক নৃত্যধারায়, প্রহরী কথাকলি নৃত্যধারায় ও শ্যামা চরিত্র মণিপুরী ভঙ্গিতে। এখানে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও মূল নাট্যপ্রচেষ্টায় একটি কাব্যধর্মী সুরকেই অনুসরণ করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যই শান্তিনিকেতনে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। মণিপুরী নৃত্যের সহজ সাবলীল ছন্দ, স্বচ্ছ বিন্যাস ও মনোরম মৃদু ললিত সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিকল্পনার একাত্মতাই এর কারণ। কথক নৃত্যপদ্ধতি শান্তিনিকেতনে তার স্থূল আঙ্গিকসর্বস্বতার জন্যে বিশেষ সমাদৃত হয়নি।

কবিগুরু নৃত্যপ্রযোজনা কালে সৌন্দর্যরসের উদ্বোধন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন বলে অনেকক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নৃত্যের বাহুল্য ও কলা-কৌশল বাদ দিতেন। প্রতিমা দেবী এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরসের তাৎপর্য এমন সূক্ষ্ম পরিমাপণীর উপর দাঁড়িয়ে আছে যে তার কোনোদিকে একটু স্থূলতার ভার চাপলে গতি নিম্নগামী হবে এই আশংকায় অনেকগুলি প্রচলিত নৃত্যরীতিকে আমরা স্বীকার করিনি।'

"চণ্ডালিকা" প্রযোজনা সম্পর্কে প্রতিমাদেবীর আলোচনায় শান্তিনিকেতনে নৃত্য প্রযোজনার সুন্দর ছবি পাওয়া যায় :

'চণ্ডালিকার কথোপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারুকার্য মনকে টানে। কীর্তন, বাউল থেকে আরম্ভ করে পূরবী, সাহানা, পরজ, ভৈরবী, বাগেশ্রী পর্যন্ত নানাপ্রকারের সুর কথার অনুসরণে প্রতিপদে পরিবর্তিত হয়েছে। সঙ্গীতে যেমন মিশ্রণ ঘটেছে নৃত্যেও হয়েছে ঠিক তাই। চতুর্বিধ তালনৃত্যই বিবিধ ভঙ্গীর মধ্যে মিলিত হয়ে গল্পের ভূমিকাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই যে সংমিশ্রণ এতে ঐক্য নষ্ট না হয়ে নৃত্যকলা ও সঙ্গীত সমভাবেই বৈচিত্র্যলাভ করেছে। এই রকমারী না থাকলে নাটক তৈরি হত না। বিচিত্র সুর সমাবেশের জোরে কথোপকথনের ছন্দ সচল ও জোরালো হয়ে উঠেছে, তালও প্রথাগত নিয়ম থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ করেছে। কোথাও কোথাও আধুনিক সাহিত্যের গদ্য কবিতার মতো ভাব আপনাকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। নৃত্যের সেই বন্ধনহীন রূপ নূতন আকৃতি নিয়ে নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে এক অকৃত্রিম রস ও শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। অনেকেই জানেন বোধহয় শান্তিনিকেতনের নৃত্য কোনো বিশেষ বিধিবদ্ধ সর্বাঙ্গীণ প্রাচীন নৃত্য-কলার আঙ্গিককে অনুসরণ করে না। মিশ্রসুরের মতো মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর যোগে বর্তমান নৃত্যকলা সংগঠিত হয়ে থাকে। এই মিশ্রণ যত সহজভাবে হয়, দেখা গেছে নাচের বৈচিত্র্য ও প্রকাশ ততই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদার মধ্যে এই আঙ্গিকের অনুশীলন আমরা পুনঃপুনঃ দেখতে পাই। যদিচ মণিপুরের নৃত্যের আঙ্গিকের উপর চিত্রাঙ্গদার ভিৎ তৈরি হয়েছে তবুও দর্শক সমস্ত মণিপুর ঘুরেও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যের অনুরূপ জিনিস দেখবেন না। তেমনি দক্ষিণী আঙ্গিকে তৈরি চণ্ডালিকাকেও দক্ষিণী নৃত্যের মধ্যে চেনা যাবে না, সংমিশ্রণের এমনি গুণ। এ যেন রাসায়নিক মিশ্রণ।'

জাভা, বলিদ্বীপ, সিংহল ও জাপানের নৃত্যপদ্ধতিতে সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ও সুষম প্রকাশ কবিগুরুর নৃত্যকল্পনাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। তিনি 'জাপান যাত্রী'তে নৃত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

'একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহভঙ্গীর সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড। ভঙ্গি বৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিংবা কোথাও জোড়েব চিহ্ন দেখা যায় না ; সমস্ত দেহ পুষ্পিতলতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধ-নারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়া-ছুঁড়ি আছে। জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কবিগুরু যে সবলতা ও স্বচ্ছতার সমন্বয়ে বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার ব্যঞ্জনায় রসসৃষ্টির প্রয়াসী, নৃত্যের ক্ষেত্রেও তিনি সেই একই পথ নির্দেশ করেছেন, কারণ তার নৃত্যকল্পনাতে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান। নৃত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

'মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্যভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর কোনোটাকে বলি তার উল্টো। তফাতটা কিসে। কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলার সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।'

এই হচ্ছে নৃত্য সম্পর্কে কবিগুরুর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। নৃত্যকলাকে জীবনের ছন্দরূপে মানুষের মনে কত সহজভাবে কবিগুরু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন নিচের উদ্ধৃতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

'রোসো, নাচের কথা যখন উঠলো ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনাছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়।'

এই হচ্ছে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণভাবে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে একদল তথাকথিত রবীন্দ্র অনুরাগী যে অনুকরণপ্রিয়তা ও রবীন্দ্র ধারারক্ষার কথা বলেন তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্র শিল্পকলার অনুকূল নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ঃ

'সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করতে গেলে সঙ্গীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটার মতো সঙ্গীতের নিজের একটা ওঠা-নামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস ; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।'

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় এই সংযম ও কাব্যিক সুবিচারের প্রয়োজন সব থেকে

বেশি। রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ

'অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না।'

অনেক প্রখ্যাত নৃত্যগুরুও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য কল্পনায় ভাবরূপের প্রতি বিশেষ অবহেলা দেখান। রবীন্দ্র সাহিত্য ও নৃত্যাদর্শের মর্মকথা না বোঝাই এর কারণ। তারা অনেক সুন্দর নৃত্যাংশ রচনা করেন কিন্তু মনোগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশক্ষেত্রেই তা ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের আতিশয্যদুষ্ট। কবিগুরুর কথায় ঃ

'এরূপ অসংযত আতিশয্য অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করে ফেলে ; তাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে ঢোকবার এমন বাধা তো আমি আর দেখিনে।'

রবীন্দ্র নৃত্যকল্পনার সৌন্দর্য ও আনন্দের সূক্ষ্ম সংবেদন রচনা একটি মহৎ গুণ— এই সৌন্দর্য রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর সতর্কবাণী মনে রাখা দরকার।

'এক রকমের গায়ে পড়া সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতিলালিত্য গুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে সে আর্ট এই সৌন্দর্যকে আমল দিতেই চায় না।'

নতুনত্বের প্রলোভনে চমক সৃষ্টি ও কাব্যের মর্মকথাকে উপেক্ষা করে চোখ-ধাঁধানো দৃশ্য, মন-মাতানো নৃত্যভঙ্গিমা ও পরিমিতিহীনতা অনেক সময়ে রসবিকৃতি ঘটায়। এই বিকৃতিও স্থূল দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে, কারণ 'রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে'।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নৃত্য, নাট্য ও কাব্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। সুরের রস, নৃত্যের রস ও কবিতার রসের সমন্বয়ে এক অখণ্ড রসবৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ সংহতি। কাজেই এই ত্রিধারার সম্যক উপলব্ধি না ঘটলে শিল্পীর পক্ষে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের যথার্থ রূপায়ণ ও পরিকল্পনা অসম্ভব। প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে বিষয়বস্তুর ভাবরূপ— পরিকল্পনার যা প্রধান প্রেরণা। তারপরে নৃত্যের বিভিন্ন অংশের সংযোজন ও ভারসাম্য। তার পরে পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্য যাকে কবিগুরু বলেছেন চালচিত্র খাড়া করা। এবং সর্বোপরি প্রাণছন্দের ভাবসৌষাম্য অর্থাৎ সকল অভিব্যক্তির মধ্যে সুষমা স্থাপন, সৌন্দর্য ও আনন্দের সূক্ষ্ম সংবেদন রচনা করা যা মানবমনের গভীর অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে। ভাবরূপের সার্থকতা যদি নৃত্যরূপে সুষম হয়ে ওঠে তবেই সেই নৃত্যকল্পনা সার্থক, কারণ নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য তার সমগ্র ভাবটিকে দেহচাঞ্চল্যে প্রস্ফুট করা। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুভূতির একটি অশরীরী আত্মা ও

নৃত্যের মধ্য দিয়ে সেই অনুভূতির বাস্তব রূপ যদি গঠন পারিপাট্য, সামগ্রিক অভিনয় সৌষ্ঠবে, নৃত্যগীতের উৎকর্ষ ও মেলবন্ধনে একটি সর্বাঙ্গীণ অখণ্ডতা সম্পাদন করে দর্শকমনে অলৌকিক রস সঞ্চার করতে পারে তবেই রবীন্দ্রনৃত্য পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করে। অবশ্য এই সুষমা কিভাবে প্রস্ফুট হবে সেটা শিল্পীর দক্ষতার উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছাপার অক্ষরে নির্ভুল পাওয়া যায়, সঙ্গীতেরও স্বরলিপি আছে কিন্তু নৃত্যের জন্যে বিশেষ কোনো নির্দেশিকা না থাকায় অপব্যাখ্যা ও স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের বহু নিদর্শন দেখা যায়।

রাবীন্দ্রিক হয়েছে-কি-হয় নি এই প্রসঙ্গে বর্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক শ্রীউদয়শংকরের 'সামান্য ক্ষতি"র কথা মনে আসে। অনেক রবীন্দ্র অনুরাগী বলেছেন ভালো হয়েছে কিন্তু ঠিক রাবীন্দ্রিক হয় নি। শ্রীউদয়শংকর "সামান্য ক্ষতি" পরিকল্পনায় কাব্যিক সুবিচার করেছেন। পণ্ডিত রবিশংকর সঙ্গীতাংশে কাব্যের মর্মকথাকে অনবদ্যরূপে ঝঙ্কৃত করেছেন। তা হলে রাবীন্দ্রিক হয় নি এ প্রশ্ন কেন? কোনো পরিচিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর অনুকরণ করা হয়নি বলে? এই অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তাকে কবিগুরু সব সময়েই নিন্দা করেছেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। কিছুকাল আগে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রতারকা প্রযোজিত "চণ্ডালিকা" আমরা দেখেছি। কাব্যের মর্মকথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চোখধাঁধানো দৃশ্য, মনমাতানো নৃত্যভঙ্গিমা ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখানোর অশোভন আতিশয্যে এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্র সংস্কৃতিচর্চার নামে রসবিকৃতির নিদর্শন। প্রকৃতির ভূমিকায় রূপায়ণী চিত্রতারকা দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের একজন দক্ষশিল্পী। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় অসংযম ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উৎকট বিলাস দেখে 'রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে' এই কথাটি বারবার মনে হয়েছে।

এই অসংযম ও পরিমিতিহীনতা সম্পর্কে কবিগুরু বারবার সতর্ক করেছেন:

'আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি।'

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্যে যতটুকু চালচিত্র খাড়া করা দরকার ততটুকুই দৃশ্যপট, আলোক সম্পাত, বেশভূষা ও বর্ণসমন্বয় ব্যবহার করা উচিত। এর আতিশয্যও অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। বেশভূষা, প্রসাধনেও কবিদৃষ্টি কাব্যধর্মী। 'জাভা যাত্রীর পত্র'-এ তিনি বলেছেন:

'নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায় খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি মণিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্ধ—তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায় সবুজে মেলানো আঁট কাঁচুলি, কোমরবন্ধ থেকে দুই ধারায় বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্রবেষ্টনী সুন্দর বর্তিকাশিল্পে বিচিত্র; দেখবামাত্রই মনে হয় অজন্তার ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখিনি। আমাদের

নর্তকী বাইজীদের আঁট পায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমার ভারী কুশ্রী লেগেছে। তাদের প্রচুর গয়না-ঘাঘরা-ওড়না ও অত্যন্ত ভারীদেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়—সাজানো একটা মস্ত বোঝা। ···আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনুদেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।'

এই উদ্ধৃতি থেকে রবীন্দ্র নৃত্য প্রযোজনায় আঙ্গিক-এর দিকেও কাব্যধর্মী দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মনে রাখতে হবে ভাব নিজেতে প্রকাশ করার জন্যে রূপকে অবলম্বন করে। ভাব না থাকলে শুধু রূপ প্রাণহীন পুতুল। রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ

'ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তার কপালে মৃত্যু আছে। পাথরের টুকরা দিয়া রুটির কাজ চালান যায় না, বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না।'

রবীন্দ্র নৃত্য পরিকল্পনার প্রযোজনা ও আঙ্গিক-এর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কবির কবিতা যেমন তার হৃদয়াবেগের ভাষা, তেমনি সুর ও নৃত্যও শিল্পীর হৃদয়াবেগের বাহন। আর কাব্য, সুর ও নৃত্যের যথার্থ ত্রিবেণীসঙ্গম না ঘটলে রবীন্দ্রনৃত্য কল্পনা অসম্পূর্ণ থাকে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক বাংলা দেশের কবিদের সম্পর্কে একটি অভিযোগ করা যেতে পারে। বর্তমানে কাব্যে, নাটকে, সঙ্গীতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা দেশের কোনো কবি নৃত্যনাট্য রচনা করেন নি। স্বভাবতই তার ফলে মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান নৃত্যকলা আধুনিক কাল ও মানসের বাহন হয়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গঠনশৈলী, রূপ ও রীতির পার্থক্য কবিগুরুর রচনাতেই নির্দেশিত হয়েছে। কারণ কবিগুরু "চিত্রাঙ্গদা", "শ্যামা' প্রভৃতির রচনা কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য দুই ভাবেই করেছেন। আমরা নৃত্যশিল্পীরা সাগ্রহ প্রত্যাশা করব—কাব্য ও নৃত্যকলার সেতুবন্ধে সংস্কৃতির যে মুক্তি কবিগুরু প্রবর্তন করেছেন, বাংলা দেশের কবিরা তার উত্তরসাধকের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসবেন।

কুচিপুড়ি নৃত্য

মানুষের ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তার শিল্পকর্মে। মানবের মননশীলতার অনন্ত বৈচিত্র্য শিল্পের বহুমুখিতায় প্রকাশিত। জগতের জীবন্ত শিল্প-কলার মধ্যে প্রাচীনতম—নৃত্যকলা। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা, উৎকর্ষে রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবরসের ঐশ্বর্যে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শনের স্বভাব-সুন্দর পরম অভিব্যক্তি।

সংস্কৃতি স্থাবর নয়, গতিশীলতা তার ধর্ম। সংস্কৃতির ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ করা ও বর্জন করা; আর গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই তার অভিযাত্রা। শিল্পতাত্ত্বিক বিচারে নৃত্যের প্রাচীনতা স্বীকৃত হলেও ভারতীয় নৃত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছে। কারণ আমাদের দেশের এই গুরু-মুখী শিল্পকলার যতখানি ফলিত চর্চা হয়েছে ততখানি ঔপপত্তিক চর্চা হয় নি। ইতিহাসের গতিকে অনুসরণ না করলে নৃত্যকলার বিবর্তনের রূপটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শির করণ ও অঙ্গহারযুক্ত নৃত্যকলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত না হলে এর ক্রমপরিণতির রূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অত্যন্ত ও ছিন্নসূত্র হওয়ার জন্যে ভারতের নৃত্যকলার ক্রমবিকাশের ইতিহাসও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

নানা বৈচিত্র্যময় বিপুলায়তন এই নৃত্যধারাকে বর্তমানে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন—আদিবাসী নৃত্য (Iribal Dance) লোকনৃত্য (Folk Dance), ধ্রুপদী (Classical Dance) নৃত্য। এছাড়া লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যবর্তী ধারাটিকে বলা হয়ে থাকে—Classico Flock বা Quasi Folk। যাই হোক ঐ আদিবাসী নৃত্য কিভাবে লোকনৃত্যে এবং লোকনৃত্যই বা কিভাবে মার্গ নৃত্যের পরিশীলিত রূপ পায় তার বিস্তৃত ইতিহাস অনুধাবনযোগ্য।

আমরা এখনো মার্গ নৃত্য বা উচ্চাংগ নৃত্য বলতে কথাকলি, মণিপুরী, ভরত-নাট্যম্ ও কথক-কে প্রাধান্য দিয়ে থাকি কারণ এগুলি বহুল প্রচলিত। কিন্তু এছাড়া, মোহিনী আট্যম্, কৃষ্ণনাট্যম্ বলে দুটি ক্ষয়িষ্ণু ধারা আছে। তাছাড়া বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণীয় নৃতকলা ওড়িশী। এছাড়া কুচিপুড়ির সম্ভাবনাও বর্তমানের রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাদিরনাট্যম, ভগবতমেলা নাটক, কুরুভঞ্জি ও কুচিপুড়ি—এই চারিটি পদ্ধতিই পূর্বে ভরতনাট্যমে প্রচলিত ছিল। সাদিরনাট্যম্, ভরতনাট্যম্ নৃত্যের শুদ্ধ মৌলিক রূপ। বহু শতাব্দী ধরে মন্দিরে ও রাজ দরবারে দেবদাসীদের দ্বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। সাদিরনাট্যম্, দাসী-আট্যম্, চিন্নমেলম্, ভোগমেলম্, তাঞ্জোরী নাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। এর গঠনে নৃত্ত ও নৃত্য দুই-ই সমভাবে প্রযুক্ত হত। প্রাচীন ভগবতমেলা নাটকের ধারা অনুসরণ করেই কুচিপুড়ি নৃত্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে মন্দির ছেড়ে মঞ্চে এসেছে।

উত্তর ভারতের নৃত্যের সংগে দক্ষিণ ভারতের নৃত্যশৈলীগুলির বিভিন্ন মৌল

পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নৃত্যশৈলীগুলিতে অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভরতনাট্যম্, ওড়িশী, কুচিপুড়ি, ভগবত মেলা, কথাকলি প্রভৃতি প্রত্যেক নাচই নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুশাসনে সমৃদ্ধ।

অন্ধ্র প্রদেশেরর সংগীত নাটক আকাদেমী রিপোর্টে বলা আছে—'The Purest type of Bharat Natya as enunciated by Bharatmuni can be seen only in Andhra of all the states of India. Kuchipudi, the seat of pure Bharata Natyam and Dance Drama is now attracting the attention of the whole world.' (Report of the Survey, conducted by Sangeet Natak Academy, Andhra Prodesh, Hyderabad, 1960) আরও একটি সাময়িকীতে বলা হয়েছে, 'Bharat Natyam and Kuchipudi—which are particularly ancient and classical Andhra Art.' (Suvenir—Natya Niketan—Hyderabad.) এই সমস্ত উক্তি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ভরতনাট্যম্ ও কুচিপুড়ি একই ভাবগঙ্গার দুই স্রোত ধারা এবং এখানে অন্ধ্রের প্রাধান্যও স্বীকৃত হয়েছে। শ্রদ্ধেয়া রাগিনী দেবীর উক্তিতে ভরতনাট্য ও কুচিপুড়ির মেলবন্ধনের কথা আরও সুস্পষ্ট—'The gurus of Kuchipudi have also preserved the Andhra Style of Bharat Natya, and have composed Jatiswarams, Varnams and Tillanas in the Devdasi tradition.' (Dance Dialects of India—Ragini Devi ; (Vikash Publication—Bombay 1962.)

দাক্ষিণাত্যের প্রতিটি নৃত্যনাট্য একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কারণ—(১) ভৌগলিক অবস্থান (২) আবয়বিক ও ঔপপাত্তিক প্রকরণ নাট্যশাস্ত্র অনুসারী। ভৌগলিক অবস্থান পূর্বঘাট পর্বতমালা-কেন্দ্রিক, আবয়বিক পদ্ধতিতে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকলেও ভরতনাট্যম্, কুচিপুড়ি ও ওড়িশীর মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কর্ণাটকের যক্ষগণ নৃত্যনাট্যে প্রায় দশ প্রকার 'কলি' নৃত্য আছে, যার প্রভাব কেরলের কথাকলি নৃত্যে লক্ষ্য করা যায়। তেমনি ভগবত মেলা নৃত্যনাট্যের প্রভূত প্রভাব পাওয়া যায় কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে এবং এর সঙ্গে ওড়িশী নৃত্যের মিলও লক্ষ্য করার মতো। যদিও আঞ্চলিকতা ভেদে ও আচার ভেদে পার্থক্যও আছে। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা অবশ্য ভরতনাট্যমের সঙ্গে এদের একীকরণ পছন্দ করেন না যেহেতু এগুলির প্রচার ও প্রসার এখন ঘটলেও আগে ছিল না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ডঃ চার্লস-এর উক্তি আমাদের অনেকখানি সাহায্য করবে: 'Kuchipudi in Andra is a brave variety of Bharatnatya, certainly classical and taught by learned Vidwans, Similar, but not identical with Bharatnatya'. (classical and Folk Dance of India).

বিখ্যাত নৃত্য সমালোচক প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ডঃ চার্লস এর মতকে গ্রহণ করেন নি, তিনি বলেছেন: 'Kuchipudi or Kuchalapura is a village in Krishna District of Andhra which is the birth place of this particular Folk Dance' (Folk Dance of India—Prajesh Banerjee—Page 21), এ ব্যাপারে দুজনের মতই আমাদের গ্রহণযোগ্য। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে

আদিম নৃত্য, লোকনৃত্য ও সর্বশেষে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে মার্গ নৃত্য হয়ে ওঠায়। জানা যায় 'শিবালিয়া' নামে বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকনৃত্যের নবতর রূপ উদ্ভূত হয়েছে কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে। যদিও সাধারণভাবে মার্গ নৃত্য বলতে ভরতনাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী ও কত্থক এই চারটিই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু অনেকের মতে এই বর্গীকরণ অসম্পূর্ণ। কেউ কেউ বলেন মার্গ নৃত্য অন্তত নয়টি—(১) কুচিপুড়ি (২ ভরতনাট্যম্ (৩) কত্থক (৪) মণিপুরী (৫) কথাকলি (৬) সেরাইকেল্লার ছৌ নাচ (৭) আসামের আঙ্কিয়ানাট (৮) ওড়িশী (৯) যক্ষগণ।

ডঃ চার্লস ফেব্রির মতে ভরতনাট্যম্, কথক, কথাকলি মণিপুরী, ওড়িশী, ভগবত মেলা, কৃষ্ণনাট্যম্, মোহিনী আট্যম্ ও কুচিপুড়ি—নয় প্রকার।

এনাক্ষী ভবনানীর মতে মার্গ নৃত্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়—ভরতনাট্যম্, কুরুভাঞ্জী, কথক, কথাকলি ও কুম্মি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওড়িশী, কুচিপুড়ি, মণিপুরী, সেরাইকেল্লার ছৌ নাচ, মোহিনী আট্যম্, কৃষ্ণ ন ট্টম, ভগবত মেলা ও যক্ষগণ।

এইভাবে বিচার করার আগে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে মানব সংস্কৃতি ভৌগলিক অবস্থান ও বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাত-তানিত ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ও পরিপুষ্ট হয়। বিচার করার সময় আমরা যদি আঞ্চলিক আবেগের বশীভূত না হই তাহলে সত্যকে দেখা অনেক সহজ হয়। একথা স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্থ হবার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না যে নৃতাত্ত্বিক ও নাট্যশাস্ত্র এই দুইদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে মার্গ নৃত্যকে মূলত ভবতনাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী ও কথক এই চারটি বিভাগেই রাখতে হয়। এই স্বীকৃতির ফলে অন্য নৃত্যশৈলীগুলির উৎকর্ষ বা মর্যাদার কোনও হানি ঘটে না। ঐতিহাসিক তথ্য একথাই প্রমাণ কয়ে যে ভরতনাট্যম্ ভগবত মেলা, কুরভিঞ্জি, ওড়িশী, কুচিপুড়ি, যক্ষগণ—আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র বাদ দিলেও মোটামুটি ভাবে একই সূত্রে গ্রথিত। কথাকলি, মোহিনী আটম্, কৃষ্ণনাট্যম প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। সেরাইকেল্লার ছৌ-নাচ, কুম্মি, আঙ্কিয়ানাট এগুলি লোকনৃত্যের মাগ নৃত্যোভিমুখী রূপ।

প্রাচীনতম নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের রচনাকালের আগেও আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাক্ বৈদিক যুগের নৃত্যকলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত উর্ধ্ব-তাণ্ডব ভঙ্গিযুক্ত নটমূর্তি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ নৃত্য পদ্ধতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এছাড়াও বহু সংগৃহীত মূর্তি, প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতি থেকে অন্ধ্রের নৃত্যকলার প্রাচীনত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে অন্ধ্রের রাজত্বের ও শিল্পকলার উল্লেখ আছে। পরবর্তী সাতবাহন, ইক্ষ্বাকু, চোল, পল্লব, বিষ্ণুকুন্তিমা, কাকতীয়, হাম্পি, বিজয়নগর, মাদুরা ও তাঞ্জোরের নায়ক, গজপতি-জগপতি, ভেলস, রেড্ডি, গোলকুণ্ডার পদ্শা, তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রীয় শাসক প্রভৃতি বংশের নৃপতিরা অন্ধ্রে রাজত্ব করেছেন। এ ছাড়া মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনও ছিল।

ঐতিহাসিক অস্তিত্বের দ্বারা যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে মনে হয় বিজয়নগর রাজত্বের কালে ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে কুচিপুড়ি নাচের উদ্ভব হয়। ভারতের তথা দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিজয়নগর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। ঐতিহাসিক

বিচারে—'Works on music, dancing, drama, grammar, logic, philosophy etc. received encouragement from the emperors and their ministers. In short the Vijoynagar Empire was a synthesis of South Indian Culture. (An Advanced History of India—Majumdar, Roy Chowdhury, Dutta ; (Macmillan—1965, Page 378)

সংস্কৃত সাহিত্য ও তেলেগু ভাষা অন্ধ্রের তথা দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি বিকাশের একটি অন্যতম বাহন। এই তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত ও নৃত্যের চর্চা অদ্যাবধি বর্তমান। ভারতের নৃত্যকলার মূল ভাবধারা ধর্ম-ভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যাত্রার সূচনা। দেবতাকেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতা নৃত্যকলার উপরণের এই পথপরিক্রমার মধ্যেই ভারতীয় নৃত্য-ধারার ইতিহাসকে অনুসরণ করতে হবে।

নৃত্যকলার উৎস সন্ধানে ভারতের মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা একটি অন্যতম প্রধান বিষয়। পদ্মপুরাণে স্বর্গে পূর্ণ কল্পলাভের জন্যে দেবতাকে সুন্দরী স্ত্রী উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের উপাসনায় নৃত্যগীতি কুশলা স্ত্রীলোকদের উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবমন্দিরে নৃত্যগীতানুষ্ঠানের রীতির উল্লেখ পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। অন্ধ্রের চারুকলা বিকাশে ও প্রচারে—অমরাবতী, দ্রাক্ষারম সিংহপুরী, শ্রীশৈলম, কলাহস্থী প্রভৃতি ধর্মকেন্দ্রগুলি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আর্য যুগ থেকে দক্ষিণ ভারত ইতিহাসে তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। আর্য ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার দাক্ষিণাত্যে অনেক পরে হয়েছিল। মুসলমান আমলে খলজী সুলতানরা দক্ষিণভারতে প্রথম আক্রমণ করেন, এরপর আসেন তুঘলকরা। মহম্মদ-বিন তুঘলক দেবগিরিতে তাঁর রাজধানী পর্যন্ত'স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু শত বিপর্যয়ের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা বিচলিত হন নি। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সচেতন, নিষ্ঠাবান ছিলেন বলে তাদের সংস্কৃতির ভিত আলগা হয়ে পড়েনি। এই সচেতনতায় বিজয়নগর রাজাদের অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক।

বিজয়নগররাজ বীর নরসিংহ রায়ের রাজত্ব কালেই কুচিপুড়ি নৃত্যকলা সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে। এরপর রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-৩০) অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায়ের (১৫৬৫) রাজত্ব কালেও কুচিপুড়ি নৃত্যের উৎকর্ষ ম্লান হয় নি।

মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের আদর্শে বিজয়নগরে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েও কিন্তু শিল্পকলার চর্চা অব্যাহত ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত কিস্তনা (kistna) জেলার কুচিপুড়ি বা কুচেলাপুরম্ গ্রামে কুচিপুড়ি নাচের উদ্ভব হয় বলে ধরা হয়। সেখানকার ব্রাহ্মণ পরিবারের পাঁচশত বছরের চর্চার ফলেই কুচিপুড়ি নৃত্যধারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তা বর্তমানের মার্জিত ও উন্নততর মার্গ নৃত্যে উন্নীত হয়।

গ্রামের আঙিনা থেকে কুচিপুড়ি নৃত্য দেবালয়ে আসে। বিজয়নগরের রাজাদের আমলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেরও প্রভূত উন্নতি হয়। মন্দিরের হাজার হাজার স্তম্ভের মধ্যে বিভিন্ন মূর্তিতে সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। বিভিন্ন দেবদাসীদের নৃত্যরতা মূর্তি এই

সমস্ত গোপুরমকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। এ ছাড়াও বহু শোভাযাত্রা ও পশুদের মূর্তিও দেখা যায়। দেবালয়ের মধ্যে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মন্দির ও আরও অনেক মন্দির স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করে। এই সমস্ত মূর্তি সে যুগের নৃত্যকলার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। মন্দিরগুলি নাটমন্দির সংলগ্ন। নাটমন্দিরে দেবদাসীরা নৃত্য করতেন। 'শিবালিয়া' গ্রামীণ নৃত্য নাট্য পদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিমার্জিত হয়ে কুচিপুড়ি হয় এবং দেবমন্দিরে দেবদাসী নৃত্য হয়ে ওঠে, নগর সভ্যতার উন্মেষে তাই বর্তমানে মঞ্চে পরিবেশিত হয়।

খ্রীস্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র, শিলালিপি, পুঁথি প্রভৃতি থেকে জানা যায় যে তখন উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ অবধি ও কর্ণাটকে এক বিশেষ ধরণের শিল্পী সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটে। 'নাত্তুভ মেলা' (Nattuva Melas) নামে এরা পরিচিত। মহিলা শিল্পীরা এই সম্প্রদায়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতেন। স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। প্রাচীন শিল্পকলার পবিত্র ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে একদল রক্ষণশীল শিল্পীদল এগিয়ে আসেন ও তাঁরা 'ব্রহ্মণ্যমেলা' নামে এক শিল্পী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সম্প্রদায়ে কোনো মহিলা শিল্পী ছিলেন না। পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। এই ভাবে 'কুচিপুড়ি ও ভগবত মেলা র সৃষ্টি হল। 'শিবালিয়া' গ্রামীণ লোক নৃত্যনাট্যও 'ভগবত মেলা' বা কুচিপুড়ি উদ্ভবের আর একটি সূত্র। শিবের নানা আচার অনুষ্ঠান (Rituals) এই শিবালিয়ার বিষয়বস্তু ছিল। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের সমাগমে ভগবত পুরাণের কাহিনী এই নৃত্যনাট্যে স্থান লাভ করে ও যাঁরা তার চর্চা করতেন তাদের বলা হত 'ভাগবতুলু' (Bhagabatulu)। এঁরাই কুচিপুড়ি ভাগবত মেলার প্রধান শিল্পী।

১৫০২ খ্রীস্টাব্দে লেখা 'মছুপল্লী কৈফিয়ৎ' নামে গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায় যে— ভাগবতুলুরা একবার বিজয়নগর রাজ্যে গমন করেন। রাজা বীর নরসিংহ রায় তাঁদের নৃত্য প্রদর্শনের জন্য রাজধানীতে আমন্ত্রণ করেন তখন ঐ ভগবাতুলুরা নৃত্যের মাধ্যমে সিদ্ধবতমের রাজা সম্মেত গুরুভরাজুর অত্যাচারের কাহিনী প্রদর্শন করেন। কথিত আছে রাজা এই অত্যাচারের কাহিনী দেখে বিচলিত হয়ে অচিরেই তা বন্ধ করে দেন। এই ভ্রাম্যমান নৃত্যশিল্পী গোষ্ঠী শিবলীলা নাট্যম অনুষ্ঠান করতেন।

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কুচিপুড়ি নাচের শিল্পী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঞ্জোরে চলে যান ও ঐখানে 'নায়ক' রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজা অচ্যুতাপ্পা নায়ক (১৫৬১-১৬১৪) এই শিল্পের প্রতি অত্যন্ত দরদী ছিলেন। তিনি এই শিল্পী সম্প্রদায়ের অনেক ব্রাহ্মণকেই 'অগ্রহারম' দিয়ে তাঁদের শিল্পকলার সমৃদ্ধি ও প্রসারে উৎসাহিত করেন। রাজা অচ্যুতাপ্পার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম দেওয়া হয় 'অচ্যুৎপুরম'। এই 'অচ্যুৎপুরম'ই এখন 'মেলাতুর'। 'মেলাতুর' গ্রামেই 'যক্ষগণ' নৃত্য-নাট্যের খুব প্রচলন ছিল। ব্রহ্মণ্যমেলা সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। এখনও তেলেগু ভাষায় রচিত কবি ভেংকটরমনের পদগুলি মেলাতুরের ভগবতমেলায় অনুষ্ঠিত হয়। মেলাতুর নৃত্যের সঙ্গে এই সংমিশ্রণে কুচিপুড়ি আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ও কতকগুলি সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়—যেমন প্রবেশদায়াভূ যা শিল্পীদের মঞ্চে

দর্শকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ছাড়া মন্দিরের প্রাঙ্গনে বা নাটমণ্ডপে মুখে মুখে ছড়া বেঁধে 'রক্তি রাগ' অনুষ্ঠান হত। মৃদঙ্গে তাল রক্ষা করা হত এবং দুটি বড় মশালের আলোয় প্রাঙ্গন আলোকিত হত। এটি কতকটা কথকতা বা কবিগানের মতো।

এই ভাবে তাঞ্জোর ও অন্ধ্রগোষ্ঠী ভরতনাট্যম ও কুচিপুড়ি নৃত্যের উত্তরাধিকারী হল এবং একে অপরকে সমৃদ্ধ করল এবং বর্তমান রূপ গ্রহণ করল। মেলাতুর ও কুচিপুড়ি নৃত্যের মধ্যেও সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

বর্তমানে মেলাতুর ও কুচিপুড়ি শিল্পীগোষ্ঠী কী কী নৃত্যনাট্য সাধারণভাবে মঞ্চে পরিবেশন করেন তার তালিকা–

কুচিপুড়ি

১) ভামকলাপম্ ২) গোল্লাকলাপম্ ৩) প্রহ্লাদ চরিতম্ ৪) উষা পরিণয়ম্ ৫) শশিরেখা পরিণয়ম্ ৬) মোহিণী রুক্মাংগদী ৭) হরিশ্চন্দ্র ৮) গায়োপাখ্যানাম্ ৯) রাম নাটকম্ ১০) রুক্মিণী কল্যাণম্

মেলাতুর

১) প্রহ্লাদ চরিতম্ ২) উষা পরিণয়ম্ ৩) রুক্মাংগদা ৪) হরিশ্চন্দ্র ৫) মার্কণ্ডেয় ৬) সীতা কল্যাণম্ ৭) রুক্মিণী কল্যাণম্ ৮) ধ্রুব চরিতম্ ৯) কংস বধ ১০) ভস্মাসুর বধ ১১) শিবরাত্রি বৈভবম্ ১২) গোল্লাভাম্।

এর পর ক্ষেত্রয়্য-এর পদের সাহায্যে নায়ক নায়িকার অভিসার বিষয় নিয়ে লাস্য আঙ্গিকে কুচিপুড়ি নৃত্যকলার বিকাশ ঘটে। এগুলিকে 'মুভ্যাগোপল' পদ বলা হয়। ক্ষেত্রয়্য এই পদগুলির রচয়িতা এবং তিনি কুচেলাপুরমেরই 'মুভা' নামক গ্রামে বসবাস করে নৃত্য-গীতের চর্চা ও পদ রচনা করতেন তাই এই পদগুলির নাম হয় 'মুভ্যাগোপাল' পদ। এরপর বিজয় রাঘব নায়ক-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি নৃত্যগীতের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পদগুলি অত্যন্ত ধীর গতির কিন্তু সাত্ত্বিকাভিনয় গুণে সমৃদ্ধ। নৃত্যকলায় দক্ষ শিল্পীরাই ক্ষেত্রয়্যের পদে অভিনয় করে থাকেন। বিজয়নগরের পতনের পর কুচিপুড়ি দুটি ঘরানায় বিভক্ত হয়। কুচিপুড়ি অন্ধ্রগোষ্ঠী ও তাঞ্জোরের মেলাতুর গোষ্ঠী, এঁদের পরিবেশিত মঞ্চ তালিকা থেকে আমরা দেখি যে ক্ষেত্রয়্যের পদ মেলাতুর গোষ্ঠী তীর্থনারায়ণ যতি–যিনি কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী ও যক্ষগণের স্রষ্টা তাঁর পদও অভিনয় করতেন। অন্যদিকে অন্ধ্রগোষ্ঠী ভক্ত সিদ্ধেন্দ্র যোগীর পদ অভিনয় করতেন। সিদ্ধেন্দ্র যোগী বিখ্যাত ভামকলাপম্ ও পারিজাত হরণমের স্রষ্টা এবং কুচিপুড়ি নৃত্যের উন্নতি ও প্রসার তার দ্বারাই সম্ভব হয়।

ক্ষেত্রয়্যের পর এই শিল্পকলার উন্নতিকল্পে যে নামটি স্মরণীয় তিনি তীর্থনারায়ণ যতি (১৬২০-১৭০০)। তিনি প্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী'র রচয়িতা। এগুলি পদ বা শোল্লোকত্তু (Sollokattu)। এগুলি সুরে অনেকটা বৈষ্ণব পদাবলীর ভণিতার মতো গীত হত। কুচিপুড়ি নৃত্যগোষ্ঠীরা জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও অষ্টপদীও নৃত্যাভিনয়ে প্রযোজনা করতেন। 'গোল্লাকলাপম্' ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ কথোপকথনাকারে রচিত নৃত্যনাট্য। এই কথোপকথন হত একদল ব্রাহ্মণ ও গোয়ালিনীর মধ্যে। এটি কতকটা আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মতো।

'যক্ষগণ' প্রথমে গীত হত। পরে নৃত্যনাট্য আঙ্গিকে খানিকটা আমাদের যাত্রার মতো অভিনীত হয়। 'যক্ষগণ' সৃষ্টির ইতিহাসটি এরূপ—একবার সোমনাথ নামে জনৈক পণ্ডিত 'বহুনাটক' নামে দশ প্রকার বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ 'শিবলীলা' লেখেন এবং এই 'শিবলীলা'ই পরে 'যক্ষগণ' হয়ে ওঠে। এই যক্ষগণ আজও ভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় যেমন—মহারাষ্ট্রে এটি 'ললিতা', গুজরাটে 'ভাবাই', বাংলায় 'যাত্রা', নেপালে 'গন্ধর্বগান' অন্ধ্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে 'যক্ষগণ'।

চরিত্রানুযায়ী অভিনয়ের রীতি কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনীতে তীর্থনারায়ণ যাতি প্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁর অভিনয় রীতির প্রভাব পড়ে কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যগুলিতে। ভক্ত ক্ষেত্রয়্য ও তীর্থনারায়ণ যাতির পরে আবির্ভূত হন সিদ্ধেন্দ্র যোগী। কুচিপুড়ি নৃত্য-নাট্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো তার নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। কুচিপুড়ি নৃত্যের নব রূপায়ণ করেন সিদ্ধেন্দ্র যোগী। তিনি এই নৃত্যনাট্যগুলিতে নবরসের সমাবেশ সমৃদ্ধ করে তোলেন। একক অভিনয়েরও প্রেরণা এই সময় থেকে বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধেন্দ্র যোগীর 'ভামকলাপম্' ও 'পারিজাত হরণম্' অনবদ্য দুই সৃষ্টি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

বিজয়নগরের পতনের পর সিদ্ধেন্দ্র যোগী কুচেলাপুরম্ ছাড়েন নি, বরং ঐ গ্রামে অবস্থান করে তিনি ব্রাহ্মণ বালকদের এই নৃত্যকলায় শিক্ষিত করার কাজে ও এই নৃত্য-কলার উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গোলকুণ্ডার নবাব আবুল হাসান কুতুব শাহ (১৬৭২-১৬৮৭) কুচিপুড়ি নৃত্যসম্প্রদায়কে কুচেলাপুরম্ গ্রামটিকে 'অগ্রহারম' হিসাবে দান করেন। তিনি প্রতিটি ব্রাহ্মণ পরিবারের শিল্পীদের ধর্মসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করান যে তারা যেন জীবনে একবার অন্তত সত্যভামার চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রকৃতপক্ষে 'ভামকলাপম্' এর মাধ্যমে কুচিপুড়ি নৃত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

কুচিপুড়ি শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ পরিচিত তাঁরা হলেন—পশুমূর্তি সীতাইয়া, চিন্তা ভেংকটরতনম্, ভেংকট রামাইয়া, চিন্তা কৃষ্ণমূর্তি, বেদান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী, বেদান্ত রামাইয়া, পশুমূর্তি কৃষ্ণমূর্তি, তাণ্ডবকৃষ্ণ, কাঞ্চনমালা, নটরাজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। তাণ্ডবকৃষ্ণ ও কাঞ্চনমালা এঁদের মধ্যে স্নাতক ছিলেন বলে জানা যায়।

এই নৃত্যনাট্যের বেশির ভাগ শিল্পীই ছিলেন বৈষ্ণব। মীরা, তুকারাম, চৈতন্য, তুলসীদাস, রামদাস প্রভৃতি যেমন ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আপন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন এই যাতি ও যোগী সম্প্রদায়ও তেমনই ধর্মমূলক নৃত্যনাট্য রচনা করে আপনার ভক্তিকে শিল্পে সঞ্চারিত করেছিলেন। আবার শোনা যায় আসামের শঙ্করদেব কিছু ধর্মমূলক নৃত্যনাট্য লিখে দক্ষিণাত্যে পাঠান ও প্রচার করেন যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নৃত্যনাট্য রচনা না করলে মানুষের মুক্তি নেই, ধর্মনেতা হবারও যোগ্যতাও নেই। এই উক্তিটি সম্ভবত তীর্থনারায়ণ যাতি ও সিদ্ধেন্দ্র যোগীকে ধর্মমূলক নৃত্যনাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে বলে অনেকে মনে করেন।

কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যের সর্বাপেক্ষ জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত কাহিনীগুলি হল—
১) ভামকলাপম্—সিদ্ধেন্দ্র যোগীর রচনা। এই নামে অবশ্য অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, অবশ্য মূলের সঙ্গে এদের অনেক পার্থক্য।

(২) প্রহ্লাদচরিতম্‌—তীর্থ নারায়ন আচার্‌লু রচিত। ষাট বছর প্‌র্বে বইটি ম্‌দ্রিত হয়।

(৩) গোল্লাকলাপম্‌—ভাগবতুল্‌ রামাইয়া রচিত। প্রায় ১০০ বছর প্‌র্বের রচনা। রামাইয়া একজন স্‌পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। এ'র বই খানির প্‌র্বকার নাম ছিল 'ওরা গোল্লাবেশম্‌'।

(৪) শশি রেখা পরিণয়ম্‌—বল্লভসেনী চৌধ্‌রী রচিত। বইটি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রচিত ও ম্‌দ্রিত হয়।

(৫) মোহিনীর্‌ক্‌মাংদা—রচয়িতা বেটা ভগবন্ত রাও। কইখানি আধ্‌নিক কালের রচনা। ম্‌দ্রণও সাম্প্রতিক কালের। এইখানি গীতবহ্‌ল।

(৬) উষাপরিণয়ম—লেখক বিদাম্বরম্‌কৈর। ম্‌দ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়।

(৭) হরিশন্দ্র নাটকম্‌—প্রাচীন রচনা।

(৮) গয়োপাখ্যানম—বল্লভসেনী রচিত।

(৯) রাম নাটকম্‌ (উত্তর রামচরিতম্‌) প্রাচীন রচনা।

(১০) র্‌ক্মিণী কল্যাণম্‌—প্রাচীন রচনা।

কুচিপ্‌ড়ির সঙ্গে ওড়িষীর অন্‌ষ্ঠান তালিকায় এবং ন্‌ত্যশৈলীতে প্রচুর মিল আছে। কুচিপ্‌ড়িতে ভামকলাপম, গোল্লাকলাপম্‌ এবং দশাবতার প্রধান ন্‌ত্য, এছাড়া তরঙ্গন্‌ত্য, পদাভিনয়, ম্‌ক্তারি, যক্ষিণী তীরক্ষণম দার্‌ভু, শব্দ পল্লবী, মণ্ডূক শব্দ, কাণ্ড ধর্মও প্রসিদ্ধ। ওড়িষী ন্‌ত্যেও দশাবতার ও পল্লবী আছে।

বর্তমানে প্রচলিত তাঞ্জোরের ভরতনাট্যমে যে ন্‌ত্যতালিকা—আলারিপ্‌, যতিস্বরম, শব্দম, বর্ণম, পদম, তিল্লানা তা খ্‌ব বেশি দিনের প্রবর্তন নয়। একক ন্‌ত্যের প্রদর্শন অর্থাৎ দেবদাসীদের কাল থেকেই সম্ভবত এর প্রচলন, এবং তাঞ্জোরের ভ্রাতৃচতুষ্টয় চিন্নাইয়া, প্‌ন্নাইয়া, শিবানন্দম্‌, ওয়াডিবেল্‌ এর প্রবর্তন করেন। কিন্তু এর প্‌র্বে রাগ-আলাপন এবং পদাবলী সঙ্গীত ভরত নাট্যমে কাবেরী সঙ্গীতের দ্বারা পরিচালিত ছিল। এই ভাবে কুচিপ্‌ড়ি পদ্ধতি ত্যাগরাজের সঙ্গীত স্‌ষমাকে সম্‌দ্ধ করেছে।

তখনকারদিনে সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মন্দিরগ্‌লি। মন্দিরে দেবদাসীরা নাচতেন। নাটমণ্ডপে দেবদাসীদের অন্‌ষ্ঠান হত। কল্যাণমণ্ডপে দেবদাসী ছাড়া অন্যরা নাচ করতেন। যক্ষগণ যা দরবারে স্‌চিত হত তা এই কল্যাণমণ্ডপেও অন্‌ষ্ঠিত হত। দেবদাসী ন্‌ত্যের সঙ্গে যক্ষগণের মিলনে ঐ ন্‌ত্যকলায় নতুনত্ব এল। ভ্রাম্যমান কুচিপ্‌ড়ি গোষ্ঠির ব্রাহ্মণ মেলা ন্‌ত্যধারা দেবদাসী ও রাজনর্তকীদের সঙ্গে এসে মিশল। বৈষ্ণবধর্মী দেবদাসীরা কুচিপ্‌ড়ি শিল্পীদের কাছে 'পারিজাত হরণম্‌' ন্‌ত্যনাট্যের পাঠ নিতে আরম্ভ করল। ক্রমশ মন্দিরে এই নাচের স্‌চনা ঘটল যদিও দেবদাসীদের তিরমনম, শব্দম, দার্‌ভু প্রভৃতিতে কিছ্‌ট্য পার্থক্য লক্ষিত হল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিকতা ভেদে ন্‌ত্যকলার বিভিন্ন আঙ্গিকে কিছ্‌টা পার্থক্য ঘটলেও আসলে তারা ম্‌লে এক। ভরতনাট্যম্‌ ন্‌ত্যকলা শ্‌ধ্‌মাত্র একটি ন্‌ত্যশৈলী নয়, এটি একটি সামগ্রিক ন্‌ত্য পদ্ধতি, যা অন্যান্য ন্‌ত্যধারাকেও প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে মোহন খোকারের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য: 'Bharata Natyam is an art of great antiquity, great beauity, great histrionic potentiality. But, Para-

doxically, that which is recognised, extolled and encouraged as Bharata Natyam today is only a part of a more comprehensive art of that name. Its popular connotation leads one to asscciate Bharata Natyam exclusively with the now familiar Allaripu-Jatiswaram-Padam-Tillana order of dance concerts : actually, Bharata Natyam is not a dance style but a dance technique—a 'system' ; if you will, and one that is capable of presentation in at least four related though varied forms. These are the Sadir Natya, Kuruvanji, Bhgavata Mela Nataka and the Kuchipudi. The Yakshagana and Mohini Attam are also based on the Bharat Natyam technique, but not to the extent to which these four are.'

এ কথা মনে রাখতে হবে যে ভগবত মেলা ও কুচিপুড়ি এই দুটি রীতিই কাব্য-নির্ভর। শ্রাব্যকাব্য থেকে এদের উত্তরণ ঘটেছে দৃশ্যকাব্যে। কুচিপুড়ি নৃত্যে শিল্পীর একক অনুষ্ঠানের সুযোগ আছে, ভগবতমেলায় তা নেই। ভগবতমেলা নাটকে নৃত্য-শিল্পীরা অনেক সময় বাচিক অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেন, কুচিপুড়িতে এই পদ্ধতি নেই। নাট্য বিচারে ভগবতমেলা অনেকাংশেই টোটাল থিয়েটারের শর্ত পালন করে। এই দুই রীতির ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সেই পুরাতন ভক্তি রসাশ্রিত পুরাণ কাহিনী প্রধান উপজীব্য, সমকাল এখনও সেখানে আসন পায় নি। কুচিপুড়ি নৃত্য-ধারার পুনরুজ্জীবনে যাঁরা ব্রতী, তাঁদের এ কথাটি ভেবে দেখা দরকার।

সাম্প্রতিক কালে আধুনিক দর্শকের কাছে কুচিপুড়ি নৃত্যের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠার আদর্শে যে শিল্পীর কৃতিত্ব সর্বাধিক ; তিনি হলেন শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী শুভা নাইডু ও স্বপ্নাকুমারী।

ওড়িষী নৃত্য

মার্গনৃত্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও গভীর ভাবসম্পদ সমৃদ্ধ ওড়িষী নৃত্যধারা নিঃসন্দেহে নৃত্যলোকে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। উড়িষ্যার বিভিন্ন দেবদেউল ও মন্দির গাত্রে (৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত) ভারতস্থাপত্যের মহিমাময় সৃষ্টিতে উৎকীর্ণ সুরসুন্দরীদের বিচিত্র নৃত্যছন্দ কলিঙ্গ-সংস্কৃতির গৌরবময় অতীত সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করে। প্রায় দু-হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন এই নৃত্যধারার কথা গত পনের বছর আগেও উল্লিখিত হত না। এই বিস্মৃতপ্রায় নৃত্যধারা সম্পর্কে মাত্র কয়েক বছর হল গবেষণা আরম্ভ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও অদ্রমাগধী—এই চারটি আঞ্চলিক ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র, মগধ, বৎস, পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে কলিঙ্গ ও ওড্র বর্তমান উড়িষ্যা প্রদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়ে। ওড়িষী নৃত্য ধারায় নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার ও মুদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। স্বভাবতই এ থেকে এই নৃত্যের প্রাচীনতা ও শাস্ত্রীয় ধারার উপস্থিতি প্রমানিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত মহেশ্বর মহাপাত্র কৃত "অভিনয় চন্দ্রিকা" গ্রন্থে ওড়িষী নৃত্যের উৎপত্তির একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে শিবকে নৃত্যের স্রষ্টা বলে কল্পনা করা হয়েছে। শিব তার পুত্র গণেশকে ঐ নৃত্য শিক্ষা দেন। গণেশের কাছে অপ্সরা রম্ভা এই নৃত্যশিক্ষা করেন এবং ভরতমুনি রম্ভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভরতমুনির পরে গর্গাচার্য, বিকটাচার্য, কুমারাচার্য, রন্তীদেব ও অট্টহাস—এই নৃত্যধারার উত্তরসাধকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে আচার্য অট্টহাসই উড়িষ্যার দেবদাসীদের মধ্যে এই নৃত্যের প্রচলন করেন।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উড়িষ্যা বা ওরিষ্যা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ওড্রাদেশ (Odra Desha) থেকেই উদ্ভূত। কলিঙ্গ, উৎকল, তোসালি, কসোডা, ওড্রা বা ওড্ডা, দাশার্ন ও কোসাল প্রভৃতি জায়গার মিলিত নাম উড়িষ্যা। কালক্রমে তাদের অধিবাসীরা সবাই একত্রিত হয়ে পড়ে এবং তাদের উৎকল এবং ওডা বলা হত। ক্রমশঃ তাবা সকলেই উৎকল ভাষা বলতে আরম্ভ করেন ও দেশের নাম হয় ওরিষ্যা বা উড়িষ্যা। খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রাচীন ওড্রাদেশ (Odra-Desha) ও ওড্রাবিশ্বা (Odra Vishaya) বলে পরিচিত হয় এবং খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই ওড্রাবিশ্বা (Odra Vishaya) ক্রমশঃ প্রাকৃতের সংস্পর্শে আসে এবং ওড্ডাবিশ্বা (Odda Vishaya) হয় ও পরে ক্রমশঃ উচ্চারণগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ওড্ডাবিশ্বা—ওডাবিশা—ওডিবিশা—ওর্ডাবিশা—ওড়িষা (Odda Vishaya—Odavisa—Odivisa—Odvisa—Odissa) ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এই উড়িষ্যা নামেই পরিচিত হয়।

প্রাচীন কাল থেকেই ওড্রজাতি ও দেশের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রাচীন জাতি ও দেশের উল্লেখ আছে। রামায়ণে এই ওড্রজাতি ও দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওড্র অধ্যুষিত এই স্থান

প্রাচীনতম আর্যজাতির বাসস্থান বলেই পরিচিত ছিল। মনুসংহিতায় এদের ব্রাত্য হিসাবে বর্ণনা করে পৌণ্ড্র ও দ্রাবিড়দের সমপর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। একথাও সত্য হতে পারে যে ওড্রদের বিজিত কলিঙ্গদের ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে সংযোগের ফলে একটা নতুন মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তোলে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে এই ওড্রজাতিরা অত্যন্ত বীর ও যোদ্ধা ছিল। তারা অন্যান্য উপজাতি ও আদিবাসীদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে ওড্রা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সমুদ্রতীরবর্তী উর্বর ভূমিতে এরা একটি অতি সম্পন্ন কৃষিনির্ভর রাজত্ব স্থাপন করে। কৃষিনির্ভর হয়েও কিন্তু তারা যুদ্ধবিগ্রহ চর্চা ত্যাগ করে নি। কিন্তু কালক্রমে এখানে শান্তিতে বসবাসের ফলে তারা আর্যদের নিকট পরাজিত হয়ে পশ্চিম উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এরা নিজেদের রাজত্ব ক্রমশ জয়পুর, বস্তার এবং রায়পুর অবধি বিস্তৃত করে। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে এই ওড্রাজাতি পাণ্ডবদের হস্তিদন্ত উপহার দেয়। কালিদাসের রঘুবংশে উল্লিখিত আছে যে মহারাজ রঘু কপিলানদীর ওপর হস্তিদন্ত নির্মিত সেতু পার হয়ে কলিঙ্গের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সুতরাং এ থেকে সেই সময়কার উন্নততর সংস্কৃতির কথা জানা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের বিরাট-সংহিতায় উড়িষ্যাব উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত আমরা উড়িষ্যার যে ইতিহাস পাই সেখানে আমরা চেদী, শৈলোদভাব, ভৌমকার, নন্দ, তুঙ্গ, ভঞ্জ, সোম অথবা কেশরী, কালাচুরী ও হৈহয় প্রভৃতি রাজাদের উল্লেখ পাই। এরপর গঙ্গ রাজবংশের উল্লেখ পাই। গঙ্গরাজ চোড়গঙ্গদেবের রাজত্বকালে গোদাবরী থেকে হুগলী অবধি বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কেবলমাত্র বড় যোদ্ধা ছিলেন না এক দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। তিনি ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি ১০৭৮ থেকে ১১৪৭ খ্রীস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালেই পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই পুরী উৎকল ভাষাভাষী ও ধর্মীয়দের সভ্যতার পীঠস্থানে পরিণত হয়। গঙ্গবংশের রাজত্বকালে ১০৭৮ থেকে ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যাবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। প্রথম নরসিংহ রাজের সময় কোনারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহুজাতি ও ধর্মের সংমিশ্রণে 'জগন্নাথ ধর্ম' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাকে অনেকেই 'শবর' দেবতা বলেন। অনেকে তাঁকে বৌদ্ধ দেবতা আবার অনেকেই জৈন দেবতা বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথদেবের সেবায়েতদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ উভয় জাতিরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে এই শিল্প বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যম লাভ করেছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য এ সবই শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন আঙ্গিক। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে এগুলি সবই ধর্মকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের মতো উড়িষ্যাতেও নৃত্যকলা ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। জগন্নাথদেব এই নৃতকলার প্রাণপুরুষ। জগন্নাথদেবের পূজা ব্যতিত কোনো

শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন না। তাই মঞ্চেই একপার্শ্বে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। জন্মের আদিকালে নৃত্যকে গিরিগুহায় পাওয়া যায়। সেখানে অসংখ্য নর্তক নর্তকীর মূর্তি দেখা যায়, তারা সবাই ভগবানের আরাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এর থেকে মনে হয় বহু শতাব্দী ধরেই উড়িষ্যায় নৃত্যকলা বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে দেব-দেবী ও মানুষের প্রভূত আনন্দ উৎপাদন করত। অদ্যাবধি নৃত্যগীত ব্যতিরেকে উড়িষায় কোনো উৎসবই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। যেহেতু ইতিহাস সৃষ্টির আদি থেকে শিল্প ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাই নৃত্যকলা বা এখানকার শিল্পকলার ইতিহাস জানতে গেলে ধর্মের ইতিহাসকেও জানতে হবে।

জৈনধর্ম উড়িষ্যার প্রাচীন ধর্ম। কলিঙ্গযুদ্ধে জয়লাভের পর অশোক যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে 'জিন'-এর সিংহাসনটি নিয়ে আসেন। রাজা খারবেল এই আসনটি পুনরাবিষ্কার করেন। উয়দগিরির হাতিগুম্ফা গুহায় উৎকীর্ণ একটি ব্রাহ্মীলিপি থেকে 'গন্ধর্ব-বেদ-বুধ', খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে কলিঙ্গরাজ খারবেলের নৃত্যগীতি কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নৃত্যগীতের মাধ্যমে নাগরিকদের অভ্যর্থনা জানাতেন বলে লিপিতে উৎকীর্ণ আছে।

উদয়গিরির জৈন গুহায় আমরা বিভিন্ন স্থানে নৃত্যরত ও বাদ্যরত মূর্তি উৎকীর্ণ দেখি। হাতিগুম্ফার একটি গুহায় একটি নারীমূর্তিকে নৃত্যভঙ্গিতে ফুল উৎসর্গ করতে দেখা যায়। এবং উদয়গিরির রাণীগুম্ফার দক্ষিণদিকে সমবেত ভাবে নর্তক ও নর্তকীকে চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্যরত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। মহারাজ খারবেল তার দুই রাণীসহ নৃত্যচর্চা অবলোকনের দৃশ্যটিকে আনন্দকুমারস্বামী নাট্যশালা বা নৃত্যগৃহ বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া গুহার বিভিন্ন স্থানে বহু সন্ন্যাসীদের মূর্তি নৃত্যরত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যগীতরতদের গন্ধর্ব বলা হয়েছে। এই গন্ধর্বগণ বাদ্যযন্ত্রে তাল রক্ষা করছেন এবং বিদ্যাধরগণ বিভিন্ন সুন্দর ভঙ্গিতে দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

খারবেলের রাজত্বকালের পর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল কলিঙ্গ সংস্কৃতির নৃত্যধারার কোনো প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের একটি লিপিতে কেশরী রাজমাতা কলাবতীর শিবমন্দির নির্মাণ ও দেবদাসী বিনিয়োগের কথা পাওয়া যায়। কেশরী রাজগণ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন এবং দুইজন কেশরী নৃপতি সঙ্গীত ও নৃত্যে দক্ষতার জন্য 'গান্ধর্বকেশরী' ও 'নৃত্যকেশরী' উপাধিতে ভূষিত হন। কেশরী রাজবংশের সময়ই উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার হয়। এই সময়েই উড়িষ্যায় দেবদাসী সম্প্রদায়েরও বিস্তার ঘটে।

উড়িষ্যায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে তন্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মও শিল্পতাত্ত্বিক দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত। কেবলমাত্র স্থাপত্য-ভাস্কর্যে নয় নৃত্যগীত বাদ্যেও এই সময়ের প্রভূত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এদের বিভিন্ন নামও পাওয়া যায়—মারিচি, বজ্রবারাহি, অপরাজিতা, হেরুকা ইত্যাদি। এইগুলি উড়িষ্যার নৃত্যকলার প্রাচীনতম নিদর্শন।

ললিতগিরি গুহার দ্বারদেশে নর্তক-নর্তকীর নৃত্যরতা মূর্তিগুলি অত্যন্ত সুন্দর।

এদের নৃত্যরত মূর্তিগুলি এক অদ্ভুত নৃত্যশৈলীর সন্ধান দেয়। বাঁ পা দিয়ে ডান পাকে ছেদ করে এবং হাত দুটিতে সুললিত ছন্দময় ভঙ্গি, রমণীদের চোখ দুটিতে স্বপ্নময় আবেশ, তাদেব পোষাকের আভরণ ও পোষাক-পরিচ্ছদ সবকিছু মিলিয়ে এক ব্যাঞ্জনাময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া মহাযান বৌদ্ধধর্মে নির্দেশগুলিতে এমন সুন্দরভাবে সমাজধর্ম, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সাহিত্য সম্পৃক্ত কবে উপদেশ দিয়েছে যে নৃত্যকলা তাদেব ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি, ববং সন্ন্যাসী ও ভক্তদের মধ্যে এব প্রভূত প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। মনুষ্যত্ব বিকাশে নৃত্যকলাকে এই ধর্ম একটা অঙ্গ বলে মনে কবেছে। শোনা যায় বুদ্ধেব জীবিত কালে সন্ন্যাসীবা নৃত্যকলার চর্চা কবতেন। সেইজন্যে দেবতা হেবুকা ও দেবী নৈবত্তমার বিভিন্ন নৃত্যবত মূর্তি ভারতেব বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। বৌদ্ধ-ধর্মে নৃত্যকলা কেবলমাত্র প্রেম প্রতীক্ষাকেই ব্যক্ত করে না, বীরত্ব ও সৌন্দর্যও এই নৃত্যকলাকে ঐশ্বর্যময় করেছে। ডঃ নবীনকুমার সাহার মতে : "Heruka at Ratnagiri adorned with a garland of human skulls and holding a khatwanga dances with remarakable vigour ; Vajra-Varahi at Choudwar, holding Vajra-tariani and Korata dancрs with intoxication displaying her nude and amorous limbs and dishavelled hair ; Marichi at Ratnagiri, Ayodhya, Khiching, Udla and Astaranga dances in alidha attitude on her chariot surrounded by dancing companions and having full set of jewellery glowing with beauty of a virgin ; Ganga of Udayagiri dances in rhythmic movement conveying the sense of elegantly flowing water of the river Ganges ; Aparajita at Lalitagiri dances with remarkable grace and rhythm showing tarjani in her left hand and displaying chapctadana mudra in her uplifted right hand in which she also carries a flower. Examples of this kind may be multiplied in order to show that dancing in Budhism had not only the aesthetic importance but also a spiritual significance." (Orissan Budhism and Odissi dance)

ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিকাপুবাণে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে আসামে বিভিন্ন লিপিতে 'তান্ত্রিক পীঠ' হিসাবে উড়িষ্যাকে উল্লেখ করা হয়। ভুবনেশ্বরের নিকট হীরাপুর মন্দিরে এবং রাণীপুর ঝাড়িয়ালে যোগিনীদের অসংখ্য নৃত্যরত মূর্তি এবং মৃদঙ্গ বাদকদের মূর্তি দেখা যায়। দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে অবস্থিত বীরঘাট মন্দিরে কোনো নৃত্যমূর্তি বা দৃশ্যেব উল্লেখ নাই।

শৈব ধর্ম দীর্ঘদিন ভারতীয় ইতিহাসে অবস্থান করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে এই শৈব ধর্মের অবস্থানকালে। কিভাবে কখন শৈব ধর্ম উড়িষ্যায় প্রচলিত হয় আমরা জানি না। চতুর্থ শতকে ভঞ্জবংশের রাজা শত্রুভঞ্জ প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরে একটি নৃত্যরত শিবমূর্তি পাওয়া যায়। শিবের এই উর্ধ্ব-লিঙ্গ অষ্টবাহু মূর্তিতে দুটি হস্ত বীণা বাদনরত এবং দুটি হস্তে লম্বিত সর্প, একটি

হস্তে ত্রিশূল, একটি হস্তে ডমরু, একটি হস্তে অক্ষয়মালা এবং একটি হস্তে পতাক-মুদ্রা লক্ষিত হয়। এছাড়াও বিক্ষিপ্ত বহু উপাদান থেকে শৈব ধর্ম প্রভাবিত নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মূর্তিগুলিতে খোদিত বিভিন্ন মূর্তিতে ওড়িষী নৃত্যে প্রচলিত বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব মন্দিরে অসংখ্য দেব-দাসীদের কথা শিলালিপি ও পুঁথি থেকে পাওয়া যায়। চোড়গঙ্গদেব নির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাদাসীদের মাহারী বলা হত। এই মন্দিরের ভোগমণ্ডপে নটরাজ শিবের সান্ধ্যতাণ্ডব নৃত্যরত মূর্তি খোদিত আছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেও নটরাজ তাঁর মর্যাদা হারান নি। রাজা অনঙ্গভীমদেবের কন্যা চন্দ্রাদেবী সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শিনী ছিলেন।

গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্বের অবস্থান নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কেহ কেহ বলেন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে অজয়নদীর তীরে এই কেন্দুবিল্ব অবস্থিত, অপর মতটি এই যে পুরী জেলার কেন্দুলী শাসান গ্রামটি জয়দেবের জন্মস্থান। উড়িষ্যার নৃত্যকলায় গীতগোবিন্দের প্রভাব সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

পঞ্চম শতাব্দীতে গঙ্গ-রাজবংশের অবসানের পর সূর্যবংশের রাজত্বকালে গজপতি কপিলেন্দ্রদেব, পরুষোত্তমদেবের পর প্রতাপরুদ্রদেব রাজা হন। তাঁর রাজত্বকাল উৎকল-সংস্কৃতির প্রসারের স্বর্ণযুগ। এই সময়েই চৈতন্যদেব বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যায় যান এবং রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ও রামানন্দ তাঁর কাছে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং রামানন্দের নম হয় রায়-রামানন্দ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত'-তে রায়রামানন্দের সঙ্গীত ও নৃত্যকুশলতার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জগন্নাথ-বল্লভ মঠে মাহারীদের নৃত্য ও অভিনয় শিক্ষা দিতেন। রায় রামানন্দই ওড়িষী নৃত্যে সাত্ত্বিক অভিনয়ের প্রবর্তক। রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যহ গীতগোবিন্দের সঙ্গীত ও নৃত্যরূপ পরিবেশনের নির্দেশ দেন, তখন স্বভাবতই শুদ্ধ নৃত্যের পরিবর্তে সাত্ত্বিক অভিনয় সমন্বিত নৃত্যের প্রয়োজন ঘটে। চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে রামানন্দ দেবদাসীদের সাত্ত্বিক ও সঞ্চারীভাব শিক্ষা দিচ্ছেন এই বর্ণনা পাওয়া যায়।

অবশ্য জগন্নাথের পূজায় নৃত্যসংগীতানুষ্ঠানের উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণেও পাওয়া যায়। দশম-একাদশ শতকে রচিত রামদেব সংহিতার উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

'শজ্যাকালেতু কর্তব্যং পুষ্পাঞ্জলি গণৈসহঃ
জয় বিজয়দ্বারেণ শয়নারাত্রিকংচরেৎ।
গজদন্ত সমাযুক্তংপর্যংক সমিপে পুনঃ
আরত্রিক ত্রিণি কুর্যাৎ গায়নাদি সমাচরেৎ ॥
বীণা বাদন যুক্তেন নানা বাদ্যানি সংযুতৈ।
গায়ীকানর্তকীরম্যে গীত নৃত্যাদিমঞ্জুলৈ ॥'

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উড়িষ্যাতেও দেবদাসী প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান। দেবদাসীদের বলা হয় "মাহারী" ও পুরুষ দেবদাসদের বলা হয় গটিপু"। অবশ্য পুরুষ দেবদাসরাও স্ত্রীলোক সেজেই দেবপরিচর্যা ও নৃত্যগীত করে। মাহারীদের 'সুরবেশ্যা আখ্যা দেওয়া হত। এরা মন্দিরে দেবপরিচর্যায় নিবেদিত হত। পরবর্তীকালে রামচন্দ্রদেবের সময় থেকে মাহারীদের রাজদরবারে চিত্তবিনোদনের জন্যে নিয়োগ করার প্রথা প্রচলিত হয়।

মাহারী শব্দের অর্থ ঐশী প্রেমপাগলিনী। রাজা চোড়গংগদেব জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিত্যসেবার অংগরূপে মাহারীদের নৃত্যগীতানুষ্ঠানের প্রচলন করেন। রামচন্দ্রদেব মন্দিরের সেবকদের জন্যে সাতটি পথ (সপ্ত-শাহী) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার একটি "অঙ্গ অলস পতন" মাহারীদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়। মাহারীদের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সদাশিব রথশর্মা যে রাজকীয় ফরমান আবিষ্কার করেছেন সেটি বিশেষ মূল্যবান।

ঐ ফরমানে আছে : 'মাহারী সেবকে কাহারি সংগে অংগ সংগ ন হেবে। অন্য যাত্রারে ন গমিবে। গংগামাতা মঠু, কুংজ মঠু, রথ সামন্তঠারু দিক্ষা নেই কলিতিলক নেবে। পালি দিনে ঘরু পাক না করিবে। পহুড় লুগা ন পিন্ধিবে। তুলসী কণ্ঠী গলারে বান্ধিবে। শাস্ত্র প্রমাণে নৃত্য করিবে। নৃত্যকালে যাত্রী দর্শনিয়াকু ন চাহিবে। পরমেশ্বরঙ্ক দাসী-তুল্য চলিবে। শূদ্র অংগ ন ছুঁইবে। সেবা খটনি পালি দিন পুরুষকু বচন ন কহিবে। মীননাহক জানি খটাইব। নাচুনি, গাউনি, সেবাকালে বিকল ন করিব। স্বরভংগ ন করিব। পহপট, সরিমান, পরমেশ্বর, মালশ্রী, হরচণ্ডী, চন্দনঝুলা, শ্রীমংগল বচনিকা, ঝুটি, আঠতালি, গীতগোবিন্দ কাব্য ভাউনি করিবে।'

অর্থাৎ পুরুষের দেহস্পর্শ নিষিদ্ধ, জগন্নাথদেবের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব ধর্মানুসারে দীক্ষান্তে রসকলিতিলক অংকিত করতে হবে। সেবার দিনে স্বগৃহে রন্ধন করা চলবে না। মলিন ও অশুচি বস্ত্র পরিধান করা চলবে না। তুলসী কণ্ঠী ধারণ করতে হবে। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসরণ করে নৃত্য করতে হবে। নৃত্যকালে যাত্রী দর্শকদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চলবে না। পরমেশ্বরের দাসী বলে নিজেকে মনে করে সেইমতো আচরণ করতে হবে। শূদ্র অংগ স্পর্শ করা চলবে না। অনুষ্ঠানের দিনে পুরুষের সংগে কথা বলাও নিষিদ্ধ। মীননাহক (অলস অংগ পতনের মাহারীদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবায়েত) এসে তাদের মন্দিরে নিয়ে যাবে। নৃত্যকালে নৃত্যশিল্পী ও গীতশিল্পী পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলবে না। সুর ও তাল যথাযথ রক্ষা করতে হবে, ভংগ করা চলবে না। পহপট, সরিমান, পরমেশ্বর, মালশ্রী, হরচণ্ডী, চন্দনঝুলা, শ্রীমংগল বচনিকা, ঝুটি আঠতালি—এই কটি তাল আশ্রয় করে নৃত্য করতে হবে এবং গীতগোবিন্দের সংগীত অনুসরণ করতে হবে।

রাজকীয় ফরমানের উপরোক্ত কঠিন বিধিনিষেধ থেকেই 'মাহারী' সম্প্রদায়ের নৃত্য-পদ্ধতির প্রথমযুগে রক্ষণশীলতার সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে রামচন্দ্রদেবের নির্দেশে রাজদরবারে চিত্তবিনোদনের জন্যে প্রযুক্ত হওয়ার পর থেকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দেবদাসীদের মতো উড়িষ্যার মাহারী সম্প্রদায়ও ব্যাভিচার ও কলুষতায় পর্যবসিত হয়। অথচ অতীতে উড়িষ্যার মাহারী সম্প্রদায় সমাজে অত্যন্ত

সম্মানিত ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের এমন কি রাজপরিবারে স্ত্রীলোকেরাও এই বৃত্তি গ্রহণ করত।

মাহাবী সম্প্রদায়েব মধ্যে ছটি শ্রেণীবিভাগ ছিল। ভিতর গাউনি. বাহার গাউনি, নাচুনি পটুয়ারী, রাজ অঙ্গিলা ও গাহন মাহারী। কর্মবিভাগ অনুযায়ী এই শ্রেণীবিভাগ নির্দিষ্ট হত। বৈশাখে চন্দনযাত্রা. জগন্নাথদেবেব নৌকায় দেবদাসী নৃত্য, স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতান ষ্ঠান, গহম বেদীপূজা. জন্মাষ্টমী দুর্গামাধব পূজা. বিমলাদেবীর পূজা অভিষেক বসন্ত পঞ্চমী উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্যগীতি অনুষ্ঠিত হত। এছাড়া নিত্যসেবাব অংগরূপে ভোগ ও শিঙাব-এব সময়ে দেবদাসীদেব অনুষ্ঠান প্রচলিত।

গজপতি নাবাযণদেব রচিত "সংগীত নাবায়ণ নৃত্যখণ্ড," রঘুনাথ রথ রচিত 'নৃত্যমনোবমা." মহেশ্বব মহাপাত্র বচিত "অভিনয়-চন্দ্রিকা." নারায়ণচন্দ্র মিশ্র রচিত "দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি" প্রভৃতি গ্রন্থেব উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবদাসী মুক্তা মাহারী রচিত 'নীলাদ্রী' গ্রন্থ দেবদাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে সব থেকে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। পরিতাপের বিষয় এই যে এই সব মূল্যবান গ্রন্থেব বিভিন্ন অংশ সংকলন করার ব্যবস্থা এখনও হয় নি। তাব ফলে ওড়িষী নৃত্যধারার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা এখনও সম্ভবপর হয় নি।

মাত্র কযেক বছর আগেও এই নৃত্যধাবার অস্তিত্বেব কথা সাধাবণের অজ্ঞাত ছিল। স্বাধীনতা উত্তবকালে কালীচরণ পট্টনায়ক, ধীরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, সদাশিব রথশর্মা প্রভৃতি গবেষকদেব প্রচেষ্টায় এই নৃত্য সম্পর্কে অনুসন্ধান সূচিত হয়।

ওড়িষী নৃত্যকলায় ভূমিপ্রমণাম, বিঘ্নবাজ পূজা, বটুনৃত্য, ইষ্টদেব বন্দনা. স্বরপল্লবী নৃত্য. সাভিনয় নৃত্য ও তবিঝম—এই কয়টি প্রধান অনুষ্ঠান। প্রথম অনুষ্ঠান ভূমিপ্রণাম হচ্ছে মঙ্গলাচবণ সূচক নৃত্য। এতে শিল্পী স্থায়ী ভঙ্গিতে (সমস্থানক) অনুষ্ঠান আরম্ভ কবে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি আশ্রয় করে বন্দনাসূচক অভিনয় করে। এই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাই ওড়িষী নৃত্যের মূল ভঙ্গিমা। পরবর্তী অনুষ্ঠান বিঘ্নবাজপূজা রঙ্গবিঘ্নশান্তির জন্যে ভাবাভিনয় সহযোগে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি কবে অনুষ্ঠিত হয়। বটুকভৈরবের মহিমা প্রচাবের জন্যে বটুনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ কঠোবভাবে প্রতিপালিত হয়। বিভিন্ন করণ, অংগহার. পাদকর্ম, গতি প্রভৃতির প্রয়োগে এই নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের উৎকর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইষ্টদেবতা বন্দনা সাধারণত গীতগোবিন্দের সুমধুর পদ আশ্রয় কবে ভাবাভিনয় সহযোগে প্রদর্শিত হয়। স্বরপল্লবী নৃত্য ওড়িষী নৃত্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংগ। এতে প্রথমে রাগ আলাপ করা হয় এবং শিল্পী প্রধানতঃ দৃষ্টিকর্মের সাহায্যে রাগটিকে বিধৃত করে এবং কয়েকটি ললিত ভঙ্গি আশ্রয় কবে। আলাপ শেষ হবার পরে তাল সহযোগে শোভা-সম্পাদক নৃত্তাংশ। তার পরে ভাবাভিনয় সমৃদ্ধ অংশ। সমাপ্তিতে দ্রুতলয়ে নৃত্যসংগঠন এই অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য ও রঞ্জনা সৃষ্টি কবে। সাভিনয় নৃত্য এই পর্যায়ে সাহিত্য. অভিনয় ও সংগীতের সমন্বয়ের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। শৃংগার রসাত্মক লাস্যভাবযুক্ত নৃত্যে এর সূচনা, সমাপ্তি ভক্তিরসমার্গে। এই অপূর্ব নৃত্যকল্পনা সুচারু মুদ্রা ও জটিল পাদবিন্যাসের প্রয়োগে, শাস্ত্রীয় করণ ও অংগহারের সমাবেশে রাগসংগীতের শুদ্ধ মৌলিক রূপটিকে আলাপে ও বিস্তারে ছন্দিত করে। বনমালী দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ. কবিসূর্য বলদেব. গোপালকৃষ্ণ

পট্টনায়ক প্রভৃতির প্রখ্যাত উৎকল কবিদের রচিত সুমধুর গীতি এর সংগীতাংশে পরবর্তীকালে ব্যবহার হয়েছে। পূর্বে "গীতগোবিন্দ"-ই কেবলমাত্র প্রযুক্ত হয়।

তরিঝম নৃত্যপ্রধান অনুষ্ঠান। পহপট (চার মাত্রা) ও ঝুলা (ছয় মাত্রা) তাল-সংযোগে দ্রুতলয়ে এর নৃত্যসংগঠন। এই নৃত্যের সময় বিভিন্ন বোল (উকুট্টা) আবৃত্তি করা হয়। এই অংশকে আনন্দ নৃত্য বা নাটাঙ্গী বলা হয়।

শৈব ধর্মের প্রভাবসমৃদ্ধ তাণ্ডবভাব প্রধান "শব্দ স্বরপট" নৃত্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শিব শব্দ স্বরপট," "গণেশ শব্দ স্বরপট" প্রভৃতি নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়।

ওড়িষী নৃত্যের আবহসংগীতে উদম্বরী, ব্রহ্মবীণা, সারাঙ্গী, চিতিরি দুঘিকা, মাহুরী, মৃদুকহলা, পারি, বিজয়কহলা, বংশী, গুণিত্রা, তালকাষ্ঠ, তোড়িরি, শিঙ্গা, মন্দিরা, নাগেশ্বর, বীরবাদ্য, চঙ্গু, কিঙ্কণীদণ্ড, পট্টতাল যন্ত্র, ঘণ্টিতাল যন্ত্র, পাখোয়াজ, তম্বুরা, কাঁসর, ডম্বরু, সুরতাল যন্ত্র প্রভৃতি বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়।

মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত "অভিনয়-চন্দ্রিকা," যদুনাথ সিংহ কৃত "অভিনয় দর্পণ", রঘুনাথ রথ রচিত "নাট্যমনোরমা", নারায়ণদাস গজপতি রচিত "সংগীত নারায়ণ", কৃষ্ণদাস রচিত "গীত প্রকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে ওড়িষী নৃত্যধারায় স্থান, মণ্ডল, চারী, করণ, অঙ্গহার, পাদকর্ম, দৃষ্টিকর্ম, গ্রীবাভেদ, মুদ্রা প্রভৃতির শাস্ত্রীয় প্রয়োগের অনুশাসনগুলি বিধিবদ্ধ আছে।

ওড়িষী নৃত্যে নাট্যশাস্ত্রোক্ত চব্বিশটি অসংযুক্ত হস্তের কুড়িটির প্রয়োগ দেখা যায়। সুখতুণ্ড, ভ্রমর, হংসাস্য ও তাম্রচূড়-এই চারটি অসংযুক্ত হস্তের প্রয়োগ নেই। অভিনয় দর্পণোক্ত সকল সংযুক্ত মুদ্রাগুলিই এই নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

ওড়িষী নৃত্যে প্রযুক্ত করণগুলিকে মামি বলে। নিবেদন, প্রণত, উত্তোলিত, বিরাজ, গোপন, অভিমান, কুঙ্গরবক্তু, অকুঞ্চন তরঙ্গ, নিকুঞ্চন, মর্দল, আরত্রিকা, লাহুনিয়া, অচর্ক, নন্দাবর্ত, শ্রুতিকুল প্রভৃতি বিভিন্ন করণের প্রয়োগ দেখা যায়।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই ওড়িষী নৃত্যে মূল স্থায়ী ভঙ্গিমা। এই ভঙ্গিমা আশ্রয় করে স্থায়ী, চৌকা, চির, লখি, নটবর ও বৈঠি—এই ছয় পর্যায়ে দেহভঙ্গির বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস রচনা করা বয়।

চৌকা, মীনদণ্ডী, বর্তুল, ঘেরা ও দ্বিমুখ-এই পাঁচটি ভূমি নির্দিষ্ট। গোহিথি, চাপুয়ানি, কড় ঘোষরা, থিয়াপুচি ও পুহনিয়া—এই ছয়টি চালি প্রচলিত। স্তম্ভপদ, মহাপদ, ধেনুপদ, কুম্ভপদ, শা.:কপদ, বিষমপদ, বীরাসনপদ প্রভৃতি পাদভেদ প্রচলিত।

ওড়িষী নৃত্যে পট্টশাড়ি, কঞ্চুল বা পুঁথি ও পাথর খচিত উজ্জ্বল রঙের ব্লাউজ, নীবিবন্ধ, ঝোবা—এই পোশাক অভিনয় চন্দ্রিকা গ্রন্থে নির্দেশিত হয়েছে। কাকর, রাগড়, মাথামণি, কেতকী, কোরক, কাপা, নাগপাশ, বকুলকলিকা, ত্রিগণ্ডী কুণ্ডল, বীরবল্লী, চপসারিকা, সসর্পী, পাদকতিলকা, কিঙ্কণী, চাপুয়ানী, করকঙ্কণ, পাহুরা প্রভৃতি বিচিত্র অলংকার ওড়িষী নৃত্যে ব্যবহার হয়। অভিনয় চন্দ্রিকা গ্রন্থে পুষ্পচূড়া, অর্ধবক্তক ও কটিবেণী—এই তিন প্রকার কেশসজ্জার কথা পাওয়া যায়। এই নৃত্যকলায় সৌন্দর্য রচনার প্রসঙ্গে প্রায় সব নির্দেশই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় মার্গনৃত্যের মহৎগুণ-

গুলি ওড়িষী নৃত্যধারায় বিদ্যমান। অবশ্য একথা সত্য যে ভরতনাট্যমের কুচিপুড়ি অংশের সঙ্গে ওড়িষী নৃত্যের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ওড়িষী নৃত্যের পুনরাবিষ্কার নিঃসন্দেহে ভারতসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ প্রবীণধারাকে অবলুপ্তির হাত রেখে রক্ষা করেছে।

আর একটি ধারা ওড়িষী নৃত্যে প্রচলিত ছিল, যাকে বলা হত বন্ধ নৃত্য। এই ধারা প্রায় অবলুপ্তির পথে। এই নৃত্যপদ্ধতি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং পাশ্চাত্য ব্যালের মত এ্যাক্রোব্যাটিক ধর্মী। এ প্রসঙ্গে ডি. এন পট্টনায়কের বক্তব্য: "While the western Ballet has retained its acrobatic features, in India the tradition is slowly dying out. Now the modern tendency is to relinquish whatever is strenuous, difficult and time-taking." (Odissi Dance—P-64) আজকের ওড়িষী নৃত্য চর্চার যে ব্যাপক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা একদিকে যেমন অভিনন্দন যোগ্য, অপর দিকে তেমনই এই সতর্ক বাণী বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য। কারণ ওড়িষী নৃত্যকলা শুধুমাত্র দৃষ্টি নন্দন নয়, তা সুন্দরের প্রকাশ, শিল্পীর ধ্যানের ধন।

পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক, উদয়গিরির মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ কাব্যিক লাবণ্যময় রূপকম সমৃদ্ধ এই নৃত্যছন্দকে প্রাণবন্ত করে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করেছেন শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান। সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে মিনতি দাস, মায়াধর রাউৎ, দেবপ্রসাদ দাস, পঙ্কজচরণ দাস, প্রিয়ম্বদা মোহান্তি, জয়ন্তী ঘোষ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বীপময় ভারতের নৃত্য

বিভিন্ন গবেষণা সূত্র থেকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধর্ম ও সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য জানা যায়। এই সব তথ্য থেকে প্রাচীনতম যুগ থেকে ভারতের সঙ্গে জাভা, বলি, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশীয়ার যে ঘনিষ্ট সংযোগ তার পবিচয় পাওয়া যায়। ভারতে আদি যুগে সভ্যতার নিম্নতম স্তরে যে অধিবাসীরা ছিল তারা 'নেগ্রিটো' বা 'নিগ্রোবটু' জাতীয়। এখনও এদের বংশধরদেব তামিল ও মালয়ালী দেশে, আন্দামান দ্বীপে, মালয়ে, ফিলিপাইন ও নিউগিনি দ্বীপে দেখতে পাওরা যায়। ভারতেব অন্যত্র সম্ভবত এদের পরবর্তীকালে বিজেতাদের প্রভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। এদের পরে ভারতে আসে অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা, আর্যরা আসার বহু শতাব্দী আগে। এই জাতির ভাষা, ধর্ম ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল ইন্দোচীনের কোনো অংশে, আসামেব পথ দিয়ে এদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে। এরা বাংলাদেশ, উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরাট, মালাবার প্রায় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। এরা চাষ-আবাদ ও তীব ধনুকের ব্যবহার জানত। সমুদ্র পার হয়ে দূর দেশেও যেত। পরবর্তীকালে সংস্কৃত 'নিষাদ' শব্দটি এদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়েছে। আদিম বা বর্বর অবস্থা থেকে এরা ছিল উন্নত, এদেশে এসে তা আরও সমৃদ্ধ হয়। সমুদ্রপথে এদের সঙ্গে ইন্দোচীন, বর্মা ও শ্যামদেশেব যাতায়াত ছিল।

মনে রাখতে হবে এসব হল ভাবতে আর্যদের আসার আগেব কথা। সেই সময় এই অস্ট্রিক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি একদিকে ভারতে অপরদিকে দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত ছিল। যার ফলে এই দুই দেশের সংস্কৃতিগত ঐক্য ছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—'এই অস্ট্রিক জাতির অস্তিত্ব হেতু ভারত, ইন্দোচীন আর দ্বীপময় ভারত অনেকটা একই সূত্রে গ্রথিত। (রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ, পৃষ্ঠা ২৮৫)

এর পবে ভাবতে এল দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতা। এই তিন সভ্যতার মিশ্রণে যে প্রভাবশালী নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠল তা স্থলপথে ও জলপথে ইন্দোচীন ও দ্বীপময় ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের কাছে পৌঁছে গেল। 'নতুন করে ভারতের প্রভাব আর্যের ভাষা আর আর্য-দ্রাবিড় অস্ট্রিক ধর্ম আর সভ্যতার সঙ্গে ইন্দোচীনে আর দ্বীপময় ভারতে গিয়ে পড়ল ঐ সব দেশেব লোকেরা, যারা ভারতের পিছনে পড়েছিল, তারা শক্তিশালী ভারতের স্পর্শে এসে যেন নবশক্তিতে নিজেদেরও সুপ্ত গুণাবলীকে জাগ্রত করে তুললে, তারাও সুসভ্য হয়ে উঠল,—এক অভিনব ভারতের দ্বীপময় ভারতেব পত্তন হল। অনুমান হয়, যীশুখ্রীস্ট জন্মাবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ইন্দোচীন আর ইন্দোনেশীয়ায় সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধধর্ম গিয়ে পৌঁছায়। (রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ—পৃষ্ঠা ২৮৯) দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন যোগসূত্র স্মরণ করে 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতায় যবদ্বীপে বসে লিখেছেন—

"এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া আসা,
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো—
নূতন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।"

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে ভারত সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ঐতিহাসিকেরা বলেন খ্রীস্টিয় প্রথম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, মালয় এবং সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাভা ও বলিদ্বীপে বিশেষ প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে স্থাপত্য, নৃত্যনাট্য ও পুতুল নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সর্বাধিক।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে খৃস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত এই সময়ে মোটামুটি ভাবে চীনদেশ থেকে আগত অধিবাসীরাই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসতি স্থাপন করে। আবার অনেকে মনে করেন যে এই জনসমষ্টি ভারত থেকেই এসেছে। 'The theory that South-East Asia was populated by immigrants from Central Asia, first made by Robert-Von Heine-Geldern, is generally accepted today. Other less popular theories are that : the original home of the races of South-East Asia was India ; in pre-historic times people from South-East Asia migrated to India so that latterIndian traders and missionaries merely brought back South-East Asia's own culture with Indian overlays ; and some of the people of the pacific islands originally came from America." (Theatre In South-East Asia—James R. Brandon, Page 8)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির বিশদ তথ্য ও লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও তা বিশ্বে অন্য সর্বত্র প্রচলিত যাদু ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী জনসমষ্টির আচার আচরণেরই অনুসারী ছিল। মূলত কৃষিনির্ভর সমাজজীবনে বীজ বপণ, শষ্য উৎপাদন, মড়ক ও অগ্নি নিবারণে সঙ্গীত, নৃত্য ও কথকতার মাধ্যমে যাদু ও অতি প্রাকৃতের বন্দনা করা হত।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত লোকগাথা, পুরাণ কাহিনী প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। এবং এই কাহিনীগুলি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নৃত্যনাট্য, নাটক-এর মূল উপাদান। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এগুলি কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব অথবা মধ্য এশিয়ার প্রাগৈতিহাসিক উৎস থেকে তা দুই দেশে এসেছে।

"It seems very likely that the prehistoric immigrants brought with them a common fund of oral myths and legends similar to Indian Sanskrit literature not so much because they were derived from Indian literature, but because both South-East Asian and Indian stories came

from the same prehistoric source in Central Asia. It may be that, as Hall once theorized about Indonesia, "when later on, after the introduction of written literature from India, we meet them in literary form with an Indonesian setting, they are not necessarily foreign importations which have been given an Indonesian twist, but represent folk myths and legends, springing from the same remote origin as the Indian stories, which have maintained their original character in purer form." (Theatre In South-East Asia—James R. Brandon, Page 11)

খ্রীস্টিয় প্রথম শতাব্দীতেই আমরা প্রথম দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের উপস্থিতির কথা জানতে পারি। চীনা ঐতিহাসিকদের সূত্র থেকে জানা যায় যে ফুণান রাজ্যে (বর্তমানে কম্বোডিয়া) নরপতি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে প্রচার করতেন। চৈনিক সূত্র ও সংস্কৃত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে চম্পা নামে (বর্তমানে মধ্য ভিয়েৎনাম) এক হিন্দু রাজত্ব ছিল। ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ফিলিপাইন ও উত্তর ভিয়েৎনাম ছাড়া সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বুদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং এই দুইয়ের মিশ্রণে এক অদ্ভুত সমন্বয় ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অভিযাত্রায় যে বিষয়টি বিস্ময়কর ভাবে লক্ষণীয় তা হল যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে ভারত কোনও দিন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে নি। সাংস্কৃতিক প্রসারের এক হাজার বছরের ইতিহাসে একটি মাত্র সামরিক প্রচেষ্টার ঘটনা আছে। ১০২৫ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভারত থেকে চোল রাজ্যের নৌবাহিনী সুমাত্রার শ্রীবিজয় আক্রমণ ও অধিকার করে। সে ক্ষেত্রেও একথা উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনার পূর্ব থেকেই সুমাত্রায় ভারত সংস্কৃতির অব্যাহত প্রভাব ছিল।

এসকল তত্ত্ব থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে নয়, বণিক এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত-সংস্কৃতির প্রসার। তৎকালীন সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অধিকাংশ নরপতিরাই বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্পে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষিত হয়। নাট্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, কাহিনীতে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক ; এবং অভিনয়াংশে ভারতীয় নৃত্যের প্রভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। "Four aspects of Indian Culture are most significant in this respect : Brahmanism, particularly the cult of Shiva worship, which provided a riligious basis for theatrical performances :

Indian epic literature, especially the Ramayana and Mahabharata, which became a common source for dramatic material ; Buddhist Birth Stories (The Jataka stories), which were introduced along with Hinayana Buddhism ; and Indian–Style Dance, which spread over almost the entire area of south-East Asia."

(Theatre In South-East Asia–James R. Brandon, p. 15)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মন্দির-স্থাপত্যেও নৃত্যের যে নিদর্শন আছে তাতে ভারতীয়

নৃত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। নবম শতাব্দীতে নির্মিত মধ্য জাভার বরবুদুর ও আঙ্কোরে নৃত্যরতা শিল্পী ও যন্ত্রীদের মূর্তিতে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব স্পষ্ট। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা জয়বর্মণ-এর রাজত্বকালে আঙ্কোরে বিভিন্ন মন্দিরে শত শত দেবদাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃত্যনাট্যের কাহিনী মূলতঃ রামায়ণ ও মহাভারত-ভিত্তিক। যবদ্বীপ, বালি, কম্বোডিয়া ও মালয়ে মূল সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত প্রচলিত ছিল। ৮৬০ খ্রীস্টাব্দে যবদ্বীপে স্থানীয় ভাষায় সংস্কৃত থেকে রামায়ণ অনূদিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় মহাভারতের বিভিন্ন অংশ মূল সংস্কৃত থেকে অনূদিত হয়। এ তো গেল অনুবাদের কথা। এ-ছাড়া কথক ও আবৃত্তিকারদের মুখে মুখে যে রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জনপ্রিয় ছিল তার সঙ্গে কিন্তু মূল সংস্কৃত কাব্যের থেকে তামিল ও বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্করণের বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে এই পুরাণ কাহিনীর প্রভাবে সাহিত্যকর্মের অনুবাদের থেকে কথক ও লোকগাথাকারদের অবদান বেশি।

আর একটি জিনিসও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ হলেও ভরতনাট্যশাস্ত্র বা সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্য-সম্ভারগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তখনও অনূদিত বা প্রযোজিত হয় নি। এ থেকে মনে হয় যে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশানুসারী সংস্কৃত নাট্য প্রযোজনার যে উৎকর্ষ তা সদ্য গড়ে-ওঠা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাট্যপ্রবাহ গ্রহণ করতে পারে নি।

পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত থেকে আর একটি ধর্মের প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছল। এটি হল হীনযান বৌদ্ধধর্ম। এর পরে এল মহাযান বৌদ্ধধর্ম। তখন থেকেই জাতকের কাহিনী প্রচলিত হল। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি কাহিনী-আত্মক নৃত্যাভিনয়ই প্রচলিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যের উদ্ভব। "Possibly the most pervasive of all Indian influences on Southeast Asian theatre was dance. From one end of Southeast Asia to the other —everywhere except in northern Vietnam and in the Philippines—dance forms can be seen which, in all their variety, share a recognizable common basis in Indian dance. The essential "Indianness" of these dance forms is seen in the turned-out knees, the set finger positions, the angular break of the elbows, and the famous horizontal sliding movements of the head. One of the earliest records of Indian influence in Southeast Asia tells of a "present of musicians and products of his country" which the Brahmanic king of Funan sent to the Chinese emperor in the year A.D. 243. There is every reason to believe there were dancers as well as musicians at the court of Funan in the third century. In Java on the reliefs of the Borobudur (ca, 800) and the Hindu Prambanan Temples (ca. 915) are numerous scenes of dancing girls, musicians playing flutes, zithers, brass and bamboo xylophones,

horns, conchs, and cymbals, and watching spectators. Indian-derived dance was undoubtedly known several centuries before this in the Javanese courts. Dances of this period, though created around characters taken from the Indian epics, were not yet extended dramatic dances. They mainly told a brief episode in dance form. It was not until perhaps the thirteenth century that full fledged dance-dramas were created on Java and Bali, and it was even later that this occured in Thailand and then in Combodia."

(Theatre in South-East Asia–James R. Brandon, p. 25)

১৩০০ থেকে ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতিতে এল চৈনিক ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব। বিশেষ করে চৈনিক প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃত্যনাট্যে ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে এক অপরূপ শিল্পসুষমা যুক্ত করল। যার ফলে এমন এক সুন্দর স্পন্দমান ও গভীর নাট্যরূপের সৃষ্টি হল যা বর্তমানে আমাদের দেশেও বিরল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃত্যনাট্যের সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রথম আমাদের সচেতন করেন। সেই বিবরণ পড়ে তখন কিছুটা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই শ্রদ্ধেয় মনীষীরা ভারতীয় নৃত্যের ব্যাপ্তিকে একটু ছোটোমাপেই দেখছেন। বহুকাল পরে কলকাতায় যোগজাকার্তা ব্যালে গ্রুপ-এর রামায়ণ দেখে শিল্পী হিসাবে আমার আত্মাভিমান চূর্ণ হল। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের "এমন-তর বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতাব সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখি নি।······আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনুদেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।"–(জাভাযাত্রীর পত্র)। কুড়িআট্টম, কুচিপুড়ী যক্ষগণ আমাদের এই সব মিথ্-ভিত্তিক প্রযোজনায় হয় তো অনেক সময় শিল্পীর ব্যক্তিগত দক্ষতা, অঙ্গাভিনয়-এর উৎকর্ষ প্রশংসার দাবী রাখে কিন্তু তা এমন একটা সমগ্রতা সম্পাদন করে না, যা নিয়ে আসে সেই প্রার্থিত সিদ্ধি যাকে নাট্যশাস্ত্রে 'দৈবী' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র মতে সিদ্ধি দুই প্রকার–দৈবী ও মানুষী। দর্শকবৃন্দ যখন প্রযোজনার ঘটনা ও সংস্থাপনের গতির সঙ্গে সংগতি রেখে হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি উচ্ছ্বাস সহকারে ব্যক্ত করেন, এবং প্রশংসাসূচক ধ্বনি বা করতালি দ্বারা আবেগ প্রকাশ করেন তখন তাকে মানুষী সিদ্ধি বলা হয়। আর দর্শকবৃন্দ যখন একটি অব্যাহত সৌন্দর্যের অশিথিল অথচ সমৃদ্ধ রূপায়ণে চৈতন্যের গভীরে প্রবেশ করে স্তব্ধ ও অক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করেন তখন তাকে দৈবী সিদ্ধি বলা হয়।

ভারতীয় রীতির প্রভাবে এই নৃত্যনাট্য একদিকে গতিতে প্রাণবান অপরদিকে চৈনিক রীতির প্রভাবে নাট্যমুহূর্তগুলি আশ্চর্য চিত্রল।

এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন–"সব দেখে-শুনে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝেছিলাম যে, জাভা ও বলিতে এখনো যেভাবে নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় তার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত ভারতের প্রাচীন কোনো নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতির মিল নেই। সে ধারায় বর্তমানে চীনদেশের প্রাধান্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। ঐতিহাসিকরা বলেন, এক যুগে ভারতীয় নৃত্য-গীত-বাদ্য চীনদেশের নৃত্যাভিনয়ের উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

কিন্তু সেই প্রাচীন পদ্ধতির নমুনা ভারতে আজ কোথাও মিলবে না। ভারতে তা লুপ্ত হলেও চীন ও যবদ্বীপের এইসব নৃত্যনাট্যধারায় তার বহুরকম নমুনা মিলতে পারে বলে মনে হয়।" (জাভা ও বলির নৃত্যনাট্য—শান্তিদেব ঘোষ, পৃ. ২৩)

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের প্রতিবেদনটি প্রত্যেক নৃত্যশিল্পীর স্মর্তব্য। "এ রকম কিছু আমাদের ছিল কিনা জানি না, এখন তো নেই। ইদানীংকালে উদয়শঙ্কর প্রমুখের চেষ্টার মধ্য দিয়ে এইরকম একটা একাগ্রতা সম্পাদনের প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু একটা দেশের চৈতন্যের সঙ্গে জড়িত, একই সঙ্গে সর্বশ্রেণীর দর্শককে মুগ্ধ করার মতো ক্ষমতা-সম্পন্ন সুন্দর, স্পন্দমান ও গভীর এরকম নৃত্যনাট্যরূপ ভারতবর্ষে এখন দেখা যায় না। ভারতীয় নাট্যের নানা বিচিত্র নিদর্শন, টোটাল-থিয়েটার বলে সবগুলি সম্বন্ধেই বেশ জোর গলায় প্রচার করা হয়, কিন্তু কুডিআটাম, কুচিপুড়ি বা কথাকলি যদি এখন টোটাল থিয়েটাবের নিদর্শন হয়—আমি দর্শক হিসাবে তার আওতার বাইরেই থেকে যাব। যোগজাকার্তার নৃত্যনাট্যও যথেষ্ট আদর্শায়িত বা স্টাইলাইজ্‌ড। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু দীক্ষা থাকলে ভালো হত বলে বোধ করেছি। কিন্তু তা দেখতে দেখতে সর্বত্রই একটি আদিম মানবিক আলোড়ন নিরবধিভাবে অনুভব করা যায়। টোটাল থিয়েটারের লক্ষ্যই তো তাই, মার্জিততম থেকে অমার্জিততম মানুষকে নাড়িয়ে দেওয়াই তো তার আসল অভিসন্ধি। অন্নদাশঙ্কর রায় যাকে বলেছিলেন 'মানবসত্তম'—সেই দর্শকই তো টোটাল থিয়েটারের অভিপ্রেত।

মীথ তো আমাদেরই। নামের একটু আধটু তফাৎ আছে কিন্তু গল্পের কাঠামো মূলত এক। তার বিন্যাসও খুব একটা অপরিচিত নয়, যদিও দু-একটি এপিসোড ওখানকার নূতন উদ্ভাবনা। পালা করে এটি অভিনীত হয়েছে। প্রথম রাত্রিতে স্বর্ণমারীচ ও সীতাহরণ উপাখ্যান, দ্বিতীয় রাত্রিতে হনুমানের লঙ্কাদহণ, তৃতীয় রাত্রিতে যুদ্ধ ও সীতা উদ্ধার। দেখে আমার মনে হয়েছে এই এমন একটি থিয়েটার যা বুদ্ধিজীবী এবং কৃষককে, অতীত এবং সমকালকে, একই সঙ্গে তৃপ্ত করতে পারে। এর নাচ গতিতে প্রাণবান। আবার যদি আলাদা আলাদা ট্যাবলো হিসেবে দেখি। তবে প্রতিটি মুহূর্তই আশ্চর্য চিত্রল। অর্থাৎ এদের নাচে স্থিরতা ও চলতার মধ্যে এমন একটি অব্যাহত সৌন্দর্যের যোগ আছে, এমন অশিথিল অথচ সমৃদ্ধ রূপায়ণ আছে যাতে খুব সহজেই আমরা ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে উঠি। খুব আলোড়নময় দৃশ্য ছাড়া নাচ মোটামুটি ঢিমে তালে চলে, প্রতি সেকেন্ডে একটি ন্যূনতম ভঙ্গিমা। দ্রুতি এলে ঐ তালটিই দ্বিগুণিত হয়, এক হিসেবে মূলে একটি সুন্দর সরল ছন্দ আছে। শিল্পীদের হস্ত পদের আন্দোলনের মধ্যে কোনো কষ্টকল্পিত সচেতন বানানো ব্যাপার নেই, মনে হয় মানুষের সুখদুঃখের সহজ অনুভবের মধ্যেই বোধ হয় এই আশ্চর্য সহজ অথচ শোভন রূপগুলির বীজ নিহিত ছিল, মানুষের শরীর বোধ হয় কেবল এই ভঙ্গিমাগুলির জনাই নির্মিত হয়েছিল। অঙ্গুলির অনেক সঞ্চালন আমি হয় তো বুঝি নি। জানি না তার আড়ালে কোনো তাত্ত্বিক ভাষা লুকিয়ে আছে কি না, কিন্তু এদের সক্ষম লীলাছন্দ মুহূর্তে মুহূর্তে এমন সৌন্দর্যসৃষ্টি করছিল যার ব্যাখ্যা বা অনুবাদ অবান্তর। অথচ এদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই এদের মুখের অভিনয়ের পরিসর কম। রাবণের মুখের মেক-আপে গোঁফ ও লাল রঙ দিয়ে একটা ক্রূরতার অবিচল ছাপ

দেওয়া হয়েছে। রাক্ষস ও বানরসেনার মুখোস থাকায় মুখভঙ্গির ভূমিকাই নেই—কিন্তু রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সীতা, ত্রিজটা ইত্যাদি চরিত্রে আবার ঐ মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য খুব সাহায্য করেছে। অতিবিক্ত তীক্ষ্নতাবর্জিত ঐ মুখগুলিতে একটি করুণ বিষণ্নতা স্বচ্ছন্দেই ফুটে ছিল—যা কাহিনীর কারুণ্যকে সবসময় আনুকূল্য করেছে। গানের ভাষা বুঝি নি, কিন্তু তার সুরেও এমন তীব্র মূর্ছনা ছিল যা আমাদের আদিম তন্ত্রীকে দুলিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে পিছনে সুন্দর করে সাজানো বাদকদের বিচিত্র বাদ্য গামেলান এর গুরুগম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি সমস্ত মঞ্চকে একটি বিষাদ করুণ বাতাবরণ দান করেছিল। নাচে প্রধান ও গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে চমৎকার স্বাতন্ত্র বজায় রাখা হয়েছিল। মুখ্য চরিত্রগুলির নাচে গতির চেয়ে ছন্দোময় ভঙ্গিমা বেশি কিন্তু রাক্ষস বানরসেনার নাচ অনেকটা সমবেত ড্রিল-এর মতো, সৌন্দর্যের সঙ্গে বলিষ্ঠতার সম্মিলন। প্রধান চরিত্রগুলিব নাচ ছন্দিত এবং সৌন্দর্যময়, কিন্তু সেখানেও সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে। রাবণের গতিছন্দে একটি পৌরুষ আছে, কিন্তু রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ইত্যাদি ভালো চরিত্রে পৌরুষের চেয়ে লালিত্যই বেশী। রাবণের চেয়ে তাদের অঙ্গ সঞ্চালন এবং পদক্ষেপ, ছোট দেহ ভঙ্গিমাকে একটি সংযমের বাঁধনে রাখা হয়েছে—তাদের নৃত্যরীতি স্ত্রীচরিত্রগুলির নৃত্যরীতির কাছাকাছি রাখা হয়েছে, সম্ভবত তাদের ভালোত্বকেই সম্যক পরিস্ফুট করার জন্য। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কল্পনার বিপুল প্রসার দেখা যায়। কোমরের দুটি পাতলা আঁচলের মতো চাদরকে তারা কত অভাবনীয় অনুভব প্রকাশের জন্যই না ব্যবহার করে। ঐ আঁচলটি হাতের আন্দোলনে এদিক ওদিক ফিরিয়ে, কখনও অঙ্গুলিপ্রান্তে তুলে ধরে ক্রোধ, শোক বীর্য সমস্ত কিছুই বোঝানো হয়েছে। অথচ ব্যাপারটা বিন্দুমাত্র কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েদের দুই গোড়ালির মাঝখান দিয়ে একটুখানি trail-এর মতো বস্ত্রপ্রান্ত পিছনে লুটিয়ে থাকে—পায়ের মৃদু আন্দোলনে ডাইনে-বাঁয়ে তা নিক্ষেপ করেই বা কত 'মুড' বার করে আনা হল। কোমরের কাছে ঝোলানো লাল দুটি অঞ্চলখণ্ডকে ব্যবহার করে একটি বিপুল অগ্নিকাণ্ডকে বোঝানো হল, কিন্তু গানে, নৃত্যে, আলোয় এমন শক্তি এনে দেওয়া হল যে কার সাধ্য তা কৃত্রিম বলে উচ্চারণ করে।

বোঝাই গেল, দীর্ঘদিনের অনুশীলন থেকে, অনেক সাধনার উত্তরাধিকার নিয়ে এই শিল্প তৈরি। মুহূর্তের অনুভবের বিচ্ছুরণ যেমন সহজ, তেমনি ঘটনার প্রসার Still-poient তৈরিতে এ নাচ এতটুকু দুর্বল নয়। বীরত্ব এবং বেদনাকে যে এরা প্রযোজনায় আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহ। যুদ্ধের দৃশ্যে বেপরোয়া লম্ফঝম্প, acrobatics-এর সহজ নৈপুণ্য, উত্থান-পতনের দুর্ধর্ষ লীলা বীরত্বকে অনেক স্বাভাবিক ও জীবন্ত করে তুলে ধরে। আবার মৃত্যুর দৃশ্যে আলোর ম্লানতা ও নিষ্প্রভ নীলিমার মধ্যে রিচুয়লের আর্ত-দৃশ্য যাতে এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই, অতিরিক্ততা নেই—এসবের সংক্রমণ এড়ানো অসম্ভব। বানরদের ইতস্ততঃ মস্তক সঞ্চালনে চঞ্চল কৌতূহল প্রকাশ, রাক্ষসদের পরাজয়ের লজ্জা ও বেদনা, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণের অন্তর্লীন মানবিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট রেখায় আঁকা। নাচ যে মানুষের স্বভাবকে কত সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে তা বোঝার জন্যে এই নৃত্যনাট্য প্রত্যেকের দেখা উচিত।" (থিয়েটার/১০/১৯৬৬)

এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে রামায়ণ, মহাভারতের আখ্যান অবলম্বন করে ভারতীয় নৃত্যের প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়েও দ্বীপময় ভারতে এক অপরূপ নৃত্যশৈলী গড়ে উঠেছে। অথচ আমরা ঐ চিত্রধর্মীতা ও সামগ্রিকতা অর্জনের চর্চায় এখনও অনগ্রসর। যদি ভারতে প্রচলিত মণিপুরী নৃত্যরীতির কথাও ভাবি, যেখানকার অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় কুকি-চিন সম্প্রদায় উদ্ভূত, সেক্ষেত্রেও এটা বিরল। অথচ ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য-শিল্পগুলি শিল্পসৌকর্যে অনুপম, কিন্তু শুধুমাত্র গুরুমুখী রক্ষণশীল চর্চার জন্যে এবং বুদ্ধিগত চর্চার দৈন্যেব জন্যেই সম্ভবত এই অবস্থা।

নৃত্যনাট্যের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে অঙ্গাভিনয়ের বিভিন্ন নির্দেশ যা নাট্যশাস্ত্রে নির্দিষ্ট, তা দ্বীপময় ভারতে অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল করে নেওয়া হয়েছে। যেমন মুখজ অভিনয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ প্রাধান্য পায় না। "Facial expression is described in the Natyasastra as a vital part of Indian dance system. Eye movements were considered particularly expressive. But in South-East Asia, facial expression was almost completely eliminated from the dance. Only Balinese dancers use eye movements, and these are striking indeed." (Theatre in South-East Asia—James R. Brandon, p. 138)

হস্তমুদ্রার ক্ষেত্রেও এরা প্রকরণগুলিকে সহজ করে নিয়েছে। যেমন নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অঞ্জলি মুদ্রা আমাদের রীতিতে তিনভাবে প্রযুক্ত হয়। দেবগণের ক্ষেত্রে মাথার উপরে, মুনিঋষিগণের ক্ষেত্রে মুখের সামনে এবং বন্ধুবান্ধব ও অভ্যাগতদের ক্ষেত্রে বক্ষদেশের সামনে এই মুদ্রা প্রযুক্ত হয়। দ্বীপময় ভারতে কেবলমাত্র মুখেব সামনেই এই মুদ্রার প্রচলন। করণের ক্ষেত্রেও নাট্যশাস্ত্রে যেখানে ১০৮টি সেক্ষেত্রে দ্বীপময় ভারতে মাত্র ঊনিশটি প্রচলিত। জাভা ও বলীতে চার প্রকার হস্তকর্ম, ছয় প্রকার পদ কর্ম ও চার প্রকার বাহুকর্মের উপরেই নৃত্যশৈলী নির্ভরশীল। অবশ্য কাম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, বলি এইসব স্থানে অঙ্গাভিনয় আঞ্চলিকতা ভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। নৃত্যভঙ্গিমাগুলি পরবর্তীকালে বাহুল্য বর্জন করেছে, এটা বেশ বোঝা যায় কারণ বহু মন্দিরস্থাপত্যে নাট্যশাস্ত্রানুসারী অপ্সরা মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের মতো দ্বীপময় ভারতেও দেবার্চনা ও রাজদরবারে নৃত্য প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশেও যেমন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে, দ্বীপময় ভারতেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—"প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলার খুবই উৎকর্ষ হয়েছিল, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গান আর বাজনার মাতন নাচও দেবার্চনায় ব্যবহার হত। নাচকে বাঙলাদেশের বাউলেরা 'দেহের গান' বলে বর্ণনা করেছেন। নাচের উন্নতি এদেশে কতখানি হয়েছিল, ভাবের প্রকাশ বিষয়ে নাচকে কতটা সহায়ক বলে লোকে মনে করত, তা দক্ষিণে তামিল-দেশে চিদম্বরম্-এর মন্দিরের গোপুরম্ বা তোরণ-দেহলীর গায়ে উৎকীর্ণ নৃত্যভঙ্গির শত শত প্রস্তর-চিত্র থেকে বোঝা যায়। আগে ভারতবর্ষে ভদ্রঘবেও নাচ প্রচলিত ছিল, যেমন গুজরাটে এখনও আছে—গুজরাটের অতি

মনোহর গরবা নাচ। রাজার মেয়েরাও নগরের দেবালয়-প্রাঙ্গণে নৃত্যভঙ্গে কন্দুক-ক্রীড়া করতেন, দশকুমার চরিতের মতন বই থেকে এসব কথা জানতে পারা যায়। এখন সে সব কথা অতীতের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে—সে দিন আর ফিরবে না। রাজার ঘরের মেয়েদের নাচের প্রথা ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপেও যায়। ওখানে মন্দির প্রাঙ্গণে দেববিগ্রহের সামনে সাধারণ নর্তকীর বা রাজ অন্তঃপুরিকার বা অভিজাত বংশের মেয়েদের নাচের ব্যবস্থা হত—এই নাচ দেবপূজার একটি মনোহর অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই রীতি চলে আসে—যবদ্বীপে ভারতীয় নৃত্যকলা একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়ে দাঁড়ায়, যেন একেবারে পূর্ণতায় এসে পেঁছিয়। ইন্দোনেশীয় বা মালাই জাতির মধ্যে নৃত্যই ভাবের এক চরম অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নৃত্যের মূল সূত্রগুলি ভারতেরই; কারণ, হাতের অনেক ভঙ্গিকে এখনও এদেশে 'মুদ্রা' বলে। প্রাচীন ভাস্কর্যে—যেমন বোরো-বুদুরের গায়ে উৎকীর্ণ খোদিত-চিত্রে নাচের অতি সুন্দর কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির উদ্যানে এই নাচ একটি অনিন্দ্য-সুন্দর পুষ্প, দেবতার অর্চনাতেই মুখ্যতঃ এটি নিবেদিত হত। পরে কালধর্মে যবদ্বীপে সব বদলে গেল—মুসলমান ধর্ম এল, কাব্য-সংগীত সৌন্দর্যকলা প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে আগে দেব-সেবা হত তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। 'মন্দিরগুলি আর পূজাস্থান রইল না, পরিত্যক্ত হল, দেববিগ্রহ দূরীভূত হল; কিন্তু যবদ্বীপের রাজারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেও নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির এই জিনিসটি আর ছাড়তে পারলেন না। তাঁরা নিজেদের রাজসভার শোভার নিমিত্ত আর নিজেদের আনন্দের নিমিত্ত এই নাচ বজায় রাখলেন—এর tradition বা ঠাট যা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত রীতিকে বর্জন করলেন না। (রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ, পৃষ্ঠা ৪৯৩-৯৪)।

দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন নৃত্যের মধ্যে শ্রিম্পী, শারীতুঙ্গল, রারাষশ্রী, বটেজো, গ্যালক, লেগং, কবিয়ার, রোসেঙ, দেয়াসিণ, তোপেঙ, হার্জা, কামবিয়ঙ, বেডয়ো, বিরেঙ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর যবদ্বীপের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে "ওয়াইয়াঙ-কুলিৎ" বা পুতুলের ছায়া নাটক।

শ্রিম্পী মূলত মেয়েদের নাচ। জাভার দেবদাসীদের বলা হত ইম্প্রী। এই দেবদাসীদের নাচ হিসাবেই শ্রিম্প্রীর প্রসিদ্ধি। মুসলমান আমলে এই দেবদাসীরা মন্দির থেকে অন্যান্য লুণ্ঠিত বস্তুর সঙ্গে সুলতানদের অন্তপুরে স্থান পেল। তাদের মাধ্যমেই এই নাচটি প্রচলিত হয়। কুমারী মেয়েরাই এ নাচের শিল্পী। এই সব নৃত্যের কাহিনীগুলিতেও ভারতীয় প্রভাব স্পষ্ট। কাহিনীটি এইরূপ: ব্রহ্মা একদিন খেয়াল বশে কয়েকজন সুন্দরী নর্তকী সৃষ্টি করলেন। সেই নর্তকীদের নৃত্যে ও মোহনীয় রূপে তিনি বিমুগ্ধ হলেন। তাঁর সমস্যা হল কি করে তিনি একসঙ্গে সকলের নৃত্য দেখবেন। পিতামহের পক্ষে তো আর অবিরাম চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুন্দরীদের দেখা শোভন নয়। অথচ তিনি না দেখেও স্থির থাকতে পারছেন না। তখন তিনি চারিটি মাথা জুড়ে নিয়ে সমস্যার সমাধান করলেন। কথিত আছে সেই সুন্দরীরাই পৃথিবীতে এসে নাচের প্রচলন করেন। এই শ্রিম্পী নাচেরই ভঙ্গি ও ছন্দ থেকে ভিন্ন নামে ভিন্ন নাচের সৃষ্টি হয়েছে। নাচটি যখন একক তখন তার নাম শারীতুঙ্গল। নাচটি যখন দ্বৈত তখন তার নাম রারাষশ্রী। নাচটি যখন সাত বা নয় জন শিল্পীদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তখন তাকে বটেজো

নৃত্য বলা হয়। নৃত্যভঙ্গি প্রায় একই ধরণের কিন্তু যেহেতু এই সবগুলিই কাহিনী-আত্মক সেজন্যে প্রত্যেকটিকে আলাদা বলে মনে হয়। শারীতুঙ্গল অবশ্য কাহিনী-আত্মক নয়। নিছক সৌন্দর্য নৃত্য। ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী একে নৃত্তও বলা যায়। এই কাহিনীগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় প্রত্যেকটিতেই যুদ্ধ অন্যতম বিষয়। যেমন একটি গল্পে অর্জুন তার যুদ্ধবিদ্যার শিষ্যা রাজকুমারী শ্রীখণ্ডীর লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজকুমারী বললেন একটি শর্তে তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন, তা হল এই যে তিনি অর্জুনপত্নী লারাসতীকে যুদ্ধে পরাজিত করে তবে তাঁর গলায় বরমাল্য দেবেন। হয়তো এই শর্তের পিছনে সপত্নী হননের একটি বাসনাও লুকিয়ে ছিল। যুদ্ধে লারাসতীর পরাজয়ের পর অর্জুনের সঙ্গে শ্রীখণ্ডীর বিবাহ হয়। আর একটি গল্পে দুই রাজকুমারীরই একজন রাজপুত্রকে পছন্দ হল—কে বিয়ে করবে এই নিয়ে বহু বিতর্কের পর স্থির হয় যুদ্ধেই এর মীমাংসা হবে : দুই রাজকুমারীর মধ্যে যুদ্ধ হল, বিজয়িনী রাজকুমারের গলায় বরমাল্য অর্পণ করলেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ নাচগুলিকে মূলত যুদ্ধনৃত্য বলা যেতে পারে।

লেগং অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্যশৈলী। এই নৃত্যে দৃষ্টিকর্ম, গ্রীবাকর্ম, গণ্ডকর্ম, কটি চালনা প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের দেশের মণিপুরী নাচের সঙ্গে এই নাচের প্রভূত মিল আছে। লেগং শব্দের অর্থ নাচ করো। এ ধরনের নাচের কথা পৃথিবীর অন্যান্য দ্বীপেও পাওয়া যায়। সেখানেও এই নাচের জন্যে অনুরোধ করা এই শব্দে আঞ্চলিক ভাষান্তরের নামেই নাচের নামকরণ পাওয়া যায়। আদিমকাল থেকেই Invitation to Dance রীতি প্রচলিত। শান্তিদেব ঘোষের মতে : "এ নাচটি যে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য, তা দেখলেই বোঝা যায়। চোখের বঙ্কিম দৃষ্টি, মুখের হাসি, দ্রুতলয়ে ঘাড়ের কাজ, এ নাচে আছে। কোমরের দোলাও দেখলাম এ দেশের সব নাচেই প্রায় প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও নাচটি দেখতে ভালো লাগে। তার কারণ, এই নাচ যারা দেখায় তারা নিতান্ত বালিকা, নাচের প্রচলিত অঙ্গভঙ্গগুলিকে তারা সাধারণ নৃত্যরীতি হিসাবেই দেখিয়ে যায়, তার বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে তারা সজাগ বা সচেতন নয়। কাজেই দর্শকের কাছে নৃত্যই সর্বপ্রধান হয়ে থাকে।"

এই লেগং নাচে সাধারণত তিনটি মেয়ে নাচে। এ নাচের ধরণ প্রধানত কোণাকাটা (angular), হাতের ভঙ্গির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় ; এদিকে দেহের ভিতর দিয়ে সব সময়েই যেন কেউ খেলে যাচ্ছে। মণিপুরী নাচের মতো হাতের ভঙ্গি, দেহের ভঙ্গি ও মাথা সব যেন এক হয়ে চলতে থাকে। পায়ের তাল বা কাজ সহজ কিন্তু খুব দ্রুত লয়ে পা ফেলে নাচতে হত। হাতের দেহের ও মাথার ভঙ্গি দিয়ে সেদিকটা তারা ফুটিয়ে তুলেছে। দেখে মনে হয়, তাদের কাছে যেন এটা অতি সাধারণ খেলার মতো।

এই নাচটা বিশেষভাবে ভঙ্গিপ্রধান। পা হাত দেহ মাথা ও মুখ, সব মিলিয়ে যে যতখানি ভালো সামঞ্জস্য রেখে নিখুঁত ভাবে নাচতে পারবে, সেই হবে সবচেয়ে ভাল নর্তক বা নর্তকী।" (জাভা ও বলীর নৃত্যগীত পৃ.—৫০) গেমেলান-সঙ্গীতের সহযোগে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

লেগং যেমন প্রাচীন নৃত্য সে তুলনায় পরবর্তী কালে যে জনপ্রিয় নাচ এল তার নাম কবিয়ার। এর নৃত্যকল্পনাও গামেলান সঙ্গীতের অনুসারী। এই নাচেও কোনো

কাহিনীর অবলম্বন নেই। সঙ্গীতের শব্দধর্‌পটিকে দেহভঙ্গির বিচিত্র সঙ্গীতে র্‌পায়িত করাই এ নাচের ম্‌ল উদ্দেশ্য। শিল্পতাত্ত্বিক বিচারে এই ন্‌ত্য–Art of configuration এর অন্যতম নিদর্শন।

তোপেঙ মুখোস ন্‌ত্য। আমাদের দেশের ছৌ নাচের সঙ্গে এব অনেক মিল আছে। হার্জাকে কমেডি-আত্মক নাচ গান মিশ্র গীতিনাট্য বলা যায়। দেয়াসিন–দেব সেবিকাদের ন্‌ত্য। বিরেঙ–যুদ্ধ ন্‌ত্য। কাম্বিয়ঙ, বেডয়ো সঙ্গীতনির্ভর সৌন্দর্য ন্‌ত্য।

আগেই বলা হয়েছে জাভা ও বলিদ্বীপের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অবদান "ওয়াইয়াঙ-কুলিং" বা পুতুলের ছায়ানাটক। গ্রাম থেকে প্রাসাদ সর্বত্রই এটি সমান জনপ্রিয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঃ–যবদ্বীপের সংস্কৃতির উদ্যানে একটি সুন্দর পুষ্প হচ্ছে Wajang Koelit 'ওআইয়ঙ কুলিৎ' বা পুতুলের ছায়া-নাটক। সংক্ষেপে জিনিসটি এই ঃ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চামড়া-কাটা মূর্তি বা ছবি নিয়ে প্রদর্শক একটি সাদা পরদার সামনে বসেন ; প্রদর্শকের সামনে, মাথার উপবে একটা আলো থাকে, এই আলোর রশ্মি পরদার সামনে ধরা পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদা পরদার উপরে কালো ছায়ার সৃষ্টি করে, পরদার ওধারেও এই ছায়া দেখা যায়। পুতুলগুলির হাত নাড়াতে পারা যায়। আর প্রদর্শক মুখে মুখে ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠ করেন, বা পাত্র-পাত্রীদের কথা অভিনয়ের ধরণে নিজেই বলে যান। এই রকম পুতুল নিয়ে ছায়াবাজির নাটক অত্যন্ত সবল আর ছেলে-মানষি ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু একে অবলম্বন করে যবদ্বীপে একটি বেশ বড়ো আর বৈশিষ্ট্যময় শিল্প-কলা গড়ে উঠেছে।

যবদ্বীপে এই রকম ছায়া-নাটকের উৎপত্তি কী ক'রে হ'ল ? এরা যে চামড়ায়-কাটা পুতুল বা ছবিগুলি ব্যবহার করে, সেগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত। যবদ্বীপে ওআইয়াঙ্-এর পুতুলের চেহারায়, মানবদেহ-চিত্রণে একটা অত্যন্ত Grotesque বা বিসদৃশ ঢঙ এসে গিয়েছে, ছবিগুলিব হাত-পা সব লিক্‌লিকে সরু করে তৈরি করা হয়, মাথাটির সমাবেশও অদ্ভুত ; আর পোশাক-পবিচ্ছদ পরনেব ধবণও অদ্ভুত। প্রথম দর্শনে, এ জিনিসের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোকের চোখে সবটা জড়িয়ে দেবতা বা মানবের মূর্তিগুলিকে ভূতেব বা ব্যাঙ্গচিত্রের মূর্তি বলেই মনে হবে। কেমন করে এই বিসদৃশ ঢঙের মূর্তির উদ্ভব হলে তার ক্রম-বিকাশ বোঝা কিছু কঠিন নয়। কাৎস (Kats)-রচিত এই ছায়া-নাটক বিষয়ক বৃহৎ সচিত্র পুস্তকে ছবি দিয়ে বেশ দেখানো হয়েছে, কেমন করে খ্রীস্টীয় নবম শতকের প্রাম্বানান্-এর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মন্দিরের বাস্তুবানুসারী শিল্পের দেব-মূর্তি আস্তে-আস্তে ত্রয়োদশ শতকের পানাতারান্-এর শিল্পে বিশিষ্ট ভঙ্গি পেয়ে অনেকটা অন্য ধরনের হয়ে দাঁড়াল, আর তারপর ধীরে-ধীবে এই শিল্প আজকালকার ওআইয়াঙ্-এর সজ্ঞান-কৃত কিম্ভূত মূর্তি পেয়ে বসল। মূর্তিগুলি অদ্ভুত হলেও, তাদের মধ্যে একটা কলা-রীতি আছে, তাদের উদ্দেশ্য আছে, আর দস্তুরমতন তাদের iconography বা মূর্তি-নির্ণয়-বিদ্যাও আছে। মোষেব পরিষ্কার চামড়া থেকে কেটে লাল নীল আর সোনালি ইত্যাদি নানা উজ্জ্বল রঙ লাগিয়ে, এগুলিকে দেখতে খুবই জমকালো করা হয় ; দুদিকেই রঙ লাগানো হয়,–প্রত্যেক রঙের, দেহের প্রত্যেক ভঙ্গিটির একটি বিশেষ অর্থ থাকে। মোষের শিঙের বা বাঁশের কাঠের তৈরি সরু হাতলে মূর্তিগুলি আটকানো থাকে, আর পৃথক আর দুটি সরু কাঠি শক্ত সুতো দিয়ে দুটি হাতের সঙ্গে লটকানো

থাকে, তার দ্বারা হাত নাড়াতে পারা যায়—কাঁধ আর কনুইয়ে কাটা হাত কব্জা দিয়ে আটকানো থাকে।

কি রকম ভাবে এই আদিম অবস্থার নাটক যবদ্বীপে এতটা প্রচার লাভ করে তা বলা যায় না। পুতুল নাচ দড়ি টেনে পুতুলের হাত-পা নাড়িয়ে নাটকের খেলা দেখানো যবদ্বীপে এখনও প্রচলিত আছে, আর মানুষের দ্বারায় স্বাভাবিক মুখে অথবা মুখোস-পরা মুখে অভিনীত নাটকও খুব হয়; কিন্তু এই ওআইয়াঙ্-কুলিৎ-এর লোকপ্রিয়তা কিছু কমেনি।

এ জিনিস ভারত থেকেই যবদ্বীপে গিয়েছিল বলে অনুমান হয়। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতের আদি নাটক হত পুতুল-নাচ আর ছায়ানাট্যকে অবলম্বন করে। পুতুল-নাচের সঙ্গে মানুষের দ্বারা অভিনীত নাটকের একটা যোগ যে ছিল, তা সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার শব্দই যেন ইঙ্গিত করছে—'সূত্রধার' অর্থে, যে পুতুল নাচাবার সুতো বা দড়ি ধরে থাকে, তার পরে অর্থ দাঁড়াল—যে নিজেই অভিনয় করে। তবে 'ছায়া-নাটক' এই শব্দটি সংস্কৃতে আছে, আর সম্ভবতঃ এর দ্বারা পুতুল বা ছবির ছায়ার সাহায্যে অভিনয় সূচিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতে যে দুই-চারিখানি 'ছায়া-নাটক' আছে, সেগুলি ঢের পরের—খ্রীস্টীয় ১০০০-এর বা তারও পরেকার। যে-সকল পণ্ডিত মনে করেন যে সংস্কৃত নাটকের মূল এই ছায়া-নাটক, তাঁরা পতঞ্জলির মহাভাষ্যের একটি উক্তি নিয়ে নিজেদের মত স্থাপন করবার চেষ্টা করেন; তবে তাঁরা এই উক্তিটিকে যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অন্য পণ্ডিতরা তার আপত্তি করেছেন। আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পুতুল নাচের সঙ্গে কিছু পরিমাণে জড়িত থাকা সম্ভব; কিন্তু যবদ্বীপীয় ওআইয়াঙ্ এর মতো পুতুলের ছায়া দ্বারা অভিনয়—প্রাচীন ব্যাপার নয়, অর্বাচীন যুগেরই ব্যাপার; খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে ইন্দোচীন (শ্যাম আর কম্বোজে) যায়, আর তুর্কীরাও এই জিনিস পরে নেয়; যবদ্বীপীয়দের ওআইয়াঙ্-এর মতো শ্যামদেশেও ছায়াভিনয়ের জন্যে চামড়ার কাটা ছবি ব্যবহারের রেওয়াজ আছে; আর ইরাক মিসর আর তুর্কদেশেও খ্রীস্টীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকের চামড়ায় কাটা মূর্তি আর অন্য চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে বোধ হয় এ জিনিসটি ততটা লোকপ্রিয় হতে পারেনি।

বেশির ভাগ রামায়ণ মহাভারত আর 'পাঞ্জি' (Pandji) অর্থাৎ প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী অবলম্বন করে এই ওআইয়াঙ নাটক; মহাভারত-রামায়ণ অবলম্বন করে যে ছায়া-নাটক হয়, তার নাম Wajang Poerwa 'ওয়াইয়াঙ পূর্ব'। যবদ্বীপে রামায়ণ মহাভারতের এতটা লোকপ্রিয়তা অনেকটা এই 'ওআইয়াঙ্-পূর্বে'র লোকপ্রিয়তার সঙ্গে জড়িত।"

ভারত-সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রায় দক্ষিণ ভারতের বম্মালাত ও জাভা বলির ছায়া-নাটক যেন একই ভাবগঙ্গার দুটি স্রোতধারা—যা সুদূর অতীতেই গ্রথিত হয়েছে মৈত্রীবন্ধনে।

দেবদাসী

সাধারণ ভাবে ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার মূল ভাবধারা ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। এই পর্যায়ে নৃত্য-এর বিকাশে মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা প্রয়োজন। এ গবেষণাকে শুধুমাত্র তত্ত্বনির্ভর হলে হবে না, হতে হবে মূলত তথ্যনির্ভর। যেহেতু ধর্ম প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও রক্ষণশীল, সেজন্যে নির্মোহ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা না করলে দেবদাসী প্রথার সার্বিক চেহারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৮৬৮ সাল থেকে এই প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯১০ সালে মহীশূর এবং ১৯৩০ সালে ত্রিবাংকুর এই দুটি দেশীয় রাজ্যে দাসী-উৎসর্গ নিষিদ্ধ হয়। মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ হয় ১৯৪৭ সালে। সরকারী ভাবে এই প্রথার অবসান হলেও এই প্রথার যারা শিকার হয়েছেন এমন অসংখ্য দেবদাসী ও তাদের উত্তরসূরীরা ভারতের বিভিন্ন গণিকালয়ের এখনও অন্যতম প্রধান অংশ। দাসত্ব সব সময়েই ঘৃণিত। দেবতার নাম নিয়ে মহিমান্বিত করার প্রয়াস করলেও আসল প্রভু তো রাজা, রাজপুরুষ ও পুরোহিতবৃন্দ। যুগ যুগ ধরে দেবতার নামে এই নির্লজ্জ নারীমেধ যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে দেবদাসীদের আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

এ ইতিহাস অবশ্য শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বের। কারণ দাসপ্রথার সূচনা হয়েছে যেদিন থেকেই, যেদিন থেকে সমাজে গোষ্ঠী জীবনের অবসানে ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার, রাষ্ট্রভেদ ও শ্রেণীভেদ-এর সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাবিলোনিয়ার 'ইস্তার' থেকে ভারতের 'ইয়ালাম্মা' যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসেও দেবদাসীদের দেখা পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ শতকে ফারাও তৃতীয় আমেস হোটেপ, থিবস্ নগরীতে দেবতা 'আমন' দেবী 'মুট' ও দেবপুত্র খোন্ সু—এই ত্রিমূর্তির মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবদাসীদের নিয়োগ করেন। তৃতীয় রামেশিস্-এর রাজত্বকালের Great Harris Papyrus দলিলে মন্দিরের জন্যে ৮৬,৪৮৬ জন ক্রীতদাস ও দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়। দেবদাসী প্রথার প্রথম প্রামাণ্য দলিল হিসাবে একে গণ্য করা যায়। ব্যাবিলনের ইতিহাসে দেবী ইস্তারের সঙ্গিনী হিসাবে নৃত্যগীতকুশলা নারীদের দেবদাসী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। দেবদাসীদের ইস্তার-এর প্রেমিক দেবতা তাম্মুজ এর প্রতিনিধিস্বরূপ উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজপুরুষ ও পুরোহিতদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক যৌনসম্পর্ক ব্যাবিলনের মন্দিরেই শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থের বক্তব্য: "আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে কেউ যদি হঠাৎ জেরুজালেমে অবতরণ করতেন, তাহলে অনিবার্য ভাবেই একটি অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ত তার। সবিস্ময়ে তিনি দেখতেন, নগরের সুখ্যাত মন্দিরটির উত্তর তোরণে বসে শত শত রূপসী অঝোরে কাঁদছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে আগন্তুক জানতে পারতেন, ওরা যার জন্যে কাঁদছে—নাম তার তাম্মুজ (Tammuz)। সেমেটিকরা যার নাম রেখেছিল অ্যাডোনিস—(Adonis)। হয় তো এমনও হতে পারত, বিদেশী হঠাৎ দেখতেন, মেয়েগুলো চকিতে কান্না থামিয়ে সোল্লাসে তার দিকেই ছুটে আসছে। —তাম্মুজ!—তাম্মুজ! বলে চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। কোনো রূপসী ধরেছে

তাঁর হাত, কারও বাহুবন্ধন অচেনা বিদেশীর বক্ষ ঘিরে।

বিশ্বখ্যাতঃ পণ্ডিত, 'গোল্ডেন বাউ'-এর লেখক জে. জি. ফ্রেজার বলেন, হিব্রুদের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই জেরুজালেম তথা সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় এ প্রথার চল ছিল। বিশেষত সিরিয়া উপকূলে বাইব্লাস এবং সাইপ্রাস-এর পাফস নগরে। পুরোহিত সম্প্রদায় তখন সেখানে অ্যাডোনিস্-এর পবিত্র ভূমিকায়। তাদের পরিতৃপ্ত করার জন্যে প্যালেস্টাইন এবং সেমেটিক পৃথিবীর নানা কেন্দ্রে মন্দিরে মন্দিরে আঙুর বাগিচার মতো নিয়মিত উৎসর্গ করা হত রূপবতী তরুণী মেয়েদের।

কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। জেরুজালেম-এর বাইরেও একই খবর। সাইপ্রাসে– নিয়ম ছিল বিয়ের আগে সব কুমারী মেয়েদের মন্দিরে গিয়ে আপন কুমারীত্ব অর্ঘ্য দিয়ে আসতে হবে। ওদের দেবীর নাম ছিল অ্যাফ্রোডাইট (Aphrodite), বা অ্যাসট্রাটি (Astrate)। তিনিও অন্য নামে সেই ইস্তার। তাঁর নামে প্রাচীন ব্যাবিলন-এর মিলিত্তা (Mylitta) মন্দিরেও কুমারী মেয়েরা নিজেদের শুদ্ধ করার বাসনায় অপরিচিত পুরুষের হাতে নিজেদের সমর্পণ করত।

ঈশ্বরের পরিবর্তে পুরোহিত, পুরোহিতের পরিবর্তে ক্রমে সর্বসাধারণ- একটি আদিম ধর্ম-ধারণা পরবর্তীকালে এই সিঁড়ি ভেঙ্গেই ধীরে ধীরে নীচের যাত্রী।"

এই দেবদাসী প্রথা যে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল তার আরও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'ভেস্টাল-ভার্জিন' প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। রুবি জিনার-এর "The Gateway to the Dance"-এ প্রাচীন গ্রীসদেশে দেবদাসীদের নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায়, "Long robed Ionians delighted the God with dancing and song"। কার্থেজের মন্দিরে, ফিনিশিয় মন্দিরসমূহে দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রীসের দেবদাসীদের, যাদের বলা হত Hierodule, তাঁদের ভূমিকা ছিল নৃত্যগীত অনুষ্ঠান এবং পুরোহিত ও প্রভাবশালী রাজপুরুষদের পরিতৃপ্ত করা। মন্দিরবালার ছদ্ম আবরণে এও এক ধরণের বাধ্যতামূলক বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর মাত্র। জুনো ও ভেনাস-এর মন্দিরে, মদিরা দেব বাক্কাস্ এর মন্দিরেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

দক্ষিণ আমেরিকার ইনকাদের ইতিহাসেও Virgins at the Sun" বা সূর্যকুমারী রূপে দেবদাসীদের উপস্থিতি পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'ইম্প্রী' নামে দেবদাসী সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতেব ইতিহাস অনুধাবন করলে মোটামুটি ভাবে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক অর্থাৎ পুরাণের কাল থেকে দেবদাসীদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও অনেক আগে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এক গুহালিপিতে এদেশের প্রাচীনতম দেবদাসী সুতনুকার নাম পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ে দুটি গুহা–একটি যোগীমারা, অপরটি সীতাবেঙ্গা। এই গুহার প্রবেশ পথের ডানদিকে মাগধী ভাষায় পাঁচটি ছত্র খোদিত আছে ঃ

শুতনুকানাম
দেবদাসিক্যী
শুতনুক নাম দেবদাসিক্যী
তং কাময়িথ বালানশেয়ে।
দেবদিন্নে নাম লুপদকুখে॥

বঙ্গানুবাদ করলে : সুতনুকা নামে এক দেবদাসী, বারাণসীর (মতান্তরে তরুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম) দেবদত্ত নামে এক শিল্পীকে ভালবেসেছিল। এই লিপিই দেবদাসী অস্তিত্বের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন।

যোগীমারা ও সীতাবেঙ্গা গুহায় প্রাচীন ভারতের রঙ্গমঞ্চের নিদর্শন দেখা যায়। প্রেক্ষাগৃহ, দর্শকদের পাষাণ আসন, ছাদে প্রাচীন চিত্রাবলী লিপি। এখানেও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ভাঙা তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। এর সন্নিকটেই রেউড় বা রেন্দ নদী। অনেকের মতে এই রেন্দ নদীই রামায়ণের মন্দাকিনী, রামগড় পাহাড়ই চিত্রকূট পর্বত। যোগীমারা গুহায় বাল্মীকি থাকতেন, আর সীতাবেঙ্গায় সীতা ছিলেন। সীতার নামেই এই সুন্দর গুহার নাম সীতাবেঙ্গা। সীতাবেঙ্গার একটি চিত্রে ধীবোদাত্ত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট এক পুরুষ। তাঁর বামে নৃত্যরতা রমণী ও বাদকবৃন্দ। জুনাগড়ের উপরকোট গুহাচিত্র, পাণ্ডুলেন চৈত্য-মন্দিরের (নাসিক) নাট্যশালার ভাস্কর্যলিপি, অমরাবতীর ভাস্কর্য চিত্র, বারহুত (খ্রীস্টপূর্ব ১৫০), সাঁচী (খ্রীস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) বৌদ্ধ-বিহারের ভাস্কর্যে দেবদাসীদের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় শতকের মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ ও সংকলনে নৃত্য, গীত ও দেবদাসী প্রথার উল্লেখ আছে। সমগ্র মৌর্য যুগে বিভিন্ন ভাস্কর্যে, ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রমোদ অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যে সমারোহ সেখানেও দেবদাসীরা অনুপস্থিত নন। থেরগাথা ও থেরীগাথাতেও তথাকথিত Vestal Virgin, Nun বা দেবদাসীদের অনুরূপ চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : "There can be no doubt that the great majority of songs of the Lady Elders, were composed by woman......Mrs. Rhys Davids has poiented out the difference in idiom, sentiment and tone between the 'Songs of the Elders' and the 'Songs of the Lady Elders.' One has only to read the two collections consecuntively in order to arrive at the conviction that, in the songs of the nuns, a personal note is very frequently struck which is foreign to those of the monks, that is the latter we hear more of the inner experience, while in the former, we hear more frequently of external experiences, that in the monks songs, descriptions of nature predominate, while in those of the nuns, picture of life prevail."—(M. Winternitz : A History of Indian Literature, Vol II, P- 101)

বৌদ্ধ জাতকমালায় সংগীত, নৃত্য ও দেবদাসী প্রসঙ্গে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ক্ষান্তিবাদী জাতকের (৩১৩ নং) উপাখ্যানে তৎকালীন সময়ে রাজদাসীদের (দেবদাসীদের যে অংশ রাজন্যদের মনোরঞ্জন করত) যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে এই প্রথার অন্তর্নিহিত চিত্রটিকে প্রস্ফুট করে। একদা রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত অবস্থায় পারিষদদের নিয়ে প্রমোদোদ্যানে এলে মঙ্গলশিলাপটে তার জন্যে আসন রচিত হল। গীত-বাদ্য-নৃত্য নিপুণা দাসীরা শিল্পচাতুর্য প্রদর্শণ করে রাজার মনোরঞ্জন করলেন। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই প্রথাটি শুধুমাত্র

শিল্পানুশীলন ও দেবচর্যাতেই—সীমাবদ্ধ ছিল না। দাস প্রথার শর্তানুসারে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র এদের নৃত্যগীতই উপভোগ করতেন না, রূপলাবণ্য সম্ভোগেরও তারাই অধিকারী ছিলেন। রাজাদের পক্ষে আবার এ বিষয়ে শাস্ত্রের অনুশাসনও আছে ঃ "A kings union takes place with a homely woman and a common man may unite with a public women while the king may have union with a heavenly Courtesan only"—এই তথাকথিত অপ্সরাই মর্তে দেবদাসী। এসবের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্যে আবার শাস্ত্রকাররা নানা মনোহর কাহিনী রচনা করেন। যেমন শাপভ্রষ্ট উর্বশী, মেনকা ইত্যাদি, মনু থেকে সকলেই এরকম নির্লজ্জ ভাবে রাজতন্ত্র ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পক্ষে অবাধ বঞ্চনার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই নারীমেধ যজ্ঞের ইতিহাসে বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রে রাজকন্যারাও এ থেকে নিস্কৃতি পান নি। রাজা যযাতি আপন স্বার্থ পূরণেব জন্যে গালব তাঁর কন্যা মাধবীকে পণ্যশুল্কা হিসাবে ব্যবহার করবে জেনেও দেহব্যববাসে কণ্যাকে দান কবলেন। যতই মোহনীয় উপাখ্যানের মোড়কে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা হোক না কেন, রাজকন্যা মাধবীর ভবিষ্যৎ জীবনে দেবদাসী বা গণিকা হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। বিদেশেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। মিসরের রাজত্ব যখন 'তানিস'-এর ফারাও ও থিবস-এর প্রধান পুরোহিতের হাতে, তখন তানিস-এর রাজকন্যারা থিবস মন্দিরে 'আমনদেবের স্ত্রী' রূপে রাজাজ্ঞায় উৎসর্গীত হতেন। এর পিছনে একটি কূটবুদ্ধি কাজ করত, তা হল এই যে ঐ কন্যাদের সন্তানরা যাতে রাজসিংহাসনেব দাবীদার না হতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আসলে ধর্মীয় অনুশাসনের পিছনে সর্বত্রই কাজ করছে বিষয়বুদ্ধিগত বঞ্চনার ইতিহাস।

সব বৌদ্ধজাতকগুলিতে নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রসঙ্গ না থাকলেও নৃত্যজাতক, ভেরীবাদক-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মৎস-জাতক, সর্বদ্রষ্ট্র-জাতক,' অসদৃশ্য-জাতক, ভদ্রঘট-জাতক, গুপ্তিল-জাতক, .ক্ষান্তিবাদী-জাতক, কাকবতী-জাতক, পাদকুশল-জাতক, কুশ-জাতক প্রভৃতিতে—এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে "অনেকাপ্সরঃ শতসহস্রনৃত্যগীতবাদিত পরিগীতে"—প্রভৃতি সূত্রও উল্লেখযোগ্য। "কথাসরিৎসাগর"-এ দেবদাসী রূপিণীকার উপাখ্যান পাওয়া যায়। রূপিণীকা ছিল মথুরার মন্দিরের দেবদাসী, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, উত্তর ভারতেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল। তবে মুসলমান আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের থেকে দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের আনুকূল্যে অনেক বেশি প্রসারলাভ করে। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে শ্রী পান্থের বক্তব্য ঃ রূপিণীকাকে উপলক্ষ্য করে পেনজার (কথাসরিৎসাগর এর ইংরাজি সংস্করণের সম্পাদক) কথাসরিৎসাগর-এর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেবদাসী প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান "তাঁর উল্লেখিত সূত্র ধরে দেবদাসী সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য এখানে সংযোজিত হল।

"প্রথমত রূপজীবিনীদের কথাই ধরা যাক। স্বর্গে, দেবলোকে তাদের অস্তিত্বের কথা স্বীকৃত। নরলোকে এই বৃত্তিকে বলা হয় 'প্রাচীনতম পেশা'। প্রাচীন ভারতে এই পেশার মধ্যে পবিত্রতার স্পর্শ ছিল কিনা, অর্থাৎ রূপজীবিনীদের সঙ্গে ধর্মাচারের সম্পর্ক কতখানি নিবিড় ছিল তা নিয়ে অবশ্যই গবেষণা চলতে পারে। তার মধ্যে

প্রবেশ না করেও কয়েকটি সংবাদ পরিবেষণ করা যায়ঃ ঋগ্বেদে বারবণিতার উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে জাতক কাহিনীতেও। ... ...'কুট্টণীমতম'-এর বিবরণ পড়ে অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেও একসময় দেবদাসী বাহিনী ছিল।" জৈন ধর্মগ্রন্থেও মহাবীরের অভ্যর্থনায় দেবদাসীদের নৃত্যের বিবরণ বায়পমেনীয় সূত্রে পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র কৃত সময়মাতৃকা গ্রন্থে কাশ্মীরে দেবদাসীদের বিবরণ দিয়েছেন। কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে দেবদাসী কমলার প্রসঙ্গ থেকে বাংলাদেশে দেবদাসী প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরের দেবদাসী কমলাকে মন্দিরের পুরোহিতদের প্রভূত অর্থ প্রদান করে কাশ্মীরে নিয়ে যান।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত পদ্মপুরাণে স্বর্গে পূর্ণ কল্পলাভের জন্যে দেবতাকে সুন্দরী নারী উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে দেবতার প্রীতির জন্যে নৃত্যগীতিকুশলা দেবদাসীদের উল্লেখ আছে ঃ

"তদা পূজোপহারশ্চ ভক্ষভোজ্যা দিকৈস্তথা
পূজয়িত্বা জগন্নাথ তোষয়েৎ গীতনৃত্যকৈঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঃ

নন্বৃতুশ্চ তথা তত্র বহবোঽপ্সরসাং গণাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিমুচো মেঘা জগর্জমৃদু নিঃস্বনাঃ॥

ভবিষ্যপুরাণে—সূর্যের উপাসনায় নৃত্য-গীতিকুশলা নারীদের উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। শিবপুরাণে শিবমন্দির নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য নির্দেশের সঙ্গে দেবমনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্যগীতনিপুণা স্ত্রীলোক নিয়োগের নির্দেশ আছে। বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে একই নির্দেশ পাওয়া যায়।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যেও দেবদাসীর উপস্থিতি ঃ

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিত-রসনা-স্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিত-বলিভিশ্চামরৈ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তত্তো নখপদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্
আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি-মধুকরশ্রেণী-দীর্ঘান্ কটাক্ষান্॥

পদক্ষেপে কাঞ্চী-রুত
দেবদাসী কুশলা নর্তনে
ক্লান্তহস্তা মণিদ্যুতি
লীলায়িত-চামর-হেলনে।
নখক্ষতে সুখদায়ী
বর্ষাবিন্দু লভিয়া তোমার
ভ্রমর-নিকর-দীর্ঘ
সুকটাক্ষে চাবে বারবার॥

(অনুবাদ ঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

'দশকুমার চরিত'-এর কামমঞ্জরী, তামিল মহাকাব্য 'শিলপ্পদিকারম্' এর নায়িকা মাধবী, 'রাজতরঙ্গিণীর'-নরেন্দ্রপ্রভা, সহজা, 'কথাসরিৎসাগর -এর রূপিণীকা—এরা যেন পথ ধরে এসেছে সেই সব সুরবেশ্যাদের—যারা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী নামে খ্যাত। এরা শুদ্ধা—কারণ "সোম তাহাকে দেন পবিত্রতা। গন্ধর্ব দেন শিক্ষিত সুন্দর বাণী। অগ্নি দেন সর্বমেধ্যতা ও সর্বভক্ষতা। অতএব এ নারী নিষ্কলুষ ও সদাই মেধ্য।" ধোয়ীর পবনদূতে মন্দির নর্তকী দেবদাসী বাররামাদের বিবরণ আছে। উমাপতি ধর-এর দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিষ্ণু মন্দিরের দেবদাসীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে ঃ পাল আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিল না; পরে দক্ষিণী প্রভাব সেন বর্মণ আমলে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে এবং দেবদাসী প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। অবশ্য এই প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছিল নগর সমাজে। এই প্রথা প্রচলনের কারণ হিসাবে বৌদ্ধ মতবিরোধিতা ও ভাগবত ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রবল প্রয়াসকেও নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।' একাদশ শতকের পরে বাংলাদেশে দেবদাসী প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উড়িষ্যায় দেবদাসী প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এদের 'মাহারী' বা 'সুরবেশ্যা' বলা হত। এদের আচরণীয় বিধির যে নির্দেশলিপি আছে, তা এই প্রথার নির্মম রীতির এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

"মাহারী সেবকে কাহারি সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গ ন হেবে। গঙ্গামাতা মঠু, কুঞ্জ মঠু, রথ সামন্তঠারু দিক্ষা নেই কলিতিলক নেবে। পালি দিনে ঘরু পাক না করিবে। পহুড় লুগা ন পিন্ধিবে। তুলসী কণ্ঠি গলারে বান্ধিবে। শাস্ত্র প্রমাণে নৃত্য করিবে। নৃত্যকালে যাত্রী দর্শনিয়াকু ন চাহিবে। পরেমেশ্বরঙ্ক দাসী তুল্য চলিবে। শূদ্র অঙ্গ ন ছুঁইবে। সেবা ঘটনি পালিদিন পুরুষকু বচন ন কহিবে। মীননাহক জানি ঘটাইব। নাচুনি, গাউনি, সেবাকালে বিকল ন করিব। স্বরভঙ্গ ন করিব। পহপট, সরিমান, পরমেশ্বর, মালশ্রী, হরচণ্ডী, চন্দনঝুলা, শ্রীমঙ্গল বচনিকা, ঝুটি আটতালি, গীতগোবিন্দ কাব্য ভাউনি করিবে।" অর্থাৎ পুরুষের দেহস্পর্শ নিষিদ্ধ, জগন্নাথদেবের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব ধর্মানুসারে দীক্ষান্তে রসকলি তিলক অঙ্কিত করতে হবে। সেবার দিনে নিজগৃহে রন্ধন নিষিদ্ধ। তুলসীকণ্ঠি ধারণ করতে হবে। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসরণ করে নৃত্য করতে হবে। নৃত্যকালে যাত্রী দর্শকদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চলবে না। পরমেশ্বরের দাসী ভাবে ভাবিত হয়ে সেইমত আচরণ করতে হবে। শূদ্র অঙ্গ স্পর্শ করা চলবে না। অনুষ্ঠানের দিনে পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। মীননাহক (অলস অঙ্গ পতনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবাইত) এসে তাদের মন্দিরে নিয়ে যাবে। নৃত্যকালে নৃত্যশিল্পী ও গীতশিল্পী পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলবে না। সুর ও তাল যথাযথ রক্ষা করতে হবে, ভঙ্গ করা চলবে না। পহপট, সরিমান, পরমেশ্বর, মালশ্রী, হরচণ্ডী, চন্দন ঝুলা, শ্রীমঙ্গল বচনিকা, ঝুটি আটতালি—এই কটি তাল আশ্রয় করে নাচতে হবে, এবং গীতগোবিন্দের অনুসরণ করতে হবে।

উপরের নির্দেশনামা থেকে একদিকে যেমন নৃত্যবিধির নিয়ম শৃঙ্খলাগত উৎকর্ষ সাধনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি অপরদিকে ব্যক্তিজীবনে দাসত্বের শৃঙ্খলিত

ছবিটিও স্পষ্ট। এখানেও রাজা ও মীননাহকই প্রভু। একাদশ শতকে রচিত রামদেব সংহিতায় জগন্নাথের পূজায় দেবদাসীদের নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায় :

শয্যাকালেতু কর্তব্যং পুষ্পাঞ্জলি গণৈসহঃ
জয় বিভবদ্বারেণ শয়নারাত্রিকংচরেৎ।
গজদন্ত সমাযুক্তপর্যংক্ক সমিপে পুনঃ
আরত্রিক ত্রিণি কুর্যাৎ গায়নাদি সমাচরেৎ॥
বীণাবাদন যুক্তেন নানা বাদ্যানি সংযুতৈ
গায়িকানর্তকীরম্যে গীত নৃত্যাদিমঞ্জুলৈ॥

কর্মবিভাগ অনুসারে এই মাহারী সম্প্রদায়ের ছ'টি শ্রেণীবিভাগ ছিল। ভিতর গাউনি, বাহার গাউনি, নাচুনি, পটুয়ারী, রাজ অঙ্গিলা ও গাহন মাহারী।

মণিপুরের দেবদাসীরা মৈতি ভাষায় মৈবী নামে পরিচিত। এরা শিব-পার্বতীর আরাধনায় উৎসর্গীত। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে কৃষ্ণদাসীরও সৃষ্টি হয়েছে। নৃত্যকালে অনেক সময় এদের 'ভর' হয়। তখন এদের বলা হয় 'মৈবী লাইতোঙবা'। এই ভর অবস্থায় এরা বাঁ হাতে ঘণ্টাধ্বনি করতে করতে দৈবী কথা ও ভবিষ্যৎবাণী করে।

পশ্চিম ভারতেও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। কুলবন্ত, ভাবিন, দেবলি, নাইকিন, ভগতানি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এরা পরিচিত। এই শব্দগুলির অর্থও এই পেশার এবং প্রথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ভাবিন এর অর্থ রূপসী রমণী, দেবলীর অর্থ দেবদাসী, নাইকিন-এর অর্থ রক্ষিতা, ভগতানি-এর অর্থ ঈশ্বর বা তাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ পুরোহিতদের সেবাদাসী। বলাবাহুল্য এরা সকলেই রূপজীবিনী। অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে এদের সংগ্রহ করা হত। কুলশীলসম্পন্ন মান্য পরিবার থেকে সংগৃহীত দেবদাসীদের বলা বলা হত কুলবন্তী।

এই সংগ্রহ করার আবার বিভিন্ন প্রথা ছিল। উড়িষ্যার কোরাপুট অঞ্চলের নৃত্য-নিপুণা 'গুণী'দের কিভাবে দেবদাসী থেকে 'গণদাসী'তে রূপান্তরিত করা হত সে প্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক আর্সটন-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : Guni is the name of Oriya dancing girls and prostitutes. It is derived from the sanskrit 'Guna' meaning qualification and skill in reference to their possession of qualification for and skill acquired by training when young. There were the other dancing girls whose apparent function was to dance to the temples but whose actual function was prostitution." অর্থাৎ এককথায় দেবদাসী প্রথার আবরণে নারীপণ্যের অবাধ বাণিজ্য।

এই পণ্য সংগ্রহের কাহিনী সব দেশেই বিচিত্র। পশ্চিম আফ্রিকায় পুরোহিতরা একটি নির্দিষ্ট বিশেষ শুভদিন ঘোষণা করে দিতেন। সেইদিন গৃহস্থারের বাইরে যত সুন্দরী কুমারী মেয়ে, তারা সবাই মন্দিরের সম্পত্তি। ঐদিন শেষ হয়ে গেলেও তাদের অনেকেরই আর পিতৃগৃহে ফেরা হত না। দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি মন্দিরের দাসী সংগ্রহণের বিবরণও অনুরূপ। মন্দিরের পুরোহিতবৃন্দ বেঙ্কটেশ্বরের প্রতিমূর্তি নিয়ে

একটি নির্দিষ্ট পূণ্যতিথিতে শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমা করতেন। দর্শনাথীদের মধ্যে যাদের পুরোহিতদের পছন্দ হত, তারা বেংকটেশ্বরের নামে সেই রমণীকে সংগ্রহ করতেন। এটা নাকি বেংকটেশ্বরের পূণ্য অভিলাষ ও আদেশ।

এই পদ্ধতির পিছনে যে একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করত সে প্রসঙ্গে আনুমানিক ১০৩০ খ্রীস্টাব্দে আলবেরুণী এবং ইদ্রিসীর ব্যক্তব্য : "The Hindus are not very severe in punshing whoredom The fault however, in this lies with the Kings, not with the nation. The Kings make them an atrtraction for their cities, a bait of pleasure for their subjects, for no other but financial reasons." যেহেতু সেযুগের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত, সেহেতু দেবতার নামেই এই সব অনাচার সংঘটিত হত।

দেবদাসীদের আর এক বিচিত্র শাখা 'বাসবী'। এদের কিভ বে সংগ্রহ করা হত সেই তথ্য মহীশূর গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় : "Social evils like prostitution, traffic in woman and gambling have been prohibited by law ; but they do exist to a certain extent especially in towns. The 'Basavi' system, which involved a sort of prostitution was prevalent in the district. In a few Castes, in a few cases, the daughter instead of being given in marriage was dedicated to a god or godess and was turned into what is known as 'Basavi's. Sometimes a girl suffering from serious illness was promised to be so dedicated, if she recovered, In a few families, it was a custom to dedicate one of their daughters, often the oldest. Sometimes a girl became a 'Basavi' if she was unable to get a bridegroom. This social evil is surviving in a few places in clandestine way." স্থানীয় অধিবাসীদের এমন একটি প্রথাও প্রচলিত আছে যে, যে পরিবারে ছেলে নেই সবই কন্যাসন্তান, সেই পরিবার থেকে একটি মেয়েকে 'গুডী বাসবী' অর্থাৎ মন্দিরে উৎসর্গ করতে হবে। এই বাসবী প্রথাটিকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করলেই কেমন করে সুপরিকল্পিতভাবে দেবাসীদের পতিতালয়ে আনা হয়—তার ছবিটি পরিস্কার দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বাসবী ছিল দেবদাসী সম্প্রদায়। তখন তাদের পাঁচটি ভাগ দেখা যায়। ১) গুডি বাসবী—এরা সবথেকে সম্মানিত, দেবভাবে ভাবিতা। ২) দীপদা বাসবী—মন্দিরের প্রদীপ সংরক্ষণ ও প্রজ্জ্বলনের দায়িত্ব এদের উপর থাকত। ৩) ঘণ্টে বাসবী—মন্দিরের ঘণ্টাগুলি পরিস্কার রাখা ও ঘণ্টা বাদনের দায়িত্বে এরা থাকত। ৪) কম্বদা বাসবী—মন্দিরের পবিত্র স্তম্ভের এরা দেখাশুনা করত। ৫) গর্ভ বাসবী—এরা মন্দিরের গর্ভগৃহের পরিচর্যা করত। এরা সকলেই নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা।

পরবর্তীকালে বাসবীদের আরও চারটি শ্রেণীবিভাগ ঘটল অর্থোপার্জন ও ভোগ-লালসাকামী প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চক্রান্তে। ১) বালগোডা বাসবী, ২) মানে বাসবী, ৩) জাতি বাসবী, ৪) বিডি বাসবী। বালগোডা বাসবীদের মন্দিরের পুরোহিত, গ্রামের অঞ্চল প্রধান, নৃত্য ও সংগীত শিক্ষক এবং তাদের আত্মীয়দের মনোরঞ্জন করতে

হত। মানে বাসবীদের প্রভাবশালী পরিবারের যুবকদের রক্ষিতা হিসাবে নিয়োগ করা হত, যাতে তারা পতিতাপল্লীতে গিয়ে, যৌনরোগে আক্রান্ত না হয়। জাতি বাসবীদের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা করতে হত। বিডি বাসবীদের এককথায় পথে দাঁড়িয়ে খরিদ্দার সংগ্রহ করতে হত। বিডি শব্দের অর্থ পথ। এথেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দেবদাসী বাসবীদের মধ্য থেকে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের সম্ভোগেচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে শ্রেণবিভাগ করেছেন। আর এদের বয়স হয়ে গেলে বা রূপলাবণ্যে ঘাটতি পড়লে তখন তাদের বিডি বাসবী বা পথগণিকা হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকত না। এভাবেই যুগে যুগে মাতৃক্রোড় থেকে মন্দির, তার পরে মন্দির থেকে পতিতালয়ে অসংখ্য দেবদাসী সংগৃহীত হতে থাকে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের ফলেই এই সংগ্রহ-এর ব্যাপকতা, এর সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় আবেগ ও সংস্কার। একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়: "It may be remarked that the origin of untouchability may be on account of high freedom in sexual matters among the lower caste women who are despised by higher caste women. For their men are too poor and weak to satisfy their needs. There can be another way of looking at the phenomenon of Devdasi. A Devdasi attains immunity from the state of inauspiciousness of Widowhood. Therefore, her presence is liked by the Caste Hindus on marriage and festival. A daughter of a Harijan thus become acceptable to other Castes in various ways, including her acceptence as a keep or sexual partner who may beget children without any stigma attached on either side. This seems to be a kind of high Caste Hindu rationality which satisfy their sexual needs."

(A study into Exploitation of Harijan women)

দেবদাসী প্রথার উৎস প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ-কৃত আলোচনা উল্লেখযোগ্য: "সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দিরে দেবদাসী নিবেদন নানা কারণে সম্ভব। (১) মন্দিরে দেবতাকে কন্যাদান বিসর্জন বা বলির রকমফের মাত্র। আপন সম্প্রদায়ের জন্যে দেবতার আশীর্বাদ চাই। অতএব তার মনোজয়ের বাসনায় প্রিয়জনকে ত্যাগেও আপত্তি নেই। (২) দেবতার সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রকারান্তরে আদিম গোষ্ঠী বা সর্বজনীন বিবাহেরই স্মারক। দেবদাসী প্রথায় ওই আদি আচারকেই স্বীকার করে নেওয়া হয় মাত্র। (৩) অতিথিকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় তাকে যৌন-সুখ দান একটি আদিম আচার। দেব-পত্নীর সূত্রে সে আনন্দ দানে সমর্থ হলে অধিকতর কল্যাণ। (৪) দেবদাসী প্রথা আসলে উর্বরতার অনুষ্ঠান। পৃথিবীতে মানুষ, পশু, পাখি এবং ফসলের কামনাতেই এই ব্রত। (৫) কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব অন্যকে দিয়ে নষ্ট করার যে আচারের চল ছিল কোনো কোনো অঞ্চলে—দেবদাসী সেই সূত্রেই ক্রমে মন্দিরে বন্দী। (৬) দেবদাসী প্রথা লোভাতুর পুরোহিত সম্প্রদায় আর নৈতিকতাহীন মানুষের এক ষড়যন্ত্রের ফল মাত্র। (৭) দ্রাবিড়দের কাল হইতে ভারতে লিঙ্গ-পূজার যে প্রাচীন প্রথা দেবদাসী তারই আর একদিক।"

আদিতে যে মনোভাবই কাজ করে থাকুক না কেন পরবর্তীকালে যে এই প্রথা শোষণের নামান্তর মাত্র সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি এই প্রথা বিলোপ আন্দোলনে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর একান্ত প্রয়াসেই দীর্ঘকাল পরে এই প্রথা-নিরোধক বিল আইনে পরিণত হয়। ধর্মের নামে শুধু দেবদাসী প্রথা নয়—তান্ত্রিক ভৈরবী চক্র, কিশোরী ভজন, সেবাদাসী বিভিন্ন ছদ্ম নামের আভরণে অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারকে মূলধন করে বহু বিচিত্র ব্যবসা চলে আসছে।

রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির ও প্রাসাদকে কেন্দ্র করে এই দেবদাসী বা প্রমোদকন্যাদের সংখ্যা এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস রচনা করে। মার্কপোলো (১২৫০ খ্রীঃ), ফরিস্তা (১৩৫২ খ্রীঃ), নিকলোকণ্টি (১৪২০ খ্রীঃ), ডোমিঙ্গো পায়স (১৫২১ খ্রীঃ), ফারনো নুনিজ (১৫৩৫ খ্রীঃ), টাভার্নিয়ের (১৬৪১ খ্রীঃ)—এদের বিজয়নগর ভ্রমণের ইতিহাস থেকে জানা যায় শুধুমাত্র এই রাজ্যেই কয়েক লক্ষ দেবদাসীর অস্তিত্ব ছিল। একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদ যখন সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে ফিরে আসেন, তখন তার লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে ছিল পাঁচশত দেবদাসী। এমনকি ১৯২৮ সালের এক সমীক্ষায় মাদ্রাজ প্রদেশের দেবদাসীর সংখ্যা ছিল দু লক্ষ ষোল হাজার। কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের সংযোগস্থলে একটি বিশাল অঞ্চলকে 'দেবদাসী বলয়' বলা হয়। এইসব স্থানে আগে নিয়মিত দেবদাসী উৎসব অনুষ্ঠান হত। বছরের চারটি পূর্ণিমা তিথিতে ইয়েলাম্মা মন্দির, জমদগ্নি মন্দির, পরশুরাম মন্দির, কমলেশ্বরী মন্দির, ভাগ্যমুরুলী, শান্তাদুর্গা ও অন্যান্য বহু মন্দিরে প্রতি বছর অগণিত দেবদাসীদের ছাগশিশুর মতো উৎসর্গ করা হত। যার ফলে দেবদাসীদের বহু সম্প্রদায় কোয়েম্বাটুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে পড়ে। ভালাঙ্গাই, ইলাঙ্গাই, কমলাদাসী, তেবদিয়াল, কুদিক্কার, পেনুকল, নানছিনাল ভেল্লাল্লা, কুরাকুন্দি, চিরাপ্পুকুটি, যোগাম, সানি—আরও কত বিচিত্র সম্প্রদায়।

ভিন্ন নাম, ভিন্ন সম্প্রদায় হলেও রীতিনীতি, বঞ্চনা, অভিশপ্ত জীবনযাত্রা—সব মিলিয়ে মূলত এক। কিভাবে নির্মম বঞ্চনার মধ্য দিয়ে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, সে সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টঃ "The Devdasi system has a significant role in the history of prostitution of India. The system requires that a girl should be dedicated before she attains puberty. The growing girl is then repeatedly told that she could not marry and if even she broke the secred vow, her deity would punish and curse her family. In return for their services in the temple they received 'Inama' lands and cash allowances, which tempted the needy parents to dedicate their daughters to prosperous temples. The young women, thus forced into a life that offered no opportunity for the fulfilment of their natural urges and desires, could be easily induced to lead an immoral life by their exploiters."

এই প্রথাকে কিভাবে অপব্যবহার করা হত তা দেবদাসী-সংগ্রহের ধারা অনুযায়ী তাদের যে বিভাগ তা থেকে জানা যায়। সেভাবে এদের ছ'টি ভাগ। দত্তা, হৃতা,

বিক্রীতা, ভৃত্যা, ভক্তা, অলংকারা ও গোপিকা বা রুদ্রগণিকা। স্বেচ্ছায় যে মন্দিরের দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বা পিতামাতার দ্বারা সমর্পিত হয় তাকে দত্তা বলা হয়। যেসব মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে এসে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্দিরে নিবেদন করা হয় তাদের হৃতা বলে। মন্দির-কর্তৃপক্ষের কাছে অর্থের বিনিময়ে যাদের বিক্রয় করা হয় তাদের বিক্রীতা বলে। পরিবারের মঙ্গলের জন্য যেসব মেয়েরা স্বেচ্ছায় মন্দিরে আত্মনিবেদন করে তাদের ভৃত্যা বলা হয়। উচ্চ বংশের কোনো কন্যার বৈরাগ্যের উদয় হলে সে ভক্তিমার্গযাত্রিণী হবার জন্যে মন্দিরে আত্মনিবেদন করলে তাকে ভক্তা বলা হয়। নৃত্যগীতবাদ্য পারদর্শিনী কোনো নারীকে যখন বিভিন্ন অলংকারে ভূষিত করে মন্দিরে দান করা হয় তখন তাকে অলংকারা বলা হয়। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্যে পেশাগত যে দাসীরা অর্থের বিনিময়ে মন্দিরে আসে তাদের রুদ্র-গণিকা বলে। এই শ্রেণীবিভাগ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সংগ্রহের কোনও পদ্ধতিই গ্রহণ করতে বাধা ছিল না, তা যতই নীতিবিগর্হিত হোক না কেন—কারণ দেবতার নামে অসৎকর্মেও দোষ নেই। এই দাসীদের মধ্যে যারা মন্দিরে অনেকদিন পরিচর্যা করার সুযোগ পেতেন, তাদের তাড়াবার জন্যেও পুরোহিতরা এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিলেন—দাসীবিদায় অনুষ্ঠান। রূপ-যৌবন গত হলে, নাচবার ক্ষমতা শেষ হলে তখন তার নাম দেওয়া হয় তাইক্কিঝাবি। দেবতার তো তাইক্কিঝাবি চলবে না—তাঁর প্রতিভূদের চাই 'আত্মম-পাত্র' অর্থাৎ রূপলাবণ্যবতী নবীনা দাসী। তখন সেই স্থবিরা তাইক্কিঝাবি-র কর্ণাভরণ 'পম্পাদাম' খুলে নিয়ে দেওয়া হত নবীনা দাসীকে। নবীনার উরু এবং বুকে উল্কির চিহ্ন এঁকে দিয়ে তার অভিষেক হয়। আর স্থবিরা তাইক্কিঝাবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় ভিখারিণীর মতো পথে পথে ঘোরে। অবশ্য সদাশয় মন্দির কর্তৃপক্ষ বিদায় দেবার আগে তাকে একটি প্রশংসাপত্র ও কলি-যুগলক্ষ্মী উপাধি দিতে কৃপণতা করেন না।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের অগণিত কন্যা এই প্রথায় শিকার হয়েছেন। আজ এ প্রথার অবসান হয়েছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ-এর বক্তব্য: "আইনত ভারতের সর্বত্র দেবদাসী লুপ্ত। কিন্তু রূঢ় সত্য এই,—নানাভাবে এখনও বেঁচে আছে তারা। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বোম্বাই মাদ্রাজের "লাল আলোর" অন্ধকারে নিমজ্জিত যে রূপজীবিনীর রাজ্য সেখানকার অনেক অপ্সরাই দেবদাসী-কুলোদ্ভবা। অন্তত বোম্বাইয়ের সন্ধানী গবেষকদের বক্তব্য তাই।" কর্ণাটক, গোয়া, মাদ্রাজ-এর নারী-মুক্তি আন্দোলনের পুস্তিকা থেকে জানা যায়, এখনও অনেক জায়গায় অন্য নামে অশিক্ষা সংস্কার ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করে এই প্রথার মূল উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা চলছে। কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের আবরণে, কোথাও অন্য ছদ্মবেশে। যেহেতু আইনত দেবদাসী বা তথাকথিত দেবীপল্লী শহরে তৈরি করা সম্ভব নয়, সেজন্যে এখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুদূর মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এই নারীপণ্যের বাণিজ্যাভিসার।

দেবদাসী প্রথা আমাদের লজ্জা, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে দেবদাসীদের অবদানও অনেক। সে প্রসঙ্গও সেজন্যে আলোচনা করা দরকার। শিলপ্পাদিকরণ গ্রন্থে আমরা নট্টুয়াঙ্গম ও দেবদাসীদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাই। নট, আভই ও আঙ্গম—এই তিনটি শব্দের

সমন্বয়ে গঠিত নাট্টুবাঙ্গম শব্দের অর্থ নৃত্যসম্প্রদায়ের নেতা। সাধারণ নৃত্যশিক্ষককে নট্টুবান বলা হয়। এরাই চুক্তিবন্ধ ভাবে মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত্যশিক্ষা দিতেন। এরা কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না, বিনিময়ে ঐ দেবদাসীদের আজীবন তাদের উপার্জনের অর্ধাংশ গুরু বা তার পরিবারকে দিতে হত। এই অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতার ফলে স্বভাবতই একটি নিয়মিত, সুশৃঙ্খল নৃত্যপদ্ধতি গড়ে ওঠে এবং ক্রমশ তার উন্নতি ও প্রসার ঘটে। উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাদ, কর্ণাটক, গোয়া, মহারাষ্ট্র—এই সমগ্র অঞ্চলেই নৃত্যের যে প্রসার তাতে দেবদাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে দেবদাসীদের মধ্যে যারা রাজদাসী পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, তাদের নৈপুণ্য ছিল সর্বাধিক। শিলপ্পদিকরম্-এর মাধবী, মৃচ্ছকটিক-এর বসন্তসেনা, মালবিকাগ্নিমিত্র-এর মালবিকা—এরা শুধুমাত্র কবিকল্পনা নয়। সেযুগে নৃত্যকলার এরকম উৎকর্ষ ঘটেছিল বলেই কবিরা শাস্ত্র এবং শিল্পসম্মত বর্ণনা দিতে পেরেছেন।

কাজেই একথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করতে হবে যে, দেবদাসীরা আজীবন বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে যে নিদর্শন রেখে গেছেন, তা আজও গিরিগাত্র ও মন্দির স্থাপত্যে উৎকীর্ণ হয়ে সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। নীলকণ্ঠের মতো হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তারা আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এই অমৃতপাত্র।

ব্যালে

প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ব্যালে শিল্পে চারুকলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ও কাব্য—এই ষড়ঙ্গই আধারীকৃত। শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো ব্যালে শিল্পেও বিভিন্ন যুগের শিল্পতাত্ত্বিকদের মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। ইউরোপে বিভিন্ন নন্দনতাত্ত্বিকরা যে বিভিন্ন শিল্পবাদের উপস্থাপনা করেছেন তার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়েছে চিত্রশিল্পে, এবং তার পরই নাটক, ব্যালে ও সাহিত্যে।

ব্যালে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে শৈল্পিক সৌন্দর্য তা প্রধানত তিন প্রকার। (১) গঠনের সৌন্দর্য, (২) ভাবের সৌন্দর্য, (৩) প্রকাশের সৌন্দর্য। এই তিনটির ঐক্যের উপরেই ব্যালে-শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে। এই শিল্পকলার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, যখন এই শিল্প নিছক প্রদর্শন বিলাসে পরিণত হয়েছে তখনই এর অবনতি ঘটেছে। ল্যা কামারগো বা ত্যাগলিয়ানী নিঃসন্দেহে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়-এর তৃষ্ণা মেটানোই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। একথা মনে রাখতে হবে যে জনজীবনে শিল্পের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। খাদ্যের মতোই মানবজীবনে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন অথবা রসনাতৃপ্তিকর হলে সে হয়ে ওঠে বিলাসীর ব্যাসন। কারণ শিল্প মানস-উন্নয়নের সহায়ক। মানসজ ও ইন্দ্রিয়জ ক্রিয়ার সুষম সমন্বয়ের উপরেই ভিত্তি করে শিল্পপ্রতিমা নির্মিত হয়।

ব্যালে-শিল্পের পর্যালোচনা করতে হলে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্যায়ে একে বিচার করতে হবে। (১) আঙ্গিকগত ভাবে, (২) সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, (৩) শিল্পতাত্ত্বিক বিচারে। যদিও ব্যালে উন্নত সমাজের সৃষ্টি, আধুনিক কালের প্রবর্তন, তা হলেও এর শিকড় আদিম সমাজেই প্রোথিত। ব্যালেকে বলা হয় নৃত্য, মূকাভিনয় ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে গঠিত কাহিনী-আত্মক প্রযোজনা। নৃত্যনাট্য ও ব্যালের মধ্যে অবশ্যই মৌল পার্থক্য আছে। একথা অবশ্য ঠিক যে গীতিনাট্য বা অপেরার পথ ধরেই এই দুই প্রজাতির আবির্ভাব। এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের বক্তব্য :

'এই গীতিনাট্যেরই সমগোত্রীয়—আমাদের নৃত্যনাট্য প্রজাতিটি (Dance Drama)। নৃত্য-গীত-বাদ্যসর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও একে আমরা অভিজাত নাট্যের পঙ্‌ক্তিতেই স্থান দিয়ে থাকি, অপেরা বা যাত্রার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করি না। নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য এই—এ গীতিময় বা গীতিভাষী বটে, কিন্তু এর গীতিগুলোর সুর-লয় নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে একলয়ে বাঁধা। এই জাতীয় নাট্যে কথা ও সুরকে তথা ভাবকে সমগ্র সত্তা দিয়ে—আঙ্গিক ও মানসিক গীতিভঙ্গিমার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যদিয়ে জীবন্ত করে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই জাতিটির লক্ষণ সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, লিখেছেন—"এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে।" সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এ হল সবাক নৃত্যের নাট্য। এই নাট্যে ভাষা, সুর ও নৃত্য তিনটিই

মাধ্যম, এই তিনের সমবায়েই নৃত্যনাট্যের অন্য এক প্রকারও সম্ভব। এই প্রসঙ্গেই যাকে সাহিত্য বলা চলে না অথচ নাট্য বলা হয় সেই নৃত্তনাট্য প্রজাতিটি সম্বন্ধে আলোচনা করা সমীচীন।

নৃত্য ও নৃত্ত এই শব্দটি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত, আমরাও নৃত্ত কথাটিকে একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে নৃত্তনাট্য প্রজাতিটির বৈশিষ্ট্য বিচার করতে চেষ্টা করতে পারি। এই নৃত্তনাট্যের বিলক্ষণ লক্ষণ নির্বাক নৃত্য। নৃত্যনাট্যে যেখানে কণ্ঠসঙ্গীত ও নৃত্য মাধ্যম নৃত্তনাট্যে সেখানে যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য মাধ্যম। এই জাতীয় নৃত্তনাট্যকেই প্রতীচ্যে ব্যালে (Ballet) বলা হয়ে থাকে। ব্যালে সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—drama without words ; the art of narrative through dancing, Pantomime and music। নৃত্যের ভাষায় বা আঙ্গিক ইঙ্গিতে কাহিনী রচনা। রোমের প্যান্টোমাইমে বা মূকাভিনয়ে এর প্রথম নিদর্শন। পরে ইতালীয় অপেরাতে সসঙ্গীতে এর পুনরাবির্ভাব ঘটে। ক্যাথারিন-ডি-মেডিচি একে ফরাসীদেশে চালু করেন। প্রথম প্রথম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই এতে অংশগ্রহণ করতেন। পরে চতুর্দশ লুই স্থূলকায় হয়ে পড়ায় জাঁ ব্যাপটিস্টে লালি (১৬৩৯–৮৭) নর্তকীর প্রবর্তন করেন। ক্রমে খণ্ডভাবাত্মক নাচের জায়গায় কাহিনীকে নাচের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং এই নৃত্যনাট্য ব্যালেরও মোটামুটি দুটি রূপ দেখা যায়। একরূপে খণ্ডভাবের অভিব্যক্তি, অন্যরূপে কাহিনীর অভিব্যক্তি। এর উপাদান—নৃত্য, মূকাভিনয় ও সঙ্গীত।" (নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, পৃ. ৪৫৪)। ভাষার ভূমিকা এখানে গৌণ। এ প্রসঙ্গে Arnold L Haskel এজন্যেই বলেছেন, "Ballet is an expressive art without language barriers."

আগেই বলা হয়েছে উন্নত সমাজের সৃষ্টি হলেও ব্যালে-শিল্পের শিকড় আদিম গোষ্ঠীজীবনের গভীরেই প্রোথিত ছিল। প্যান্টোমাইম যা ব্যালের অন্যতম অংগ সেটি তো আসলে গোষ্ঠীজীবনের লোক-অনুষ্ঠান। রোমের প্যান্টোমাইমে ব্যালের সূচনার আভাস, পরে ইতালীয় অপেরাতে সংগীত সহযোগে পুনরাবির্ভাব। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতিই সংস্কৃত হয়ে ব্যালেশিল্পে পরিণত হয়। সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি যে আদিম যুগেই গাথা, সংগীত ও নৃত্য একাত্ম ছিল। এজন্যেই বলা হয় যে "Dancing as a spontaneous emotional reaction was practised in the most premitive communities of mankind." বুশম্যান ও এস্কিমোদের মধ্যেও এই গাথার প্রচলন ছিল, একথা নৃতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করেছেন। সেই সময়ে আহরণ যুগে বা শিকার যুগে শ্রমগীতির উৎপত্তি। আদিম সমাজের গাথাগুলি একাধারে নৃত্য, সুর, ছন্দ ও ভাষার সমবায়। নৃত্য সংগীত ও কাব্য আদিম অবস্থায় অবিভক্ত—কারণ মানবদেহের ছন্দোবন্ধ ভঙ্গিমা যা গোষ্ঠীজীবনের শ্রমে নিযুক্ত তা এর প্রেরণা। নৃত্য থেকে গান ও কাহিনী পৃথক হয় উন্নত সমাজ ব্যবস্থায়। গোষ্ঠী উৎসবে এই সব গাথাগুলি অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তীকালে কৃষিযুগেও নৃত্য গীত ও বাদ্য অবিভক্ত অবস্থাতেই ছিল। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে ও গোষ্ঠী-উৎসবে যেসব গাথাগুলি অভিনীত হত সেগুলি অনুকরণাত্মক রূপেই উপস্থাপন করা হত। 'ডায়োনিসাস' কাহিনীটি বিচার করলে দেখা যায় যে এই উৎসবেও নৃত্য, বাদ্য, স্তব ও স্তুতি প্রভৃতি ধর্মমূলক নাট্যের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের মহেন্দ্রবিজয় উৎসব অনুষ্ঠানেও অনুরূপ প্রমাণ

পাওয়া যায়। বৈদিক যুগেও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানরূপে যা আচরিত হত তাও ধর্মমূলক নাট্যেরই অংগ। উপরোক্ত উদাহরণগুলি এই কথাই প্রমাণ করে যে প্রাচীনকাল থেকেই গাথা, সংগীত ও নৃত্য অবিভক্ত রূপেই প্রচলিত ছিল। প্যান্টোমাইম যে শুধুমাত্র গ্রীস ও রোমে সমাদৃত ছিল তা নয়, রামায়ণ, মহাভারতেও এই জাতীয় অভিনয়ের কথা পাওয়া যায়। অপেরাও নিঃসন্দেহে লোকসংস্কৃতি হতে উদ্ভূত। বিশেষ করে ব্যালাড অপেরায় গানের সংগে নৃত্যের সহচারিতা ছিল। সুতরাং অপেরা, প্যান্টোমাইম এই দুটি উৎস থেকে ব্যালের উৎপত্তি এ কথাই প্রমাণ করে যে ব্যালেশিল্পে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অসামান্য। কাহিনীর উৎসের ভিত্তিতে বিচার করলেও দেখা যায় সাধারণত পৌরাণিক, রূপকথা বিষয়ক, কাল্পনিক বা ফ্যান্টাসি বিষয়ক ও লোকগাথা বিষয়ক এই চারভাবেই ব্যালের গল্পাংশ গঠিত। অবশ্য পরে আধুনিক বিষয়বস্তু মডার্ন ব্যালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কাহিনী উৎসও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ব্যালের নিবিড় সম্পর্কের কথা প্রমাণ করে।

ক্ল্যাসিকাল ও রোমান্টিক ব্যালেতে যে কাহিনী হত তা হয় গ্রীক পুরাণের কাহিনী অথবা পুরাতন গাথা বা রূপকথা। ব্যালের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীতে রাণীর ভগ্নির বিবাহ উপলক্ষে যে রূপকধর্মী ব্যালে প্রযোজিত হয় তা প্রাচীনকালের গোষ্ঠীজীবনের "রিচুয়াল"-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যালেতে সমবেত নৃত্যের সময় Drill-এর মতো যূথবন্ধ যে নৃত্যভঙ্গিমা তা লোকনৃত্যের শিকার বা যুদ্ধনৃত্যের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। রাশিয়ায় ভূমিদাসদের দিয়েই প্রথম শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। যেজন্যে ঐ প্রযোজনাতে লোকশিল্পের স্বচ্ছন্দ সারল্য ও বলিষ্ঠ উৎপ্লাবন এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইতালীয় ব্যালেতে জিপসীনৃত্যের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এই সকল তথ্য নিঃসন্দেহে ব্যালের ক্ষেত্রে লোকনৃত্যের বিশেষ ভূমিকাকে প্রমাণ করে।

ক্যাথারিন-ডি-মেডিচি ইতালী থেকে ফরাসী দেশে এসে ব্যালের যে প্রয়াস শুরু করলেন, ব্যালেশিল্পের ইতিহাসে একে এক দিকদর্শী সূচনা বলে গণ্য করা হয়। পৌরাণিক আখ্যানকে অবলম্বন করে নৃত্য, সঙ্গীত ও আবৃত্তি সহযোগে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম নাট্যধর্মী ব্যালে 'Le Ballet comique De La Revne' প্রযোজিত হয় ১৫৮১ খৃস্টাব্দে। এটি রচনা করেন ইতালীয় বেহালা বাদক বালদাসারিনো। ইনি পরে ফরাসী দেশে বালতাজার নামে বিখ্যাত হন। বালতাজার রাণীর ভগ্নীর বিবাহ অনুষ্ঠানে আর একটি ব্যালে রচনা করেন। এটি রূপক নাট্য। এতে রাজবংশীয় ও অভিজাতেরা অংশ গ্রহণ করেন। নৃত্যপারদর্শী শিল্পীর অভাবে নৃত্যছক পরিকল্পনায় ছন্দের গতি ও লয় সীমিত থাকে। সেজন্যে বালতাজার Pattern রচনার দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেন। এই অনুষ্ঠানের প্রয়োগ থেকেই ব্যালে শিল্পের নূতন সম্ভাবনাময় শিল্প আঙ্গিকের জন্ম হয়।

রাজা চতুর্দশ লুই নিজে একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী ও ব্যালে-শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। এঁর সাথে সহযোগিতা করতেন সেনানায়ক দ-বসম্পিয়ের, ইনিও একজন কুশলী নৃত্যশিল্পী ছিলেন। পরে রাজা চতুর্দশ লুই স্থূলকায় হয়ে পড়ায় জাঁ ব্যাপটিস্টে লালী নর্তকীর প্রবর্তন করেন। এই সময় থেকেই পেশাদারী শিল্পীর

প্রবর্তন। রাজা চতুর্দশ লুই ১৬৬১ খৃস্টাব্দে শিল্পচর্চার জন্যে জাতীয় আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেন। এই আকাদেমীর প্রতিষ্ঠা ব্যালে-শিল্পের অগ্রগতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রখ্যাত নাট্যকার মলিয়েরর এখানে প্রযোজিত ব্যালের কাহিনী রচনা ও প্রযোজনায় সহায়তা করেছেন। এর ফলে মলিয়েরর রচিত বহু কমেডিতে নৃত্যের দৃশ্য এবং ব্যালেতে কমেডি অংশ প্রবর্তিত হয়।

ল্যা কামারগো (১৭২১) সম্ভবত ব্যালে-শিল্পের প্রথম ব্যালেরিনা যাঁকে কেন্দ্র করে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তিনিই প্রথম Entrechat-এর প্রবর্তন করেন। ল্যা কামারগো নৃত্যের জন্যে যে স্কার্ট প্রচলিত ছিল তার ঝুল কয়েক ইঞ্চি ছোট করায় বিশেষ আন্দোলন হয়। তাঁরই সমসাময়িক স্যালী 'পিগম্যালিয়ন' ব্যালেতে গ্রীক পোষাক ব্যবহার করেন। ব্যালেশিল্পের ক্ষেত্রে ভারি পোযাক ব্যবহার করার পক্ষে এবং নৃত্যছকে স্বচ্ছন্দ পৌরুষ প্রকাশের বিপক্ষে দীর্ঘকাল ধরে জেহাদ চলে। ফরাসী বিপ্লবের পরে ফরাসী অপেরার পোষাক পরিকল্পক মালিয়ট 'Tights' এর প্রবর্তন করেন। রক্ষণশীলরা এতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং পোপের দরবারে নালিশ জানান। মহামান্য পোপ অবশ্য পরে নাট্যশালায় Tights ব্যবহার অনুমোদন করেন। কিন্তু এই নির্দেশ থাকে যে এগুলি নীল রঙের হতে হবে ; কোনোক্রমেই যেন স্বাভাবিক গাত্রবর্ণের না হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যালের পাঁচটি মূল ভঙ্গি প্রবর্তিত হয়। ইতালীতে এই সময় দুই পায়ের প্রসারিত ভঙ্গি অনুমোদিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সের নৃত্যকলায় শুধুমাত্র লঘুছন্দ, মন্দগতি, স্থিরসৌন্দর্য প্রদায়িনী সুষম দেহভঙ্গিমা প্রচলিত ছিল। এই সময় থেকে ইতালীয় রীতির গতিবেগ, নাট্যধর্মী আবেগ, চিত্রকল্প যুক্ত হয়ে প্রকৃত শিল্প রচনার পটভূমিকা সৃজিত হল। এই পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সব শিল্পের মতো ব্যালে শিল্পেও সেই সময় আঙ্গিকসর্বস্ব শিল্প ও সামগ্রিক শিল্পরূপের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ল্যা কামারগো প্রবর্তিত ধারাটি মূলত আঙ্গিকসর্বস্ব হওয়ায় নৃত্যকল্পনায় কাহিনীর রূপায়ণ ও শিল্পায়ণ অপেক্ষা নিছক সৌন্দর্য প্রসবিনী দৃষ্টিনন্দন নৃত্যই প্রধান হয়। তৎকালীন অনেক সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই ব্যালেগুলি ভাবাভিনয় প্রকাশে এতই দুর্বল যে পুতুল বা যন্ত্র সহজেই নৃত্যশিল্পীর স্থান গ্রহণ করতে পারে। শিল্পায়ণের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় এই ব্যালেগুলিতে form ও content এর একাত্মীকরণ ঘটে না।

আঙ্গিকসর্বস্বতা থেকে সামগ্রিক শিল্পগুণান্বিত হওয়ার দীর্ঘকালীন অভিযাত্রায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ব্যালে-শিল্পের ইতিহাসে বহু প্রতিভাধর আচার্যের অবদান স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম J. G. Noverre–যাঁর প্রভাব সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অনুভূত। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর পরিকল্পক ১৭২৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত লুই দুপ্রের শিষ্য কোরিওগ্রাফার রূপ Fe tes chinoises প্রযোজনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ফ্রান্সিস বুচার এই ব্যালের অলংকরণের কাজ করেন। তৎকালীন যুগের মহান অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক Noverre-কে নৃত্যলোকের শেক্সপিয়র রূপে অভিনন্দিত করেন। তিনিই প্রথম ব্যালে নৃত্যধারা প্রসঙ্গে মূল্যবান নির্দেশাবলী রচনা করেন। তাঁর নির্দেশাবলীর মধ্যে ব্যালে-শিল্পের চরিত্রগত পরিবর্তন প্রয়াসের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতেঃ ১) চিত্রকলার মতো নৃত্যকলাকেও

প্রকৃতি থেকে রূপ ও রস আহরণ করতে হবে। ২) কোরিওগ্রাফারকে চিত্রকরের মতো রূপকল্পনা ও প্রকাশনের জ্যামিতিক রীতিগুলি মেনে চলতে হবে। ৩) প্রকৃত ব্যালে নাট্য, চরিত্র ও সমাজজীবনের সার্থক চিত্ররূপ। অভিনেতব্য অংশগুলিকে যথাযথ রূপায়ণে উজ্জ্বল করতে হবে। Form ও Content এর সমন্বয়ে সৃষ্টি কর্মে বিষয়ের প্রকাশের সঙ্গে সুন্দরের প্রকাশকে যুগলবন্দী করতে হবে। ৪) ব্যালেতে নৃত্যের আঙ্গিকই সর্বপ্রধান নয়। নৃত্যের ভূমিকা হবে নাট্যধর্মী ভাবনাটির প্রকাশের বাহনরূপে।

ব্যালের ক্ষেত্রে Noverre-র অসামান্য অবদানের জন্যে মনীষী ভল্‌টেয়ার তাঁকে "প্রমিথিউস" বলে সম্মানিত করেন। চার্লস ইউজেন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি স্টুগার্টে ব্যালে শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিভিন্ন প্রযোজনায় গার্ডেল, দুবারভেল, হেনেল, ভেস্ত্রি প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। হেনেল প্রথম Pirouette প্রবর্তন করে ব্যালেতে এর প্রয়োগ করেন। গার্ডেল ও ভেস্ত্রি এই পিরিয়টকে আরও উন্নত ফর্মে নিয়ে আসেন।

La Guimard ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যালেরিণা। ইনি Noverre-র সার্থক রূপায়ণী শিল্পী। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কিছুকালের জন্যে ব্যালে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং ইতালীতে আবার এই শিল্পের প্রসার দেখা যায়। এই সময়ে স্যালভাতোর ভিগানে ও কারলো ব্লাসিস এই দুই জন মনীষীর অবদান স্মরণীয়।

স্যালভাতোর ভিগানে (১৭৬৯-১৮২১) ছিলেন দুবারভেল-এর শিষ্য ও Noverre-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত। ইনি তাঁর প্রযোজিত ব্যালের সঙ্গীত নিজেই রচনা করতেন এবং তাঁর শিল্পকৃতি মনীষী স্তাঁদাল কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। তৎকালীন ফ্রান্সের অশান্তি-পূর্ণ অবস্থার জন্যে এবং ভিগানের প্রযোজনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে প্রখ্যাত ফরাসী শিল্পীরা অনেকেই সে সময় ইতালীর মিলানে চলে আসেন।

কারলো ব্লাসিসকে (১৮০৩) ব্যালে শিল্পের অগ্রগতির ইতিহাসে Noverre-এর পরেই সর্বাপেক্ষা উল্লেযোগ্য ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁকে ক্ল্যাসিক ব্যালে আঙ্গিকের জনক বলা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে তাঁর প্রবর্তিত আঙ্গিকের মৌল পদ্ধতিগুলি বর্তমানেও অনুসৃত হয়। Noverre-এর শিল্পতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি সমর্থন করেছেন। কিন্তু আঙ্গিকগত নির্দেশাবলীর অনেকগুলিকে যুগোপযোগী নয় বলে বাতিল করেছেন। স্থাপত্য ও শারীর বিদ্যার একজন কুশলী ছাত্র হিসেবে তিনি ব্যালে আঙ্গিকের শরীর সংস্থান ও জ্যামিতিক বিন্যাসের যথার্থ রূপ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। Attitude ইনিই সৃষ্টি করেন। নৃত্যশিল্পীর পক্ষে স্থাপত্য ও চিত্রকলার জ্ঞান যে বিশেষ আবশ্যক একথা Noverre ও Blasis উভয়েই জোর দিয়ে বলেছেন। ব্লাসিস ছিলেন প্রকৃত অর্থে এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে সু-সাহিত্যিক, শারীর বিদ্যায় সুপণ্ডিত, শিল্পকলার সকল শাখা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও কুশলী রাজনীতিবিদ। ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এ কথাই প্রমাণ করে যে নৃত্য-পরিকল্পক বা নৃত্যশিল্পীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নৃত্যশিক্ষাই একমাত্র বস্তু নয়। শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগেও তাঁকে অভিজ্ঞ হতে হবে। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মিলানে নৃত্য আকাদেমী স্থাপন করেন। এবং শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে প্রকৃত

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত নির্দেশাবলী প্রণয়ন করেন : ১) পূর্বের মতো শিশু অবস্থা থেকেই ছেলে মেয়েদের ব্যালে ক্লাসে ভর্তি করা চলবে না। কারণ এর ফলে তাদের শারীরিক গঠন ও মানসিক উন্নতি ব্যাহত হবে। ২) আট বছরের আগে ও বারো বছরের পরে কোনও মেয়ে ব্যালে ক্লাশে ভর্তি হতে পারবে না। ছেলেদের ক্ষেত্রে চোদ্দ বছরের পরে কোনও ছেলে ভর্তি হতে পারবে না। ৩) তিনিই ব্যালেতে Barra-র উপর বিভিন্ন ভঙ্গিমার অনুশীলন প্রবর্তন করেন। ৪) শিশুদের ক্ষেত্রে তিনি লঘু ধরনের Music-এর উপর ছড়া বা রূপকথা ভিত্তিক গাথা সমন্বিত নাচের মাধ্যমে অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে শিশুদের বার বার একই শরীর সংস্থানের অভ্যাস করালে তাদের মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয় এবং তার ফলে এই শিল্পের প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে বিতৃষ্ণারই উদ্রেক করে।

১৮৩০ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভেই ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রোম্যান্টিক ব্যালে প্রবক্তাদের আবির্ভাব ঘটে। বাস্তববাদকে 'নির্বাসিত করো', 'শিল্প মুগ্ধ সৌন্দর্যের অবসর সৃষ্টি করুক'—রোম্যান্টিকদের এই আন্দোলন শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো ব্যালে শিল্পকেও প্রভাবিত করে। ভিক্টর হুগোর নাটক, দেলাক্রা-র চিত্রাবলী, হেইন ও ওয়াল্টার স্কট-এর রচনাবলী সেই সময় এই রোম্যান্টিকবাদ প্রচারের সহায়ক হয়। রোম্যান্টিকবাদ ব্যালে শিল্পের আঙিনাতে বিশেষ পরিবর্তন আনে নি। এই পর্যায়ে শুধু মাত্র : "Les Pointes" অর্থাৎ স্বপ্নময় পরিবেশে নিজের দেহকে হাল্কা করে পায়ের পাতার উপর উড়ন্ত ভঙ্গিতে নেওয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। শিল্পতাত্ত্বিক বিচারে এই রোম্যান্টিক-বাদ ব্যালে শিল্পে কৃত্রিমতা ও বন্ধ্যাত্ব আনায়ন করে। কবি গতিয়ের-এর প্রভাবে ফিলিপ্পি ত্যাগলীয়নি ব্যালে শিল্পের রোম্যান্টিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। Noverre নির্দেশিত 'প্রকৃতি হতে আহরিত ভাব ভাবনার রূপায়ণ'—রোম্যান্টিকবাদীরা অস্বীকার করেন এবং কৃত্রিম সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন।

রোম্যান্টিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী প্রখ্যাত শিল্পী মেরী ত্যাগলীয়নি প্রযোজিত La Sylphide—এই রোম্যান্টিক যুগের অন্যতম নিদর্শন। মেরী ত্যাগলীয়নি প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রোম্যান্টিকবাদী হলেও ব্যক্তিগত শিল্পচর্চায় তিনি ক্ল্যাসিক ধর্মী ছিলেন।

রোম্যান্টিকবাদের প্রভাবে ব্যালের জনপ্রিয়তা ও শিল্পায়নের আদর্শ নিম্নগামী হল। ব্যালে সেই সময় ধনীদের অবসর বিনোদনের ও প্রদর্শনবিলাসে পরিণত হল। পুরুষ শিল্পীরা ব্যালে থেকে প্রায় নির্বাসিত হলেন। সুন্দরী স্ত্রীলোকদের যৌন আবেদনময় লাস্য ভঙ্গিই ব্যালের প্রধান অবলম্বন হল। তখন তাদের পেশা দাঁড়াল— (১) অভিজাত মহলের মনোরঞ্জন করা, (২) তৎকালীন রোম্যান্টিক আন্দোলনের প্রবক্তা চিত্রশিল্পীদের স্টুডিওতে মডেলের কাজ করা। এর ফলে চতুর্দশ লুই পৃষ্ঠপোষিত, মলেয়ার, ভলটেয়ার, স্তাঁদাল প্রভৃতি মনীষীদের দ্বারা অভিনন্দিত, Noverre, Carlo Blasis প্রভৃতি আচার্যের অবদানে সমৃদ্ধ ব্যালে শিল্প জাতীয় আকাদমীর প্রতিষ্ঠার ২০০ বছর পরে নিছক মনোরঞ্জনের বস্তুতে পরিণত হল।

ইংল্যান্ডেও এই একই ব্যাপার ঘটল। গতিয়ের ফরাসী শিল্পীদের নিয়ে ইংল্যান্ডে গেলেন ও বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত হলেন। শিল্পের অন্যান্য শাখায় রোম্যান্টিসিজম,

রিয়ালিজমের দ্বারা অপসৃত হয়, আবার ইম্প্রেসনিজম রিয়ালিজম-এর স্থানে আসে, কিন্তু ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে তখন এই পরিবর্তন এল না। ব্যালে শিল্পকে এই দুর্ভাগ্যজনক পতন থেকে রক্ষা করলেন রাশিয়ান শিল্পীরা। ১৯০৯ সালে প্যারিস, ১৯১১ সালে লণ্ডনে তাঁদের অনুষ্ঠান ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যালে শিল্পীদের শুভ বুদ্ধি উদ্বোধিত করল।

রাশিয়ায় যখন ব্যালে শিল্পের প্রবর্তন হয় তখন সেই দেশ জারের শাসনাধীন। রাজা পিটার দি গ্রেট (১৬৭২–১৭২৫) শিল্প সংস্কৃতির প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই রাশিয়ায় চিত্রকলা, স্থাপত্য ও নৃত্যের প্রচলিত রীতিনীতিতে পশ্চিমের প্রভাব ও উন্নত পর্যায়ের অনুশীলন সূচিত হয়।

সম্রাজ্ঞী এ্যান (১৬৯৩–১৭৪০) নৃত্যচর্চার জন্যে আকাদেমী স্থাপন করেন। ক্যাথারিন দি গ্রেট (১৭৬৪–৯৬)-এর সময়ে ব্যালে শিল্পের দিক পরিবর্তন সূচিত হয়। সেই সময় ফরাসী শিল্পী লেপিক ও বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী এ্যানজিয়োলিনি ব্যালে শিক্ষক-রূপে রাশিয়ায় আসেন। রাশিয়ায় তখন ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ভূম্যধিকারী-গণের অধীনে বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল। এরা আপন বিলাস ব্যাসন চরিতার্থ করার জন্যে ব্যালে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এলেন। স্বাভাবিক কারণেই রাজ দরবারের আনুকূল্যও তাঁরা পেলেন। ভূমিদাসদের মধ্য থেকে শিল্পী নির্বাচন করে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ব্যালে শিল্প যখন অন্য দেশে অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তখন জারশাসিত রাশিয়াতেও তা জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। সেজন্যে শিল্পের ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ যখন অন্যান্য দেশের ব্যালে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত করছে তখনও রাশিয়ার ব্যালে শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত। কারণ রাশিয়ার শিল্পীরা কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। রিয়ালিজম তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। সেজন্যে রোম্যান্টিকবাদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে তারা সহজেই আত্মরক্ষা করতে পেরেছে।

ক্যাথারিন দি গ্রেটের সময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত রাশিয়ান ব্যালের অগ্রগতির অভিযাত্রায় বহু দেশী-বিদেশী শিল্পী ও আচার্যদের অবদান স্মরণীয়। ফরাসী দেশীয় মরিস পেতিপা, ডেনিস শিল্পী গুস্তব জোহান সেল এবং ইতালীর এনরিকো সিসেটির প্রভাব ও অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে কোরিওগ্রাফি একটি বিশেষ অঙ্গ। নৃত্যছক রচনা ও কোরিও-গ্রাফি এক কাজ নয়। একটি আঙ্গিক প্রকরণ, অপরটি শিল্পমূর্তি নির্মাণ। নৃত্যছক যেখানে ব্যালের বস্তুরূপ-এর অনুকৃতি রচনা করে, কোরিওগ্রাফি সেখানে ভাবরূপের রেখাবলী সৃষ্টি করে। রুচি যেমন রূপে দীপ্তি আনে, কোরিওগ্রাফি তেমনই ব্যালেতে লাবণ্য যোজনা করে। নৃত্যছক যেখানে দেহ ভঙ্গিমায় স্থাপত্যের ও চিত্রকলার কারুকৃতি সৃষ্টি করে, কোরিওগ্রাফি সেই চারুকর্মে চিত্রকল্প, রসরঞ্জনা সৃষ্টি করে। কোরিওগ্রাফি মূলত প্রয়োগ নির্ভর। সাহিত্যে যেমন একটি শব্দ প্রয়োগের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠে, চিত্রকলায় যেমন একটি রঙ ব্যবহার বৈচিত্র্যে বিভিন্ন রঙের মায়াজাল আভাসিত করে, কবি যেমন ভাবে কবিতার শব্দ শরীরে ধ্বনির নূপুর বাজিয়ে বাক্ প্রতিমা নির্মাণ করে, ব্যালে শিল্পে তেমনই কোরিওগ্রাফার রচনা কুশলতায় মঞ্চের

ফ্রেমের বস্তুরূপটিকে অরূপে উত্তীর্ণ করে। অর্থাৎ বিশেষ বা Particular কে সামান্য বা Universal-এ পরিণত করে। চারুকলার ষড়ঙ্গের একাত্মীকরণে কোরিওগ্রাফি মানস চৈতন্যে সহৃদয় হয়ে ওঠে। কোরিওগ্রাফার যেন এক চিত্রকর, নৃত্যশিল্পীরা তার বিভিন্ন রঙের পাত্র, আর মঞ্চ যেন তার ক্যানভাস।

কোরিওগ্রাফার-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে Art of the Opera এবং Art of the Drama—এই দুটি গুণই একান্ত প্রয়োজনীয়। ফোকিন তার বিখ্যাত নির্দেশাবলীতে নৃত্য ছাড়াও কোরিওগ্রাফার-এর চিত্রকলা, সঙ্গীত ও শারীরবিদ্যায় সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেছিলেন। কোরিওগ্রাফির অর্থ নিছক নৃত্য রচনা নয়, এর অর্থ সেই সার্থক শিল্পকলা যা প্রয়োগ-কৌশলে ত্রয়ী ঐক্য সম্পাদনে মূল ভাবনাটিকে আধারীকৃত করে একটি সজীব ও সামগ্রিক শিল্প রচনা করে। কোরিওগ্রাফারকে সামগ্রিক পরিকল্পনায় কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করতে হয়। কাহিনী আত্মক সংঘাত-তানিত যে ভাবনাটিকে তার সমস্ত আবেগ ও প্রক্ষোভ সহ দর্শকের উপলব্ধির মধ্যে সঞ্চারিত করে তুলতে হবে, কোরিওগ্রাফার-এর দায়িত্ব সেই নাট্যভাবনাকে প্রাণবন্ত, অখণ্ড, যূথবন্ধ প্রয়াসে শিল্পায়িত করা।

এই কাজে নৃত্যশিল্পীর দায়িত্ব নাট্য ভাবনাটিকে সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে শরীরী করে তোলা, সঙ্গীত রচয়িতার দায়িত্ব সেই সুরসুষমা সৃষ্টি করা যার ফলশ্রুতি নাট্য ভাবনার অনির্বচনীয় রূপটিকে দর্শক চিত্তে আস্বাদ্য করে তুলবে। দৃশ্যসজ্জার কারুকৃতি, পোশাক-পরিকল্পনা, আলোক-সম্পাত সমগ্র পরিকল্পনার অন্বয় সাধনে সহায়ক হবে। এজন্যেই ব্যালের ইতিহাসে আমরা প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী দেলাক্রা, রোদেনস্টাইন, পিকাসো, সিলভ্যাঁ এ্যাঞ্জেলি, প্রখ্যাত সংগীতকার স্ট্রাভিনস্কি, স্যুমান, চাইকোভস্কি, সোঁপা প্রভৃতি মনীষীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ দেখতে পাই। কোরিওগ্রাফার থাকেন নেপথ্যে, কিন্তু তিনিই সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করে শিল্প প্রতিমা নির্মাণ করেন।

ব্যালে শিল্পে সংগীত ও নৃত্যের সহযোগিতা আদর্শ দাম্পত্য বন্ধনের সঙ্গে তুলনীয়। এ প্রসঙ্গে Edwin Evans-এর বক্তব্য : "The association of music and the dance is a partnership, a marriage between the two arts, analogous, for instance, to the marriage of music and lyrical poetry which is familiar to us in the art of song" (Edwin Evans—Music and the Dance—P-9)। সাধারণভাবে নৃত্যশিল্পীরা সঙ্গীতের ছন্দ ও লয়ের প্রতি বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ না থাকলে তা স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গীত ও নৃত্যের পরিপূর্ণ মিলনের প্রতিবন্ধক। সঙ্গীতের মুড, ইমোশন, চরিত্র এগুলিকে অবহেলা করে শুধু ছন্দ নির্ভর হলে চলবে না, কারণ ব্যালের ক্ষেত্রে সঙ্গীতকে একটি কাহিনী-আত্মক ভাবনার প্রতিফলন করতে হয়। সঙ্গীতের যেমন ছেদ, যতি, পূর্ণছেদ প্রভৃতি আছে, নৃত্যেও তেমন-ই আছে। কিন্তু এই দুই-এর Punctuation আলাদা। এই দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে হলে সঙ্গীতকার ও কোরিওগ্রাফার, এদের সমধর্মী হওয়া প্রয়োজন। ছন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বস্তুজগতে, ভাবরাজ্যে, প্রকৃতির লীলাচাঞ্চল্যে সর্বত্র আমরা এই ছন্দের নৃত্য বা ছন্দোবন্ধ সঙ্গীত দেখতে পাই। সাহিত্য, চিত্রকলা বা স্থাপত্য সর্বত্রই ছন্দ নিয়ামক। ব্যালেশিল্পের ইতিহাসে অনেক সময়েই সংগীতকার ও কোরিওগ্রাফার কার

ভূমিকা মুখ্য এ নিয়ে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। অনেক সময় পরবর্তী কালে নবাগত কোরিওগ্রাফার পুরাতন ব্যালেকে নতুন ভাবে রূপ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে হয়তো পূর্বসূরীর সংগীত রচনাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তখন অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, এতে কোরিওগ্রাফার এর স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। Diaghileff সঙ্গীতকার ও কোরিওগ্রাফার এর সমান ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন। পেত্রোচ্কা, দি ফায়ার বার্ড প্রভৃতি এই আদর্শ অনুসরণ করে প্রযোজিত হয়।

ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে সঙ্গীতরচয়িতাদের মধ্যে Peter Ilyich Tchaikovosky-কে উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে অভিহিত করা হয়। সঙ্গীত ও নৃত্যের যে আদর্শ আচার্যেরা নির্দেশ করেছেন, যাকে এক কথায় বলা চলে এই দুই শিল্প মাধ্যমের পরিপূর্ণ মিলন, চাইকোভস্কি কৃত সঙ্গীত তার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

চাইকোভস্কি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পরিকল্পক মরিস পেতিপা বলেছেন: 'তিনি সর্বকালের সঙ্গীতরচয়িতাদের আদর্শ'। আনা পাভলোভা, মার্কোভা, আলিসা আলফাঁসো প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যালেরিনাদের মতে: "চাইকোভস্কি রচিত সঙ্গীত যখনই ধ্বনিত হতে থাকে, সেই মুহূর্ত থেকেই তাদের হৃদ্স্পন্দনও সেই ছন্দে ছন্দিত হতে থাকে। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ছন্দের লীলাচাঞ্চল্যে নৃত্যচপল হয়ে ওঠে।" চাইকোভস্কিই প্রথম ব্যালে-সঙ্গীত রচনার সেই মহান আদর্শের নির্দেশ করেন: "সঙ্গীত বলতে তো শুধুমাত্র কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত বোঝায় না। সমস্ত শিল্পের মূলেই রয়েছে সেই সঙ্গীত অর্থাৎ একটা rhythmic pattern। এই প্যাটার্ণটিকেই রঙে, রসে, শব্দে, বর্ণে শিল্পপ্রতিমা রূপে নির্মাণ করাই স্রষ্টার আদর্শ।" অর্থাৎ অরূপকে রূপ দেওয়া, মৌনকে ভাষা এবং অপ্রকাশকে মূর্ত করা—অন্যান্য শিল্পের মতো সঙ্গীতেরও আদর্শ। বিশেষ করে ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সমন্বয়ে কাব্যধর্মী চিত্তকল্প রচনা করতে হয়, সেখানে নৃত্যের ও নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গীতের সহচারিতা ও ছন্দের ভাবসৌষাম্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে মহাকবি গ্যায়টের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য: "Painting and Architecture is frozen music"। বিশ্বপ্রকৃতির লীলাচাঞ্চল্য ও সকল শিল্পকর্মের গভীরেই রয়েছে ছন্দের গ্রন্থনা।

চাইকোভস্কি-ই প্রথম দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন যে ব্যালে-শিল্পে সঙ্গীতের ভূমিকা প্রত্যক্ষ (Direct) বা স্বরূপাশ্রয়ী নয়। এর ভূমিকা দ্বিতীয় পক্ষনির্ভর (Intermedative), অর্থাৎ কোরিওগ্রাফার-এর পরিকল্পনার সঙ্গে সার্থক সমধর্মিতা ও সহমর্মিতার উপরেই সঙ্গীত-রচয়িতার সার্থকতা। এড্উইন ইভান্স নৃত্যশিল্পীদের চাইকোভস্কির যে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা-ও সর্বকালের আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে। "Perhaps all the advice one can offer to dancers in the selection of their music can he summed up in one general admonition. Do not contradict." এ কথাটি নৃত্যশিল্পীদের সর্বদা মনে রাখা দরকার।

Sleeping Beauty, Swan Lake, The Nutcracker প্রভৃতি চাইকোভস্কির উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তিনি ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে শুধুমাত্র একজন মহান সঙ্গীত স্রষ্টাই নন, সঙ্গীত রচনার যে নির্দেশাবলী তিনি প্রণয়ন করেছেন তাও সর্বকালের আদর্শ। অন্যান্য সার্থক সংগীত রচনার মধ্যে Stravinsky-এর Fire Bird, Chopin এর Les

Sylphides, Adolphe Adam-এর Giselle বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যালে শিল্পে Decor (Stage Craft, Light, Costume) একটি প্রধান অংগ। সৌন্দর্য এখানে পরিবেশে সাপেক্ষ। যখনই কোনো একটি বস্তুকে সুন্দর বলে মনে হবে, তখনই বুঝতে হবে যে পরিবেশে এই বস্তুটি পরিস্ফুটিত, তা আমাদের মনের সেই বিশেষ মুহূর্তের বিশেষ ভাবকে দোলা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ রচনার কাজটি প্রকৃতি নিজ হাতেই করে রাখেন। কিন্তু তার বাইরে সৌন্দর্য রচনা করতে হলে শিল্পীকে এই পরিবেশটিকে সাজিয়ে নিতে হয়। ফুল যখন লতাকুঞ্জের শ্যামল অবগুণ্ঠনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তখন তাকে আমাদের আপনা থেকে ভালো লাগে, কিন্তু তাকে গাছ থেকে তুলে নিয়ে ফুলদানিতে সাজানোর সময় প্রয়োজন হয় বিশেষ শিল্পরুচি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির। যেমন তেমন করে একগুচ্ছ ফুল ঘরে ফেলে রাখলেই ভালো লাগে না।

মঞ্চমায়ার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। মঞ্চের নির্ধারিত ফ্রেমে নাট্যবস্তুর ভাব-রূপটির বাস্তব রূপায়ণের জন্যে পরিবেশ রচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। দৃশ্যসজ্জা, রূপ-সজ্জা, পোষাক পরিকল্পনা, আলোকসম্পাত ভাববস্তুর ব্যঞ্জনায় অলংকরণের কাজ করে। এই বিভিন্ন উপকরণগুলির যথার্থ সমন্বয় সমগ্র দৃশ্যমণ্ডলে এক ছন্দোবদ্ধ রূপশ্রী করে। ব্যালের যে পাঁচটি প্রধান গতি—(ঊর্ধ্বগতি, অধোগতি, পার্শ্বগতি, আবর্তগতি, বৃত্তগতি), মঞ্চের ক্যানভাসে তা এক বর্ণাঢ্য সচল চিত্রসুষমা সৃষ্টি করে।

ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা প্রধান বলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা (দেলাক্রা, পিকাসো প্রভৃতি) এর প্রযোজনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এর ফলে ব্যালে শিল্পে Classicism, Romanticism, Realism, Impressionism, Symbolism ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষার প্রয়াস হয়েছে। Noverre, Vigano, Carlo Blasis, Diaghileff প্রভৃতি সকলেই এই পরিবেশ রচনার দিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন।

ব্যালে-স্ক্রিপ্ট রচনা (Libretto Writing) প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য নাট্য আঙ্গিকের সঙ্গে ব্যালের পার্থক্য কোথায়। দৃশ্যকাব্যের যে সর্বজনস্বীকৃত শ্রেণী-বিভাগ তা প্রধানত চারটি—(১) গীতিনাট্য বা অপেরা (২) নৃত্যনাট্য বা ব্যালে (৩) যাত্রা (৪) নাটক। কাহিনী উৎসের ভিত্তিতে এদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়—(১) ক্লাসিকধর্মী—এতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, বা আপাত ঐতিহাসিক কাহিনী পরিবেশিত হয়। (২) রূপকথা বিষয়ক (৩) কাল্পনিক (Phantasia) (৪) সামাজিক। অন্যান্য শাখার মতো ব্যালে-স্ক্রিপ্ট রচনার ক্ষেত্রেও কাহিনীকে নাট্যধর্মী করার জন্যে আটটি পর্বে ভাগ করতে হবে—(১) সূচনা (Exposition), (২) প্রারম্ভ (Initial incident), (৩) প্রবাহ (Rising action), (৪) উৎকর্ষ (Climax), (৫) গ্রন্থিমোচন (Resolution), (৬) উপসংহার (Conclusion)।

এর পরে আসবে ব্যালে প্রযুক্তি স্ক্রিপ্ট (Working Script)। এটি আবার আট পর্যায়ে বিভক্ত। (১) সন্ধি বিভাগ (Stages of Action), (২) অংক বিভাগ (Act Division), (৩) ঐক্য (Unity), (৪) অগ্রগতি (Progression), (৫) ক্রম (Continuity), (৬) ঔৎসুক্য (Suspense), (৭) আবেগত্ব (Tempo), (৮) উপকরণ সংযোগ (Combination of elements)।

এই কাহিনীভিত্তিক বিন্যাসের পর সমগ্র পরিকল্পনাটির প্রয়োগ-ছক নির্মিত হয়।

ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে পেতিপা-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ফরাসী দেশ থেকে রুশ দেশে এসে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যালে শিক্ষণ ও কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সাতান্নটি পূর্ণাঙ্গ ব্যালের পরিকল্পনা করেন। এবং অন্যান্য পরিকল্পকদের প্রযোজনার তত্ত্বাবধান করেন। Swan Lake, Sleeping Princes প্রভৃতি তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি প্রাচীন ধারার বিশেষ করে ফরাসী শিল্পের লঘুছন্দ-মন্দলয় সৌন্দর্য সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ল্যাসিকাল ব্যালের বাঁধাছক ভেঙে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। পরে যখন ইতালীয় পরিকল্পক সিসেটি শিক্ষকরূপে রুশদেশে এলেন তখন ফরাসী ও ইতালীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে জন্ম নিল রুশীয় ব্যালে পদ্ধতি। পেতিপা ব্যালে শিল্প প্রযোজনার ক্ষেত্রে কোনো নব্য চিন্তাধারার প্রচলন করতে পারলেন না। তবে রাশিয়ান ব্যালের উৎকর্ষে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে Visevolojsky পেতিপা, সিসেটি ও গুস্তভ জোহালসেল-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে রুশীয় ব্যালে পদ্ধতির নির্দেশাবলী রচনা করেন।

মাইকেল ফোকিন—ইনি সঙ্গীতজ্ঞ এবং চিত্রকর। ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে নব্য চিন্তাধারার অন্যতম প্রবর্তক। শুধুমাত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে নয়, এই শিল্পের ভবিষ্যৎ ভিত্তিস্থাপনে তাঁর শিল্পতাত্ত্বিক সূত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। লে সিলফায়েড, কার্নিভাল, সেরাজাদি, প্রিন্স আইগর, পেত্রোচ্কা প্রভৃতি প্রযোজনা তাঁর প্রতিভায় ভাস্বর। তিনিই প্রথম দীর্ঘ সময়ব্যাপী ক্লান্তিকর সান্ধ্য ব্যালে প্রোগ্রাম পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। প্রযোজনার ক্ষেত্রে সংযম ও সময় সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কাহিনী বর্ণনার ভান করে মূল ভাবনাটিকে এড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন খণ্ডভাবাত্মক নৃত্যরচনার যে প্রয়াস ক্লাসিক ব্যালে রীতিতে প্রচলিত ছিল, তিনি এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। অনেকের মতে তিনি ছিলেন প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধী; কিন্তু একমাত্র তিনিই ঐতিহ্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯৪৩ সালে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত আজীবন তিনি শিল্পে আধুনিকতার জন্যে নিরলস প্রয়াস করে গেছেন।

আনা পাভালোভা ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে কিংবদন্তীর নায়িকা। ফোকিন পাভলোভা প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রেষ্ঠতমা ব্যালেরিনা। মাত্র দশ বছর বয়সে ইম্পিরিয়াল স্কুল অব ব্যালেতে ভর্তি হন। সতেরো বছর বয়সে শিক্ষা সমাপনান্তেই প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মর্যাদা অর্জন করেন। শিক্ষার্থী অবস্থাতেই তাঁর নৈপুণ্য দুই প্রখ্যাত গুরু গুস্তভ জোহালসেল ও সিসেটিকে মুগ্ধ করে। ক্লাসিক ধর্মী শিল্পীর সব গুণই তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। যে কোনো চরিত্র রূপায়ণে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিতেন। প্যারিসে ১৯০৯ সালের অনুষ্ঠানে তাঁর প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রখ্যাত সমালোচক জাঁ লুই মন্তব্য করেন: "শ্রীমতী পাভলোভাকে নৃত্যরতা অবস্থায় দেখে সেই আনন্দই পাওয়া যায়, যে আনন্দ একযোগে সার্থক কাব্য, সার্থক সঙ্গীত ও মহৎ চিত্রদর্শনে পাওয়া যায়।" মেরী ত্যাগলিয়নির যে আশ্চর্য নৃত্যদক্ষতা তাকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিল, সেই অসাধারণ দক্ষতা ও শিল্পী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমালোচকরা পাভলোভার তুলনা করেছেন। Diaghileff-এর সঙ্গে একত্র কাজ করার সময় দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতের ফলে পাভলোভা

নিজস্ব সম্প্রদায় গঠন করেন। Giselle-এর ভূমিকায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা অবিস্মরণীয়। ফোকিন-এর প্রযোজনা The Dying Swan-এর রূপায়ণে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। Neo-Romanticism তাঁকে গভীরভাবে অভিভূত করে এবং তিনি Image making-এর দিকে বিশেষ মনোযোগী হন। পাভলোভা উদয়শঙ্করের মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখে তাকে তার সংগে কাজ করার সুযোগ দেন। পাভলোভার প্রভাবে পরবর্তীকালে উদয়শঙ্কর বিমূর্ত শিল্পরীতিতে আকৃষ্ট হন। পাভলোভা ব্যালেরিনার জগতে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। পাভলোভা একমাত্র পাভলোভার সংগেই তুলনীয়।

সার্জি পাভলোভিচ্ দ্যয়াজিলেফ (Diaghileff)–রাশিয়ান ব্যালের ইতিহাসের এক প্রবাদ পুরুষ। শুধুমাত্র ব্যালেশিল্পেই নয় রাশিয়ার শিল্প সাহিত্য আন্দোলনে আধুনিকতার ভগীরথ। নব্য চিন্তাধারার আন্দোলনের পুরোধা।

ছাত্রাবস্থা থেকেই সঙ্গীত ও চিত্রকলায় আগ্রহী। ওয়াল্টার ন্যুভেল ও আলেকজান্ডার রেনয়-এর সহযোগিতায় তিনি শিল্পীদের এক সংস্থা গড়ে তোলেন এবং তাদেব মুখপত্র সম্পাদনা করেন। স্তানিস্লাভস্কির নাট্যচিন্তায় তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং তিনিই টোটাল থিয়েটারের রূপ নির্মাণে প্রয়াসী হন। লিও টলস্টয়-এর শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক বক্তব্য সম্পর্কে তিনিই প্রথম এক বিতর্কমূলক আলোচনার সূচনা করেন। তিনিই প্রথম ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী ফ্রান্স থেকে আনিয়ে রুশ দেশে দেখাবার আয়োজন করেন। ১৯০৯ সালে তার নিরলস প্রয়াসের ফলেই রাশিয়ান ব্যালে প্যারিসে অনুষ্ঠান করার জন্যে আসে। এই সাংস্কৃতিক সফরের পর দ্যয়াজিলেফ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে তাঁর প্যারিস অভিযাত্রাই বহির্বিশ্বে রাশিয়ান ব্যালের জয়যাত্রার সূচনা। ফোকিন, আনা পাভ-লোভা, নিজিনস্কি প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন দক্ষ পিয়ানো বাদক। শিল্পের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ ছিল বিস্ময়কর। তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে রাশিয়ান ব্যালের নিজস্ব ঐতিহ্য রচনা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাঁর সময়েই ক্লাসিক্যল ও রোমান্টিক ধর্মী ব্যালেগুলির নবরূপায়ণ করা হয়। তাঁর সম্পর্কে সহযোগী শিল্পীরা একটাই অভিযোগ করতেন যে নিজস্ব শিল্পাদর্শ প্রচারে ও ব্যালে দল পরিচালনায় তিনি অনেক সময়ই ডিকটেটর সুলভ আচরণ করতেন। কিন্তু একজন অসামান্য প্রতিভাধর সংগঠক ও প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি সর্বজন স্বীকৃত।

Nijinsky–ব্যালে শিল্পের ইতিহাসের এক কিংবদন্তীর নায়ক। অনেকে তার প্রসঙ্গে বলতেন God of the Dance. পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন দক্ষ নৃত্যশিল্পী। ইম্পিরিয়াল স্কুল অব ডান্সিং-এ ছাত্রাবস্থাতেই শোলিয়াপিন ও পেতিপা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। দ্যয়াজিলেফ সংগঠিত রাশিয়ান ব্যালের প্যারিস সফরের তিনি অন্যতম শিল্পী ছিলেন। সেই প্রদর্শনীতে তাঁর অসামান্য নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত সমালোচক রা তাঁকে "ছন্দোময় অগ্নিশিখা', "বিশ্বনৃত্যের নর্তক" প্রভৃতি বিশেষণে সমাদর জানান। আনা পাভলোভাও ঐ অনুষ্ঠানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

শিল্পী হিসাবে হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের পর নিজিনস্কি কোরিওগ্রাফার

রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি গতিবিন্যাসের জ্যামিতিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক সহজ ও সাবলীল ছন্দ রচনা করে। ক্লাসিকাল রীতির জটিল পদ্ধতির পরিবর্তে এই যে নতুন ছন্দ তিনি প্রচলন করলেন যাকে বলা যায় 'অনায়াসের ছন্দ।' পরবর্তীকালে ম্যাসিন এই পদ্ধতিটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন। এই অসামান্য প্রতিভাধর শিল্পীর মধ্যজীবনেই স্মৃতিবিভ্রম ও মস্তিষ্কবিকৃতি এক শোকাবহ বিয়োগান্ত পরিণতি।

Isadora Duncan—ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে শিল্পপ্রতিভা ও ইনটেলেক্ট-এর এত নিবিড় সংযোগ অন্য কোন শিল্পীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বহুজনবন্দিত ও বিতর্কিত এই অনন্যা শিল্পীর আত্মজীবনী আজও বিশ্বসাহিত্যের সম্পদরূপে স্বীকৃত। শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ইসাডোরার মতে কোনো পূর্ব নির্ধারিত কাহিনীভিত্তি বা প্রস্তুতি ছাড়া তাৎক্ষণিক আবেগ নির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত স্বতস্ফূর্ত যে শিল্প তাই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। গ্রীক শিল্প ও ভাস্কর্যের বলিষ্ঠ নগ্ন সৌন্দর্যই শিল্পের মুক্তির পথনির্দেশক—এ ছিল তাঁর বিশ্বাস। হেলেনিক নৃত্য-পদ্ধতিই তাঁর আদর্শ ছিল। প্রখ্যাত গবেষক ও নৃত্যপদ্ধতির স্রষ্টা Ruby Ginner ইসাডোরা প্রসঙ্গে বলেছেন: "Educatio ally, however, the strongest force is that which has found life through a revival of the beautiful simplicity of Greek Art, which serves to mitigate the Complexity and tumult of modern times. The first exponent of this form was that great artist of the dance, Isadora Duncan, who regarded movement not only as a means of artistic expression but a power wherewith to reform life." (Revival ot Helenic Dance—Ruby Ginner. P.—12).

আদিম নৃত্যের প্রকৃতিচেতনা থেকে উদ্ভূত যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎপ্লাবন, নিরলংকার সরল প্রকাশ সেই নিবিড় আবেগ ও অনুভূতিকেই শরীরী করে তোলা তার আদর্শ ছিল। ইসাডোরার শিল্পচিন্তার প্রভাব শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নাট্য প্রযোজনায় নতুন চিন্তার সূচনা করেছিল। স্তানিস্লাভস্কি, গর্ডন ক্রেগ, রুডিন, দ্যয়াজিলেফ প্রভৃতি প্রখ্যাত মনীষীদের শিল্পচর্চার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ ছিল। খ্যাতি অখ্যাতিতে রহস্যময়ী এই মহৎ শিল্পীর জীবন ও শিল্পসাধনা প্রচলিত সংস্কার ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেযুগে সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

Ninette de valois—এই আইরিশ শিল্পীকে সহজাত প্রতিভাময়ী রূপে গণ্য করা হয়। শিশু শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জনের পর কিশোর বয়সেই তিনি দ্যয়াজিলেফ-এর ব্যালে কোম্পানীতে Auroras Wedding প্রযোজনায় শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই ব্যালে কোম্পানীতে দুই বৎসর থাকাকালীন সময়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষণপদ্ধতিও অর্জন করার চেষ্টা করেন। কারণ সেই কৈশোর কাল থেকেই তাঁর বাসনা ছিল যে ভবিষ্যতে তিনি কোরিওগ্রাফার রূপে স্বাধীনভাবে ব্যালে প্রযোজনা করবেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজস্ব কোম্পানী গঠন করেন কিন্তু অনভিজ্ঞতার জন্যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন। তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত

ব্যালেরিনা মার্কোভাকে দলে নিয়ে এসে অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান হল, কিন্তু তাঁর সমষ্টি শিল্প হিসাবে ব্যালের প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ তা ব্যাহত হল। পরে লিলিয়ান ডেনিসের আমন্ত্রণে ওল্ডভিক থিয়েটারে ব্যালে প্রযোজনার জন্যে যোগদান করেন। 'জব', 'চেকমেট', 'ফলিবার্জার' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। শিল্পী নির্বাচন ও শিক্ষণে তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'Invitation to the Dance' শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট চিন্তাধারার সাক্ষর।

Martha Graham—আমেরিকার প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার। মার্থা গ্রাহাম ব্যালে শিল্পে নতুন অঙ্গাভিনয় পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্যে স্মরণীয়। প্রচলিত ব্যালে টেকনিক থেকে তাঁর পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাঁর পদ্ধতি 'Theory of Contractions' নামে পরিচিত। এই পদ্ধতি নার্ভকেন্দ্রগুলির সচেতনতার উপর নির্ভরশীল। এই পদ্ধতি আয়ত্ব করতে পারলে পেশী সমূহের গতিশীলতা ছন্দায়িত অগ্নিশিখার রূপ পরিগ্রহ করে। এই রীতি সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিমূর্ত চিত্রকলা রচনায় বিশেষ সহায়ক। মার্থা গ্রাহামের বক্তব্য: "নৃত্য হচ্ছে জীবনছন্দ। যে দেহযন্ত্রের মাধ্যমে নৃত্য প্রতিভাসিত হয়, সেই দেহযন্ত্রের মধ্যেই মানবজীবন বেঁচে থাকে। কাজেই জীবনচর্যা ও দেহচর্যা পরিচালনে প্রাণকেন্দ্র ও স্নায়ুকেন্দ্রের নিয়ামক ভূমিকাটিকে নৃত্যশিল্পীকে অনুধাবন করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণের দক্ষতার উপরেই শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য ও সুষমা নির্ভরশীল। মার্থা গ্রাহাম প্রযোজিত ব্যালেগুলির মধ্যে 'Diversion of Angels' 'Errand into the Mare', 'Night Journey' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজা অয়দিপাউসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত Night Journey ব্যালেতে রাণী যোকাস্তার চরিত্র চিত্রণে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রযোজনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্মগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হলে গবেষকরা সাধারণ ভাবে Giselle, Swan Lake, Les Sylphides ও Sleeping Beauty (Princess)—এই চারটিকেই আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেন। Giselle-কে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যালে বলা যেতে পারে। রোমান্টিক যুগের ভাবধারার এটি যেমন একটি শুদ্ধ নিদর্শন তেমনই এর কাহিনী ও চরিত্র শিল্পীর পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রথম প্রযোজনা থেকে আরম্ভ করে যে কোনও প্রখ্যাত শিল্পীর স্বপ্ন এই চরিত্রে রূপ দেওয়া। প্রথমাংশে নায়িকা একটি নৃত্যচঞ্চল খেয়ালখুশির আনন্দে উচ্ছল গ্রাম্য প্রেমিকা। দ্বিতীয়াংশে তাকে প্রতারিত এবং উন্মাদ অবস্থায় দেখা যায়। যে কারণে সে আত্মহত্যা করে। পরবর্তী অংশে সে এক অশরীরী আত্মার শরীরী প্রতীক এবং এই অংশে তার চরিত্র প্রথমাংশের একেবারে বিপরীত। গল্পাংশ থেকেই বোঝা যায় যে অন্যান্য রোমান্টিক ধর্মী ব্যালের চেয়ে এক্ষেত্রে নাটকীয়তা ও খন্ডভাবাত্মক চিত্রকল্প রচনার সুযোগ অনেক বেশি।

১৮৪১ সালে এর প্রথম প্রযোজনা। গতিয়ের, হেইন ও সেন্ট জর্জের সহযোগিতায় এটি রচনা করেন। কোরিওগ্রাফার ছিলেন কোরালী। সঙ্গীত রচনা করেন এ্যাডল্ফি এ্যাডাম। মুখ্য চরিত্রে কারলোভা। পরবর্তীকালে এই চরিত্রে আনা পাভলোভা, কারসাভিনা, মার্কোভা প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। এই ব্যালের পুরুষ চরিত্রও অবহেলিত নয়। নিজিনস্কি, শিয়ারে, হেল্পম্যান প্রভৃতি এই চরিত্রের রূপায়ণে বিশেষ

কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দ্যয়াজিলেফ ১৯১১ খৃস্টাব্দে এই ব্যালেটিকে আবার নতুন করে শিল্প রসিকদের সামনে উপস্থিত করেন।

Swan Lake—ক্লাসিক ধর্মী প্রযোজনার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যালে। এই ব্যালের অব্যাহত ধারা ও উৎকর্ষের প্রধান কারণ চাইকোভস্কি কৃত অপূর্ব সঙ্গীতাংশ। ১৮৭৭ সালে প্রথম প্রযোজনায় কোরিওগ্রাফার ছিলেন আইভানভ। দুর্বল পরিকল্পনার জন্য প্রথম প্রযোজনা ব্যর্থ হয়। আইভানভের মৃত্যুর পর ১৮৯৪ সালে পেতিপার পরিকল্পনার অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে নতুন ভাবে প্রযোজিত হয়। কাহিনী নাট্যধর্মী নয়। সুন্দর নৃত্যাংশই এর প্রধান আকর্ষণ। মুখ্য চরিত্রে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের রূপায়ণ, এখানেও অশরীরী আত্মার উপস্থিতি। পিয়েরিনা লেগনানি তাঁর অসামান্য নৃত্যকুশলতায় এই চরিত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে দ্যয়াজিলেফ এই ব্যালের আধুনিকীকরণ করেন।

Les Sylphides—নিও-রোমান্টিক ধর্মী ব্যালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—যে ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে মেরী ত্যাগলিওনি La Sylphid নামে একটি ব্যালে প্রযোজনা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে সময় গতিয়ের, ত্যাগলিয়নি, হেইনে প্রভৃতি—এই আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলনে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফোকিন যখন Les Sylphides প্রযোজনা করলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এখানে মনে রাখতে হবে ফোকিন পূর্বসূরী ত্যাগলিয়নির পূর্বতন ব্যালের শুধুমাত্র নামটিকেই স্মরণ করেছেন—দুটি প্রযোজনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী। কারণ, ত্যাগলিয়নির বাস্তবতাবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ফোকিন-এর নব্য-রোমান্টিকবাদের প্রভেদ আছে। গতিয়ের, ত্যাগলিয়নি প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে ব্যালে শিল্পে কৃত্রিমতা আসে এবং মান নিম্ন-গামী হয়। ফোকিন-এর বিদ্রোহও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে, কিন্তু এ কৃত্রিমতা ক্লাসিসিজম্-এর ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ফল। তাই নব্য রোমান্টিকবাদের মাধ্যমে ফোকিন তার প্রযোজনায় Image-making বা কল্পনাসৃষ্টির দিকেই জোর দিলেন। এখানে ভাবাভিনয় সমৃদ্ধ হল। নিছক কাহিনী বর্ণনা নয়, বেশি জোর দেওয়া হল শুদ্ধ ভাবরূপ-নির্মাণে। এই ক্ষেত্রে ক্লাসিক ব্যালে ও পুরাতন রোমান্টিক ব্যালের সঙ্গে এর মৌল প্রভেদ। প্রথম প্রযোজনা ১৯০৬। কোরিওগ্রাফি ঃ ফোকিন, সঙ্গীতঃ সোঁপা (Chopin)। পরবর্তীকালে দ্যয়াজিলেফ 'সোপিনিয়ানা' নামে এই ব্যালেটিকে প্যারিস ও অন্যত্র প্রদর্শন করেন।

Sleeping Beauty (Princess) ব্যালে একটি পরীক্ষামূলক প্রযোজনা। বার বার এই ব্যালেটিকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। অনেকে বলেন নাট্যধর্মী আবেদনের অভাবের জন্যে এই ব্যালে পরিপূর্ণ শিল্পসাফল্য লাভ করেছে—একথা বলা যায় না। আবার অনেকের মতে সুন্দর-এর প্রকাশে এই ব্যালের পরিকল্পনা অসাধারণ—এ যেন নিসর্গ চিত্রের বর্ণাঢ্য রূপময়তা। পেতিপা-র পরিকল্পনায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রযোজনা। সঙ্গীত রচনা করেন চাইকোভস্কি। কারলোভা, অরোরা, সিসেটি বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে দ্যয়াজিলেফ এর পুনঃপ্রবর্তন করেন। ট্রেভিলোভা, পোলিভা, লোপোকোভা প্রভৃতি শিল্পী সমন্বয়ে ১৯২২ খৃস্টাব্দে প্যারিসে এক বিশেষ প্রদর্শনীতে সমালোচকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে দ্য-বেসিল-এর পরিকল্পনায় এই ব্যালের নবরূপায়ণ হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে

আর কোনও ব্যালে নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় নি।

ভারতীয় নৃত্যাদর্শে ব্যালের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যনাট্য-এর প্রসঙ্গ আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যে ব্যালের উপাদান ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, যদিও আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য প্রচুর।

ব্যালে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ তাঁর বিলাত প্রবাসের সময়েই সূচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংল্যান্ড প্রবাসের সময় সেখানে Wagner-এর সঙ্গীতই অপেরার মাধ্যমে যে নবজাগৃতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। অপেরার ক্রমবিকাশে আমরা দেখতে পাই, সেখানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৃত্যও স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে জাঁ লালী প্রচলিত ফরাসী অপেরায় নৃত্যাদর্শ, সেক্ষেত্রে ইতালীয় রীতির সঙ্গে পার্থক্য দেখা গেল। ইউরোপীয় অপেরার ঐশ্বর্য ও প্রভাব সেসময়কার বাংলাদেশের গীতাভিনয়কে প্রভাবিত করে। অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় জানা যায় প্রচুর অর্থব্যয় করে ইতালীয় অপেরাকে কলকাতায় এনে লিন্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে অভিনয় করানো হয়।

ব্যালে নাচের অনুশীলন ও এখানকার নৃত্যনাট্যে তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের আগ্রহ তো তাঁর ছিল। শান্তিদেব ঘোষ-এর বক্তব্য ঃ "১৯৩০-এর মার্চ মাসে গুরুদেব তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিলেত রওনা হলেন। ইংলন্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর ভক্ত মিঃ এলমহার্স্ট প্রতিষ্ঠিত, 'ডার্টিংটন হল' বিদ্যালয়ে তাঁরা কিছুকাল বাস করেন। সেখানে তারা ব্যালে নাচ দেখেন। প্রতিমাদেবী এই বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা নৃত্য পরিচালকের Ballet নৃত্য-পরিকল্পনা, প্রতিদিনের কাজ ও Ballet রচনার করণ-কৌশল অনুশীলন করেন।" (শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা—পৃঃ ২৫৫)

এই অনুশীলন ও আগ্রহই পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন নৃত্য-সমাবেশ ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঃ "কীভাবে নৃত্যনাট্যে বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে, সে আলোচনা করবার আগে রচনা-পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক আলোচনা-যোগ্য। মিশ্রণের যে রীতি অনুসৃত হয়েছিল, তার পিছনে হয়ত ব্যালের প্রভাব রয়েছে। প্রতিমাদেবীও একথা অন্যভাবে বলেছেন। ব্যালের রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে Arnold Haskel প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আসলে যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যালে রচিত হয় ; কতকটা শ্রমবিভাগের মতো। একটি কাহিনী খাড়া করে তদনুযায়ী সংগীত, মঞ্চ ও রূপসজ্জা এবং নৃত্য গড়ে ওঠে। Choreographer-এর উপর দায়িত্ব থাকে দৃশ্যগুলি যথাযথভাবে বিন্যাস করার। ব্যালের শিল্পকলার এই দিকটিই রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিল সম্ভবত। সেই জন্যেই ঐক্য বজায় রেখে বিভিন্ন নৃত্যধারাকে মেলাবার সম্ভাবনা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে তিনি ব্যালের এই রচনা পদ্ধতির দিকটিই শুধু গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, অন্যদিক থেকে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।" (রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য—প্রণয়কুমার কুণ্ডু, পৃঃ ২৭২)

ব্যালের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের যে প্রকৃত বিমূর্ত শিল্পরূপ গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল, তা 'শিশুতীর্থ' ও নবপরিকল্পনায় 'শাপমোচন' পরিকল্পনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। জার্মানীর উফা কোম্পানীর জন্যে রচিত Child এবং তার বাংলা রূপান্তর শিশু-তীর্থ-এর খসড়া ব্যালে স্ক্রিপ্ট রচনার আদর্শে রচিত। এর প্রয়োগ-পদ্ধতিতে ব্যালের

আদর্শ অনুসৃত। ইউরোপীয় নৃত্যরীতিতে অভিজ্ঞ শ্রীমতী ঠাকুর কথিকা অংশ তৎকালীন ব্যালেতে প্রচলিত 'ইমপ্রেশনিস্ট' নৃত্য আঙ্গিককে রূপদান করেন। এই রীতি নিয়ে আরও বৃহত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কল্পনা তাঁর ছিল, প্রতিমাদেবীর আলোচনা সূত্রে তা জানা যায়। এই কল্পনা তাঁকে তখন বিশেষভাবে নাড়া দিচ্ছিল, তা সেই বছরেরই শেষাংশে শাপমোচন-এর নবরূপায়ণ থেকে বোঝা যায়। শান্তিদেব ঘোষের বক্তব্য ঃ "এই বৎসরের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বরে গুরুদেবের ৭০তম জন্মোৎসবের সময় কলকাতায় 'নটীর পূজা' ও 'শাপমোচন' অভিনয় হল। শাপমোচন এই উপলক্ষ্যে তিনি নূতন করে লেখেন। শিশুতীর্থের মতই রাজা নাটকের ভাব অবলম্বনে এই কণিকাটি রচিত। তাকেই অবলম্বন করে ব্যালে-নাচের আদর্শে এই নৃত্যনাট্যটি গড়ে ওঠে। আগের মতনই কথা, আবৃত্তি ও গানের সাহায্যে একে রূপ দেওয়া হয়।" (শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা—পৃঃ ২৬৩)। তাসের দেশ এর পরিকল্পনার পিছনেও ব্যালের আদর্শ-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই সব তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে উত্তরণের প্রস্তুতি পর্বে রবীন্দ্রচেতনায় ব্যালের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ভারতীয় নৃত্যধারায় ব্যালে পদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগশিল্পী উদয়শঙ্কর। ব্যালে শিল্পকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্যে যেসব প্রস্তুতি দরকার, তা সবই তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন চিত্রকলার শিক্ষার্থী। পারিবারিক সূত্রে সঙ্গীতে অনুরাগী ও কুশলী। এর সাথে যুক্ত হল প্রখ্যাত শিল্পী রোদেনস্টাইন ও ব্যালে শিল্পী আনা পাভলোভার প্রেরণা। আর সবথেকে বিস্ময়কর বিষয় হল এই যে, যে ডার্টিংটন হল বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীর ব্যালে অনুশীলন—সেই কেন্দ্রেই প্রখ্যাত ব্যালে শিক্ষক Michael Chekhov-এর সাহচর্য। এই চেকভের আদর্শেই উদয়শঙ্করের শিল্পাদর্শ ও শিক্ষণপদ্ধতি গড়ে ওঠে। এখানকার আদর্শ, প্রেরণা ও আনুকূল্যেই পরবর্তীকালে আলমোড়া শিক্ষাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ্রে মাইকেল চেকভের সঙ্গে ছিলেন 'The Green Table' ব্যালের কোরিওগ্রাফার Kurt Joose.

চেকভ ছিলেন স্তানিস্লাভস্কি রীতির প্রবক্তা। শিল্প সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু পদ্ধতি ছিল। "Nephew of the famous play-write Anton Chekov, Michael was a product of the Moscow Art Theatre. Inspired by the Stanislavsky system, Michael believed in movement before speech for an artists training. Rhythm for him was the secret of any significant drama. He used to take classes of the simple walk with variations of rhythm and character. His course included exercises for training in concentration and imagination in creative work ; speech ; body as the instrument of the dramatic artist, enrhythmics ; improvisation and finally your own production. Uday Shankar watched Chekov's classes and was very fascinated by his methods. It was here that Uday Shanksr deeply realised the training of the inner world of a dancer along with the discovery of body movement." (N. Sarma—

Sangeet Natak—April-June—78.)

পরবর্তীকালে উদয়শঙ্কর এর শিক্ষণ-পদ্ধতিতেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে ব্যালের ক্ষেত্রে এই রুশ শিল্পাদর্শই উদয়শঙ্করকে প্রভাবিত করেছিল। যার ফলে তার প্রযোজনায় ও দেশজ পদ্ধতি বিশেষ স্থান পেয়েছে। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও শিবতাণ্ডব থেকে শুরু করে লেবার এণ্ড মেসিনারি, রিদম অফ লাইফ, আসাম সবই যুক্ত হয়েছে।

আনা পাভলোভার সহযোগিতায় উদয়শঙ্কর পরিকল্পিত দুটি ব্যালে Radha-Krishna ও Hindu Marriage বিদেশের সর্বত্র সমাদৃত হয়। উদয়শঙ্কর-ই ভারতীয় ব্যালে আন্দোলনের অগ্রদূত। উদয়শঙ্করের পর যে সব ভারতীয় শিল্পীরা ব্যালে প্রযোজনার ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন—তাঁরা সকলেই উদয়শঙ্কর সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। প্রয়াত শিল্পী শান্তিবর্ধন এর Spirit of India এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শচীনশঙ্কর-এর The Train প্রভৃতি কয়েকটি ব্যালে, অনাদি প্রসাদ প্রযোজিত ওমর খৈয়ম ও মহাভারত; অসিত চট্টোপাধ্যায়ের আফ্রিকা ও ক্ষুধিত পাষাণ, দেবীলাল সমর-এর পাপেট ব্যালে, নরেন্দ্র শর্মার কয়েকটি প্রযোজনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নৃত্যলোকের রাজপুত্র

নৃত্যের মুক্তি ও নবজাগৃতির সূচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। নৃত্যের আধুনিক ধারা প্রবর্তন করলেন শ্রীউদয়শংকর। ভারতের নৃত্যকলায় আধুনিকতার অগ্রদূতের সম্মান নিঃসন্দেহে তার প্রাপ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছোট বড় সকল শিল্পীরই মূল্যায়ন হয়; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিভার অবদান সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী সমালোচকদের গবেষণাধর্মী সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় শিল্পীমানস ও দর্শকচেতনা সমৃদ্ধ হয়। আমাদের দেশে মাঝারি শিল্পীদের তো দূরের কথা, মহৎ শিল্পীর অবদানও যথাযথ আলোচিত হয় না। গভীর দুঃখের সঙ্গে একথা স্মরণ করতে হবে যে আমাদের দেশে শ্রীউদয়শংকর সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা ও মূল্যায়নের কোনো প্রয়াস এখন পর্যন্ত সূচিত হয় নি।

স্বদেশে আলোচিত না হলেও শংকরপ্রতিভা ও নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিদেশের সমালোচকরা প্রয়াস করেছেন। দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে "The Other Mind" একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, লেখিকা শ্রীমতী জোয়েত। তিনি বলেছেন উদয়শংকরের নৃত্য দেখে প্রাচ্যদেশীয় নৃত্যকলা সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয় এবং তার ফলেই প্রচুর পরিশ্রম ও তথ্যসংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই উদাহরণ আমাদের দেশের সমালোচকদের শিক্ষণীয়।

উদয়শংকর প্রবর্তিত নৃত্যশৈলী সম্পূর্ণ আধুনিক, অথচ ভারতীয় নৃত্যের আঙ্গিক আদর্শ ও সত্যের চিরন্তন রূপপ্রকাশের ধারা থেকেও নৃত্যকল্পনা বিচ্যুতি হয় নি। ইউরোপীয় নৃত্যপদ্ধতির রেখাবলী (কোরিওগ্রাফী) ও চিত্রধর্মীতা অনুসৃত হলেও ভারতীয় মানসের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যে এই পদ্ধতি ভারতীয় নৃত্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয় নি।

ভারতীয় মার্গনৃত্যের আঙ্গিকসর্বস্ব রক্ষণশীলতা অনেকক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিকর্মের প্রতিবন্ধক। নৃত্যকে এই বন্ধন থেকে মুক্ত করে সৃজনশীল শিল্পরূপে উদয়শংকর প্রয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য: 'আর্টকে যদি জীবন্ত রাখতে হয়, তাহলে তাকে গতিশীল জীবনের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে; তাকে অনড় ব্যাকরণের সূত্রের বন্ধনে বাঁধলেই তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। 'Art must live with life.'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সার্থক সমন্বয়ে তৎকালীন সময়ে উদয়শংকর প্রযোজিত নৃত্যে নবসৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে সূচিত হল আধুনিক যুগ। শুধুমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারার অনুকরণ ও অনুরণনের অবসাদের সমাপ্তিতে নবতর বোধের আস্বাদে সজীব হল নৃত্যকলা। নৃত্যকলায় সেই প্রথম সূচিত হল আধুনিকতার লক্ষণ—সর্বাভিমুখী জটিলতার মধ্যে সামগ্রিকতার অনুসন্ধান। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করল বহু বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি। কথাকলির নাটকীয় বৃত্ত, ভরতনাট্যমের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপ্রসাবিনী ইঙ্গিতময়তা, কথকনৃত্যের ক্ষিপ্রচটুল ছন্দ, মণিপুরী নৃত্যের গীতধর্মী ব্যঞ্জনা ও লোকনৃত্যের স্বতস্ফূর্ত উৎপ্লাবন—এই বিভিন্ন রীতির সুষম সঙ্গত সমন্বয়

বর্ণাঢ্য হল পাশ্চাত্য রীতির কোরিওগ্রাফীতে। নৃত্যকল্পনার শরীরে বহুচারী বিস্তারে বিভিন্ন আঙ্গিকের সংকেতকে সংমিশ্রিত করা ও ভাবব্যক্তিতে সৃজনশীল শিল্পীর বুদ্ধিদীপ্ত মননের গভীরতায় চারুতা ও রসরঞ্জনা সৃষ্টি করা—এই পদ্ধতি ভারতের নৃত্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তন করলেন শ্রীউদয়শঙ্কর। এই বিচিত্র প্রয়াসেই ভারতের নৃত্যকলার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা।

উদয়শঙ্করের শিল্পকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর শিল্পীমানসের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। প্রথম জীবনে তিনি চিত্রকলার শিক্ষার্থী ছিলেন, সেজন্যে তার শিল্পকর্মের একটি বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে চিত্রধর্মীতা। চিত্রকলার মাধ্যমে শিল্পীমনের বিবক্ষু চেতনা রং, রেখা, বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস ও বিচিত্র কারুকার্যে দর্শকমনে যেমন একটি রূপময় সঞ্চারী আধার সৃষ্টি করে; নৃত্য কল্পনার ক্ষেত্রেও উদয়শঙ্কর মঞ্চের ফ্রেমে শিল্পীমনের প্রকাশ-উন্মুখ রূপভাবনাকে চিত্রধর্মী পদ্ধতিতেই দর্শকমনে সহৃদয় করে তুলেছেন। তাঁর প্রযোজিত শিল্পকর্মের মৌলিকতা ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই চিত্রধর্মীতা। এই ক্ষেত্রে তিনি অনন্য।

নৃত্যকল্পনার ক্ষেত্রে বিমূর্ত চিত্ররীতির পরীক্ষার উজ্জলতম নিদর্শন তাঁর প্রযোজিত "আসাম" অনুষ্ঠান। এই চিত্রধর্মীতা কিভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ প্রসঙ্গে উদয়শঙ্কর বলেছেন ঃ

'গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ এক-একটি নাচের ছবি তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে; দিবারাত্রি আমাকে কল্পনার রাজ্যে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে গতিশীল রূপ দেবার জন্যে, তার গোড়া থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত একটি রসমূর্তি প্রকাশ করার জন্যে। এইভাবেই আমি আমার বিভিন্ন নাচের জন্ম দিয়েছি।'

একথা স্মরণীয় যে তার স্বীকৃতি সূচিত হয় ইউরোপে। এবং তাঁর শিল্পীজীবনের বিকাশে রোদেনস্টাইন, শ্রীমতী আনা পাভলোভা ও শ্রীমতী সিমকীর অবদান ও সহযোগিতা অবিস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীভেঙ্কটচলম-এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য ঃ

'Like Tagore, he was discovered first in Europe, Rothenstein spotted his genious; Pavlova fanned it to a bursting flame; Simkie shared his first triumphs.'

প্রয়োগনৈপুণ্য (Showmanship) ও স্টাইলের ক্ষেত্রে উদয়শঙ্কর শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ প্রয়োগশিল্পীর সমকক্ষ। তাঁর শিক্ষণ ও পরিচালন পদ্ধতি শিল্পীমানসের পূর্ণ প্রতিভাস সৃষ্টিকারী, নৃত্যকল্পনার উপস্থাপন পদ্ধতি ও প্রকরণের সঙ্গে শিল্পীর রূপায়িত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পদ্ধতির সংমিশ্রণ। তাঁর পদ্ধতি শুধুমাত্র রূপাঙ্গ নয়, রূপের পরিমুক্ত প্রাণময় ছন্দ রচনা করে। উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ে শিল্পীরূপে এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবার আমার সুযোগ ঘটেছিল এবং আমার শিল্পীজীবনের উৎকর্ষ ও অভিজ্ঞতার এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমি মনে করি। এই পদ্ধতির পূর্ণচিত্র দিতে গিয়ে রাইনহার্টের শিল্পাদর্শের কথাই মনে পড়ে ঃ

'The methods of regisseur are all but unexplainable; his way of employing not only the tangible materials like actor, lights, dialouge,

movement and setting, but proportion, stress, pace, contrast, interval variety etc. But one may visualise him as he brings the work to stage through years of study, perhaps, and then through weeks and months of rehearsal ; getting it first to come to focus in his own minds eye, then setting out to obtain the right actors and to rig the right stage environment ; in rehearsal showing the pace here, hastening it there, struggling to bring so to the peak of the performance and the centre of attention—at the right moment, building up the sound sequence through one stretch, playing a silence against it at the end ; flowing colour over the performance.'

প্রয়োগবৈচিত্র্যের এই অপূর্ব নৈপুণ্য তাঁর প্রযোজিত শিল্পকর্মে এক রসস্নিগ্ধ মায়াজগৎ সৃষ্টি করে।

উদয়শঙ্কর সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সমালোচক ও মার্গনৃত্যের শিল্পীরা তাঁর শাস্ত্রীয় নৃত্যে দক্ষতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি সমন্বয়ের শিল্পী, শাস্ত্রীয় নৃত্যের রূপ ও রীতি সম্পর্কে তাঁর পূর্ণজ্ঞানের অভাব ছিল না। তবে তিনিও নিজেকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সুদক্ষ শিল্পী বলে দাবী করেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

'আমি নিজেকে কোনোদিনই ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী বলে জাহির করি নি। আমি চিরদিনই সৃষ্টিধর্মী ; তাই যেমন হরপার্বতী নৃত্যস্বপ্নও সৃষ্টি করেছি তেমনি সৃষ্টি করেছি "লেবার এ্যান্ড মেসিনারী", সৃষ্টি করেছি "সামান্য ক্ষতি"।...বহু নামকরা ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী আমার গতিভঙ্গি তাঁদের বহু নাচেই ব্যবহার করেন, অথচ আমি যে একজন খাঁটি ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী নই, এ কথাও বলতে ছাড়েন না। কিন্তু ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা আছে, যাঁদের ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, নিজস্ব ভঙ্গি সৃষ্টি করবার অধিকারও তাদের আছে।'

শিল্পপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এই অনন্য প্রতিভাকে সরকার উপাধিদানে স্বীকৃতি জানিয়েছেন একথা সত্য ; কিন্তু সৃজনশীল প্রতিভাকে সম্মানিত করার শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি উপাধিদান নয়। তাঁকে সম্মানিত করার জন্যে শিল্পীর সৃজনকর্মের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন। আজও প্রয়াণের পরেও তাঁর শিল্পকৃতিগুলিকে জন সাধারণের কাছে উপস্থিত করার জন্যে সরকারী প্রয়াস নেই ; শিল্পীর বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত কলাকেন্দ্র স্থাপন করে দেবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয় না। শতবার্ষিক বৎসরের শ্রেষ্ঠতম নিবেদন 'সামান্য ক্ষতি'র ব্যাপক প্রদর্শনের কোনো আয়োজন হল না। ভবিষ্যৎকালের শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের জন্যে তাঁর প্রযোজিত নৃত্যকল্পনাগুলিকে ফিল্ম করে সংরক্ষণ করার কোনো প্রয়াসও নেই। এ বিষয়ে সরকারী প্রয়াস সূচিত হবে এই আশাই পোষণ করি।

উদয়শঙ্করের অনন্য প্রতিভার দীপ্তিকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েও (১৯২২ সাল থেকে আরম্ভ করে "সামান্য ক্ষতি" প্রযোজনাকাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে এ কথা গভীর দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে তাঁর কাছে জাতির সব প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি।

সূচনায় তাঁর শিল্পকৃতিতে যে ঐশ্বর্য ও অমেয় মুক্তির আবেগ নৃত্যকলায় নবদিগন্ত উন্মেচনের সম্ভাবনা এনেছিল ; উদগ্র আত্মকেন্দ্রিকতা, জীবনবোধে আস্থাহীনতা ও নৈতিবাদ পরবর্তীকালে সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ পরিণতির পথ অবরুদ্ধ করল। ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ হলে ও যে সব সত্য অধীত হলে শিল্পবোধ জীবনবোধের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হত ; নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় মনের আকাশ প্রসারিত করা সম্ভব হত—আত্ম-কেন্দ্রিকতার আবর্তে তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল। ফলে দুর্নিবার প্রাণপ্রবাহের খরস্রোতে নামল না নতুন সৃষ্টির উন্দামতা ; শিল্পকর্ম আবদ্ধ হল পুনরাবৃত্তির সংকীর্ণ বৃত্তপরিধিতে। "গৌতম বুদ্ধ" পরিকল্পনায় শিল্পীমানসের এই বিয়োগান্ত অবক্ষয় শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের ব্যথিত করেছে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে "সামান্য ক্ষতি" পরিকল্পনায় এই মহৎ প্রতিভার শিখাটিকে আবার উজ্জ্বল হতে দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু অপূর্ণতার বেদনা বহন করতে হচ্ছে। ভবিষ্যৎকালের কাছে এত বড় একটা মহৎ প্রতিভা কি শুধুমাত্র একটি নামের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে ? তাঁর শিল্পচেতনার ও প্রয়োগকর্মের সম্পর্কে একটি গ্রন্থও নেই যা ভবিষ্যৎকালের শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করতে পারে।

বৈচিত্র্য ও সমন্বয়ের সাধনায় যে মহৎ শিল্পীর শিল্পকৃতিতে আমরা প্রথম নৃত্য-কল্পনায় আধুনিক যুগের মনোগাহনে অবতরণ করতে পেরেছি ; শিল্পমানসের অবক্ষয়ের এই বিয়োগান্ত পরিণতিকে নৃত্যলোকের সেই রাজপুত্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিল্পলোকের অবসন্ন নিঃসঙ্গ নায়ক রূপে কাটিয়ে গেলেন।

উদয়শংকর-এর আদর্শ অনুযায়ী নৃত্যশিক্ষণ ও প্রযোজনায় শ্রীমতী অমলাশংকর, নরেন্দ্রশর্মা, শচীনশংকর, শ্রীমতী সুন্দরী শ্রীধরনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নৃত্যলোকের রাজকন্যা

The lips are closed, for the dancer has plenty of other voice at his service. —LUCIAN

লুসিয়ানের এই উক্তি নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু প্রায়শই উল্লেখ করতেন। যদিও মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অভিনয়কালে বাচিক অভিনয়েও তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তবুও নৃত্যের বিমূর্ত রূপায়ণই তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতির ছন্দ গতি, রূপ ও রেখাকে দেহভঙ্গির ব্যঞ্জনায় একটি সচল, সুষম নৃত্যপ্রতিমায় জীবন্ত করে তোলায় তাঁর সমকক্ষ শিল্পী বিরল। ইউরিপিডিস বর্ণিত সমুদ্রকন্যার নৃত্যলীলা তাঁকে অভিভূত করেছিল। নৃত্য প্রসঙ্গে আলোচনা কালে তিনি সেই বিখ্যাত উক্তি—

'Folk of the waves astray
Have seen, through the gleaming grey,
Ring behind ring, men say,
The dance of the old sea's daughters'.

তাঁর সুললিত অভিজাত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন।

সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয়—এই তিন শাখাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীতে পাঠ দিয়েছেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও শচীন দেববর্মণ। পিয়ানো শিক্ষা দিয়েছেন প্রখ্যাত মিঃ টি. ফ্রাঙ্কোপোলো। অভিনয় শিক্ষা করেছেন মধু বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখের কাছে। নাচ শিখেছেন গুরু সেনারিক্ রাজকুমার, তারকনাথ বাগচী, কলামণ্ডলম জয়শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যের কাছে। শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের পাঠ নিয়েছেন লোরেটো কনভেণ্ট ও বেথুন কলেজে। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, মাদাম আনা পাভলোভা, ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, স্যার আকবর হায়দারী, শ্রীমতী অম্মু স্বামীনাথন, শ্রীমতী বালা সরস্বতী প্রভৃতি প্রখ্যাত চিন্তানায়ক, দার্শনিক ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে ও স্নেহে তাঁর শিল্পীমানস সমৃদ্ধ হয়েছে। পারিবারিক পরিচয়ে তিনি ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী। সম্ভবতঃ শিক্ষা, রুচিবোধ, বংশমর্যাদা, আভিজাত্য, মনীষী-সান্নিধ্যের এই উজ্জ্বল পরিমণ্ডল—একাধারে এতগুলি সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে কোনও শিল্পী নৃত্যজগতে আজ পর্যন্ত আসেন নি।

নৃত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও শ্রীমতী সাধনা বসুর এই পরিশীলিত মনের পরিচয় আমরা পাই। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য Dream songs of Omar Khyam। এই অসাধারণ প্রযোজনা সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিদগ্ধ সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা নিম্নে উল্লিখিত পত্রপত্রিকার সুচিন্তিত সমালোচনা থেকে অনুধাবন করা যায়—

'If Omar Khyam had been living to-day and seen dance presentation of his famous 'Rubayiat' last night...the inspiration would have come to him seeing Sadhana Bose exqusite rendering of his sentiments and imagery through movements that it might well have been a

problem for the old poet to decide as to which was a more effective medium for popularising his philosophy whether his own singularly beautiful poems or Sadhana's dance interpretation. It wouldn't be surprising if he had cast vote in favour of the later ..'

—Sunday Standard (Bombay)

তাঁর নৃত্য-পরিকল্পনা ও প্রয়োগনৈপুণ্য প্রসঙ্গে–

'Sadhana Bose's ballet now at the Regal Theatre is the most lovely that has been seen in Delhi since Madam Pavlova visited us. In colour composition and movement it is the equal of Russian bellet at its best,'

The Statesman (Delhi)

তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পনৈপুণ্য প্রসঙ্গে–

'Sadhana Bose is an artiste from the crown of her beautiful head to the soles of her hemmed feet which gives one a feeling that an Ajanta fresco or some ancient Sculptured Goddess had suddenly come to life'.— Times of India (Bombay)

নৃত্য পরিকল্পনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী সাধনা বসু ছিলেন প্রগতিশীল ভাবধারার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর নিজের কথায়–

'ভাবধারার ক্ষেত্রে আমার নিজের একটা স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করে রাখি যথোচিত সম্ভ্রম সহকারেই। গতানুগতিকতা কোনও দিনই আমার অন্তরে পায়নি আসন। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটে যাবে অনন্তকাল ধরে এ আমার অসহ্য। অবশ্য পুরোনোকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। পুরোনোকে বাদ দিলে নতুনকে খুঁজে পাওয়া যায় কি? নাচের ক্ষেত্রেও সেই নীতিই আমি অনুসরণ করেছি, বিশেষ করে নৃত্যাংশ রচনার ক্ষেত্রে। তাই আমার তৈরি নাচের মধ্যে পুরনো-পটের উপর নতুনের ছবি আঁকাই আমার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা।'

শ্রীমতী সাধনা বসু ভারতবর্ষের প্রথম নৃত্য-পরিকল্পক যিনি সমকাল ও সমাজ-জীবনকে তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু করেছেন, এ প্রসঙ্গে তাঁর কথায়–

'ঘটনা ১৯৪৪ অব্দের। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর অবস্থা। মন্বন্তর। যুদ্ধের তাড়নায় মানুষ আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছে, এইবার একমুঠো চালের জন্য সে প্রতিটি দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করছে। ডাস্টবিনে কি সাংঘাতিক ভীড়–কুকুর তার খাদ্য খুজছে, মানুষও তার খাদ্য খুঁজছে। সামান্য ভাতের ফ্যানের জন্য অসহায় জননীদের কি লোলুপতা। এক চুমুক ফ্যান পেলেও তো দুঃখিনীর অঞ্চলনিধি, তার বাছার যৎসামান্য ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে।

এই সময়ে হরেনদার কাছ থেকে মধ্যভারত ভ্রমণের প্রস্তাব। "ক্ষুধা"কে কেন্দ্র করে নৃত্যসমূহ রচনা করা গেল। ক্ষুধার চেয়ে সময়োপযোগী পটভূমি আর কি থাকতে পারে, তখন যা দেশের অবস্থা, মানুষের কান্নার যে সুর, সর্বহারার আর্তনাদের যে রূপ, সমস্যার যে চেহারা–সে ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পটভূমি বলতে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ল না।'–

এই সমাজ সচেতনতা সে যুগে বিরল ও বিস্ময়কর। মর্জিনা, রাজনর্তকী, বিষকন্যা মীণাক্ষী, পার্বতী, কুমকুম চরিত্রের খোলস ছেড়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল জীবনশিল্পী সাধনা বসুর। উদয়শঙ্করের মতো মহৎ প্রতিভাও যখন জীবনবোধে আস্থাহীনতা, ইতিহাস সচেতনতার অভাব ও নৈতিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, তখন শ্রীমতী সাধনা বসু প্রযোজনা করলেন শিল্পবোধ-জীবনবোধে অন্তরঙ্গ "ক্ষুধা"।

মঞ্চ ছাড়াও শ্রীমতী বসুর স্বপ্ন ছিল ফিল্ম-ব্যালের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক প্রযোজনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—"কয়েক বছর আগেও ফিল্ম-ব্যালে পরীক্ষামূলক হিসাবে গণ্য ছিল। আজ তা সকল পরীক্ষার গণ্ডী সসম্মানে অতিক্রম করে গেছে। ব্যালে শিল্পী অর্থাৎ যাঁকে ব্যালেরিনা বলা হয়, তাঁকে ক্যামেরার সামনে নৃত্যপ্রদর্শনের সময় কতকগুলি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে—সজাগ থাকতে হবে তার সম্মুখভাগ সম্বন্ধে, তাঁর আলঙ্কারিক পরিকল্পনার সম্বন্ধে, প্রচলিত ভঙ্গি সম্বন্ধে। এ সব বিষয়ে তাঁকে অন্য সময়েও সজাগ থাকতে হবে। মঞ্চের উপর যখন কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন একজন ব্যালেরিনাকে তাঁর সম্মুখভাগ, আলঙ্কারিক পরিকল্পনা প্রচলিত ভঙ্গি সম্বন্ধে যতখানি সচেতন থাকতে হয়, যখন ছবিতে নৃত্যকলা প্রদর্শন করছেন, তখন তাঁকে তারও অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। এর প্রধান কারণ, মঞ্চে তিনি নৃত্য দেখাচ্ছেন উপস্থিত দর্শকের সামনে—এখানে দর্শকের সঙ্গে তাঁর সোজাসুজি যোগাযোগ। এই যোগাযোগ কোন কিছু মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল নয়—এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। ছবির বেলাতেও দর্শকের সঙ্গেই শিল্পীর যোগাযোগ-তবে তফাৎ এই যে এ যোগাযোগ পরোক্ষ, এখানে ক্যামেরা হচ্ছে মাধ্যম। ক্যামেরা যন্ত্রে অনেক কিছুর খুঁটিনাটি অবধি ধরা পড়ে যায়। সেজন্য ছবির বেলা শিল্পীর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ছবির ব্যালে অর্থে অবিরাম ভঙ্গিমা, মঞ্চের ব্যালে অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণের সুযোগ। ছবির ব্যালেতে শিল্পীদের ক্ষেত্রে নানাবিধ সম্ভাবনার চিহ্ন বিদ্যমান, অনেক নতুন নতুন কলাকৌশলের সুযোগ রয়েছে। ছবির মাধ্যমে মায়াজাল বিস্তারের সম্ভাবনাও অনুপস্থিত নয়। মঞ্চে কলাকৌশলের মাধ্যমে মায়াজাল বিস্তরের যতটা সম্ভাবনা রয়েছে, ছবিতে সে সম্ভাবনা আরও বেশি, আরো বলিষ্ঠ, আরো উন্নত। নৃত্যের শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায় যে নাচ সাধারণত প্রেমমূলক, ধর্মমূলক অথবা দৃশ্যমূলক। মোটামুটি এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়—এই পটভূমিকা উপজীব্য করে নৃত্যাংশ কল্পিত হয়। শিল্পীরা যেন বাকশীল মানুষ-প্রজাপতি, সাফল্যের বিজয়োল্লাসের অবিস্মরণীয় মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অর্থান্তর ভূতলে পতন-প্রবণতা। আপন অনুভবনীয় এবং ইচ্ছানুযায়ী গঠনক্ষম শিল্পনৈপুণ্যে দর্শক সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করা শিল্পীদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

ছন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক। ছন্দ কোথায় নেই—ছন্দ এমন বস্তু যা সীমিতির বাঁধন মানে না। জীবনের প্রতিটি লগ্নে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্মে ছন্দ রয়েছে। ছন্দকে বাদ দিলে জীবন নিরর্থক, জীবন রূপহীন। ললিতকলার মধ্যে নৃত্যের স্থান, সেখানেও ছন্দের সংযোগ কম নয়। আমার সাফল্যের মূলে এর অবদানের পরিমাণ অনেক। ছন্দে ছন্দেই নাচের গতি এগোতে থাকে। আমার নিজের জীবনেই প্রথমে বিভিন্ন মঞ্চে নৃত্য

প্রদর্শন, তারপর ছন্দে ছন্দে এগোতে এগোতে চলচ্চিত্রে।

আমার বিশ্বাস ফিল্ম-ব্যালের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের নৃত্যকলার সৃষ্টি হতে পারে। এই নৃত্যকলার উদ্ভব এবং প্রকাশ হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর আঙ্গিকে। সে দিক দিয়ে এর উন্নতির প্রচুর সুযোগ মিলবে। বর্তমান যুগে ছায়াচিত্রে নাচের সুযোগ প্রচুর। সুযোগ অর্থে ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেই বোঝাতে চাইছি, সে সব দিক দিয়ে বৃহৎ। '3—D2' এবং সিনেমাস্কোপের কল্যাণে কোন অসুবিধায় আজ একে পড়তে হবে না। বিগত দিনের তুলনায় আজকের দিনে ছবির জগতে নৃত্যপরিচালকদের সুযোগ, সুবিধা, প্রয়োজন, গুরুত্ব এবং মূল্য অনেক বেশি।

আজ বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যা যোগ, তার ফলে ভারত নিজেকে নানাভাবে উপকৃত করে তুলতে পারছে। বিশ্বজোড়া সহযোগিতায় অর্জনের পথ আজ উন্মুক্ত। আমার জিজ্ঞাসা, আমাদের দেশের প্রগতিবাদী চিত্রনির্মাতারা কেন সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করছেন না? রঙীন কার্টুনের কথা একবারও তাঁদের চিন্তায় আসে না? এ দেশে এখন রঙীন কার্টুন নির্মাণে আপত্তি কি, বাধাটাই বা কোথায়, ওদের দেশে ওয়াল্ট ডিসনীকে এর পথপ্রদর্শক বলা হয়। সিন্ডারেল্লা, স্নো হোয়াইট য়্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফস, য়্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড, প্রভৃতি অসামান্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে ব্যালের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছেন। আমাদের দেশে যে অজস্র রূপকথা ছড়িয়ে রয়েছে, সেইগুলি অবলম্বন করে সুন্দর কার্টুন চিত্র হতে পারে। আমাদের দেশে কাহিনীর অভাব নেই, গল্পের রাজ্য আমাদের দেশ"।

ফিল্ম-ব্যালে সম্পর্কে তার এই চিন্তাধারা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিভিন্ন আঙ্গিকে নৃত্যের প্রসার ও প্রচারে তিনি কত আগ্রহী ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি নিজে করে যেতে না পারলেও আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেন নি। মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও 'বার্থ-অব-ফ্রিডাম' 'উইদার নাও', 'ভুখ্', 'ডিভাইন সোর্স'; 'সমর্পণ', 'অজন্তা'—এই সব দিকদর্শী প্রযোজনার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্তও কোনও উত্তরসাধক অনুসরণ করলেন না। শ্রীমতী বসুর একক নৃত্য প্রযোজনা 'দ্রৌপদী' আজও পর্যন্ত Neo-classical Ballet-এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

শ্রীমতী বসু বলেছেন, 'আমার সংকল্প ছিল, ভরত মুনির হাতে ব্রহ্মার নাট্যবেদ সমর্পণ করার সময় থেকে নাট্যকলার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ধারাকে ব্যালের মাধ্যমে রূপ দেবার। এই প্রচেষ্টা যদি সত্যি সত্যি রূপ নিত, আমার দৃঢ়বিশ্বাস—তা এক বর্ণ-বহুল দর্শনযোগ্য ব্যালেতে পরিণত হত।'

শিল্পীর এ স্বপ্ন সফল হয় নি। প্রত্যাশা করব এক মহান শিল্পীর এই মহৎ শিল্প-ভাবনাকে রূপ দিতে এগিয়ে আসবেন আগামী দিনের কোনও শক্তিমান উত্তর-সাধক।

শিলপ্পদিকারম্ ও আনন্দ বৃন্দাবন

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ থেকে শুরু করে কাব্যে, নাটকে নৃত্যকলা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য ও চিত্র পাওয়া যায়। শুধুমাত্র এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করলে ভারতের নৃত্যকলা সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য যা আজও অজ্ঞাত রয়েছে, তা জানা যেতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় ভাষায় রচিত দুটি বই-এর নৃত্যের ক্ষেত্রে অবদান অসামান্য। একটি হল প্রাচীন তামিল মহাকাব্য "শিলপ্পদিকারম্" অপরটি সংস্কৃত গীতিনাট্য "আনন্দ বৃন্দাবন"। এই দুটি বই থেকে শুধু যে নৃত্য সম্পর্কে সেযুগের একটা ছবি পাওয়া যায় তাই নয়, এই বইয়ে যে বর্ণনা আছে তা অনুসরণ করে সঙ্গীত ও নৃত্যছক রচনা করা যায়। নৃত্য পরিকল্পক ও শিল্পীর পক্ষে এ দুটি বই অত্যন্ত মূল্যবান। সঙ্গীত ও choreography সম্পর্কে এমন নিখুঁত ও বিশদ নির্দেশ অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এ দুটি বই এখনও পর্যন্ত শিল্পীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত নয়। "শিলপ্পদিকারম্" এর তামিল সংস্করণ ছাড়া বিদেশে প্রকাশিত দুটি ইংরেজী অনুবাদ আছে। মূল সংস্কৃত ছাড়া "আনন্দ বৃন্দাবন"-এর একটি বাংলা অনুবাদ (প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর-কৃত) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি বইয়ের সম্পর্কে আলোচনা না করলে ভারতের নৃত্যকলার আলোচনা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সেজন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলির উল্লেখ করছি মাত্র। কারণ বিস্তৃত উদ্ধৃতি ও আলোচনা করলে সেটাই একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হবে।

শিলপ্পদিকারম্ একটি সুপ্রাচীন তামিল মহাকাব্য। রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল। রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ-এর শতক। নায়িকা মাধবী নর্তকী। শ্রীপান্থ-কৃত ভাবানুবাদ উদ্ধৃত করছি ঃ—

"আকর্ণবিস্তৃত চোখ, ঘন পল্লব, খড়্গের মতো নাসিকা। কানে রুপোর কর্ণমূল, কণ্ঠে চন্দ্রলেখা, নাকে হীরাকমল, চোখে কজ্জল রেখা। মাধবী যেন আর এক তিলোত্তমা, অথবা মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত সুর-সুন্দরীদেরই কেউ। সেই গুরু নিতম্ব, উন্নত বক্ষ, ঘন জঙ্ঘা, সুডৌল বাহুবল্লরী, চম্পককলির মতো অঙ্গুলি। তার প্রতি অঙ্গে সেই অবিশ্বাস্য প্রাণভঙ্গি। ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। ডান পা বাড়িয়ে সে চৌকাট অতিক্রম করল। এটাই রীতি। নর্তকী ডানদিকের স্তম্ভটি ঘেঁষে ক্ষণেক দাঁড়াল। সহচরীরা বাঁয়ের স্তম্ভটি ঘিরে মণ্ডল রচনা করল। স্বস্তিবচন উচ্চারিত হল। প্রথম মন্ত্রে দেবলোকের আশীর্বাদ প্রার্থনা করল, দ্বিতীয় মন্ত্রে যাবতীয় অশুভ শক্তিকে বিতাড়ন করা হল। বাদ্যকররা আপন আপন বাদ্যযন্ত্রে হাত দিল। মাধবী আড়চোখে পরিপূর্ণ সভাগৃহের দিকে তাকাল।

নাচ আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। সমস্ত সভার চোখ মঞ্চের ওপর নিবদ্ধ। নর্তকীর মতোই দর্শনীয় মঞ্চ। ওরা বলেন—"কুট্টামবলম"—নৃত্যসভা। দক্ষিণের রাজধানীতে রাজধানীতে মন্দিরের মতোই সেদিন অন্যতম দর্শনীয় নৃত্যসভার পরিকল্পনা, তুলনাহীন

তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য। কমবেশি সব নৃত্যসভাই পরিকল্পনায় এক। কি মন্দিরে, কি রাজপ্রাসাদে। বিরাট বাড়ি, বিশাল হল, হলের মুখে বারান্দা। নিশ্ছিদ্র পাথরের ছাদ। পালিশ করা মসৃণ মেঝে, কাকচক্ষু দীঘির জলের মতো স্বচ্ছ। রং কালো নয়, ঈষৎ নীলাভ। জলের ভেতরে সারি সারি স্তম্ভ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে স্তম্ভের অরণ্য যেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আসলে সেগুলো তিনটি সারিতে বিভক্ত। হলটি তিন-খণ্ডে বিন্যস্ত। কারুকার্য খচিত এই স্তম্ভগুলো তাদের সীমা নির্দেশ করছে। প্রথম সারিতে স্তম্ভ থাকে যদি ষোলটা, তবে তার এক ধাপ ওপরে দ্বিতীয় সারিতে আছে, আটটি। তারও এক ধাপ ওপরে তৃতীয় সারি। সেখানেই মঞ্চ। মঞ্চের নিচের ধাপে বসেছেন বাদ্যযন্ত্রী এবং গায়কেরা, তার পরের ধাপে মান্য দর্শকেরা। মঞ্চের পিছনের দেওয়ালে নানা চিত্র। অধিকাংশ মণ্ডপেই অলংকার হিসাবে খোদাই করা হত, নৃত্যের নানা ভঙ্গীতে মানবী-মূর্তি। সেগুলো পর পর এমনভাবে সাজানো যে নর্তকী সবসময় তার পরবর্তী নৃত্যভঙ্গিটি চোখের সামনে দেখতে পাবে, তালভঙ্গের কোনো আশংকা নেই তার। নৃত্যসভার স্থাপত্য পরিকল্পনায় সেকালে আরও দুটি বিশেষত্ব ছিল। প্রথম বৈশিষ্ট্য আলোছায়ার সমস্যা মীমাংসা। নর্তকী যেখানে নাচবে, সেখানে স্তম্ভাদি এমনভাবে স্থাপিত যে কোনো সময়েই ছায়াপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রাসাদের "কুট্টামবলম" এমন জায়গায় এমনভাবে নির্মিত হত যে, একটি গবাক্ষ খুলে দিলেই রাজ-অন্তপুরের বাসিন্দারা ওপরতলা থেকে অলক্ষ্যে বসে সব দৃশ্য দেখতে পারবেন।

মাধবী তার আবাহন শুরু করল। এটাই নিয়ম। আসর যখন দেবমন্দির নয়, নর্তকী তখন রাজার বন্দনায়ই তার নাচ শুরু করল। আল্লারিপুর লক্ষ্য তখন স্বর্গের দেবতার বদলে মর্ত্যের মানব-শ্রেষ্ঠ।

নাচ এগিয়ে চলেছে। অনিন্দ্যসুন্দর "রেচক" রচনা করতে করতে মাধবী ক্রমে "যতিস্বরম" শুরু করল। 'যতি' কাল্ পরিমাপ=তাল স্বরম্ বাদ্য। গায়কেরা একটি বিশেষ রাগ গাইছে। নর্তকী রূপ থেকে অরূপে উত্তীর্ণ হল যেন; নৃত্য এবং অভিনয় দুই-ই চলেছে এখন। নির্ভুল মুদ্রা নির্ভুল ভাব। মানবী নয়, যেন প্রাণবন্ত কোনো সুবর্ণলতিকা।"

আর একটি বর্ণনায়,—"মান্য অতিথিদের সামনে নেচে চলেছে দেবদাসী। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব। শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ। বিশাল নয়ন। বিম্বের মতো অধর, কম্বুগ্রীবা, সুচারু দর্শন, ক্ষীণ কটি, স্থূল নিতম্ব, পীনোন্নত পয়োধরা, পল্লবিনী বাহুলতা। সাথক নর্তকীর অন্য লক্ষণও তার প্রতিটি ভঙ্গিতে, প্রতি কর্মে। প্রগলভা নায়িকা স্পষ্টতই সুরসিকা, সলজ্জা, তাল লয়ে দক্ষা। 'যতিস্বরম' সম্পূর্ণ করে মাননীয় সভানায়কের শৌর্য, বীর্য, মহত্বের গুণগান গেয়ে 'বর্ণম' শুরু করেছে নর্তকী। আসরের একদিকে সুকণ্ঠ গায়ক। সঙ্গে বীণা, তম্বুরা, নফরী, মৃদঙ্গম, করতাল। কখনও কখনও অন্য যন্ত্রও থাকে,—সুরশৃঙ্গার, সারেঙ্গী, মন্দিরা, নাগেশ্বরম্, বুদবুদিকা। আবহসঙ্গীতে প্রণয়ের সুর, শৃঙ্গার রসাত্মক আবহাওয়া। সুর, ভাব, ছন্দ আর লাস্যের সমন্বয়ে মঞ্চে থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝিলিক, কোনো সুরসুন্দরী যেন বারেক দেখা দিয়েই আবার নতুন ভঙ্গিতে হারিয়ে যাচ্ছে। টানা এক ঘণ্টা নেচে

মেয়েটি থামল। কিন্তু অভিবাদন করে মঞ্চ থেকে নেমে গেল না। যেন সুরে পেয়েছে ওকে। অন্তহীন সুরসাগরে ঢেউ হয়ে ভেসে চলেছে। আপাতত শ্রম বিনোদন করছে—'পদম্' নেচে, সামান্য কাল পদাবলী অভিনয়। পরক্ষণেই আবার সুরশৃঙ্গারে ঝড়ের আভাস, মঞ্চে আবার নতুন ভাস্কর্য, শিরকর্ম, ভ্রূকর্ম, পাদকর্ম—"তিল্লানায়" অবতীর্ণ হয়েছে শিল্পী। অনুষ্ঠান এবার উপসংহারের দিকে।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে কি বিশদ ও নিখুঁত নৃত্যজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন মহাকবি ইলাঙ্গের আদিগল। এখন মাধবীর শিক্ষা, নৃত্যগুরু, সংগীত পরিচালক এদের প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করছি।

'AGASTYA, the famous sage who dwells on the sacred Mount podiyal, had once cursed the son of the god INDRA and the nymph Urvasi for their unseemly behaviour. But Urvasi was forgiven when she displayed her exquisite art on the stage. It was to this noble and adventurous pair that a beautiful girl named Madhavi was born. Her art as a dancer was unequalled. Her shouders were wide, and her flowing hair was always adorned with flowers. For seven years she studied dancing, singing and etiquette, and became accomplished in all these arts.

The teacher, who had trained Madhavi was an expert in the two kinds of dance. He knew how to attune the rhythm of the body to the flow of the song. He taught the rules that keep the breasts independent of the movement of the limbs. He knew the words of every song and could play every instrument. He was a faultless master of movement, gesture, composition and rhythm. He knew which gestures should be made with one or with both hands, which movements are used for mime, and which belong to the dance. Familiar with the most subtle secret of the great art, he always kept the simple gestures seperate from the complex, and never confused pure dance with character dancing. In footwork he carefully distinguished pure rhythm from rhythm suited to song.'

এ থেকে আমরা দেখছি শুদ্ধ নৃত্য ও নৃত্যাভিনয় এই দুই-এর পার্থক্য ও প্রয়োগ তখন থেকেই কত সুস্পষ্ট ছিল। সঙ্গীত পরিচালক প্রসঙ্গে—

'Madhavi's music master was an expert performer on the yazh and the flute. He could vocalise, and could draw from the drums well-rounded sounds, mellow and deep. He could adopt the music to the dance, and understood which style best suited each technique of expression. He had a profound knowledge of the subtle intricacies of the classical melodies, yet he could invent new variations. He taught

the various styles of dance and of music, and brought out the most subtle shades of the composer's intention.'

এ থেকে আমরা সঙ্গীত নাট্য-আবহ ও নৃত্য পরিকল্পনায় একটি সমতান সৃষ্টি করার যে প্রয়াস তখন থেকেই প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাই। এই মহাকাব্যের একটি বিস্তৃত অংশই নৃত্যকলার প্রসঙ্গ। সব উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। Choreography-র একটি সুন্দর পরিকল্পনার ছবি তুলে ধরে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। শুধু মনে রাখতে হবে যে এরকম অসংখ্য নৃত্য ছক্ এ বই থেকে পাওয়া যাবে। আলোচ্য নাচটি হল গোপিনীদের নৃত্য—The dance of the cowgirls.

'When the seven maidens had each taken from the herd the bull that she had brought up, Madari placed the girls in line and gave each a role to play. From West to East, she called them SA, RI, GA, MA, PA, DHA, NII ; SA Played the part of the krishna. PA was the valiant Balarama ; high-pitched NI was Pinnai, the devine cowherdess. The others were given their names in order. Pinnai, (Ni) stood near krishna (SA), MA and DHA joined the white Balarama (PA), GA came next to Ri, and the honest DHA stood to the right of Ni.

They stood in a circle, holding each others hands in the crab clasp, and all began to dance. First the girl who was SA looked at her neighbour RI and said : 'lets sing the mode of jasmine for him who uprooted the demon disguised as a citrus tree that stood in the middle of the great meadow.'

SA first gave out her low note, next PA her medium sound and then NI her high pitch. Lastly, the girl who was DHA sounded her note, less high-pitched than that of her neighbour Ni.

The flower garlands in disorder fell
Out of the cowgirl's dark and curly hair,
While they were marking time by clapping
hands loaded with gold bangles.
Lets all sing masks song honouring the god
who rides upon the bird, Garuda.
Hail to him ! Hail to him ! Hail to him !

এ যেন গানের স্বরলিপির মতো Choreography-র নৃত্যলিপি। কত অনায়াস নৈপুণ্যে তা বিধৃত করেছেন খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে মহাকবি ইলাঙ্গের আদিগল। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর আশি-এর দশকেও এই মহাগ্রন্থের প্রচার ও অনুবাদ নেই। New directions (New York) থেকে প্রকাশিত ALAIN DANIELOU কৃত অনুবাদ-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল।

দ্বিতীয় মূল্যবান গ্রন্থটি হল, কবি কর্ণপূর বিরচিত আনন্দ-বৃন্দাবন। সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে রচিত। চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে অনেকেই নৃত্য-গীত পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে বক্রেশ্বর, রায় রামানন্দ ও কবি কর্ণপূর উল্লেখযোগ্য। ওড়িষী নৃত্যে রায় রামানন্দের অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

হরিবংশে উল্লিখিত হল্লীসক নৃত্যের একটি বিশদ তাল লয় সঙ্গীত মুদ্রা নির্দেশ সহ প্রয়োগ পরিকল্পনা "আনন্দবৃন্দাবন" গ্রন্থে আছে। অভিনব গুপ্তের মতে "মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকমিতি স্মৃতম্"। নীলকণ্ঠের মতেঃ "হল্লীসকং বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ সহনৃত্যম্।"

হরিবংশে আছে ঃ

'তাস্তু পঙক্তিকৃতাঃ সর্বাঃ রময়ন্তি মনোরমম্।

গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বয়ো গোপকণ্যকাঃ।

কৃষ্ণলীলানুকারিণ্য কৃষ্ণ প্রণিহিতেক্ষণাঃ॥'

হল্লীসক নৃত্যের যে নির্দেশ "আনন্দবৃন্দাবন" গ্রন্থে আছে তা যথাযথ অনুসরণ করলে ঐ নৃত্যের সম্পূর্ণ রেখাবলী উপস্থাপন করা সম্ভব। "আনন্দবৃন্দাবন" থেকে ঐ অংশটি উদ্ধৃত করা হল। অনুবাদ করেছেন প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

১. কৃষ্ণবাণীর ভাবালুতায়, মদ না খেয়েও যেন মাতাল হয়ে উঠল রমণীরত্নদের সেই সভা। কৃষ্ণমুখের সুধাধারায়, আগুণ নিভে গেল যেন তার অন্তরের। বিপুল মধুরিমায় উজ্জ্বস্তনের মধ্যে, জয়ধ্বনি করে উঠল সেই সৌভাগ্যবতী সভা। কি তার তখনকার সেই লাবণ্য-বিথার রূপ! কোটি মদনের যেন নত হয়ে গেল বাণ।

সভাস্থ সমস্ত বিস্ময় যেন নয়ন হয়ে দেখতে লাগল···নয়নের বিস্ময়কে, নয়নের উৎসবকে।

২ তরঙ্গিত হয়ে উঠল কৃষ্ণেরও কৌতুক। মুহূর্তে মনস্থ করলেন···তিনি নাচবেন। তিনি নৃত্য করবেন "হল্লীসক নৃত্য"। কোন অসাধারণ নট···কোনদিন··· আবিষ্কার করতে পারেননি এই নৃত্য; একমাত্র শুভব্রত ভরতমুনিই অভিনায়িত করেছিলেন এই নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ মনস্থ করলেন···তাল বন্ধ মণ্ডল ভেদে তিনি স্বয়ং হল্লীসক নৃত্যেই দান করবেন রাসলীলার রূপ। এই লাস্য বিশেষের মধ্যে এতটুকুও স্থান নেই···লেশমাত্র আবিলতার। আহা, কি আনন্দেই না ভরে উঠবে প্রাণপ্রিয়া ব্রজগোপীদের মন! ঐ যে তাঁর চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে প্রণয়িনীদের সদয় সমাজ, রমণীয় রত্নখণ্ডের যশঃং.তাকার মতো যে সমাজ ঐ কাঁপছে, সেই সমাজের মনের মধ্যে আধান করে দিতে হবে এর আনন্দ।

৩. তাই বিশ্বের যিনি একমাত্র বিস্ময়, তিনি বলে উঠলেন,—'হে আমার প্রেয়সী সমাজ, আশাকরি আপনাদের আনন্দিত করতে পেরেছে আমার আশ্বাসবাণী। মণ্ডল রচনা করে এবার আমার চতুর্দিকে আপনারা দাঁড়ান। চেয়ে দেখুন, ঐ যমুনার পুলিনে···কতদূর···আহা কত দূর···ছড়িয়ে পড়েছে ওর সৌন্দর্যের শুভ্রমায়া। এতটুকুও কোথাও নেই কাঠিন্য। যেন পড়ে রয়েছে ঘন সারের সার ছড়ানো একখানি সমতল ক্ষেত্র। যেন যমুনা দেবীই প্রকাশ করে দিয়েছেন নিজের নিরঙ্কুশ কল্যাণময় হৃদয়।

এইখানে মণ্ডল রচনা করে যদি আপনারা দাঁড়ান, তাহলে যথাযথ বোধগম্য হবে এই পুলিনের অবস্থান, বুঝতে পারা যাবে, এখানে মানানসই বা মাপসই হবে কিনা আপনাদের পরিমণ্ডল।'

৪. অচিরে উত্তর দিলেন ব্রজগোপীরা,—

'না না তা হয় না। মণ্ডল রচনা করে আমরা দাঁড়ালে আপনি আপনার ঐ নীলকমলজয়ী রূপের ছটা নিয়ে আমাদের কাছ থেকে অনেকদূরে চলে যাবেন। ও-কথা ভাবতেও ভয় হয়, হৃদয় কাঁপে। না না, দূরে চলে যাবার উৎসাহ আমাদের নেই; আর আমরা নতুন করে সইতে পারব না দুঃখ।'

৫. পুনর্বার বললেন শ্রীকৃষ্ণ—'আশাকরি আমার শিক্ষণ কৌশল তোমরা দেখবে। পৃথিবীতে রসের খেলায় কে পারবে আমার মতো তোমাদের সকলের মাঝখানে থেকেও, ক্ষিপ্রভাবে বিভ্রান্ত প্রমাণ করতে, ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেককে অনুরঞ্জন করতে, রঞ্জিত করতে করতে নিত্য নিকটে প্রকট হয়ে থাকতে প্রত্যেকের?'

তাঁরা স্থির করলেন···মণ্ডল রচনা করবেন এবং তাই ইনি-ওঁর উনি-তাঁর হাত ধরাধরি করে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন যমুনার পুলিনে, বন্ধানুবন্ধ ক্রমে, লীলায়িত তনুলতায়···জ্যোৎস্না সমুদ্রের ভাঙা ঢেউগুলির মতো আনন্দ!

৬. অনিন্দসুন্দর···ঐ ধীরে ধীরে বলয়াকারে মণ্ডলগুলির ছড়িয়ে পড়াটি, এর এক-একটি নাট্য বিস্তার···হৃদয় নিয়ে যায় এক একটি ভাবের রাজত্বে, নয়নকে পেঁছিয়ে দেয় এক-একটি ছবির রাজত্বে, আনন্দকে নিয়ে যায় এক একটি ব্যঞ্জনার রাজত্বে।

প্রথম যখন চমকে উঠল সেই মণ্ডল তখন মনে হল, কৃষ্ণ মনোরথ মহীরুহের যেন প্রোথিত রয়েছে মহামূল, আর মরি মরি একখানি সোনার আলবাল যেন তার চতুর্দিক ঘিরে প্রতিরোধ করছে প্রণয় সুধাসলিলের নিঃসরণ।

তারপরই মণ্ডলের লাস্যরূপ গেল বদলিয়ে। তখন মনে হল···মহামত্ত এক কৃষ্ণবলভ রয়েছে দাঁড়িয়ে, আর তাকে বন্দী করবার অভিপ্রায়ে যেন কোনো বিলাসরস-সম্রাট বলয়ের মতো গোল করে নিক্ষেপ করছেন তাঁর সোনার ফাঁস।

তার পরেই বিস্তারের চেহারা বদলিয়ে গেল মণ্ডলের ছবির, ছবি যেন দেখিয়ে দিলে···কৃষ্ণ মনোমীনটিকে ধরবার আগ্রহে যেন আকুল হয়ে কন্দর্প ধীবর ছড়ালেন তার বলয়াকৃতি কাঞ্চন জাল, আর জালের মাথায় মাথায় সাজানো রয়েছে শুকনো লাউয়ের ভেলার বদলে কুচ কোরকের অরুণবরণ ভেলা।

তার পরে বিস্তারেই মণ্ডলটি যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল···কৃষ্ণবন্দী জ্যোৎস্না দুর্গের স্বপ্নে, তোরণে তোরণে যার বসানো হয়, সোনার মণ্ডল ঘটের মতো ব্রজগোপীদের চন্দ্রানন, শিখরে শিখরে অসংখ্য তিমির পতাকার মতো কাঁপছে গোপীদের মুক্তবেণীর চঞ্চল দণ্ড।

যতই ছড়িয়ে পড়ল ততই বাড়ল যেন মণ্ডলের চিত্ররূপ। একবার মনে হল, ও বুঝি বিলাসময় পৃথিবীর সোনায় বাঁধানো কানবালা; আবার মনে হল, না না, নিশ্চয় পুলিন-লক্ষ্মীর বুকের উপরকার চাঁপাফুলের গোড়ে···নিশ্বাসে কাঁপছে।

একবার মনে হল, ও বুঝি কৃষ্ণ-রত্নসানুর চতুর্দিকে কৈলাস পর্বতের কনক বলয়; আবার মনে হল, না না, ও বুঝি বা হবে পূর্ণজ্যোতি কৃষ্ণ কলানিধির মহাপরিধি

নাচতে নাচতে আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ল ব্রজরমণীদের এ রত্নমণ্ডল। মণ্ডলের ভ্রমণ দেখতে মনোরম ভ্রমও যে দেখতে থাকবে কবির মন, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

তিনি যেন দেখলেন,—জাগতিক সমস্ত রতি রসের কুলালচক্র, নাচছে, আর তার কেন্দ্রে যেন সৃষ্টি হয়ে চলেছে শিল্পসার এক অপূর্ব মঙ্গলঘট।

তিনি যেন দেখলেন,—এক মূর্তিমান চিত্রকাব্যের বিবরণ, যার পাতায় পাতায় ঝরছে সুখ, যার একপদে অনুলোম ও অন্যপদে প্রতিলোমের লীলা, যার একাক্ষর রয়েছে চরণ এবং যার নটন-ভাষায় ফুটে উঠেছে অদ্ভুত লালিত্য।

তিনি যেন দেখলেন,—এক শব্দালঙ্কারের নাচ, যেখানে বিরাজ করছে সদাশ্লেষ, যেখানে নিত্য চলেছে ছেকবৃত্তির অনুপ্রাস এবং যেখানে ঝকমক করছে পুনরুক্তবৎ "আভাস" নামক অলঙ্কার! এক দোলে তো তিন খোলে।

তিনি যেন দেখলেন,—একটি নয়নের স্বপ্ন···তারকাটি যার কৃষ্ণ। তিনি যেন দেখলেন,—দুলছেন ছন্দ···সমভাবে ও বিষমভাবের রমণীয় ভাবালুতায় আদ্র হয়ে।

তিনি যেন দেখলেন,—যমুনা পুলিনের কর্পূরশুভ্র বালুকায় চমকাচ্ছে এক বলয়াকার রমণীমণ্ডল, হঠাৎ ফুটে-ওঠা অজস্র কাঞ্চন কল্পলতার একটি স্বপ্ন···যাদের শাখায় ডগায় ডগায় দর্শনীয় হয়ে উঠেছে আলিঙ্গনের বৈশিষ্ট্য, যাদের পাতার মাথায় মাথায় লোভনীয় হয়ে উঠেছে স্বেদসম শিশিরের শোভা।

৭ ইত্যবসরে কখন যে দেবী যোগমায়া সেখানে এসেছেন, কখন যে তিনি তৎকালোচিত কঙ্কণে-গুণ্ঠণে সাজিয়ে দিয়েছেন ব্রজগোপীদের কারোর চোখে পড়ল না তা। কৃষ্ণের কেবল ভরে উঠল মন, কেবল তাঁর অতি মনোরম লাগল সেই অলঙ্করণ। আর বলিহারি যাই কৃষ্ণের হৃদয়ানুরঞ্জনের বহরখানি ও দেবীটির। ···তাঁর কৃপায়, বিপুল হর্ষের মধ্য দিয়ে প্রথমেই সেই রমণীসমাজ দেখতে পেলেন, মণ্ডল আলো করে কৃষ্ণের সঙ্গেই মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করছেন···যেন চিত্রীভূত···তাঁদের বৃষভানুনন্দিনী, যিনি অসামান্যা, যিনি সর্বমান্যা, যিনি ব্রজরমণীগণের মুকুটমণি।

৮ তারপরে সেই মণ্ডলীর ভাবনা হল, বেশি ছড়িয়ে পড়ছেন না তো তাঁরা ? যদি সে পালায়, যদি সে পালায়! অতএব, গায়ে গায়ে সেঁটে দাঁড়াতে লাগলেন তাঁরা,···গাঢ়বন্ধ দিয়ে কবিতার শিথিল বন্ধ দোষটাকে দূর করে দেন যেমন করে কবি।

ইনি ওঁর কাঁধে, উনি এঁর কাঁধে, বাহুমূল বিন্যস্ত করে মণ্ডলে মণ্ডলে দাঁড়ালেন আভীরিণীরা।

৯. মাঝখানটিতে দাঁড়িয়েছিলেন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। হঠাৎ তাঁর চরণে জাগল সরসতার গতিমান এক আবেগ! তিনিও প্রবেশ করলেন, আর শিথিল হয়ে খুলে যেতে লাগল দুটি রমণীর প্রত্যেকের অংশতট। পুরঃপশ্চাদ্ভাবে তিনি প্রবেশ করলেন তাঁদের মধ্যে। দুটি দুটি করে গোপীদের মাঝখান দিয়ে ভুজবন্ধনে তাঁদের কণ্ঠ জড়িয়ে, বিভ্রান্ত তাণ্ডবে শৃঙ্গাররসের সমস্ত হাবভাব বিকশিত করতে করতে; অলাত চক্রের মতো ভ্রমণ করতে লাগলেন তিনি। অদ্ভুত অত্যদ্ভুত সেই ভ্রমণ, সেই রাসতাণ্ডব যোগেশ্বরের। প্রতিলোম ও অনুলোম ক্রমে যেন সৃষ্টি হয়ে যেতে লাগল একখানি চিত্রক্যব্য, গোমূত্রিকা বন্ধপ্রায়। কলাবতীরা সকলেই মনে করতে লাগলেন···তাঁরই রয়েছেন কৃষ্ণ, তাঁকেই ঘিরে নাচছেন কৃষ্ণ, তিনি তাঁর, তিনি তাঁর,···এমনি স্যন্দমান হল রাসতাণ্ডবের ক্ষিপ্রতা।

একজনের দক্ষিণস্কন্ধে তাঁর দক্ষিণ ভুজ বলয়, একজনের বামস্কন্ধে তাঁর বাম ভুজ বলয়, একসঙ্গেই দুটি কান্তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সঘন আলিঙ্গন করলেন কৃষ্ণ। তারপরে তাঁদের দু-জনের দেওয়া পথ ধরে একজনকে পিছনে ছাড়তে ছাড়তে এবং অপর একজনকে সামনে টানতে টানতে, আবার নিমেষে কৃষ্ণ তড়িৎ-নর্তনে এগিয়ে গেলেন আর দু'টি কান্তার যুগপৎ আলিঙ্গনের নিবিড়তায়। এমনি ধারায় ছুটে চলল সেই নৃত্য।

১০ প্রতিলোম ও অনুলোমে ভ্রমণের কৃপায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে লাগল এই অদ্ভুদ নৃত্য-কাব্যের গোমূত্রিকাবন্ধন ; পুরঃপশ্চাৎ সমালিঙ্গনের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে লাগল এই অদ্ভুত নৃত্যের লাঘব কৌশল। ব্রজগোপীদের সঙ্গে জোড়ে জোড়ে এই নৃত্য করতে করতে কৃষ্ণ আবার যখন এই প্রণালীতে নৃত্যোন্মত্ত হয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যগতা প্রধানা সখীদের সঙ্গে, তখন যেন ঝরণা খুলে উৎসবমুখর পরম কৌতুকের আনন্দের।

১১. প্রচণ্ড বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে, মুখাবলোকনের আশায়, জ্যোতিশ্চক্রের মতো ঝুলতে ঝুলতে, অম্বরতলে ভিড় জমিয়ে ফেললেন সস্ত্রীক চারণেরা, কিন্নরেরা, সিদ্ধ-সাধ্য গন্ধর্বেরা, বিদ্যাধরেরা। বিমানে বিমানে যদিও ছেয়ে গেল আকাশপথ, তবু কোথায় যেন ভেসে গেল তাঁদের মান এবং তাদের মর্যাদাবোধ। লেখাজোখা নেই এত এসে দাঁড়ালেন রেখাশ্রেণীর মতো দেবতারা।

১২. বাজতে আরম্ভ হয়ে গেল দেব-দুন্দুভি দিব্যবাদ্য। ললিত মুরজবন্ধ চিত্রকাব্যের ন্যায়, সুছন্দ খর-বোল বেজে উঠল মুরজ ; বেজে উঠল নির্দোষ মৃদঙ্গ ; আনন্দের বিকি-কিনির যেন হাট খুলে বসল পণব। আলিঙ্গ্য অংক প্রভৃতি কত মৃদঙ্গে, কত আনন্দে, কত দুন্দুভিতে নাটকীয়ভাবে যে মুখরিত হয়ে উঠল সমুদ্রগম্ভীর আনন্ধ ধ্যান তার ইয়ত্তা নেই। বাজল বাঁশী, বাজল বীণা, আকাশে আকাশে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ পক্ষধ্বনি বিহঙ্গের।

১৩. স-ভ্রমর ফুল ছুড়তে লাগলেন, না না, কাজলটানা চোখের জলের যেন আনন্দ-বৃষ্টি করতে লাগলেন···নন্দনবনের বনবিহারিনীরা। অঙ্গনাদের সঙ্গে নিয়ে সহর্ষে গান আরম্ভ করে দিলে গন্ধর্বেরা ; ললিতকণ্ঠে উঠল যশোদানে নব যশোগান।

ব্রজগোপীদের ও শ্রীহরির তখন পায়ে পায়ে বাজছে···হল্লীশ নৃতের তালবিভংগ, গতিভেদ ছন্দ। রুণ-রুণ করে বাজছে মুখর নূপুর, কিণ্ কিণ্ করে বাজছে কংকণ-কিংকণী। কি তাদের মধুরোল। একরোলের বিকিরণ যেন শ্রবণের অমৃত···নষ্ট করে দিতে চায় অমৃতভোজীদের রসনার রস।

দু'টি দু'টি করে সুদর্শনা কান্তা···আলিঙ্গন ভ্রান্তা,···আর তাদের মাঝখান দিয়ে নৃত্য বেগে অনুপ্রবেশ করে চলেছেন নীলাঞ্জনবর্ণ ঘনশ্যাম, কি অশ্রান্ত নৃত্য। কি অদ্ভুত সুন্দর এই মণ্ডলীর মাল্যরূপ। আকাশ থেকে একি দেখছেন তাঁরা···দেবতারা ? এ 'মালা' যে সব মালাকেই হার মানিয়ে দিলে !

একি জ্যোৎস্নায় আর তিমিরে গাঁথা মালা ? একি দামিনী আর মেঘে বিনোট মালা ? এ কোন চম্পক আর কুবলয়ের মাল্য ? এ কোন কাঞ্চন আর ইন্দ্রমণির ফুলহার ?

১৪ কখনও কখনও আবার গোমূত্রিকাবন্ধ পরিত্যক্ত হয়ে স্বচ্ছ ভূমিতেই আরম্ভ হয়ে গেল···শ্রীকৃষ্ণের চক্রাকার নর্তনের আবর্তন। বেঁকে বেঁকে দুলতে লাগল বীরবৌলি··· দু-কানে ; বুকের উপর নাচতে লাগল মন্দারের মাল্য ; কিণ্ কিণ্ কণ্ কণ্···বাজল

কাণ্ডী, বাজল কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ; গা থেকে খসে পড়তে লাগল উত্তরীয় শ্রীকৃষ্ণের ; চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ। আর সেই মেঘ চক্রাকার সর্বব্যাপী আলোক তরঙ্গে মৃগনয়নারা সকলেই ভাসতে লাগলেন···নব-স্থির যেন বিদ্যুতের দল।

১৫. এই নাচ নাচতে যা ঘটল, তা অত্যাশ্চর্য এবং সম্পূর্ণ বিচিত্র। কনক-মণি কণিকার মতো কেন্দ্রস্থিতা শ্রীরাধিকাকে ঘিরে হ্রস্বাবর্তে নাচতে নাচতে দীর্ঘাবর্তে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ পেঁাছে যেতে লাগলেন মণ্ডলস্থিতা প্রিয়াদের সান্নিধ্যে। অন্তর্মণ্ডল ও বহির্মণ্ডলে একসঙ্গে এই বিভ্রান্তি ঘটিয়ে বারংবার পরিভ্রমণ করতে লাগলেন শ্রীহরি। সে কি অদ্ভুত সরস নাচ ! ···সুতোর বাঁধন খুলে কে যেন তাঁকে সবেগে ঘুরিয়ে দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে···একজোড়া খেলনার চাকার মতো পান্নার ; আর সেই যুগ্ম লীলাচক্র বন বন করে ঘুরছে, আবেষ্টন করে পান্নার দু'টি মণ্ডল···যুগপৎ।

এই অত্যদ্ভূত চক্র-ভ্রমরী-নৃত্য দেখে চমকে উঠলেন তৌর্যত্রিকের (নৃত্য-গীত-বাদ্য) দেবীগণ তাঁদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড নৃত্যবাসনা। তনু গ্রহণ করে তাঁরা উপস্থিত হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

১৬ আর কি তখন ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারেন নৃত্যগীত বাদ্যোধ্যায়ের উপাধ্যায়েরা ? তাঁরাও পেঁাছে গেলেন তাঁদের দেবীদের চরণোপাসনায়। অপরিমিত আনন্দের আবেশে দেবীরা প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করতে লাগলেন নিতান্ত নৈপুণ্যবতী !

তাঁরা প্রথমেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন হস্তাধ্যায় দেবীকে।

এই দেবীটির প্রধান কার্য হচ্ছে, হস্ত-পদের অঙ্গুলিগুলির বিশিষ্ট বিন্যাসের মাধ্যমে পদার্থের আকৃতি প্রকট করা, এবং তন্মূলে রক্তি জন্মিয়ে দেওয়া নর্তনে। তিনি এলেন এবং এসেই···তর্জনীমূলে লীলাভরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ঠেকিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরভাবে অন্য করাঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করে এমন সুষ্ঠু প্রকাশ করলেন পতাকা নামক হস্তক-ভেদ, যে মনে হল ধনিক মণিকাদের গৃহে গৃহে সত্যই বুঝি ললিত পতাকা উড়ছে।

তারপরে তিনি দেখালেন ত্রিপতাকা মুদ্রা। পতাকা হস্ত রচনা করে এমন লীলাভরে তিনি বাঁকাতে লাগলেন অনামিকাটি, যে মনে হল যাজ্ঞিকদের সত্রে সত্রে যেন পতাকার মতোই হোমধূমাবলী উঠছে।

তারপরে, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমা—এই তিনটি অঙ্গুলিকে মিলিতাগ্র করে, এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাটিকে পৃথক পৃথক ভাবে উধর্বমুখী করে এমনভাবে তিনি প্রকাশ করলেন হংসাস্য মুদ্রা, যে সকলেরই মনে হল তাঁরা যেন সত্যিই দেখছেন একটি হাঁসের মুখ, আর সেই মুখটি যেন ধীরে ধীরে নাড়ছে, না না নরম করে নিয়ে চিবোচ্ছে একগাছি মৃণাল সানন্দে। এইভাবে তিনি তাঁর অঙ্গুলি ভঙ্গে কত যে প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাতে লাগলেন হস্তক-মুদ্রার, ইয়ত্তা নেই তার। দ্বিতীয়ার চাঁদ এঁকে গেল···কস্তুরীমুখ। টিয়ে পাখীর ঠোঁটের মতো দেখতে ঐ রাঙা রাঙা পলাশকলিগুলোকে যেন ফুটিয়ে দিয়ে গেল তাঁর হাতের শুকতুণ্ডাখ্য মুদ্রা।

সাঁড়াশী দিয়ে তপ্ত সোনার সুতো টেনে বার করবার নাটক দেখিয়ে গেল সংদংশমুদ্রা। ঘটকবাদ্য বাজাচ্ছেন মহাদেব···এই ছবিটি ফুটিয়ে তুলল ঘটকমুখ-মুদ্রা। পদ্মকোশে উৎকণ্ঠিতা মধুকর শ্রেণীর যেন গুঞ্জন শোনাল পদ্মকোশ-মুদ্রা। সাপুড়ে সাপধরার খেলা দেখিয়ে গেল অহিতুণ্ডক। অঙ্গুলিগুলি যে সীবন শিল্পকলায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে,

এই ভঙ্গীটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করে দিল সূচীমুখ। মৃগশিরা-নক্ষত্রযুক্ত অঘ্রাণ পূর্ণিমার স্বপ্ন দেখিয়ে গেল মৃগশীর্ষ-মুদ্রা। অষ্টমীর চাঁদ আঁকল অর্ধচন্দ্র-মুদ্রা। কত আর বলি বলুন, কার্তবীর্য মূর্তির মতো সেই বিশুদ্ধ সহস্রহস্তা হস্তাধ্যায় দেবীকে অনুগৃহীত করতে দ্বিধা করলেন না তৌর্যত্রিকের দেবীগণ।

এদের পরেই এলেন··হরিবিলাস স্বরার্থাদি ও স্বরপাঠ বিরুদাদি সম্বলিত নানা প্রবন্ধাদির, এই ধ্রুবার যিনি গান-দেবতা, তিনি। তাঁর কৃপায় প্রকাশ পেল দুটি মার্গতাল··চচ্চৎপুট ও চাচপুট; তিনটি দেশী তাল···হংসলীল, গজলীল ও সিংহ-নন্দন; প্রকাশ পেল এইগুলিরই মতো আরো অনেক মহাতাল। আদিতাল, একতালী, ত্রিতাল, প্রতিমণ্ঠ, নিসারু, যতিতাল, ত্রিনুট ও আড়ক তালেরও পরিচয় দিতে বিলম্ব করলেন না তিনি।

তিনি বিদায় নিতেই, প্রবেশ কবলেন দেশীয় গান দেবতা, তিনি শুনিয়ে গেলেন দ্রাবিড়, তৈলংগ ও পাশ্চাত্য দেশীয় গান।

তারপরেই ঝংকাব তুলে আবির্ভূত হলেন···মালব, মল্লার, ভৈবব, কেদার, সারঙ্গ, নট, কর্ণাট, কামোদ, সাম, সোহাগ, গান্ধার, বঙ্গাল, বসন্ত-আদি-রাগসমূহ; এবং আবির্ভূতা হলেন··গুর্জরী, বিপুল-গুর্জরী, বারাটী দেশিকা, ভৈববী, বেলাবলী, রামকিরী, ধন্নাসিকা, শ্রী, পালী, গৌরী, তোড়ী, গোণ্ডগিরী, কল্যাণিকা, পৌরবী, সৈন্ধবী, শোভনবতী, আশাবরী, দেশবড়ী, গোড়ী, পটমঞ্জরী, ললিতা, দেবক্রী, মগধী, কৌশিকী প্রভৃতি রাগিণীগণ।

এঁদের মধ্যে এলেন·সপ্তস্বর, একবিংশতি মূর্ছনা, তিনগ্রাম, অষ্টাদশ জাতি, দ্বাবিংশতি শ্রুতি এবং মাতু ও ধাতুদেবতা।

এদের সকলের আবির্ভাবে তৌর্যত্রিকের দেবীগণের মনে হল, তারা যেন আবির্ভাব দেখলেন মূর্তিমতী নানাধ্যায়–লক্ষ্মীর। অনুগৃহীতা হয়ে তিনি বিদায় নিতেই আবির্ভূতা হলেন বাদ্যধ্যায়ের দেবতা। তাঁকে আশ্রয় করে মধুর কলধ্বনি তুলে প্রথমে এলেন বংশী, মুরলিকা, পারিকা, উপাঙ্গাদি বিবিধ শুষির বাদ্য; তারপরে এলেন ঝংকারিণী বীণার দল, যথা–মহতী কবিলাসিকা, বিপঞ্চ, স্বরমণ্ডলিকা, কচ্ছপী, রুদ্রবীণা, কিন্নরীবীণা; তারপরে এলেন বিবিধ আনদ্ধ-বাদ, যথা–মৃদঙ্গ, ডম্ফ, ডমরু; শেষে এলেন ঘন-বাদ্য, যথা–মন্দিরা, ঘুঙুর, করতাল।

অনুগৃহীতা হয়ে এঁরা যখন সরে দাঁড়ালেন তখন বিলম্বিত ও মধ্য-লয়ে কান্তি প্রকাশ ক··ত করতে লীলাঙ্গনে আবির্ভূতা হলেন অঙ্গহারশ্রী।

১৭. তিনি প্রস্থান করতেই তাঁদের মধ্য থেকে এবার উঠে দাঁড়ালেন কয়েকটি বীণা-ধারিণী। কবিলাসিকা বীণার তাঁরা কর্তার দেখাতে লেগে গেলেন স্বরমণ্ডলিকা, বিপঞ্চিকা, মহতী, রূপবতী ও তুম্বুরী বীণার।

বিস্মিত হলেন দেবতারা। আসন্ন রাসলীলা-রহস্য এ যেন সঙ্গীত শাস্ত্রের উপনিষদ-গুলির মূর্তি আবির্ভাব। পদ্মের কুঁড়ির মতো তাদের প্রত্যেকটি মুখে সে কি সরস হাস্যের শৌখিনতা। তাঁদের দেখাদেখি মৌরজিকীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন বীণাবাদিনীরা ও চিত্র বেণুবাদিনীরা। এলেন গায়নীরা, তালধারিণীরা। করাঙ্গুলির বিচিত্র মুদ্রার খেলা দেখাতে দেখাতে এলেন ঔপঙ্গিকীও।

তারপর নক্ষত্রের মতো ঝলমল করতে করতে নাচতে নাচতে এলেন বর-নর্তকীরা। কথা বলে বলে গান গাইতে গাইতে তাঁরা লাস্যনেতৃত্ব করলেন শুদ্ধাঙ্গ শুদ্ধতর কর্কশ-মার্গের। তাঁরা প্রত্যেকেই যেন সঙ্গীততন্ত্র রহস্যে পারদর্শিনী।

যে গান গাইতে গাইতে তাঁরা নাচলেন, মার্গ ও দেশীয়-ভেদে সে গীত দ্বিবিধ। চচ্চৎপুটাদি পঞ্চপ্রকারে বিভিন্ন তালের খেলা দেখিয়ে তাঁরা প্রকাশ করলেন চৌত্রিশ রকমের মার্গ-প্রভেদ, এবং বিয়াল্লিশ রকমের দেশীয় প্রভেদ।

১৮. অতএব স্বয়ং উল্লসিত হয়ে উঠলেন তালপাঠ। ফুটল বোল—

'থৈয়া ত থ ত থ থৈয়া,
ত থ ত থ থৈয়া ত থ ত্তি থ থৈয়া।
থৈয়া ত থ থৈয়া,
থ গ থ গ থ গ—তত্তি তধি গণ থৈ।'

১৯. অতএব, এই শব্দগুলিকে গ্রহণ করে জনৈক তালধারিণী কাংস্যময় করতাল যোগ, ডাইনে বাঁয়ে ঊর্ধ্বে অধে করপদ্ম নিক্ষেপ করতে করতে, উপরটন করতে লাগলেন অনির্বচনীয় এক অষ্টম স্বর। লঘু, গুরু, প্লুত, দ্রুত ও বিরাম—এই মাত্রা বিধি অনুসারে, ঐ স্বর কখনও হয়ে উঠল স-শব্দক, কখনও অ-শব্দক।

অতএব মুরজবাদিনীর হাতখানি যেই মুরজে তুলল ঐ বোল, অমনি সেই বোলগুলি ফুটে উঠল উপাঙ্গধারিণীর উপাঙ্গে উপাঙ্গে, স্ফুরিত হল তাঁর অধরদল, কম্পিত হল কণ্ঠ। এবং গায়নীরাও অস্ফুট গুঞ্জনে সময়োচিত রাগগুলি আলাপ করতে করতে যন্ত্রে যন্ত্রে ঝংকার তুলে, কান খাড়া করে, উপভোগ করতে লাগলেন সেই নিখিল ধ্বনিমিলনের মাধুরী।

প্রাদুর্ভূত হলেন সপ্তস্বর···রাজার মতো বাদী, শত্রুর মতো বিবাদী, মন্ত্রীর মতো সম্বাদী ও ভৃত্যের মতো অনুবাদী···এই চতুর্বিভেদ নিয়ে।

নিজ নিজ গরিমায় প্রাদুর্ভূত হলেন একবিংশতি শ্রুতি, শ্রুতিসম তিনগ্রাম এবং মূর্ছনা।

পূর্ণাদি ভেদে ত্রিধা প্রাদুর্ভূত হলেন পঞ্চাশৎ রাগ বিশুদ্ধ ও সংকীর্ণ ভেদে··· আরো বহুবিধ রাগ; এবং এদের সঙ্গে এলেন···পরিচিত অষ্টাদশ জাতি, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সতের হাজার নয় শত ত্রি-লক্ষণ তাল।

এবার ঘটে গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সকলেই জানতেন···শ্রুতি জাতি মূর্ছনার, এবং পঞ্চদশ গমকের প্রকাশ হয় না কণ্ঠতটে; চলাচল বীণেই এটি প্রশস্ত···কিন্তু অত্যাশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটল এখানে। রাসের আরম্ভ-লীলায় গোপীদের কণ্ঠের মাধ্যমেই চলবীণায় ও অচলবীণায় আরম্ভ হয়ে গেল ঐ মূর্ছনা গমকাদি পরম্পরের পরীক্ষা।

তারপরে প্রকট হলেন আদি, যতি, নিসারু, আড়ুতাল, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্পক, মণ্ঠ ও একতাল। এই নবতালেব নৈপুণ্যে প্রকাশ পেলেন অত্যন্ত মনোরঞ্জনকারী সূড়। বিবিধা এবং বিষমা গতি নিয়ে তখন কণ্ঠে দীপ্ত প্রকাশ হল ধ্রুবলক্ষণ শুদ্ধ সূড়ের ও মণ্ঠলক্ষণ সাল্যা সূড়ের।

২০. তারপরে যেই আরম্ভ হয়ে গেল প্রবন্ধগান, এবং···'থৈ থৈ থৈ থৈ তিগড়ি

তিনথৈ থা'···শব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বোল, অমনি তাল পাঠের অনুকরণে তালে তালে মাটিতে পা ফেলতে লেগে গেলেন মণ্ডলস্থা গোপীসুন্দরীরা, অন্তরীক্ষে বিন্যাস করতে লেগে গেলেন বাহুলতা, একবার বামাবর্তে একবার দক্ষিণাবর্তে, ফিরে ফিরে আরম্ভ করে দিলেন···মধুর মধুর···যেন ঝরিয়ে ঝরিয়ে রস।

তাঁদের···গান গাইতে লাগল মুখ, নাটক করতে লাগল হাত, তাল দিতে লাগল চরণ; তাঁদের···দোলন ফোটালো নেত্রযুগ, কম্পন দেখালো গ্রীবাভাগ, ডাইনে বামে তূর্ণবেগে ঘূর্ণী দেখালো দেহরাগ।

একই সঙ্গে একই রঙ্গে
একই ছন্দে একই ভঙ্গে
একটি তারায়
ঠেকলো তাঁদের দৃষ্টি,
হৃদয় মাঝে মোহন সাজে
একটি কৃষ্ণ যেথায় রাজে
ঝুম ঝুম ঝুম···
হোলো প্রেমের বৃষ্টি।

উল্লাস ঘন দ্রুত তালে চলতে লাগল নাচ। তবুও যুগ্ম ভুরুর সে কি সুন্দরিত নর্তন, সে কি নর্তন···কমলিত চরণের! থর থর করে কাঁপতে লাগল ভুজবন, আকাশ চিরে চলতে লাগল জানু রাজির উৎক্ষেপন। সগর্ভ ঘূর্ণনে নাচতে লাগল মণ্ডলী, যেন ডাইনে বাঁয়ে নেচে চলেছে অভঙ্গ অবক্র একগাছি মাল্য···সূত্রটি যার অন্তর লহরী মুকুন্দ কান্তির।

পড়ে চরণ বাজে নূপুর
রুণ রুণ ঝুনু ঝুনু
ঝুনু ঝুনু রুণ রুণ
ধি ধি ধি ধি
তাধি ধি
অনুপম মধুর রোল
মিশতে থাকে বোল।
দোল দোল···বাম অংগ দোল,
উতরোল···ডাহিন অংগ দোল,
খসে অঞ্চল বক্ষলোল।
না না, ভয় ছিল; মচকায়নি কটি
যায় নি খুলে বাজুবন্ধ, লপটি লপটি
হর্ষের আবর্ত নাচে···দু'বাহু উল্লোল।

এই আনন্দিত নৃত্য-রোল সঞ্চারিত হয়ে পড়ল সর্বত্র। পায়ে পায়ে ঠেকা দিতে দিতে, দেখতে দেখতে, মৃদু মৃদু নাচ আরম্ভ করে দিলেন বীণাবাদিনীরা, বেণুবাদিনীরা। বাজল বেণু, বাজল বীণা। গীতের তালে তাল রেখে নৃত্য করতে লাগলেন গায়নীরা, এমন কি তালধারিণীরাও। বোলে তুলতে তুলতে নৃত্যে মেতে উঠলেন মুরজ-

বাদিনীরাও। নর্তকীদের সঙ্গে যেন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে হয়ে গিয়ে নাচতে লেগে গেলেন সকলে। বাদ পড়লেন না চামরধারিণীরা, তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীরাও।

২১· তারপরে যেই আরম্ভ হয়ে গেল দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত নৃত্য, অসীম হয়ে উঠল কৌতুকরস তাণ্ডবের।

বামাবর্তে যেই ঘুরতে লাগলেন কৃষ্ণ অমনি কৃষ্ণের সম্মুখীন হয়ে মন্ডলের লীলাময়ীরা অবলম্বন করলেন দক্ষিণাবর্ত রীতির নটনবিলাস। রসিক ও রসিকার চিরন্তন নৃত্যলীলায় যেন ভাঙতে লাগল রসের ঢেউ।···এই রীতিতে অথবা তার ব্যুৎক্রমে, প্রতিলোম্য ও অনুলোম্যের এত নিবিড় হয়ে উঠল পরিগ্রহণ যে কৃষ্ণও পারলেন না এবং লীলাময়ীরাও পারলেন না···পরপারে পেঁছে যেতে সেই ভ্রমী-নটন-কলাকেলি-পারাবারের।

একটি দীপের আলো যেন বামদিক দিয়ে নেচে চলেছে সামনে তারপরই পিছনে ডানদিক দিয়ে নেচে চলেছে তারি অন্ধকারের গুচ্ছ···এমনি হল ঐ নৃত্যের কৌতুকচিত্র। এ এক অনন্য নৃত্যক্রীড়া, যেখানে প্রকট হয় অনন্য; যেখানে মরি মরি তাঁর ও তাঁদের উভয়েরই ব্যত্যয়েরও ঘটে ব্যত্যয়।

বিরামহীন রভসে এগিয়ে চলল নৃত্য। নৃত্যের তালে তালে বিলাসবতীদের বিলাসকরকমলে বাজতে লাগল মণ্ডলবিলাসী বাদ্য। ঝিমিকি ঝিমিকি ঝিম ঝিম, ঝিমিকি ঝিমিকি রিণ্ রিণ্। সহায় হল শ্রীহরির নর্তনের। কিন্তু আশ্চর্য, দুপক্ষেরই গান হয়ে গেল ভিন্ন। সুলোচনাদের অধরতটে ঝরতে লাগল কৃষ্ণের অখিল গুণগান আর কৃষ্ণের মুখে ফুটতে লগল আকাশভরা চাঁদনী-রাতের আর সুন্দরীদের সঙ্গীতের ললিত ললিত মুর্ছনা।

ছন্দে ছন্দে পড়ে তাল···চরণে। মুক্তির আনন্দ বাজে পদ্ম-হাসা চরণে। আগো, আঘাতও এত মধুময় হয়। মরি মরি সেই চরণকমলের মধুতে মধুতেই যেন সিক্ত হয়ে গেল যমুনার-পুলকিত পুলিন ভাগ। ধুলো উড়ল না এক কণিকাও। যেন ধুলোই নেই। অত নাচ, ঐ প্রচণ্ড নর্তন, নর্তনের ঐ দুরন্ত আবেগ, এক কণা তবু ধুলো উড়ল না; যেন ধূলিগুলিও এলিয়ে পড়েছে আনন্দে।

সুন্দরীদের দীঘল দীঘল নয়নের নিচে গালের পাতায় পাতায় ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। প্রত্যেকটি বিন্দুতেই বিম্ব-সমান ফুটে উঠল নৃত্যশীল শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গিম রূপ। অঙ্গনাদের বদনকমলদোলে, আর সেই গালের কৃষ্ণ যেন চোখের কৃষ্ণকে বলে।···

'না না না, তুমি তেমনটি নাচতে জান না এঁদেরটি যেমন নাচে।'

গানের ভাষায় ভাসলো কোনো কোনো সুন্দরীর নয়নের পদ্মদুটি, নাচের তরঙ্গে দুললো কোনো সুন্দরীর চরণের মরালপংখী। মঙ্গলোৎসবের মতো তাঁদের অঙ্গে অঙ্গে পরশ দিয়ে গেল ঘনশ্যামের আলিঙ্গনের রঙ্গ। শিহর জাগল রোমে রোমে নবাঙ্কুরের ছন্দে। নাচতে নাচতে আবার ক্ষণকালের নাচও ভুলে গেলেন তাঁরা। উৎকণ্ঠার কণ্ঠ ছেড়ে তখন গেয়ে উঠলেন অন্য গান। বলিহারি যাই সে গানের মাধুরীর। সে গান শুনে বারংবার মূর্ছা গেলেন সংগীতের দেবীরাও।

একটি সুন্দরী তোড়ায় তোড়ায় ফুটিয়ে তুললেন স-গান্ধার গ্রাম ভাস্বর। কোথাও সংকীর্ণ হল না তাতে জাতি-শ্রুতি-গমকের স্বচ্ছতা, খণ্ডিত হল না এতটুকুও। তখন

কি আনন্দ হৃষীকেশের। তিনিও যোগ দিলেন সেই স্বরালাপে।

সুমঙ্গল শ্রুতি-সনাথ তাঁদের সেই স-গ-রি-ম-প-নি-র রূপগুলিতে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন কাবালংকারের মণি ফলন। কি আশ্চর্য, ঐ রূপগুলিই কি প্রকাশ করে দিচ্ছে না তার স-গারিম-পালন লাবণ্য-ধনাদি ঐশ্বর্য? বিরাট প্রীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর নাচ।

আর সেই নাচের সঙ্গে…তা ধিক্ তা ধিক্ (তাঁরা ধিক্ তাঁরা ধিক্)—বোলে উদ্দাম বেজে উঠল গোপীদের মৃদঙ্গ। বোল শুনে চমকে উঠলেন সুরপুরীর নর্তকী সমাজ। ভারী অন্যায় তো, আমাদের নিন্দে করছেন কেন এঁরা?…কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হলেন নর্তকীরা। কান যে তাঁদের জুড়িয়ে যাচ্ছে মৃদঙ্গের বোল-তানে।

২২. বিরামহীন নৃত্যে বিরামহীন বাদ্যের স্রোত বহাতে লাগলেন মণ্ডলের রমণী-মণিরা। আর তার মধ্যে স্বাতন্ত্রে নেচে চললেন মুকুন্দ, যিনি অনন্ত-রস, প্রত্যেকের অন্তরে একত্রে সবল করে দিয়ে কাম, গর্ব ও আনন্দ। নাচতে নাচতে তিনি নয়ন তুলে চাইলেন শ্রীরাধার মুখের দিকে। দেখলেন…ও মূর্তিটি যেন রচনা করছেন তাঁরি বৈদগ্ধী দেবী স্বয়ং। অখিল তৃপ্তিবাহিনী, রসাধিকারিণী শ্রীরাধাই যেন তাঁর সিদ্ধৌষধি স্বয়ং, যেন তিনিই সেই তিনি, যেখানে একমাত্র জুড়োয় গিয়ে তাঁর সমস্ত জ্বালা, সমস্ত ক্লেশ। দেখেই, শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র সত্তায় শ্রাবণ-বর্ষণ হতে লাগল প্রেমী-পীযূষের। মণ্ডলনৃত্য সমাপ্ত হতেই, দুবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে শিখণ্ডমৌলি ঘিরে ফেললেন তাঁর রাধাকে, রাধাও ঘিরে ফেললেন তাঁর কৃষ্ণকে…যেমন করে সোনার দামিণীকে জড়ায় কৃষ্ণমেঘ, যেমন করে তমালকে জড়ায় হেমবল্লরী। তারপর সে কি দোঁহার রুদ্ধাশ্লেষ নর্তন, নর্তনের কি শিল্পশোভা, শিল্পশোভায় কি অনন্ত কৌতুক।

কত মন্মথের যে পরাজয় হল কে তা খোঁজ রাখে। এ এক অদ্ভুত চুম্বকমণি, যা কুঁড়িকেও আকর্ষণ করে ফুলের। তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন রাধা। সুঠম বঙ্কিম হয়ে গেল মণ্ডল রমণীদের ভ্রূ। বাক্যহারা বিস্ময়ে তাঁরা দেখতে লাগল সেই নাচ। তাঁদের স্পৃহা হল…আনুকূল্য করবেন ঐ লাস্যের; তালে তালে তাই আরম্ভ করে দিলেন গান, আরম্ভ করে দিলেন বাজনা। কিন্তু হায়রে, সে নর্তনের রূপ কেমন করে ফোটাবেন তাঁরা পায়ে? পারলেন না।

২৩. গুণ সম্প্রসারণ, বিকার এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ ভাব,…এইগুলি অভ্যাসধর্মের লক্ষণ; তবুও কোথাও এব ব্যাভিচার দেখা যায়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এইটেই কি আশ্চর্যের বিষয় নয়, যে নৃত্যাভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বভাবসিদ্ধ বলেই রাধার নর্তনে আবিষ্কৃত হল নৃত্য গীত পাণ্ডিত্যের সম্প্রসারণ, ঔৎসুক্য, মত্ততা, চাপল্য আবেগাদি মনোবিকারের প্রকাশ বাহুল্য বা প্রকাশ অল্পতা।

২৪. রাধার এই স্বভাবসিদ্ধত্ব দেখে বশীভূত হয়ে গেলের উর্বশী, লজ্জায় সায়রে যেন ডুব দিলেন অপ্সরার দল এবং অরণ্যের সীমা পার হয়ে যেন পালিয়ে বাঁচলেন চারণ বধূরা। আর ওদিকে নারীদের যা উচিত কাজ তাই করতে লাগলেন সিদ্ধনারীরা, গন্ধর্বীরা এবং দেব ও মুনিদের বধূরা। তাঁরা কেবল বর্ষণ করতে লাগলেন নন্দন কুসুম, তাঁরা কেবল স্মরণ করতে লাগলেন শ্রীমদনের মাহাত্ম্য এবং সৌভাগ্য।

আর সেই বর্ষণের ও স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন…রাধা আর কৃষ্ণকে… তাঁরা নাচছেন; তাঁরা উল্লসিত করতে করতে নাচাচ্ছেন স্বরগুলিকে…গারে মা নি রি

গামা। ধৈবতের আগ্রহান্বিত গ্রহভার্স ও গেয়-ব্যঞ্জক অংশভাগ, এই দুটির সঙ্গে আরোহণ ও অবরোহণে স্বরগুলিকে উল্লসিত করতে করতে তাঁরা নাচছেন, আহা সেগুলিকে রম্য গমকময় করতে করতে তাঁরা নাচছেন। রাধাকৃষ্ণ সমস্ত পদে নাচছেন। সে রাগ সাহিত্যের সে কি গতিমান আবেগ। 'তেনা তেনা'…এই মঙ্গলসূচক আলাপের মুখে তাঁরা যুগলে বিস্তার করে চলেছেন নানান রস, নৃত্য ও গান। এ লোকের নয় যেন সেই শব্দ প্রবাহ। আর সেই নৃত্যের গতিবেগ, কৌতুক ও উল্লাসের শৌখিনতায় রাধা জয় করতে চাইছেন কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ জয় করতে চাইছেন রাধাকে।

২৫ তাঁকে ঘিরতে চেষ্টা করল আলস্যের মোহনতা। ছেদ পড়ল না নৃত্যে। তিনি নাচতে লাগলেন তাঁর তুলনাহীন নাচ; ক্ষণনৃত্য…মণ্ডলগতা আভীর ভীরুদের সঙ্গে ক্ষণ নৃত্য…মণ্ডল–মধ্যস্থিতা শ্রীরাধিকার সঙ্গে।

২৬ …তিনি তুলে নিলেন তাঁর বাঁশরী। যে গান ধরলেন বাঁশরীতে হায় রে, পূর্বে সে গান কখনও আবিষ্কার করেন নি কোনও সঙ্গীত দেবতা কোথাও। এ যেন এক অতিরিক্ত তাল, যা দুর্গম সঙ্গীতাচার্যদের কাছেও সেই গানের অনুগানে তিনি নিয়োজিত করে দিলেন গান্ধার গ্রামকে। ধুয়া ধরলেন গায়নীরা পাখোয়াজের তালে তালে।

দেখতে দেখতে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল তন্ত্রীদল, মুখর হয়ে উঠল কণ্ঠ। শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন…সোনার পাপড়ির মতো গায়নীরা। তারপরে সেই কান্তমিলন ঘটল সর্বস্বরের এবং যেই সোমে এসে থামল তাল, অমনি ঝনু ঝনু ঝনু শিঞ্জন তুলে তড়িদ্বেগে আবির্ভূতা হলেন নৃত্যপরা এক রাধাসখী…পদ্মের যেন কর্ণিকা, সঙ্গীতবিদ্যার যেন সমুদ্গীর্ণ ঝঙ্কার-ধাম।

জানুদুটিকে ঈষৎ কুঞ্চিত করে নিতম্বশীর্ষের বিশালতায় অর্ধচন্দ্র মুদ্রায় বাম হাতখানি রেখে, তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তারপরে ক্ষীণ ক্ষীণ কটিভাগের নিম্নস্থিত ত্রিবলির হ্রস্ব রেখার উপর দিয়ে কফোনি কুঞ্চিত করে, তিনি তাঁর সমুন্নত স্তনশিখরে উঠিয়ে নিয়ে এলেন দক্ষিণ হস্তের পদ্মকোষ মুদ্রাটিকে। মৃদু লালিত্যে উৎফুল্ল করলেন পদ্মকোষ। আর সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে সম্মিলিত হয়ে পড়তে লাগল তাঁর দু-নয়নের কালো তারার নাচ।

নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন রাধার সখী…ধীরে ধীরে। তালে তালে সর্পলীলায় দুলতে দুলতে কেঁপে উঠতে লাগল পড়তে লাগল হাত। প্রসারণ ও আকুঞ্চনের সে কি সুললিল ভঙ্গী, অভিনয় কুশলার অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে কত যে খেলে গেল হংসাস্য, কর্তরীমুখ পদ্মকোষ, ইয়ত্তা কোথায় তার? নব নবাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাচতে লাগল লাক্ষার মতো চিকণ চিকণ গ্রীবা-ললাটাদি অঙ্গ। মরি মরি কি অসাধারণ তাঁর বিষম ছাঁদের পায়ের কাজ। নাচিয়াদের যা দুঃসাধ্য তাই নাচতে লাগলেন রাধার সখী…হেলা ভরে…উল্লাসে।

নাচতে নাচতে তিনি ক্ষীণ করে ফেললেন উদরভাগ। অতিস্ফার হয়ে উঠল তাঁর বক্ষোজ-ভার, বঙ্কিম হল পৃষ্ঠদেশ, মিলিত পার্ষ্ণিদ্বয়ের উপর লুটিয়ে পড়ল বেণী, লুপ্ত হল ত্রিবলীর রেখা। এই সৌষ্ঠবের মধ্যে আবার যখন তিনি প্রত্যেক তাল-মোক্ষে প্রকাশ করতে লাগলেন তাঁর হস্ত-লাস্যের কর-কম্পন, তখন জয়ধ্বনি করে উঠলেন সকলে। তাঁদের ঘনীভূত বিস্ময় যেন বলে উঠল–

'আপনারা কামদেবের চম্পক শরাসনের সাজানো নাচ দেখছেন।' তারপরেই তিনি

তাঁর দুই জানু দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরলেন ভূমিতল। এবং ধরেই বাহু দুটি বিস্ফারিত করে, অলঙ্কারে ঝঙ্কার তুলে নৃত্যছন্দে বিঘূর্ণন করতে লাগলেন গাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল…গলার হার, কানের দুল, সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগল গন্ধমাতাল ভ্রমরকুল। কান্তির পরিধি রচনা করে বসল…গাত্রের গৌরিমা, বক্ষোহারের শ্বেতিমা, অধরের অরুণিমা, আর ভ্রমরদের শ্যামলিমা। ছবির মতো যেন এক পুষ্পধনুর সোনার চর্কি ঘুরছে।

তারপরেই তিনি পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, পার্ষ্ণিদ্বয়ের উপর স্থাপন করলেন তাঁর শ্রোণিদেশ। পুরক-শ্বসের কৃপায় বিস্তীর্ণ হল বক্ষ, শান্ত হল ত্রিবলী, শিথিল হল নীবি। স্তনদ্বয় ও জানুদুটিকে কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করতে করতে কর দু'টির অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তালে তালে আঘাত দিতে দিতে, আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, যুগপৎ রসনায় বোল তুললেন—'তথ তথৈ থৈ তথৈ থৈ…' সেই বোলের ছন্দে ছন্দে সুর তুলল কণ্ঠ, বাজল বেণু বাজল বীণ, মন্দিরা…তথৈ থৈ তথৈ থৈ। এইভাবে যখন উচ্ছল হয়ে উঠল নাট্য, হঠাৎ তখন রাধারাণীর চরণ থেকে খসে পড়ে গেল নূপুর এবং গীত সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বীণাবাদিনী ও বেণুবাদিনীদের চোখের নিমেষে তিনিও হলেন অন্তর্ধান। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উঠতে লাগল বক্ষের কুণ্ডলিকা। সখীর কাঁধে হাত রেখে তিনি বিশ্রাম করতে বসে পড়লেন নেপথ্যে। সখীদের অঞ্চলের বাতাস এবং প্রণয়ভরে তাঁদের দেওয়া এক খিলি পান মুখে পুরে তিনি আরাম করলেন ক্ষণকাল।

৩০. ক্ষণকাল বিশ্রামের পর, গায়নীরা যেই পুনর্বার গেয়ে উঠলেন অন্য গান এবং সংগীতকারিণীরা সম্পাদনা করতে লাগলেন সেই গানের মেলনের আলাপ-লালিত্য, রাস-লাস্যমঞ্চে ললিত করশাখার মাধুরিমা দেখতে দেখতে পুনর্বার প্রবেশ করলেন রাধাসখী। দুটি কর দিয়ে গীতের পদার্থ বিস্তার করতে করতে তিনি এমন বিচিত্রভাবে নৃত্য দেখালেন,…অভিরূপ-জ্যেষ্ঠা জ্যেষ্ঠার, মদনগর্ব-তর্জনী তর্জনীর, ভুবন-সৌন্দর্যসার মধ্যমা মধ্যমার, রতি-মদ-নামিকা অনামিকার এবং বৈচিত্র্য-কনিষ্ঠা কনিষ্ঠার…যে চমকে উঠলেন মনসিজ এবং নাচি নাচি করে উঠল শিবেরও মন।

নাচতে লাগলেন রাধাসখী।
উঠতে লাগল, পড়তে লাগল
বাঁকতে লাগল, কাঁপতে লাগল,
যুগল বুক যুগল স্ফিক্।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার তুলল কনকবলয়,
কাঁপতে লাগল এ-কর ও কর…
যেন ফুল ঝরছে পুজার ফুল।
আর
'তত্তা ততথৈ তিকিড় তিকিথৈ,…
তালে তালে দুলতে লাগল জানু,
তালে তালে বাড়তে লাগল বোল,
তালের মুখে নাচল দাঁতের হাসি।

তারপরেই সেই গৌর বরণী ধনী এত উর্ধ্বোর্ধ্ব গতিতে উপর্যুপরি ঘোরাতে লাগলেন

নিজের দেহ···সৃষ্টি করে গৌরিমার অসংখ্য পরিধি, যে মনে হল, ঝড় উঠছে গায়নীদের কমল-বনে, আর সেই ঝড় যেন উড়িয়ে নিয়ে ছুটছে পদ্মফুলের পরাগ।

তারপরে তিনি আকাশচারী নৃত্যের মধ্য দিয়ে এত বিস্তার করতে লাগলেন অত্যন্ত দুরূহ সব নৃত্যছন্দ, যে মনে হল তাঁর তনুলতা বুঝি আকাশেই স্থায়ী হয়ে রয়েছে··· কাঁপছে···কাঁপছে···জ্যোতির্বল্লরীর মতো কাঁপছে। শিক্ষার কোনো গর্ব-প্রকাশ নেই। কেবল মনে হতে লাগল, লাবণ্যদেবীর দু-খানি চরণ যেন অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল হেলাভরেই পৃথিবীর উপর পড়ছে না।

কী সুন্দর নাচ! এর কী যে উপমা হতে পারে ভেবে পাওয়া যায় না।···

বিদ্যুৎবল্লী যদি সুচির-স্থায়িনী হতেন নির্মেঘ গগনে, আলগোছে মুঠির ভিতর কাঁপতেন যদি মৃদুল-মৃদুপবনে, দৈবযোগে যদি মুখ ফুটে বোল তুলতেন–

'তত্তা তত্থৈ তিকিড় তিকি থৈ থাঃ'···

তাহলে তাঁর উপমা দেওয়া চলতো এই নটনবিদুষীটির বৈদগ্ধীর সঙ্গে। লঘু লঘু চরণে এইভাবে নর্তন-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে করতে, সমের মাথায়, স্তনভার-দুর্বহ নিজের পূর্ব কায়াটিকে এমন প্রচণ্ড বেগে তিনি দোলায়িত করতে লাগলেন, যে মনে হল···ঝঞ্ঝার ঘূর্ণীতে গেল গেল···ঐ বুঝি উড়ে গেল···কমলিনী।

আহা ঐ কোমর ভেঙে গেল···ভেবে ব্যথায় সিঁটিয়ে উঠলেন পরিজনেরা।

৩১. এইভাবে লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-দ্রুতাধর্ব-দ্রুতপাদ-ভেদে তালের সঙ্গে সঙ্গে চরণকমল চালনা করতে করতে, তিনি···সেই অতুলনীয়া রাধাসখী,···এমন অপূর্ব সব নর্তনকৌতুক আবিষ্কার করতে লাগলেন যে, সাধু সাধু বলে অভিনন্দন করতে করতে ছুটে এসে তাঁকে আলিঙ্গন না করে থাকতে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ, বুকে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীরাধা, আকাশে আকাশে গর্ব দূর হয়ে গেল অপ্সরাদের, আর বিস্ময়ের হাসি হেসে ফেললেন দেবতারা।

৩২. চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার আনুকূল্যে, অনিন্দ্যসুন্দর এই প্রত্যেকটি নৃত্য অবলোকন করতে করতে কৃষ্ণও আর কেবল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। নিখিল কলাপণ্ডিতাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আরম্ভ করে দিলেন প্রকীর্ণ-নটন-ক্রম। সকলের হৃদয় সাগরে ঢেউ দিয়ে উঠল নাচ। তিনি নাচতে লাগলেন, নাচাতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন, গাওয়াতে লাগলেন, আয়ামিনী যামিনীকে যেন নিমেষের মতো খরচ করে দিয়ে তিনি খেলতে লাগলেন বিরামহীন এই খেলা। নৃত্যন্তী ও গায়ন্তীদের ব্যূহ থেকে তখন বেরিয়ে এলেন একটি সুন্দরী। প্রকীর্ণক-নৃত্যে কখনও একীভূত, কখনও মণ্ডলীভূত, কখনও নিঃসঙ্গ, কখনও যুগলে, তিনি নাচতে লাগলেন, তিনি গাইতে লাগলেন···কৃষ্ণের নাচের তালে তাল রেখে, কৃষ্ণের গানের সুরে সুর মিলিয়ে।

সহগান আর সহনাচ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তালে তাল রেখে চলা কি সহজ কথা। স্বেদসিক্ত পরিশ্রমের অলসতায় ক্লিন্ন হল তাঁর অঙ্গ। শ্লথ হয়ে গেল স্তনাংশুক, হাত বাড়িয়ে তিনি ধরে ফেললেন বিশাল স্কন্ধ শ্রীহরির।

ভারী সুন্দর দেখতে হল তাঁর ঐ···তমাল স্কন্ধে শিথিল শাখাটির মতো, বাতাসে-ঘষা হৈমীবল্লরীর মতো ঢলে পড়াটি। আর শ্রীকৃষ্ণকে মনে হতে লাগল···তিনি যেন মূর্তিমান আদিরস শৃঙ্গার, যাঁকে এক লীলাবধূর অলসতায় অভিভূতা হয়ে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর ই

স্থায়ীভাব স্বরূপিণী রতি।

দেখতে দেখতে আর একটি সুন্দরী হঠাৎ মণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। গাইতে আরম্ভ করে দিলেন, নাচতে আরম্ভ করে দিলেন কৃষ্ণগীত কৃষ্ণতাণ্ডব। ঝিন্ঝিন করে বেজে উঠল তাঁর কাঞ্চীর কিঙ্কিণী, রুন্রুন্ করে বেজে উঠল পদ্মপায়ের পাঁয়জোর, ধীর্ধীর্ দুলতে লাগল চীনাঞ্চল, কর্ণকমল আর কণ্ঠহার। পুরুষলীলায় তিনি বালার মতো বাম বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ। হরি হরি, শ্রীকৃষ্ণও তখন নাচতে লাগলেন গাইতে লাগলেন তাঁরি নাচ তাঁরি গান।

আর একটি সুন্দরী এবার নাচতে নাচতে এগিয়ে এলেন। কি তার জলভরা পদ্মের মতো ঢল ঢল দুটি আঁখি। এসেই আহা যেন বাম করে পদ্মের লালিত্য ছড়িয়েই তিনি টপ করে ধরে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণের পীতবরণ বসনের অঞ্চল। তারপর প্রসর্পণ ও অপসর্পণের খেলা দেখাতে দেখাতে কি তাঁর অপূর্ব নৃত্য, কি তাঁর ঘনশ্যামকেও নাচানো।

কৃষ্ণাধরে বেজে উঠল মুরলী। মুরলীরব-মাধুরীতে আকৃষ্টা হয়ে এবার নাচতে এগিয়ে এলেন আর-একটি নটন্তী। মুরলীর ঐ লয়ের ও তালের সঙ্গে তাললয় মিলিয়ে কি অনিন্দ্য তাঁর হেলায়-ফেলায়-ভালোবাসার রসের নাচ। কিন্তু লীলাকিশোরের দুষ্টুমিরও অন্ত নেই। তাই যখন তিনি ইচ্ছে করেই তাল কাটলেন মুরলীতে, অমনি তাঁর দিকে সকোপ কটাক্ষ হেনে, তালভঙ্গ সামলিয়ে নিয়ে নটন্তীর সেকি বিজয় নৃত্য।'

*   *   *

এই হল্লীসক বর্ণনা নিঃসন্দেহে নৃত্যশিল্পী ও প্রযোজকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। বিস্মৃত ও লুপ্তপ্রায় কত পুঁথি ও গ্রন্থে যে ভারতীয় নৃত্যের কত অমূল্য পরিচিতি ছড়িয়ে আছে কে তার হিসাব রাখে। ভরসা রাখি ভবিষ্যতে এ নিয়ে গবেষণা করতে অনেকে এগিয়ে আসবেন।

তালপ্রকরণ

যে কোনও রূপসৃষ্টির পিছনেই কাজ করে চলেছে এক অদৃশ্য ছন্দলীলা। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি এই দুই ক্ষেত্রেই ছন্দ অন্যতম নিয়ামক। মানুষ যে দিন থেকে চার পা থেকে দু পা হল, সেদিন থেকেই সে এক সমস্যার সম্মুখীন হল। তা হল তাল সামলিয়ে চলা। এই চেষ্টা থেকেই মানুষের বুদ্ধিগত উৎকর্ষের সূচনা। হৃদস্পন্দনের যে ছন্দ শরীর বৃত্তটিকে চলমান রেখেছে, সেই ছন্দের ভিত্তিতেই আচার-আচরণ, সৃজনশীলশক্তি নিয়ন্ত্রিত. এ থেকে বোঝা যায় ছন্দ শুধু কাব্য, নৃত্যগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য- এরই অঙ্গ নয়, এ সমগ্র জীবনের অঙ্গ। এই চালিকাশক্তিই জীবনছন্দ।

ভারতীয় দার্শনিকরা সৃষ্টি রহস্যের মূলেও তালের কল্পনা করেছেন। কোহল-এর মতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে তালের সৃষ্টি। এই পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মিলনই বিশ্বসৃষ্টির কারণ। ক্রিয়াশীলতার স্পন্দন বা ছন্দ শিব শক্তির মিলনেই উদ্ভূত। এ প্রসঙ্গে শঙ্করচার্যের বক্তব্য ঃ

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।

ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥

কোহল তাঁর তাল লক্ষণ গ্রন্থে তাল শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে সৃষ্টি রহস্যের দার্শনিক তত্ত্বরূপের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে 'ত'-কারে শঙ্কর বা শিব এবং 'ল'-কারে শক্তি এই দুই-এর সংযোগে তালের উৎপত্তি ঃ

তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে।

শিবশক্তিসমাযোগাত্তালনামাভিধীয়তে ॥

প্রাচীন নাট্যকারদের মতে নটরাজ শিব থেকে নাদের জন্ম, নাদ থেকে মনের, আর মন থেকে কাল অর্থাৎ মাত্রা, লয় ও তালের সৃষ্টি ঃ

"শম্ভোঃ সংপদ্যতে নাদো নাদাদুৎ পদ্যতে মনঃ।

মনসো জায়তে কালঃ স কালস্তাল সংজ্ঞিকঃ ॥

'রুদ্রডমরূদ্ভবসূত্রবিবরণম'- থেকে আমরা সে যুগে প্রচলিত বিশ্বব্যাপী ছন্দ লীলার দার্শনিক তত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পারি ঃ

"তালাত্মকং জগৎ সর্বং তালস্তু ব্যপকঃ স্মৃতঃ।

সূত্রে সূত্রে স তালঃ স্যাৎ স তালঃ কালসম্ভবঃ ॥

আবার তাল প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারদের মতে ঃ

তালস্তলপ্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘঞি স্মৃতঃ।

গীতংবাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম ॥

(সঙ্গীত রত্নাকর—তালাধ্যায় ২)

অর্থাৎ তাল শব্দটি প্রতিষ্ঠার্থক তল্ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ-এর প্রত্যয়যোগে উদ্ভূত। গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। দশরূপকে নৃত্যের যে লক্ষণ ঃ

"গাত্রবিক্ষেপমাত্রেণ সর্ব্বাভিনয়বর্জ্জিতম্।
আঙ্গিকোক্ত প্রমাণেন নৃত্যং নৃত্যবিদো বিদুঃ॥
অন্যদ্‌ভাবাশ্রিতং নৃত্যং নৃত্তং তাললয়াশ্রিতম্।
উদ্ধতং তাণ্ডবং প্রোক্তং লাস্যন্তু সুকুমারকম্॥

এই শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উদ্ধত নৃত্যকে তাণ্ডব ও কোমল নৃত্যকে লাস্য বলা হয়—এই দুই নৃত্যই তাললয়াশ্রিত। অনেকে বলেন যে তাণ্ডবের 'তা' ও লাস্যের 'ল' থেকেই তালের উৎপত্তি। তাণ্ডবের স্রষ্টা শিব এবং লাস্যের স্রষ্টা পার্বতী। তাণ্ডব ও লাস্য শব্দ থেকে তালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে কিন্তু এই দুই নৃত্যের স্রষ্টার অর্থাৎ শিব শক্তির মিলনেই যে তালের উৎপত্তি এটাই সূত্রকার প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

শাস্ত্রকারগণ তালহীন নৃত্যগীতকে নাসিকাহীন মুখমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করেছেন ঃ

মুখ-প্রধান-দেহস্য নাসিকা মুখমধ্যকে।
তালহীনং তথাগীতং নাসাহীনং মুখং যথা॥
(নাদার্থ রাগমালা)

নন্দিকেশ্বর-এর অভিনয়দর্পণে রঙ্গ বর্ণনায় ঃ

যদগ্রে-নটনং কুর্য্যাৎ তৎস্থলং রঙ্গ উচ্যতে।
রঙ্গমধ্যে-স্থিতে পাত্রে তৎসমীপে নটোত্তমঃ॥
দক্ষিণে তালধারী চ পার্শ্বয়োন্দ্ব মৃদঙ্গকৌ।
তয়োর্মধ্যে গীতকারী শ্রুতিকারস্তদন্তিকে।

আবার পাত্রলক্ষণ বর্ণনায় "গীতবাদ্যতালানুবর্ত্তিনী" না হলে প্রকৃত গুণযুক্তা নর্তকী বলা যাবে না—একথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সবই নৃত্যগীতে তালের প্রধান সহচারী ভূমিকার কথা প্রমাণ করে।

তালের প্রকৃত অর্থ কাল পরিমাণ। এক কথায় গতি ও লয়ের স্থিতির নিয়ন্ত্রক। তাল সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রাণ। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তালের দশটি প্রাণের বিভাগ আছে। সঙ্গীত মকরন্দ অনুযায়ী ঃ

কালো মার্গক্রিয়াঙ্গানি গ্রহজাতিঃ কলা লয়ঃ।
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশস্মৃতাঃ॥

কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার—শাস্ত্রানুযায়ী তালের এই দশ প্রাণ।

(১) কাল—কাল অর্থে সময়সীমা, এর উপরেই তালবিন্যাস নির্ভরশীল। এর আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম দুটি বিভাগ আছে। সঙ্গীত মকরন্দ অনুসারে ঃ

উপর্য্যুপরি বিন্যস্থ পদ্মপত্রশতং সকৃৎ।
যঃ কালঃ সূচিসংভেদাৎ ক্ষণঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥
লবঃ ক্ষণৈরষ্টভিঃ স্যাৎ কাষ্ঠাহ্যষ্টলবাত্মিকা।
অষ্টৌ কাষ্ঠাঃ নিমেষঃ স্যাৎ নিমেষৈরষ্টভিঃ কলা॥
কলাভ্যাং চ চতুর্ভাগঃ চতুর্ভাগাবনুদ্রুতম্।
অনদ্রুতাভ্যাং বিন্দুঃ স্যাদ্বিন্দুভ্যাং চ লঘুর্ভবেৎ
লঘুদ্বন্দ্বং গুরুশ্চৈক ত্রিলঘু প্লুত উচ্যতে॥

এ থেকে যে সময়সীমা পাওয়া যায় তা হল আটটি ক্ষণে এক লব, আট লবে এক কাষ্ঠা, আট কাষ্ঠায় এক নিমেষ, আট নিমেষে এক কলা, দুই কলায় এক ত্রুটি, দুই ত্রুটিতে এক অণু, দুই অণুতে এক দ্রুত, দুই দ্রুততে এক লঘু, দুই লঘুতে এক গুরু, তিন গুরুতে এক প্লুত, দশ প্লুততে এক পল। এই এক পল অর্থে আড়াই মিনিট সময় ধরা হয়। অবশ্য এই কালনির্ধারণ নিয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

(২) মার্গ এটি মূলত তালনির্ধারণ পদ্ধতি। এর দ্বারা মাত্রা, পদ, গতি, তালি, খালি প্রভৃতি। অবস্থান ও চলন নির্ধারণ করা যায়। এবং তালের প্রকৃতিও নির্ণয় করা যায়। সাধারণ ভাবে এর চারটি ভাগ।

মার্গাঃ স্যুস্তত্র চত্বারো ধ্রুবশ্চিত্রশ্চ বার্তিকঃ।
দক্ষিণশ্চেতি তত্রস্যাদ্ ধ্রুবকে মাত্রিকা কলা।
শেষেষু চ তস্রোহষ্টৌ ক্রমান্মাত্রাঃ কলা ভবেৎ॥

ধ্রুব, চিত্র, বার্তিক ও দক্ষিণা এই চার ভাগ। সঙ্গীত মকরন্দে অবশ্য ছ'টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ, বার্তিক, চিত্রবিচিত্র, চিত্রতর ও অতিচিত্রতর।

(৩) ক্রিয়া—তাল প্রদর্শন করার পদ্ধতিকে ক্রিয়া বলা হয়।

মার্গদেশী গতত্বেন তত্রাহত্যস্যক্রিয়াদ্বিধা।
নিঃশব্দা শব্দযুক্তা চ নিঃশব্দা তু কলোচ্যতে॥
স্যাদাবা হথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ।
নিঃশব্দেতি চতুর্ধোক্তা স শব্দাহপি চতুর্বিধা
ধ্রুবঃ শম্পা, ততস্তাল, সন্নিপাত ইতীরিতা॥

(সংগীত রত্নাকর)

তালের ক্রিয়া দুই প্রকার- মার্গ ও দেশী। এদের আবার দুটি বিভাগ—সশব্দ ও নিঃশব্দ। এদের আবার চারটি করে ভাগ আছে। সশব্দের ক্রিয়া সম্য, তাল; ধ্রুব

ও সন্নিপাত। ডান হাতে তালি দেবার পদ্ধতিকে সম্য বলে। বাম হাতে তালি দেবার পদ্ধতিকে বলা হয় তাল। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা তুড়ি দিয়ে তাল প্রদর্শন পদ্ধতিকে ধ্রুব বলা হয়। দুই হাতে তালি দেবার পদ্ধতিকে সন্নিপাত বলা হয়।

নিঃশব্দের ক্রিয়া আবাপ, নিস্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ। অঙ্গুলি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এর ক্রিয়া। দেশী ক্রিয়ার মধ্যে ধ্রুবকা, সর্পিণী, কৃষ্যা, পদ্মিনী, বিসর্পিকা, বিক্ষিপ্তা, পতাকা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৪) অঙ্গ—তালবিভাগকে অঙ্গ বলা হয়। এদের পাঁচটি ও মতান্তরে ছটি ভাগ পাওয়া যায়। অনুদ্রুত (১ মাত্রা); দ্রুত (২ মাত্রা), লঘু (৪ মাত্রা), গুরু (৮ মাত্রা), প্লুত (১২ মাত্রা), কাকপদ (১৬ মাত্রা)। এছাড়াও দবিরাম ও লবিরাম এই দুটি অঙ্গেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন বিভিন্ন পাখির ডাক থেকে বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। সূত্রকার শৌনকের মতে ঃ

চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সোঽব্রবীৎ।
শিখী ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয় এষ মাত্রাপরিগ্রহঃ ॥

তিতিরের ডাক থেকে অনুদ্রুত, চটক থেকে দ্রুত, চাষ থেকে লঘু, বায়স থেকে প্লুত মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শাস্ত্রকারদের কল্পনায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকেই এদের উৎস নির্ণয় করা হয়েছে। অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু ও প্লুতকে যথাক্রমে বায়ু জল, অগ্নি, আকাশ ও পৃথিবী থেকে সম্ভূত বলে কল্পনা করা হয়েছে।

(৫) গ্রহ—তালের আবর্তনের যে মাত্রা থেকে সংগীতের সূচনা হয় সেই স্থানটিকে গ্রহ বলা হয়। এদের চার ভাগ—সম, বিষম, অনাগত ও অতীত।

(৬) জাতি—

চতুরস্রস্তথা ত্রস্রঃ খণ্ডো মিশ্রস্তথৈবচ।
সঙ্কীর্ণঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া জাতয়ঃ ক্রমশোবুধে ॥

মাত্রার বিভেদ অনুযায়ী তালরীতির পরিবর্তনকে জাতি বলা হয়। সংগীত রত্নাকর অনুযায়ী এদের পাঁচটি বিভাগ—চতুরস্র, ত্রস্র, খণ্ড, মিশ্র ও সংকীর্ণ। চতুরস্র চতুর্মাত্রিক ও ব্রাহ্মণ জাতীয়, ত্রস্র ত্রিমাত্রিক ও ক্ষত্রিয় জাতীয়, খণ্ড পঞ্চমাত্রিক ও বৈশ্যজাতীয়, সংকীর্ণ নবমাত্রিক ও সংকীর্ণ জাতীয়, মিশ্র শূদ্রজাতীয়।

(৭) কলা—

ধ্রুবকা সর্পিণী কৃষ্ণা পদ্মিনী চ বিসর্জিতা।
বিক্ষিপ্তাখ্যা পতাকাচ মাত্রা স্যাৎ পতিতাঽষ্টমী ॥

সাধারণ ভাবে মাত্রাকেই কলা মনে করা হয়, কিন্তু আসলে নিঃশব্দ ক্রিয়ারই অপর নাম কলা। নারদের মতে ধ্রুবকা, সর্পিণী, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, বিসর্জিতা, বিক্ষিপ্তা, পতাকা ও পতিতা—এই আট প্রকার কলাই প্রধান। কিন্তু ভরত নাট্যশাস্ত্রে তিনপ্রকার

কলার উল্লেখ পাওয়া যায়—চিত্রা (২ মাত্রা), বৃত্তি (৪ মাত্রা) ও দক্ষিণা (৮ মাত্রা)।

(৮) লয়—

বিশ্রান্তি যুক্তয়া কালে ক্রিয়য়া মানবিন্যতে।
ক্রিয়ানন্তর বিশ্রান্তির্লয়ঃ সঃ ত্রিবিধো মতঃ ॥

ক্রিয়ার অন্তে যে বিশ্রান্তি তাকে লয় বলা হয়। স্থিত বা বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত—লয়ের এই তিন বিভাগ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাল, কাল ও ক্রিয়া—এই তিনের মধ্যে লয় সমতা রক্ষা করে। অবশ্য তালের গতি নিয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

(৯) যতি—লয় প্রয়োগপদ্ধতিকে যতি বলা হয়। ভরতের মতে যতি তিনপ্রকার—সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা। এছাড়া মৃদঙ্গা ও ডমরু বা পিপীলিকা—এই দুই ভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। আদি, মধ্য ও অন্তে একই লয় থাকলে সমা বলা হয়। আদিতে বিলম্বিত এবং মধ্য ও অন্তে দ্রুত লয় হলে তাকে স্রোতোগতা বলে। আদিতে দ্রুত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত হলে তাকে গোপুচ্ছা বলা হয়। ভিন্নমতে আদিতে দ্রুত, মধ্যে দ্রুত ও অন্তে বিলম্বিত হলে; ভিন্নমতে আদি ও অন্তে দ্রুত, মধ্যে—মধ্য ও দ্রুতলয়ের মিশ্রণ ঘটলে তাকে মৃদঙ্গা বলা হয়। আদি ও অন্তে মধ্য ও মধ্যে বিলম্বিত হলে তাকে পিপীলিকা বলা হয়।

(১০) প্রস্তার—তালের বিস্তার ক্রিয়ার পদ্ধতিকে প্রস্তার বলা হয়। এই পর্যায়ে তালের ছন্দ, কলা, মাত্রা, অঙ্গ। সশব্দ ক্রিয়া প্রভৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে তালবৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয়।

কথক নৃত্যের বোল

ভারতীয় পদ্ধতিতে তালের দুটি রীতি প্রচলিত আছে। উত্তরী বা হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতি ও দক্ষিণী বা কর্ণাটকী তাল-পদ্ধতি। সাধারণভাবে কয়েকটি প্রধান তালের পরিচয় দেওয়া হল ও তাদের লয়কারী দেখানো হল। যেহেতু কথক মূলত তালাশ্রয়ী নৃত্য, সেজন্যে প্রায় সব তালই এই নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। দাদরা (৬ মাত্রা), তেওরা ও রূপক (৭ মাত্রা), কাহারবা, আদ্ধা, যৎ, ধুমালী (৮ মাত্রা), ঝাঁপতাল ও সুরফাক তাল (১০ মাত্রা), চৌতাল ও একতাল (১২ মাত্রা), ধামার, ঝুমরা, দীপচন্দী ও আড়া চৌতাল (১৪ মাত্রা), পঞ্চম সওয়ারী (১৫ মাত্রা), ত্রিতাল ও সওয়ারী (১৬ মাত্রা), শিখর (১৭ মাত্রা), মত্ত ও লক্ষ্মীতাল (১৮ মাত্রা), অষ্টমঙ্গল (২২ মাত্রা), ব্রহ্মতাল (২৮ মাত্রা)।

দাদরা ঃ মাত্রাসংখ্যা—৬। বিভাগ—২টি। প্রতি বিভাগে ৩টি মাত্রা (৩,৩)। ১টি তালি ও ১টি খালি। ১ম মাত্রায় তালি এবং ৪র্থ মাত্রায় খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩		৪	৫	৬
ধা	ধিন	না	|	না	তিন	না
X				0		

॥ দুইগুণ (৪ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩		৪	৫	৬		১
ধা	ধিন	না	|	ধাধিন	নানা	তিননা	|	ধা
×				০				×

॥ তিনগুণ (৫ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩		৪	৫	৬		১
ধা	ধিন	না	|	না	ধাধিনর্না	নাতিননা	|	ধা
×				০				×

॥ চারগুণ (৪$\frac{১}{২}$ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩		৪	৫	৬		১
ধা	ধিন	না	|	না ঽঽ '	ধাধিন	নানাতিননা	|	ধা
×				০				×

তেওরা : মাত্রা সংখ্যা–৭। বিভাগ–৩। ১ম বিভাগে ৩ মাত্রা এবং ২য় ও ৩য় বিভাগে ২ মাত্রা (৩।২।২)। ৩টি তালি (১ম, ৪র্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায়), খালি নেই।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩		৪	৫		৬	৭
ধা	দেন	তা	|	তেটে	কতা	|	গদি	ঘেনে
×				২			৩	

॥ দুইগুণ (৩$\frac{১}{২}$ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
ধা	দেন	তা	|	ঽধা	দেনতা	|	তেটেকতা	গদিঘেনে	|	ধা
×				×			×			×

॥ তিনগুণ (৪$\frac{২}{৩}$ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
ধা	দেন	তা	|	তেটে	ঽঽধা	|	দেনতাতেটে	কতাগদিঘেনে	|	ধা
×				×			×			×

॥ চারগুণ (৫ৣ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	দেন	তা |	তেটে	কতা |	ঽধাদেনতা	তেটেকতাগদিঘেনে |	ধা
×			×		×		×

রূপক ঃ মাত্রা সংখ্যা–৭। বিভাগ–৩। ১ম বিভাগে ৩ মাত্রা, ২য় ও ৩য় বিভাগে ২টি করে মাত্রা। প্রথম মাত্রায় ১টি খালি ও চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায় ২টি তালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তি	তি	না |	ধি	না |	ধি	না
০			×		×	

কাহারবা ঃ মাত্রা সংখ্যা ৮। বিভাগ–২। প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা (৪।৪)। প্রথম মাত্রায় একটি তালি ও পঞ্চম মাত্রায় একটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	গে	না	তি |	না	ক	ধি	না
×				০			

॥ দুইগুণ (৫ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গে	না	তি |	ধাগে	নাতি	নাক	ধিনা |	ধা
×				০				×

॥ তিনগুণ (৫ৢ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গে	না	তি |	না	ঽধাগে	নাতিনা	নাকধিনা |	ধা
×				০				×

॥ চারগুণ (৭ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গে	না	তি |	না	ক |	ধাগেনাতি	নাকধিনা |	ধা
×				০				×

আদ্ধা ঃ মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা (২।২।২।২)। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৫ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাধিন	ঽধা |	ধাধিন	ঽধা |	তাতিন	ঽতা |	ধাধিন	ঽধা
×		×		০		×	

যৎ ঃ মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি আদ্ধা তালের মতো।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধিন |	ধাধা	তিন |	না	তিন |	ধাধা	ধিন
×		×		০		×	

ধুমালী ঃ মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি আদ্ধা ও যৎ তালের অনুরূপ।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধিন |	ধা	তিন |	না	তিন |	ধাগে	তেরেকেটে
×		×		০		×	

আদ্ধা, যৎ এবং ধুমালী তালের দুইগুণ, তিনগুণ ও চারগুণ কাহারবা তালের মতো হবে। তালি, খালি, বোল, বিভাগ প্রভৃতির পরিবর্তন হবে।

ঝাঁপতাল ঃ মাত্রা সংখ্যা—১০। বিভাগ—৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা (২।৩।২।৩)। প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম মাত্রায় তিনটি তালি এবং ষষ্ঠ মাত্রায় একটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধি	না |	ধি	ধি	না |	তি	না |	ধি	ধি	না
×		×			০		×		

॥ দুইগুণ (৬ মাত্রা হতে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না |	ধি	ধি	না |	ধিনা	ধিধি |	নাতি	নাধি	ধিনা |	ধি
×		×			০		×			×

॥ তিনগুণ (৬⅓ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না |	ধি	ধি	না |	তি	নাধি |	নাধিধি	নাতিনা	ধিধিনা |	ধি
×		×			০		×			×

॥ চারগুণ (৭½ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না |	ধি	ধি	না |	তি	না |	ধিনা	ধিধিনাতি	নাধিধিনা |	ধি
×		×			০		×			×

সুরফাক তালঃ মাত্রা সংখ্যা—১০। বিভাগ ৫। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা (২।২।২।২।২)। প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রায় তিনটি তালি ও তৃতীয় ও নবম মাত্রায় দুটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা |	দিন	তা |	কিট	ধা |	তিট	কত |	গদি	ঘেনে
×		০		×		×		০	

সুরফাক তালের দুইগুণ তিনগুণ এবং চারগুণ ঝাঁপতালের অনুরূপ।

চৌতালঃ মাত্রা সংখ্যা—১২। বিভাগ ৬। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা (২।২।২।২।২।২)। প্রথম, পঞ্চম, নবম ও একাদশ মাত্রায় চারটি তালি এবং তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় দুটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দিন	তা	কিট	ধা	দিন	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
×		০		×		০		×		×	

॥ দুইগুণ (৭ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ধা | দিন তা | কিট ধা | ধাধা দিনতা | কিটধা দিনতা |

× ০ × ০ ×

১১ ১২ ১

তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

× ×

॥ তিনগুণ (৯ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ধা | দিন তা | কিট ধা | দিন তা | ধাধাদিন তাকিটধা |

× ০ × ০ ×

১১ ১২ ১

দিনতাতেটে কতাগদিঘেনে | ধা

× ×

॥ চারগুণ (১০ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ধা | দিন তা | কিট ধা | দিন তা | তেটে ধাধাদিনতা

× ০ × ০ ×

১১ ১২ ১

কিটধাদিনতা তেটেকতাগদিঘেনে | ধা

× ×

একতাল ঃ মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি চৌতালের অনুরূপ।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন ধিন | ধাগে তেরেকেটে | থুন্ না | কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে
X 0 X 0 X

১১ ১২
ধিন না
X

এ তালে লয়কারী চৌতালের অনুরূপ, শুধু বোল পরিবর্তিত হবে।

ধামার ঃ মাত্রা সংখ্যা ১৪। বিভাগ ৪। ১ম বিভাগে ৫ মাত্রা, ২য় বিভাগে ২ মাত্রা, ৩য় বিভাগে ৩ মাত্রা এবং ৪র্থ বিভাগে ৪ মাত্রা (৫।২।৩।৪)। ৩টি তালি (১, ৬ ও ১১ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৮ মাত্রায়)। প্রথম ষষ্ঠ ও একাদশ মাত্রায় তিনটি তালি এবং আট মাত্রায় একটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
ক ধি ট ধি ট | ধা ঽ | গ দি ন | দি ন তা ঽ
X X 0 X

॥ দুইগুণ (৮ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ক ধি ট ধি ট | ধা ঽ | কধি টধি টধা | ঽগ দিন দিন
X X 0 X

১৪ ১
তাঽ | ক
X

॥ তিনগুণ (৯$\frac{1}{3}$ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ক ধি ট ধি ট | ধা ঽ | গ দি ঽকধি | টধিট ধাঽগ দিনদি
X X 0 X

১৪ ১
নতাঽ | ক
X

॥ চারগুণ (১০ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ক ধি ট ধি ট | ধা ঽ | গ দি ন | ঽঽকধি টধিটধা ঽগদিন
× × ০ ×

১৪ ১
দিনতাঽ | ক
×

ঝুমরা : মাত্রা সংখ্যা–১৪। বিভাগ–৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ৩টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৩ ৪ ৩।৪)। প্রথম, চতুর্থ ও একাদশ মাত্রায় তিনটি তালি এবং অষ্টম মাত্রায় একটি খালি।

॥ ঠেকা (১ম প্রকার) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন ঽধা তেরেকেটে | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে | তিন ঽতা তেরেকেটে
× × ০

১১ ১২ ১৩ ১৪
ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে
×

॥ ঠেকা (২য় প্রকার) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধিন ধিন ধা | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে | তিন তিন তা | ধিন

১২ ১৩ ১৪
ধিন ধাগে তেরেকেটে
×

দীপচন্দী : মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি ও খালি ঝুমরা তালের অনুসারী।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
ধা ধিন ঽ | ধা গে তিন ঽ | তা তিন ঽ | ধা ধা ধিন ঽ
× × ০ ×

আড়া চৌতাল ঃ মাত্রা সংখ্যা–১৪। বিভাগ–৭। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা (২।২।২।২।২।২।২)। প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ মাত্রায় চারটি তালি এবং পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় তিনটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধিন তেরেকেটে | ধিন না | তু না | ক ত্তা | তেরেকেটে ধিন | না
× × ০ × ০ ×

১২ ১৩ ১৪
ধিন | ধিন না

পঞ্চম সওয়ারী বা ছোট সওয়ারী ঃ মাত্রা সংখ্যা–১৫। বিভাগ–৪। ১ম বিভাগে ৩টি এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৩।৪।৪।৪। প্রথম, চতুর্থ ও দ্বাদশ মাত্রায় তিনটি তালি এবং অষ্টম মাত্রায় একটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা তেরেকেটে
× × ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
তুনা | কৎতা ধিধি নাধি ধিনা
×

॥ ঠেকা (মতান্তরে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
ধা ৪ ধা দিন | তা কৎ ধু ম | কি ট ত ক | ধা দিন তাকে
× × × ×

॥ দুইগুণ (৭২/৩ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | ^ধিন তেরেকেটেধিনা
× × ০

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
কৎধিধি নাধিধিনা | তিনতিনা তেরেকেটেতুন। কৎতাধিধি নাধিধিনা |
× ×

১
ধিন
×

॥ তিনগুণ ১১ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা তেরেকেটে
× × ০

১১ ১২ ১৩
ধিনতেরেকেটেধিনা | কৎধিধিনাধি ধিনাতিনতিনা
০

১৪ ১৫ ১
তেরেকেটেতুনাকৎতা ধিধিনাধিধিনা | ধিন
× ×

চারগুণ (১১১/৪ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা তেরেকেটে
× × ০

১১ ১২ ১৩
তুনা | ৪ধিনতেরেকেটেধিনা কৎধিধিনাধিধিনা
×

১৪ ১৫ ১
তিনতিনাতেরেকেটেতুনা কৎতাধিধিনাধিধিনা | ধিন
×

ত্রিতাল ঃ মাত্রা সংখ্যা–১৬। বিভাগ–৪। প্রতি বিভাগে ৪ মাত্রা (৪।৪।৪।৪)। প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় তিনটি তালি এবং নবম মাত্রায় একটি খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধিন	ধিন	ধা |	ধা	ধিন	ধিন	ধা |	না	তিন	তিন	না |
×				×				o			

১৩	১৪	১৫	১৬
তেটে	ধিন	ধিন	ধা
×			

॥ দুইগুণ (৯ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধিন	ধিন	ধা |	ধা	ধিন	ধিন	ধা |	ধাধিন	ধাধিন	ধাধিন	ধিনধা
×				×				o			

১৩	১৪	১৫	১৬	১
নাতিন	তিননা	তেটেধিন	ধিনধা |	ধা
×				×

॥ তিনগুণ (১০⅔ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধিন	ধিন	ধা |	ধা	ধিন	ধিন	ধা |	না	তিন	ঽঽধা	ধিনধিনধা |
×				×				o			

১৩	১৪	১৫	১৬	১
ধাধিনধিন	ধানাতিন	তিননাতেটে	ধিনধিনধা |	ধা
×				×

॥ চারগুণ (১৩ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধিন	ধিন	ধা |	ধা	ধিন	ধিন	ধা |	না	তিন	তিন	না |
×				×				o			

১৩	১৪	১৫	১৬	১
ধাধিনধিনধা	ধাধিনধিনধা	নাতিনতিননা	তেটেধিনধিনধা |	ধা
×				×

লেঘু— | — যে তাল ব্যবহার হচ্ছে তারই মাত্রা লেঘুতে যাচ্ছে।

দ্রুতম্—O—২ মাত্রা। অনুদ্রুতম্—U—১ মাত্রা।

মাত্রা	ধ্রুবম (লেঘু দ্রুতম লেঘু)	মিঠ্যিয়াম (লেঘু দ্রুতম লেঘু)	রূপকম (লেঘু দ্রুতম লেঘু)	ঝাম্পাই (লেঘু দ্রুতম অনুদ্রুতম)	ত্রিপাডাই (লেঘু দ্রুতম লেঘু)	আডাতাল (লেঘু দ্রুতম লেঘু)	একতাল (লেঘু দ্রুতম লেঘু)
সাধুশ্রম—৪	| O | | ৪+২+৪+৪ ১৪	| O | ৪+২+৪ ১০	× O | — ২ +৪ ৬	| O U ৪ +২ +১ ৭	| O O× ৪ +২+২— ৮	| | O O× ৪+৪+২+২ — ১২	| × × ৪ ৪
ত্রিশ্রম—৩	| O | | ৩+২+৩+৩ ১১	| O | ৩+ ২ + ৩ ৮	× O | — ২ +৩ ৫	| O U ৩ ২ + ১ ৬	| O O× ৩+২+২ — ৭	| | O O × ৩+৩+২+২ — ১০	| × × ৩ ৩
মিশ্রম—৭	| O | | ৭+২+৭+৭ ২৩	| O | ৭+২ + ৭ ১৬	× O | — ২ + ৭ ৯	| O U ৭ + ২ + ১ ১০	| O O × ৭+২ +২ — ১১	| | O O × ৭+৭+২+২ — ১৮	| × × ৭ ৭
খণ্ডম—৫	| O | | ৫+২+৫+৫ ১৭	| O | ৫+ ২ +৫ ১২	× O | — ২ +৫ ৭	| O U ৫ + ২ + ১ ৮	| O O × ৫+ ২+২ — ৯	| | O O× ৫+৫+২+২— ১৪	| × × ৫ ৫
সঙ্কীর্ণম—৯	| O | | ৯+২+৯+৯ ২৯	| O | ৯+ ২ +৯ ২০	× O | — ২ + ৯ ১১	| O U ৯ + ২ +১ ১২	| O O × ৯+২ +২ — ১৩	| | O O× ৯+৯ +২+২— ২২	| × × ৯ ৯

কথাকলি নৃত্যের বোল

মূল পদাবিক্ষেপ

১। ধি তা তা তা

২। থেই ইত্বা তি তি। থেই ইত্বা তোম্ তোম্।

৩। থি তি তি তেই।

৪. ধি গিতা তেই।

৫। তা কিটা কিটা তাগি, থি কিটা কিটা তাগি।

৬। থি ত্তাম, থি ত্তাম, থিত্তিথিত্তাম।

৭। তা তাগাতা, তাকা তাগাতা, তাকা তাগাতা তাকাতা, থি থিগিতি, থিকি থিগিতি, থিকি থিগিতি থিগিতি।

কথাকলি নৃত্যে ৫টি তাল বর্তমান—চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়ান্দা, পাঞ্চারী, ত্রিপাডা।

১। চাম্বাড়া (Champada) ৮ মাত্রা।

+	|	|	|	+	o	+	o
থেই	ইয়াম	তা	তা	থি	—	থি	—

২। চাম্পা (Champa) ১০ মাত্রা।

+	o	|	|	|	+	o	+	+	o
থেই	—	তা	তি	ইন্দা	তা	কিটা	থি	থি	কিটা

৩। আড়ান্দা (Adantha) ১৪ মাত্রা।

+	o	|	|	|	+	o	|	|	|	+	o	+	o
থেই	—	তা	তা	তা	থিম	—	তা	তা	তা	থিম	--	থি	থিত্তি

৪। পাঞ্চারী (Panchari) ৬ মাত্রা।

+	o	|	|	|	|
তোম	—	তা	তি	ইন্দা	কান

৫। ত্রিপাডা (Tripada) ৭ মাত্রা

+	|	|	+	o	+	o
থেই	ইয়াম	তা	থি	—	থি	—

চাম্বাডা ৮ মাত্রা কলাশম

১। + | | | +
থিত্তা মিত্তা থিন্দা তা কার তিগি থেই ইতে
o + o +
ইত্তেই থিতে ইত্ত্বা থিগি তা থেই

২। + | | | + o + o
ইতি ইত্তাম ইতি তিত্তাম ইতি ইত্তাম ইতি তিত্তাম
+ | | | + o + o
ইতি তিত্তাম ইতি তিত্তাম ইতি ইত্তাম ইতি তিত্তাম
+ | | | + o
থিত্তা মিত্তা থিন্দা তা করতিগি থেই ইতে ইত্তেই
+ o +
থিতে ইত্তা থিগিতা থেই।

৩। + | | | + o
থিত্তা তাত্তা থিত্তা থিগিতা থেই —
+ o + |
থেই থিত্তা থিগিতা থেই —থেই থিত্তা
| + o + o
থিগিতা থেই তা থিগিতা থেই তা — থিগিতা
+ | | | + o + o +
থেই থিত্তাম — থিত্তাম থিগিতা থেই থেই থিগিতা থেই

৪। + | | | + o + o
থিত্তা তাত্তা থিত্তা থিগিতা তেই ইয়াম তা তা
+ | | | + o
থিত্তা তাত্তা থিত্তা থিগিতা তেই ইয়াম
+ o + |
থিত্তা তাত্ত্বা থিগিতা থেই

| | + o
থিত্রা তাত্রা থিগিতা থেই

+ o + | | |
থিত্র থিগিতা থেই থিত্র। থিগিতা থেই

+ o + o
তা থিগিতা থেই তা। থিগিতা থেই

+ | | | + o
তা থিগিতা থেই থেই থীতেই — থীতি থেই

+ o +
— থীতি তী থেই

৫। + | | |
থী থী থেই উম তা ত্রা

+ o + o + | | |
থেই থীতেই — থিতি থেই — থীতি তি থেই উম তাত্রা

+ o + o
থিতি তি তেই উম তা ত্রা

+ | | | + o + o
থেই থীতেই — থিতিতেই — থিতিতি তেই উম তাত্রা

+ | | | + o + o
থি থি থেই উম তাত্রা থিতি তি তেই উম তাত্রা

+ | | |
থি তেই থিতি তেই

+ o + o +
থি তে ইত্রা থীত্রা দিগিতা তেই

৬। + | | |
তাককিটা কিটাতাগি তাককিটা কিটাতাগি

+ o + o + |
তাককিটা কিটাতাগি তা তাত্রা থিগি তা

| | + o + o
থিগি তা থিগি তা থেই উম তাৎ তা

+ | | |
থিককিটা কিটাতাগি থিককিটা কিটাতাগি

+ o + o + |
থিককিটা কিটাতাগি থি থিত্রি থিগি তা

| | + o + o
থিগি তা থিগি তা থেই উম তাৎ তা

+ | | | + o
তাককিটা কিটাতাগি তাককিটা কিটাতাগি তা তাত্রা

+ o + | | |
থিগি তা থিগি তা থেই উম তাৎ তা

+ o + o + |
থিককিটা কিটাতাগি থিককিটা কিটাতাগি থি থিত্রি

| | + o + o
থিগি তা থিগি তা থেই উম তাৎ তা

+ | | |
তাককিটা কিটাতাগি তা তাত্রা

+ o + o
থিগি তা থেই উম তাৎ তা

+ | | |
থিককিটা কিটাতাগি থি থিত্রি

| o + o
থিগি তা থেই উম তাৎ তা

+ | | |
তাককিটা কিটাতাগি থিককিটা কিটাতাগি

+ o + o
নং কিটা কিটাতাগি নুং কিটা কিটাতাগি

+ | | | + 0 + 0 +
তাক্ কু ডি — কু তা খি টেন তাককিটা কিটাতাগি থেই

চম্পাতালের কলাশম ১০ মাত্রা

+ o | | | + o +
১। থিতা তাত্বা থি তাম থেই থিতেই —থি তিথেই
+ o +
—থি তিতি থেই

+ o | | | + o
২। থেই থিতেই —থি তিথেই —থি তিতি থেই
+ + o +
থি তি তিথেই থিত্বা দিগিতা তেই

+ o | | | + o
৩। থেই থিতেই —থি তিথেই —থি তিতি থেই
+ + o + o | |
থিতি তিথেই —থি তিথেই —থিত তেই তেই
| | o + + o +
তেই থিতেই —থি তিথেই —থি তিতি তেই

কথাকলি আড়ান্দা তালের কলাশম ১৪ মাত্রা

+ o | | | + o | | | + o + o
তে ই তা তা তা ধি ম তা তা তা তা কিটা কিটা তাকি
+ o | | | + o | | | + o + o
তা ম তা তা তা ধি ম তা তা তা তা কিটা কিটা তাকি
+ o | | | + o
তা তা তা তা কিটা কিটা তাগি
| | | + o + o
তা তা তা তা কিটা কিটা তাগি
+ o | | | + o | | | + o + o
তা ম তা তা তা ধি ম তা তা তা তা কিটা কিটা তাগি

+	o	।	।	।	+	o	।	।	।	+	o	+
তা	—	কু	ডি	—	কু	তা	—	খি	টেন	তা	কিটা	কিটা

o	+
তাকি	তাম

তোভায়াম নৃত্যের বোল

চাম্বাডা ৮ মাত্রা

কাটতাগি থিম্‌······তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌
কিটাতাগি থিকেন তাকেন তোম্‌ তোম্‌ তোম্‌ তোম
থি·· তাম কাটতাগি থিকেন তা কেন
থেই ইতেই ইত্তেই খিতেইতা থিগিতা
থেইতাম ইত্তা থেইথেই তোম
থেইতাম ইত্তা থেই থেই তোম্‌
থেইতাম ইত্তা থেই থেই তোম্‌ তোম্‌
থেই ইত্তা খিত্তা তোম্‌ তোম্‌
থেই ইত্তা খিত্তা তোম্‌ তোম্‌
থেই ইত্তা খিত্তা তোম
খিত্তা তাতা খিত্তা তাতা
খিত্তা তাতা খিত্তা তাতা
খিত্তা তাতা খিত্তা তাতা
[খিত্তা মিত্তা থিন্দা তাকর তাগি থেই ইতেই ইত্তেই
থিতে ইতা থিগিতা].

ত্রিপাডা ৭ মাত্রা

তেই তাক্‌থিন্‌ তাগা তিন্দা
তেই তাক্‌থিন্‌ তাগা তিন্দা
তেই তাক্‌থিন্‌ তাগা তিন্দা
তেই তাক্‌থিন্‌ তাগা থিথি

চাম্বাডা ৮ মাত্রা

তেই তাক্‌ থিন্‌ তাগা থিথি
তেই তাক্‌থিন্‌ তাগা থিথি

তেই তাক্থিন্ তাগা থিথি
তেই থিথিতেই থিথি তেই
তাক্থিন তাগা থিথিতেই
তাক্থিন তাগা থিগিতা
থেই ইত্তা ধিত্তা তোম্ তোম্
থেই ইত্তা ধিত্তা তোম্ তোম্
থেই ইত্তা ধিত্তা তোম্
ধিত্তা তাতা ধিত্তা তাতা
ধিত্তা তাতা ধিত্তা তাতা
ধিত্তা তাতা ধিত্তা তাতা

[থিত্তা মিত্তা থিন্দা তা কবতিগি থেই ইতেই ইত্তেই
থিতেই তা থিগিতা]

আড়ান্দা
১৪ মাত্রা

{ তেইয়া তাক্ থিন্ তাগা তিন্ দা
তেইয়া তাক্ থিন্ তাগা তিন্ দা
তেইয়া তাক্ থিন্ তাগা তিন্ দা
তেইয়া তাক্ থিন্ তাগা তিন্ দা }

তাতাতা থি···তাতাতা তা কিটা কিটা তাগিতাম
তাতাতা থি···তাতাতা তা কিটা কিটা তাগিতাম
তাতাতা থি···তাতাতা তা কিটা কিটা তাগিতাম
তাতাতা তা কিটা কিটা তাগি
তা তাতা তা কিটা কিটা তাগিতাম্
তা তাতাথি···তাতাতা তা কিটা কিটা তাগি
তাঃ কুতি কুতা কি টেন
তা কিটা কিটা তাগি

(উপরে লেখা এই আড়ান্দা বোলটি পর পর সম্পূর্ণটি প্রথম একবার বিলম্বিত লয়ে হবে। তারপর '{' সেকেন্ড ব্রাকেট চিহ্নিত অংশ একবার বিলম্বিত হবার পর সম্পূর্ণ আড়ান্দার পর পর একবার দ্রুত লয়ে হবে)

চাম্বাড়া	তেই ইত্তাম্ ইথাতেই (৩ বার করতে হবে)
৮ মাত্রা	তাতাতা ধি

কর তিগি থেই ইতেই ইত্তেই থিতেই তা থিগিতা
তোম···ম···থিত্তাম···তিন্দা ক্যান্
তোম···ম···থিত্তাম···তিন্দা ক্যান্
তেই ইতেই ইত্তেই থিতেইতা থিগিতা
থিতা তাতা তিন্দা তা করতিগি
তেই ইতেই থিতেই তা থিগিতা
তো···ম্···থিত্তাম্···তিন্দা ক্যান্
তো·· ম্·· থিত্তাম্·· তিন্দা ক্যান্
তো·· ম্···থিত্তাম্···তিন্দা ক্যান্
তো···ম্···থিত্তাম্···তিন্দা ক্যান্
তেই ইতেই ইত্তেই থিতেই তা থিগিতা
থিতা তাতা তিন্দা তা করতিগি
তেই ইতেই ইত্তেই থিতেই তা থিগিতা
তো···ম্ ··থিত্তাম···তিন্দা ক্যান্
তো···ম্···থিত্তাম্···তিন্দা ক্যান্
তেই ইতেই ইত্তেই থিতেইতা থিগিতা
থিতা তাতা তিন্দা তা করতিগি
তেই ইতেই ইত্তেই থিতেই তা থিগিতা
তেই ইতাম্ তেই তেই ইতাম্ তেই তেই ইতাম
তাতাতা ধি থিগিতা
ধিম্······তাম্ তাম্ তাম্ তাম্
তাম করতিগি ধি ক্যান তা ক্যান
তোম্ তোম্ তোম্ তোম্
ধি তাম্ করতিগি ধি ক্যান্ তা ক্যান
তেই ইতেই ইত্তেই থিতেইত্তা থিগিতা থেই

চম্পা। ডান পা। } তা তিন্ দা। তা কিটা থি থি থিত্তা থিগিতা
১০ মাত্রা থেই……

তা তিন্ দা। তা কিটা থি থি থিত্তা থিত্তিতা থেই……

বাম পা। } তা তিন্ দা। তা কিটা থিথি কিটা থেই

(৬ বার এটি করতে হবে)

তা তিন্ দা তা কিটা থিথি

থিত্তা থিগিতা থেই

তা তিন্ দা তা কিটা থিথি কিটা

চম্পার ১ম কলাশম { থি তা তা তা থি তাম্ থেই থিতেই
তি তি থেই থি তি তি থেই

এরপর আবার চম্পা তালের উপরের ডান পা ও বাম পার অংশটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে, এরপর দ্বিতীয় কলাশম হবে।

দ্বিতীয় কলাশম { থেই থিতেই থিতি তেই থি তি তি থেই থিতিতি থেই
(থিত্তা থিগিতা তেই) দ্রুত লয়

পুনরায় চম্পা তালের ডান ও বাম পায়ে অংশটুকু করে তৃতীয় কলাশম হবে।

চম্পার তৃতীয় কলাশম { থেই থি তেই থি থিতেই থিতিতিতেই থিতিতে তেই
থিতি তেই থি তেই থেই থেই থিতেই দিতিতেই থিতি
থি তেই

পাঞ্চারী ৬° মাত্রা তো…ম্ তা তিন দা ক্যান্

(২ বার হয়ে এই বোলের উপরেই ছোট কলাশম হবে)

(কলাশম) থেই ইতে ইত্তেই থিতে ইত্বা থিগিতা (তোম)

এরপর দশবার হবে এবং মধ্যম কলাশম হবে।

তোম তাৎ দিন তা কেন তোম (তিনবার)

তাৎ তোম তাকা তোম

তাৎ দিনতা তেন তোম্থিত্ থিগিতা তেম্

এরপর আবার দুবার হয়ে ছোট কলাশম হয়ে আবার দশবার হয়ে ত্রিপাডা তালে চলে যাবে

ত্রিপাড়া ৭ মাত্রা   থেই তাত্তিম তাগা তিনদা

প্রথমবার দ্বুবার হয়ে উপরের ছোট কলাশম। তারপর দশবার করে মধ্যম কলাশম।

তিতি থেই তাত্তিম তাগা
তিতি থেই তাত্তিম তাগা
তিতি থেই তাত্তিম তাগা
তিতি থেই তাত্তিম তাগা থিগিতাৎ।

আবার দ্বুবার করে ছোট কলাশম এবং দশবারের পর বড় কলাশম।

থেই   তাত্তিম তাগা তিতি থেই
তাত্তিম তাগা তিতি থেই
তাত্তিম তাগা তিতি থেই
তিতি তেই তিতি থেই
তাত্তিম তাগা তিনি থেই
তাত্তিম তাগা তিখি খাৎ

চাম্বাড়া   তেই ইত্বাম ইত্তা তেই (৩ বার করতে হবে)
৮ মাত্রা   তা তা তা ধি, করতিগি থেই ইতেই ইত্তেই থিতেইতা থিগিত্তা
থেই ইতা তিতি থেই ইতা তোম তোম (২ বারের পর)
থেই ইতা তিতি তা তোম
ধিতা তাতা ধিতা তাতা (৩ বার)
থিতাম ইত্বা তিন্দা তা কর তিগি থিতে ইত্বা থিত্তা থিগিতা তেই।

মণিপুরী নৃত্যের প্রণামের বোল

৬ মাত্রা (মেনকূপ)

+	o	+	o
			o
			ঘিৎ ঘিণা গ্রা

+	0	+	|
ধিন ধেন তা	ধিন ধেন তা	ধিন ধেন তা	ধেন ঘিণা গ্রা
ধিন ধেন তা	ধিন ধেন তা	ধিন ধেন তা	ধিন ঘিণা গ্রা
ধেন তা ধেন	— তাৎ তা	খিৎ তা ধেন	তা ঘর ঘর
তাৎ তা তাং	খি ঘেন তা	ধেৎ ধেৎ ধেন	তা ধে ধে
ধেন			

মৃদঙ্গের রাগ

	+				|	0				
	—	—	খর	খর	|	তেন্	তা	থেন্	—	|
‖	ধিন্	—	খর	খর	|	তেন্	তা	তেন্	—	|
	তঃ	—	খর	খর	|	তেন্	তা	থেন্	—	‖

+				|	0				
ধিন্	—	খর	খর	|	তেন্	তা	থেন্	—	|
ধিন্	—	খর	খর	|	তেন্	তা	থেন্	—	|
ধিন্	—	তাং	—	|	খিৎ	—	তাং	খিৎ	|
ত	ত	খিৎ	তাং	|	খিৎ	ত	ত	খিৎ	|
ত	ত	খিৎ	তাং	|	ঘিন্	ত	ত	ঘিন্	|
ত	ত	ঘিন্	তা	|	থেন্	—	—	—	|
ধিন্	—	—	—	|	তেন্	---	—	—	|
তঃ	—	—	—	|	তাং	—	—	—	|

চালি

তাল চালি মাত্রা ৮

তাল ৩ ফাঁক ১

ঢিমালয়

‖ ১ ‖

ঠেকা

+		0		২		৩	
ধিন্ তেন্	|	— তঃ	|	খিৎ তা	|	ধেন্ তা	‖

॥ তেহাই ॥

ধিন্ তেন্	তেন তাং	— ঘিন্	থেন্ —
ধিন্ খর	খর তাং	খর খর	তাং খিৎ
তা ঘিন্ন	গ্র ধেন্	— তা	তেন্ তা ॥

॥ ২ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
তৎ তৎ	তৎ তঃ	খিৎ তা	ধেন্ তা ॥

॥ তেহাই ॥

তা তেন্	তেন তাং	— ঘিন্	থেন্ —
ধিন্ খর	খর তাং	খর খর	তাং খিৎ
তা ঘিন্ন	গ্র ধেন্	ঘিন্ন গর	ধেন্ তা ॥

॥ ৩ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
ধিন্ তেন্	খর খর	তঃ ঘিন্	ধেন্ তা ॥

॥ তেহাই ॥

ধিন্ তেন্	তেন্ তাং	— ঘিন্	থেন্ —
ধিন্ খর	খর তাং	খর খর	তাং খিৎ
তা ঘিন্ন	গ্র ধেন্	— তা	তেন্ তা ॥

চালি ডবল

॥ ৪ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
তা তঃ	ঘিন্ ধেন্	তঃ ঘিন্	ধেন্ তা
ধেন্ তঃ	ঘিন্ ধেন্	তঃ খিৎ	তেন্না তেন্না ॥

(এখান থেকে তেহাই আসবে)

+	০	২	৩
তা তঃ	ঘিন্ ধেন্	তঃ ঘিন্	ধেন্ তা
ধেন্ তঃ	ঘিন্ ধেন্	তঃ —	খর খর

॥ তেহাই পুংলোন ॥

+	০	২	৩
তা তঃ	ঘিন্ ধেন	তঃ —	খর খর
তা তঃ	খিং তা	তেন্ তা	তাং —
তা ঘিন্ন	গ্র ধেঃ	— তা	তেন্না তেন্না ॥

লয়—ঢিমা

॥ ৫ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
ধিন্ তেন্	— তত	তঃ তেন্	তঃ খখ
তঃ তেন্	— তত	তখিৎ তাধেন	তগীন ধেস্ত ॥

॥ তেহাই ॥

+	০	২	৩
ধিন্ তেন্	তেন্ তাং	— ঘিন্	ধেন্ —
ধিন্ খর	খর তাং	খর খর	তাং খিৎ
তা ঘিন্ন	গ্র ধেন্	— তা	তান্ তা ॥

॥ ৬ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
তা তেন্	তেন্ তঃ	তত তত	ধেন্ তঃ
তা তেন্	তেন্ তঃ	তত তত	তেন্ তঃ ॥

॥ তেহাই ॥

তা তেন্	তেন্ তাং	— ঘিন্	থেন্ —
ধিন্ খর	খর তাং	খর খর	তাং খিৎ
তা ঘিন্ন	গ্র ধেন	ঘিন্ন গর	ধেন্ তা ॥

॥ ৭ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
ধেঃ ধস্ত	তত খিত্তা	ধস্ত তত	খিত্তা তেস্তা
তাৎ ততেন্	তত খিত্তা	তত তত	খিত্তা তেস্তা ॥

॥ তেহাই ॥

+	০	২	৩
ধিন্ তেন্	তেন্ তাং	— ঘিন্	থেন্ —
ধিন্ খর	খর তাং	খর খর	তাং খিৎ
তা ঘিন্ন	গ্র ধেন্	ঘিন্ন গর	ধেন্ তা

॥ ৮ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
ধিন্ ঘিন্না	ধেন্ ধিন্	ঘিন্না ধিন্	তেন্ তা
তঃ খিত্তা	তেন্ ধিন্	ঘিন্না ধিন্	ধেন্ তা ॥

॥ তেহাই ॥

+	০	২	৩
ধিন্ তেন্	তেন্ তাং	— ঘিন্	থেন্ —
ধিন্ খর	খর তাং	খর খর	তাং খিৎ
তা ঘিন্ন	গ্র ধেন্	তা ঘিন্	থেৎ — ॥

বাম এবং ডান দিকে ঘুরে তেহাই

+	০	২	৩
ধিন্ ধেন্	খিৎ তা	তাঃ —	থেন্ ঘিন্নগ্র
ঘিন্তা তেন্তা	খিতা তেন্তা	খিত্ত তগীন্	তত খিত্তা
খিত্র গ্রঘিন্	তাঘিন্ থেৎ	ধেন্ —	-

লয়- ঢিমা

॥ ৯ ॥

ঠেকা

+	০	২	৩
ধিন ঘিন্তা	ধেন্ ধিন্	তেন তা	তাঃ —
ধিন্ ধিন্তা	ধেন ধিন্	তেন্ তা	তাঃ —
ধিন্ তাতেন্	তা তাঃ	তা তাতেন	তা তাঃ
তা তত	তত খিত্তা	তখিৎ তা	খিৎ ॥

॥ তেহাই ॥

ধিন্ ঘিন্তা	ধেন্ ধিন্	তেন্ তা	তাঃ —
ধিন্ ঘিন্তা	ধেন্ ধিন্	তেন্ তা	তাঃ —
ধিন্ তাতেন্	তা তাঃ	তা তাতেন	তা তাঃ

+	০	২	৩
ধিন্ ধেন্	খিৎ তা	তঃ —	থেন্ গীন্নগ্র
ঘিন্তা তেন্তা	খিত্তা তেন্তা	খিত্ত তগীন্	তত খিত্তা
খিত্র গ্রঘিন্	তাঘিন্ থেৎ	ধেঃ —	— —

॥ ১০ ॥

বোল

+		0		২		৩	
ধন্ত	তত	খিত্ত	তখিৎ	তাং	—	ঘিন্	—
তত	তত	খিত্ত	তখিৎ	তাং	—	ঘিন্	—
ধন্ত	তত	খিত্ত	তঃ	তত	তত	খিত্তা	তঃ
ঘিন্না	ঘিন্না	ধেঃ	ঘিন্না	ঘিন্না	ধেঃ	ঘিন্না	ঘিন্না ॥

+		0		২		৩	
ধিন্	ধেন্	খিৎ	তা	তঃ	—	থেন্	— ॥

॥ ১১ ॥

ঠেকা

+		0		২		৩	
ধন্তেং	ঘিন্	তঃ	ধেন্	তঃ	ধেন্	তঃ	—
ধন্তেং	ঘিন্	তঃ	তেন্	তঃ	তেন্	তঃ	—
—	তেন্	—	তঃ	—	তেন্	তঃ	—
—	তেন্	—	তঃ	তত	খুখু	খুাং	—
ধিন্	ধেন্	খিৎ	তা	তঃ	—	থেন্	—

॥ তেহাই ॥

ধন্তেন	তা	খিত্তা	ধেন	তাখিৎ	তধিন্	তা	তেন্
তাৎ	তত	তত	খিত্তা	তঘিন্	ধন্তেন্	তা	খিত্তা
ধিন্	ধেন্	খিৎ	তা	তঃ	—	থেন্	--

দক্ষভ্রমরী (ডানদিকে ঘুরে তেহাই)

+		0		২		৩	
ঘিন্তা	তেন্তা	খিত্তা	তেন্তা	খিত্তা	তঘিন্	তত	খিত্তা
খিত্র	গ্রঘিন্	তগীন্	থেৎ	ধেৎ	—	থেন	— ॥

॥ ১২ ॥

ঠেকা

+		০		২		৩	
ধিন্	ঘিন	—	তা	ধেন্	—	ধিন্	—
—	ঘিন্নগ্র	ধিন্	ধেন্	তৎ	ধেন্	তঃ	ঘিন্
তাং	—	—	তা	তেন্	—	তঃ	—
তত	খিত্তা	তঃ	তত	খিত্তা	তঃ	তত	খিত্তা

(এখান থেকে তেহাই আসবে)

+		০		২		৩	
ধিন্	ঘিন্		তা	ধেন্	—	ধিন্	—
—	ঘিন্নগ্র	ধিন্	ধেন্	তৎ	ধেন্	তঃ	ঘিন্
ধিন্	ধেন	খিৎ	তা	তঃ	—	—	— ॥

॥ ১৩ ॥

বোল ৪ রক হনবা

+		০		২		৩	
ঘিন্তাং	তা	তঘিন্	ঘিন্	তাতেন্	ত্রথ্	তঘিন্	ঘিন্
তাতেন্	ত্রথ্	তেন্তা	খিত্তা	তঘিন্	ঘিন্তাং	তা	খিত্তা
ঘিন্তাং	তা	খিত্তা	ঘিন্তাং	তা	খিত্তা	ঘিন্	তাং
খিৎ	তত	তত	খিত্তা	তঘিন্	ঘিন্তাং	তা	খিত্তা

(ডানদিকে ঘুরতে হবে)

+		০		১		২	
ধিন	ধেন্	খিৎ	তা	তঃ	—	থেন্	ঘিন্নগ্র
ঘিন্তা	তেন্তা	খিত্তা	তেন্তা	খিত্ত	তগিন্	তত	খিত্তা
খিত্র	গ্রঘিন্	তাগিন্	থেৎ	ধেঃ	—	—	—

॥ ১৪ ॥

ঠেকা

+		0		২		৩	
তৎ	তেন্	ধিন্	—	তৎ	ধেন্	ধিন্	ঘিন্নগ্র
ধিন্	তেন্	ধিন্	—	তৎ	তেন্	তঃ	—

॥ তেহাই ॥

+		0		২		৩	
তৎ	তেন্	ধিন্	—	তৎ	ধেন্	ধিন্	ঘিন্নগ্র
ধিন্	ধেন্	খিৎ	তা	তঃ	—	থেন্	ঘিন্নগ্র
ঘিন্তা	তেন্তা	খিত্তা	তেন্তা	খিত্ত	তঘিন	তত	খিত্তা
খিত্র	গ্রঘিন্	তঘিন্	থেৎ	ধেঃ	—	—	—

॥ ১৫ ॥

	+		0		২		৩	
	তা	খিত্তা	তা	ধেন্	তঃ	ঘিন্	ধেন্	তা
*	ধিন্	তৎ	তেন্	তঃ	খিৎ	তৎ	তেন্	তঃ
*	ধিন্	ধেন্	খিৎ	তা	তঃ	—	থেন্	—

তখিতত খিত্তাধেন্ | তধিন ততখিত্তা | ধিন্ত্রগ্র ধেধে | ধিন্‌ধিন্ তেন্তা |

ইঙ্গিৎ

তখিত্তত খিত্তাধেন্ | তধিন্ ততখিত্তা | ধিন্‌ধেন্ খিত্তা | তঃ থেন্‌গীন্নগ্র |

ঘিন্তাতেন্তা খিত্তাতেন্তা খিত্ততঘিন্ ততখিত্তা | খিত্রগ্রঘিন্ তঘিন্‌থেৎ ধেঃ—|

॥ ১৬ ॥

+		0		২		৩	
খিৎ	—	তৎ	—	—	—	—	—
গ্রঘিন্	—	গ্রঘিন্	—	ধিন্	—	—	—
তানেন্ন	তাৎ	—	তাং	তাতঃ	—	তাং	—
তেন্	তাৎ	ত্রখ্	ত্রেন্তা	খিৎ	তা	তঃঘিন্	থেৎ

ঘিন তৎ	ত্রখ্ তেস্তা	খিত্তা তেন্	তঃ —
— —	— —	তে তাৎ	ত্রখ্ তেস্তা
খিৎ তা	তঘিন থেৎ	ঘিন্ তৎ	ত্রখ্ তেস্তা
খিত্তা তেন্	তঃ —	— —	— —
তেন্ ধিন্	তেন্ ধিন্	তেন্ন তেন্ন	তেন্ন তেন্ন
তেন্ ধিন্	ত্রখ্ তেস্তা	খিত্তা তেন্	তঃ —
ঘিন্ন ম্রাং	— খ্	খ্রাং —	— —
খিৎ তা	— তঃ	ঘিন্ তা	তঃ —
ধিন্ তেন্ন	তেন্ন তেন্ন	তাৎ ত্রখ্	তেস্তা খিত্তা
থেন্ —	ধেঃ ধেঃ	ধেন্ তাখিৎ	তা ঘিন্ন
তাং —	ধেঃ ধেঃ	ধেন্ তাখিৎ	তা ঘিন্ন
তাং তাখিৎ	ঃতা ঘিন্ন	তাং তাখিৎ	তা ঘিন্ন
তাং —	ধেঃ ধেঃ	ধেন্ তাঘিন্	তা ঘিন্ন
তাং তঘিন	ঃতা ঘিন্ন	তাং —	— —

॥ ১৭ ॥

বোল

+	০	২	৩
তাতেন তাতাৎ	তেস্তা তাৎ	তাং —	ধেঃ ধেন্
তাতেন্ তাতাৎ	তেস্তা তাৎ	তাং —	— খ্খ্
তাতেন্ তা তাৎ	তেস্তা তাৎ	তাং —	ধেঃ ধেন্
তাতেন্ তাতাৎ	তেস্তা তাৎ	তাং —	তা থেন্
ধিন্ত্র খ্	তত্র খ্	তঃ —	তা থেন্
ধিন্ত্র খ্	তত্র খ্	তঃ —	তা থেন্
ধিন্ত্র খ্	ধিন্ত্র খ্	ধিন্ত্র খ্	ধিন্ ধেন্
ধিন্ত্র খ্	ধিন্ত্র খ্	ধিন্ত্র খ্	ধিন্ ধেন্
ধন্ ঃধন্	তাখিৎ তা	ধন্ ঃধন্	তাখিৎ তা
তাংতত খিত্তা	তঃ ঘিন্নঘিন্ন	ধেঃ —	— —

(ডানদিকে ঘুরতে হবে)

+		০		১		২	
ঘিন্তা	তেন্তা	খিত্তা	তেস্ত	খিন্তা	তঘিন	তত	খিত্তা
খিত্র	গ্রঘিন	তাঘিন	থেৎ	ধেঃ	—	—	—

(তাঞ্চপ্ মাত্রা ৮)

মধ্য লয়

॥ ১৮ ॥

ঠেকা

+				০			
ধিন্	তেন্	—	তা	তঃ	ধেন্	ঘিন্ন	ধেন্

॥ ১৯ ॥

বোল

+				০			
ত্রৎ	—	তা	তঃ	তেন্	তেন্	তা	তঃ
খিৎ	খিত্তা	তেন্তা	খিত্তা	তখিৎ	তাং	খিৎ	ঘিন্নগ্র
ধেৎ	ধেৎ	—	ঘিন্	তঃ	ধেন্	ধিন্	খ্র খ্র
তঃ	তেন্	—	তা	তঃ	—	থেন্	—
ধেৎ	ধেৎ	—	ধেন্	ধন্ত	তত	খিত্তা	তেন্তা
তঃ	তাং	খিন্তা	তেন্তা	তঃ	—	থেন্	—
—	ধেং	ঘিন্	তঃ	ধেং	ঘিন্	তঃ	—
—	ধেং	ঘিন্	তঃ	ধেং	ঘিন্	তঃ	—
তাৎ	তেন্ন	তেন্ন	তেন্ন	তঃ	—	তাং	—
—	তাং	—	ঘিন্	—	তাং	ঘিন্	খ্র খ্র
তঃ	তাং	—	ঘিন্	ঘিন্	ঘিন্	ঘিন্	—

॥ ২০ ॥

বোল

+					o				
তাৎ	তাৎ	তাৎ	তঃ	|	তাৎ	তাৎ	তঃ	—	|
তত	তত	খিত্ত	তখিৎ	|	তাং	—	খিৎ	—	|
খিৎ	খিৎ	—	খিৎ	|	—	ঘিন্নগ্র	ধিন্	ধেন্	|
ঘিন	ত	তাং	—	|	—		তাং	—	|
—	তেন্ন	তঘিন্	তাং	|	—	তেন্ন	তঘিন্	তাং	|
—	তেন্ন	তঘিন্	তাং	|	—	—	ত	খিন্নগ্র	|
খিস্তা	তেস্তা	খিত্তা	তেস্তা	|	খিত্ত	তঘিন্	তত	খিত্তা	|
তাৎ	তাৎ	তাৎ	তাৎ	|	তাৎ	ত্রখ্	তঃ	থেন্	|
—	ঘিন্	—	ধেন্	|	ঘিন্	ঃতঃ	ঘিন্	তাং	|
—	ঘিন্	—	ধেন্	|	ঘিন্	ঘিন্	ঃতঃ	তাং	|
ঘিন্তঃ	ঘিন্ ঘিন	তঘিন্	ধেন্	|	ঘিন্	ঃতঃ	ঘিন্	তাং	|
—	—	—	—	|	—	—	থেন্	—	|
ঘিন্তঃ	ঘিন্ঘিন্	তঘিন্	ধেন্	|	ঘিন্	ঃতঃ	ঘিন্	তাং	॥

(ডানদিকে ঘুরতে হবে)

+					o				
ধিন্	ধেন্	খিৎ	তা	|	তঃ	—	থেন	ঘিন্নগ্র	|
ঘিন্তা	তেস্তা	খিত্তা	তেস্তা	|	খিত্তা	তঘিন	তত	খিত্তা	|
খিত্র	গ্রঘিন্	তধিন্	থেৎ	|	ধেঃ	—	—	—	|

(ঝাঁপ মাত্রা ৮)

॥ ২১ ॥

তাল ১ ফাক ১

বোল

+					০				
ঘিন্	—	—	তঃ	|	ঘিন্	ঘিন্	তঃ	—	|
ধেন্	তত্র	খিন	তঃ	|	ঘিন্ন	তাৎ	—	—	|
তৎ	তৎ	তঃ	খিৎ	|	তৎ	ধেন	তঃ	—	|
ধৎ	ধেন	তঃ	ঘিন্ন	|	তৎ	তেন	তঃ	—	|
—	তেন্	—	তঃ	|	তত	তত	তেন্	তঃ	|
তৎ	তৎ	তঃ	খিৎ	|	তৎ	ধেন্	তঃ	—	|
ধৎ	ধেন্	তঃ	ঘিন্ন	|	তৎ	তেন্	তঃ	—	|
—	তেন্	—	তঃ	|	তত	তত	তেন্	তঃ	|
তঘিন্নাং	—	ঘিন্	—	|	খিৎ	তত	খিত্তা	তেন্তা	|
খিত্ত	তঘিন্	তত	খিত্তা	|	খিত্ত	তখিৎ	তাং	—	|
খিত্ত	তখিৎ	তাং	—	|	খিত্ত	তখিৎ	তত	খিত্তা	|
খিত্ত	তখিৎ	তাং	ঘিন্	|	—	তা	থেন্	—	|
ঘিন্	ঘিন্	থেৎ	তঃ	|	ঘিৎ	তাং	খিত্তা	তঘিন্	|
ধেন্	খিত্তা	তঘিন্	ধেন্	|	—	ধেন্	খিত্তা	তঘিন্	|
ঘিন্	ঘিন্	থেৎ	তঃ	|	ঘিন্	তাং	খিত্তা	তঘিন্	॥

(ডানদিকে ঘুরতে হবে)

+					০				
খিন্	ধেন্	খিৎ	তা	|	তঃ	—	থেন্	ঘিন্নগ্র	|
ঘিন্তা	তেন্তা	খিত্তা	তেন্তা	|	খিত্ত	তঘিন্	তত	খিত্তা	|
খিত্র	গ্রঘিন্	তাঘিন্	থেৎ	|	ধেঃ	—	—	—	॥

(মেনকুপ মাত্রা ৬)

(ঢিমা লয়) ১ তাল ১ ফাঁক

॥ ২২ ॥

ঠেকা

+			o		
ধিন্	—	তেন্ |	তঃ	খিন্	ধেন্ ॥

॥ তেহাই ॥

ধিন্	ঘিন্নগ্র	ধেন্ |	ধিন্	ঘিন্নগ্র	ধেন্ |
ধিন্	ঘিন্নগ্র	ধেন্ |	ঘিন্	ধৎ	ধেন্ ॥

॥ ২৩ ॥

ঠেকা

+			o		
ধিন্	ঃত	তেন্ |	ধিন্	ঘিন্	তেন্ |
তঃ	ঃত	তেন্ |	তঃ	খিত্ত	তগ্র ॥

॥ তেহাই ॥

ধিন্	ঘিন্নগ্র	ধেন্ |	ধিন্	ঘিন্নগ্র	ধেন্ |
ধিন্	ঘিন্নগ্র	ধেন্ |	ঘিন্	ধৎ	ধেন্ ॥

(একটু দ্রুত লয়ে বাজবে)

+			o		
ধিন্	—	ধেন্ |	খিৎ	তা	— |
তঃ	—	— |	থেন	—	— |

(ডানদিকে ঘুরতে হবে)

ধন	—	ধন্	তা	খিৎ	তা	
ধন্	—	ধন্	তা	খিৎ	তা	
তাং	তত	খিত্তা	তঃ	ঘিন্না	ঘিন্না	
ধে	—	—	—	—	—	

(মেনকুপ মাত্রা ৬)

॥ ২৪ ॥

তাল ১ ফাঁক ১

বোল

+			0			
তৎ	—	থ্রেং	—	খিৎ	—	
তঃ	—	খিৎ	—	খর	খর	
তেন্	—	তেন্	—	তা	—	
তঃ	—	—	—	—	—	
তৎ	—	থ্রেং	—	খিৎ	—	
তঃ	—	খিৎ	—	খর	খর	
তেন্	—	তেন্	—	তা	—	
তঃ	—	—	—	খর	খর	
তঃ	খিৎ	তা	খিৎ	থেন্	—	
তঃ	খিৎ	তা	ঘিন্	ধেন্	—	
ঘিন্	—	ঘিন্	—	ধেন্	—	
—	ত্র	গ্র	ঘিন্নাং	—	—	
তঃ	খিৎ	তা	খিৎ	থেন্	—	
তঃ	খিৎ	তা	ঘিন্	ধেন্	—	
ঘিন্	—	ঘিন্	—	ধেন্	—	
—	ত্র	গ্র	—	ঘিন্নাং	—	

তাং	—	তা	তা	খিৎ	তা
তা	ঘিন্	ঘিন্	তা	খিৎ	তা
ঘিন্	তা	তেন্	তা	খিৎ	তা
তা	ঘিন্	ঘিন্	তা	খিৎ	তা
তাং	—	তা	তা	খিৎ	তা
তা	ঘিন্	ঘিন্	তা	ঘিন্	তা
[illegible]	—	—	—	খর	খর
তাং	—	তা	তা	খিৎ	তা
তা	ঘিন্	ঘিন্	তা	খিৎ	তা
ঘিন্	তা	তেন্	তা	খিৎ	তা
তা	ঘিন্	ঘিন্	তা	খিৎ	তা
তাং	—	তা	তা	খিৎ	তা
তা	ঘিন্	ঘিন্	তা	ঘিন্	তা
ধে	—	—	—	—	—

॥ ২৫ ॥

বোল

+			0		
তৎ	—	ধিন্	—	ত্র	খ্
তেন্	—	তঃ	খিৎ	তা	—
খিত্র	গ্র	ধিন্	—	তত	তত
তেন্	—	—	তঃ	—	—
তৎ	—	ধিন্	—	ত্র	খ্
তেন্	—	তঃ	খিৎ	তা	—
খিত্র	গ্রধিন্	—	—	তত	তত
তেন্	—	—	তঃ	—	—
থেন্	—	তাৎ	—	ত্র	খ্
তেন্	—	তাৎ	—	ধন	তা

ধন্	—	তা	|	তা	খিৎ	তা	|
তঃ	ঘিন্	ধন্	|	তঃ	ঘিন্ন	গ্র	|
ধেঃ	—	—	|	ধিন্	—	—	|
—	—	থেন্	|	—	থেন্	তা	|
তঃ	—	থেন্	|	—	থেন্	তা	|
তঃ	—	—	|	—	খর	খর	|
তাং	ঃতাং	তাৎ	|	—	তা	ধেন্	|
তা	ঘিন্ন	গ্র	|	ধে	—	—	|
ধিন্	ঃধিন্	থেন্	|	—	ধিন্	—	|
—	—	—	|	—	ঘিন্ন	গ্র	|
ধেন্	ঃতেন্	তাৎ	|	—	তা	ধেঃ	|
তা	ঘিন্ন	গ্র	|	ধেঃ	—	—	|
থেন্	—	তা	|	—	থেন্	তা	|
তাং	—	—	|	তাং	—	—	|

॥ তেহাই ॥

+				o			
ধিন্	—	ধেন্	|	খিৎ	তা	—	|
তঃ	—	—	|	থেন্	—	—	|
ধন্	—	ধন্	|	তা	খিৎ	তা	|
ধন্	—	ধন্	|	তা	খিৎ	তা	|
তাং	তত	খিত্তা	|	তঃ	ঘিন্ন	ঘিন্ন	|

॥ ২৬ ॥

(মধ্যলয়)

বোল

+				o	খর	খর	)
তঃ	—	ধেন্	|	—	তা	—	|
তঃ	—	—	|	—	খর	খর	|

তঃ	—	ধেন্	—	তা	—	।
তঃ	—	—	—	খর	খর	।
তঃ	—	ধেন্	—	তা	—	।
তঃ	—	ধেন্	—	তা	—	।
তঃ	—	ধেন্	—	তা	—	।
তঃ	—	—	তাং	—	—	।
—	—	খিত্ত	তগ্র	ধে	—	।
তাং	—	ঘিন্	—	ধেন্	—	।
ধিন্	—	ঘ্রেং	—	ঘিন্	তা	।
তঃ	—	—	তাং	—	—	।
—	—	খিত্ত	তগ্র	ধেন্	—	।
তাং	—	ঘিন্	—	ধেন্	—	।
ধিন্	—	ঘ্রেং	—	ঘিন্	তা	।
তঃ	—	—	—	—	—	॥

॥ তেহাই ॥

ধন্	—	ধ্ন্	তা	খিৎ	তা	।
ধন্	—	ধন্	তা	খিৎ	তা	।
+			0			
ত্যাং	তত	খিত্ত	তঃ	গীন্না	গীন্না	।
ধেন	—	—	—	—	—	॥

॥ ২৭ ॥

+			0	গীন্ন	খর	।
ধে	—	—	ধে	—	—	।
—	—	ধে	ধে	ধে	—	।
—	—	তা	—	তেন্	তা	।
তেন্	ত্র	খ্	তেন্	তা	—	।

তঃ	—	—	।	তাং	—	—	।
—	—	—	।	—	গীন্ন	গর	।
ধে	—	—	।	ধে	—	—	।
—	—	ধে	।	ধে	ধে	—	।
—	—	তা	।	—	তেন্	তা	।
তেন্	ত্র	খ্র	।	তেন্	তা	—	।
তঃ	—	—	।	তাং	—	—	।
—	—	—	।	—	—	—	।
তেন্	ত্র	খ্র	।	তেন্	তা	—	।
তেন্	ত্র	খ্র	।	তেন্	তা	—	।
তেন্	ত্র	খ্র	।	তেন্	তা	—	।
তঃ	—	—	।	থেন্	—	—	।
ধেন্	তা	থেন্	।	তা	থেন্	তা	।
তা	তা	থেন্	।	তা	থেন্	তা	।
তৎ	তৎ	তৎ	।	—	ধেন্	তা	।
ধিন্	ত্র	গ্র	।	ধিন্	তাং	—	।
তৎ	তৎ	তৎ	।	—	ধেন্	তা	।
ধিন্	ত্র	গ্র	।	ধিন্	ধেন্	—	।
—	—	—	।	—	গীন্ন	গর	।
গীন্	নৎ	—	।	গীন্	নৎ	—	।
ধেন্	ত্র	গর	।	ধিন্	ধেন্	তা	।
ধিন	—	—	।	ধেন্	—	—	।
—	—	—	।	—	—	—	।
থেন্	তা	থেন্	।	তা	থেন্	—	।
তা	থেন্	—	।	তা	তঃ	—	।
থেন্	—	তৎ	।	—	ধিন্	—	।
ধেন্	—	—	।	—	—	—	॥

তেহাই

+				০			
ধন্	—	ধন্	|	তা	খিৎ	তা	|
ধন্	—	ধন্	|	তা	খিৎ	তা	|
তাং	তত	খিত্তা	|	তঃ	গীন্ন	গীন্ন	|
ধে ॥							

(তাল সুরফাক্ত মাত্রা ১০)

(তাল ৩ ফাক ২)

॥ ঠেকা ॥

+		০		২		৩		০	
ধিন্	তেন্ |	তাং	ঘিন্নগ্র |	ধিন্	ঘিন্নগ্র |	ধিন্	তেন্ |	তাং	ঘিন্নগ্র ॥

তেহাই

ধন ধন্ | ধন্ তাং | — ধন্ | তত খিত্তা | ঘিন্ন ঘিন্ন ॥

(তাল তেওরা মাত্রা ৭)

(তাল ৩)

ঠেকা

+			২		৩	
ধিন্	তেন্	তাং |	তত	খিত্তা |	ঘিন্ন	ঘিন্ন ॥

তেহাই

ধেন্তাং খিত্তা ঘিন্‌ঘিন্তাং | খিত্তত ততখিত্তা | তঘিন্ ঘিন্নাং ঃতাখিত্তা ॥

॥ ভঙ্গি পারং ॥

তাল-রাজমেল-তুইতাল, মাত্রা ৭ বিলম্বিত লয়

১ম পর্যায়

১				২			
ধিন	—	ধিন	—	খিৎ	গিনা	গর	২ বার
ধিন	—	থেন	—	ধেন	তাৎ	—	
তেন	—	তা	—	ধিন	তাৎ	—	
তঃ	—	—	—	তেন	তাৎ	—	

১				২		
				খিৎ	গিনা	গর
ধিন	—	ধেন	—	ধিন	তাৎ	—
ধিন	—	থেন	—	ধিন	তাৎ	—
তেন	—	তাৎ	—	তেন	তাৎ	—
তঃ	—	তাং	ত্রা	খিৎ	তাৎ	—

২য় পর্যায়

১				২		
ধেন	—	খ্	খ্	খ্	খ্	খ্
খ্	খ্	খ্	খ্	খ্	খ্	খ্
তা	—	তা	—	তেন	তাৎ	—
তঃ	খিত	থেন	—	ধিন	ধিন	—
থেন	—	ধিন	—	তেন	তঃ	—
তাং	—	—	—			

৩য় পর্যায়

১				২		
তেন	—	তঃ	—	খিৎ	খর	খর
তেন্	—	তঃ	—	খিৎ	তা	—

তেন	—	তঃ	—	খিৎ	তা	—
খিতাং	—	—	—	খিতা	খিতা	—

৪র্থ পর্যায়

				২		
১				খিৎ	খিন	গ্রা
ধিন	—	ধিন	—	ধেন	তাৎ	—
ধিন	—	ধিন	—	ধেন	তাৎ	—
ধিন	—	ধিন	—	ধেন	তাৎ	—
ধেন	—	তঃ	—			
				ধিন	ঘিন	গ্রা
{ ধেন	—	তা	—	ধেন	তা	— }
{ খিৎ	—	তাৎ	—	তঃ	ঘিন	— }

৫ম পর্যায়

ধেন	—	তা	—	ধেন	তা	—
খিৎ	—	তাৎ	—	ধেন	তাৎ	—

তেহাই

তঃ	খিৎ	থেন	—	ধিন	ধিন	—
থেন	—	ধিন	—	তেন	তঃ	—
তাং	—	—	—			

৬ষ্ঠ পর্যায়

				খিৎ	খর	খর
তেন	—	তঃ	—	খিৎ	তা	—
তেন	—	তঃ	—	খিৎ	তা	—
তেন	—	তঃ	—	খিতা	খিত	—
খিতাং	—	—	—			

৭ম পর্যায়

{ ধিন	—	ধিন	—	খিৎ	ঘিনা	গ্রা	}
ধিন	—	ধিন	—	ধেন	খিতাৎ	—	} ২ বার
{ ধিন	—	ধিন	—	ধেন	খিতাৎ	—	}
ধেন	—	তঃ	—	ধেন	খিতাৎ	—	}

৮ম পর্যায়

১				২		
ধেন	—	তাৎ	—	ধিন	ঘিনা	গ্রা
তঃ	—	—	—	ধেন	খিৎ	—
ধেন	—	তা	—	ধিন	ঘিনা	গ্রা
তঃ	—	—	—	ধেন	খিৎ	—
ধেন	—	তাৎ	—	ধিন	ঘিন	গ্রা
খিৎ	—	তাৎ	—	ধেন	তা	—
তঃ	খিত	থেন	—	ধেন	তাৎ	—
ধেন	তা	ধেন	—	ধিন	ঘিনা	গ্রা
ধেন	—	. তঃ	—	তাৎ	তাৎ	—

৯ম পর্যায় (ক)

{ তঃ	ঘিন	ধিন	—	খিৎ	খ্‌	খ্‌	} ৩ বার
ধেন	—	তঃ	—	ধেন	তা	—	}
তঃ	ধিন	ধিন	—	খিৎখ	খ্‌	খ	
ধেন	—	তঃ	—	ধেৎ	ধেৎ	—	

১০ম পর্যায়

				ধিন	ঘিনা	গ্রা	
{ ধিন	—	ধেন	—	তত	খিতা	—	} ২ বার
তেন	—	তাৎ	—	তঃ	ঘিন	—	}
ধিন	—	ধেন	—	তত	খিতা	—	

তেঁন	—	তাং	—	তঃ	—	—
তেন	—	তাৎ	—	তঃ	তঃ	—
তাং	—	—	—	ধিন	ঘিনা	গ্রা
ধিন	—	ধেন	—	তাৎ	তাৎ	—
ধেন	—	তঃ	—			

৯ম পর্যায় (খ)

	১				২			
(খ)	তঃ	ঘিন	ধিন	—	খিৎ	খ	খ	৩ বার
	ধেন	—	তঃ	—	ধেন	তা	—	
	তঃ	ঘিন	ধিন	—	খিৎ	খ	খ	
	ধেন	—	তঃ	—	ধেৎ	থেৎ	—	

১১নং পর্যায়

				২			
				ধিন	ঘিনা	গ্রা	
ধিন	-	ধেন	—	তাঘিন	তত	খিন্ত	২ বার
তেন	—	তাৎ	—	তঃ	ঘিন	—	
ধিন	—	ধিন	—	তাঘিন	তত	খিন্ত	
তেন	—	তাৎ	—	তঃ	—	—	
তাং	—	—	—	ধিন	ঘিনা	গ্রা	
ধিন	—	ধেন	—	তাৎ	তাৎ	—	
ধে	—	তঃ					

৯ম পর্যায়

					খিৎ	খ	খ
(গ) ৩ বার	তেন	—	তঃ	—	খিৎ	খ	খ
	তেন	তা	থেন	—	ধিন	ঘিনা	গ্রা
	ধেন	তা	ধেন	—	তাৎ	তাৎ	—

১২নং পর্যায়	+	|	|	|	o	|	|	|
(১ম) ৮ মাত্রা	ধেন	—	—	খ্ খ্	তঃ	ঘিন	ধেন	তাৎ
	তঃ	—	—	,, ,,	,,	,,	,,	,,
	,,	,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,
	,,	,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,
	তঃ	—	,,	খ্ খ্	তঃ	খিৎ	থেন	তা

১২নং পর্যায়	+	|	|	|	o	|	|	|	
(২য়) ৮ মাত্রা	থেন	—	ঘিন	গন্না	ধিন	—	ধেন	তা	২ বার
	ধিন	—	ঘিন	গন্না	ধিন	—	থেন	তা	
	থেন	—	ঘিনা	গন্না	ধিন	ঘিন	তাৎ	তাৎ	
	তাং	—	—	—					

১২নং পর্যায় ১ম এবং ২য় সম্পূর্ণ দুবার হবে এবং গানের সঙ্গে ১ম বারে ১ম পর্যায় ৪ বার, ২য় পর্যায় ৫ বার করতে হবে এবং ২য় বারে সম্পূর্ণ প্রথম পর্যায় ৬ বার করে ২য় পর্যায়টি ৭ বার হবে।

১৩নং পর্যায়				o	|	|	
৬ মাত্রা	+	|	|	খিৎ	ঘিনা	গ্রা	
	ধিন	ধেন	তা	ধিন	ধেন	তা	২ বার
	ধিন	ধেন	তা	ধেন	ঘিনা	গ্রা	
	ধিন	ধেন	তা	—	তাৎ	তঃ	
	খিৎ	তা	ধেন	তঃ	খর .	খর	
	তাৎ	তাৎ	তাং	খিৎ	থেন	তা	
	ধেৎ	ধেৎ	ধেন	তঃ	ধেৎ	ধেৎ	

১৪নং পর্যায়	থেন	ত্রা	ঘিন	তা	থেন	তা
	তঃ	ঘিন্না	গ্রা	ধিন	ধেন	তা
	ধেন	ত্রা	ঘিন	তা	থেন	তা
	ধেন	ত্রা	ঘিন	তা	থেন	তা
	ধেন	ত্রা	ঘিন	তাং	তাৎ	তাৎ
	তাং	—	—	খিৎ	ঘিনা	গ্রা

১৫নং পর্যায়	ধিন	ধেন	তা	ধিন	ধেন	তা
	ধিন	ধেন	তা	ধিন	ঘিনা	গ্রা
	ধেন	তা	ধেন	—	তাৎ	তঃ
	খিৎ	তা	ধেন	তঃ	খর	থর
	+			o		
	তাৎ	তাৎ	তাং	ঘিৎ	থেন	তা
	ধেৎ	ধেৎ	ধেন	তা	ধেৎ	ধেৎ
	ধেন	—	—	—	—	—

১৬নং পর্যায়	+			o			
	তাঘিন	—	—	খ্	খ্	খ্	
	খ্	খ্	খ্	খ্	খ্	খ্	
	খ্	খ্	•খ্	খ্	খ্	খ্	
	তা	খ্	খ্	তেন	তঃ	—	
	খিৎ	ত্রা	ঘিন	তা	থেন	তাৎ	
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা	
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা	
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা	
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা	
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা	
	তা	খ্	খ্	তা	থেন	—	
	ঘিন	ঘিন	তা	ঘিন	ঘিন	তা	২ বার
	ঘিৎ	—	—	থিৎ	ঘিনা	গ্রা	
	ঘিন	ঘিন	তা	ঘিন	ঘিন	তা	
	খিৎ	—	ঘিন	তা	ঘিন	তা	
	খিৎ	—	ঘিন	তা	ঘিন	তা	
	খিৎ	—	—	থিৎ	ঘিনা	গ্রা	
	ঘিন	ঘিন	তা	ঘিন	ঘিন	তা	
	খিৎ	—	—	—	—	—	

১৭নং পর্যায়						
	+	|	|	o		
	তাঘিন	—	—	ধ	ধ	ধ
	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
	তা	ধ	ধ	তেন	তঃ	—
	খিৎ	ত্রা	ঘিন	তা	থেন	তাৎ
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
	তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
	তা	ধ	ধ	তাং	তা	তা
	থেন	—	ধন	তঃ	ঘিন	তঃ
	ঘিন	তাং	—	তা	ধ	ধ
	থেন	—	ধন	তঃ	ঘিন	তঃ
	ধিন	তাং	—	তঃ	ধ	ধ
	থেন	—	ধন	তঃ	ঘিন	তঃ
	ঘিন	থেন	তাৎ	তঃ	ঘিন	তঃ
	ঘিন	থেন	তাৎ	তঃ	ঘিন	তঃ
	ঘিন	তাং	—	তা	ধ	ধ
	থেন	—	ধন	তঃ	ঘিন	তঃ
	ঘিন	তাং	—	—	—	—

১৮নং পর্যায়	+	|	|	o	|	|
৬ মাত্রা	তাঘিন	—	—	ধ	ধ	ধ
	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ

খ্	খ্	খ্	খ্	খ্	খ
খ্	খ্	খ্	খ্	খ্	খ্
তা	খ্	খ্	তেন	তঃ	—
খিৎ	ত্রা	ঘিন	তা	ঘেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তঃ	খিত	থেন	তা	থেন	তা
তা	খ্	খ্	তা	থেন	—
ঘিন	ঘ্রৎ	—	ঘিন	ঘ্রেং	—
খিৎ	—	—	খিৎ	ঘিনা	গ্রা
ঘিন	ঘ্রৎ	—	ঘিন	ঘ্রেং	—
খিৎ	—	—	খিৎ	ঘিনা	গ্রা
ঘিন	ঘ্রৎ	—	ঘিন	ঘ্রেং	—
খিৎ	—	ঘ্রাৎ	—	ঘিন	তা
খিৎ	—	খ্রাৎ	—	ঘিন	তা
খিৎ	—	—	খিৎ	ঘিনা	গ্রা
ঘিন	ঘ্রৎ	—	ঘিন	খ্রেং	—

১৯নং পর্যায়	+	|	|	|	o	|	|	|
৮ মাত্রা	খিৎ	—	—	খ্খ্	তঃ	গিন	ঘিন	তা
	থেন	—	—	”	তঃ	গিন	ঘিন	তা
	থেন	—	—	”	তঃ	গিন	খিন	তা
	থেন	—	—	”	তঃ	গিন	ঘিন	তা

১৯নং পর্যায়	+	|	|	|	o	|	|	|
৮ মাত্রা	তঃ	ঘিন	ঘিন	তা	তঃ	ঘিন	ঘিন	তা
	তঃ	ধেন	ঘিনা	গৱ	ধেন	—	ঘিনা	গৱা
	ঘিন	তা	খিৎ	তা	ঘিন	তা	তেন	তা
	তেন	তা	খিৎ	তা	তঃ	—	খ্‌	খ্‌
	তেন	তা	খিৎ	তা	ঘিন	তা	তেন	তা
	তেন	তা	খিৎ	তা	তঃ	খিৎ	তেস্তা	তেস্তা
	থেন	—	—	খ্‌খ্‌	তঃ	ঘিন	ঘিন	তা
	থেন	—	—	”	”	”	”	”
	থেন	—	—	”	”	”	”	”
	তাঃ	ঘিন	ঘিন	তা	তঃ	ঘিন	ঘিন	তাৎ
	তঃ	ধেন	ধিনা	গৱা	ধেন	—	ঘিনা	গৱা
	ঘিন	তা	খিৎ	তা	ঘিন	তা	তেন	তা
	তেন	তা	খিৎ	তাৎ	তঃ	—	খ্‌	খ্‌
	তেন	তা	খিৎ	তা	ঘিন	.তা	তেন	তা
	তেন	তা	খিৎ	তা	থেন	—	ঘিনা	গ্রা

২০নং পর্যায়	+	|	|	o	|	|	
৬ মাত্রা	ধিন	ধেন	তা	ধিন	ধেন	তা	২ বার
	ধিন	ধেন	তা	ধিন	ঘিনা	গৱা	
	ধেন	তা	ধেন	—	তাৎ	তাঃ	
	খিৎ	তা	ধেন	তঃ	খ্‌	খ্‌	
	তাৎ	তাৎ	তাং	খিৎ	থেন	তা	
	ধেৎ	ধেৎ	ধেন	তা	ধেৎ	ধেৎ	
	ধেন	—	—				

২১নং পর্যায়							
				তঃ	ঘিনা	গ্রা	
৬ মাত্রা	ঘিন	তা	থেন	তঃ	ঘিন	তা	
	তা	খ্‌	খ্‌	তা	থেন	তা	২ বার
	ঘিন	তা	থেন	তঃ	ঘিন	তা	
	তাং	—	—	তঃ	ঘিনা	গ্রা	

২১নং পর্যায়	+	|	|	০	|	|	
৬ মাত্রা	ঘিন	তা	থেন	তঃ	ঘিন	তা	
	তা	খ্	খ্	তঃ	থেন	তা	
	ঘিন	তা	থেন	তা	ধে	ধে	
	ধেন	—	—	থিৎ	ঘিনা	গ্রা	
	ধিন	ধেন	তা	ধিন	ধেন	তা	২ বার
	ধিন	ধেন	তা	ধেন	ধিনা	গ্রা	
	ধেন	তা	ধেন	—	তাৎ	তঃ	
	থিৎ	তা	ধেন	তঃ	খ্	খ্	
	তাৎ	তাৎ	তাৎ	থিৎ	থেন	তা	
	ধেৎ	ধেৎ	ধেন	তা	ধেৎ	ধেৎ	
	ধেন	—	—	—	—	—	
				তঃ	ঘিন	গ্রা	
	ধে	ধেন	তা	তঃ	ঘিন	তা	২ বার
	ধেন	—	তা	ধেন	খ্	খ্	
	তা	ধেন	—	তঃ	থিৎ	তা	
	তাং	—	—	তঃ	ঘিনা	গ্রা	

২২নং পর্যায়	ধেৎ	ধেন	তা	তঃ	থিৎ	তা
৬ মাত্রা	ধেন	—	তা	ধেন	খ্	খ্
	তা	ধেন	তাৎ	তা	তা	খ্রা
	খ্রাং	—	ত্রা	ঘিৎ	ঘিনা	গ্রা
	ধেন	তা	ধেন	—	তাৎ	তঃ
	থিৎ	তা	ধেন	তঃ	খ্	খ্
	তাৎ	তাৎ	তাং	থিৎ	থেন	তা
	ধেৎ	ধেৎ	ধেন	তা	ধেৎ	ধেৎ
	ধেন	—	—			

২৩নং পর্যায় ৬ মাত্রা

	+	।	।	০	।	।	
				তঃ	ঘিনা	গ্রা	
{	ধে	ধে	ধেন	—	তাৎ	তাৎ	} ২ বার
	ধেন	—	তা	ধেন	খ্‌	খ্‌	
{	তাৎ	তাৎ	তাং	—	তাৎ	তাৎ	}
	তেন	—	তাৎ	তঃ	ঘিনা	গ্রা	
	ধে	ধে	ধেন	—	তা	তাৎ	
	ধেন	—	তা	ধেন	খ্‌	খ্‌	
	তাৎ	তাৎ	তাং	—	তাৎ	তাৎ	
	তেন	—	তাৎ	তঃ	খ্‌	খ্‌	
	তাৎ	তাৎ	তাং	—	তাৎ	তাৎ	
	তেন	—	তাৎ	তঃ	খ্‌	খ্‌	
	তাৎ	তাৎ	তাং	—	তা	খ্‌া	
	খ্‌াং	—	—	ধিন	ঘিনা	গ্রা	
	ধেন	তা	ধেন	—	তাৎ	তঃ	
	থিৎ	তা	ধেন	তঃ	খ্‌	খ্‌	
	তাৎ	তাৎ	তাং	থিৎ	থেন	তা	
	ধেৎ	ধেৎ	ধেন	তা	ধেৎ	ধেৎ	

২৪নং পর্যায় ৮ মাত্রা

+	—	—	—	০	—	—	—
ধেন	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
থিৎ	—	তেন	তঃ	তাং	—	খ্‌	খ্‌
তা	তেন	—	তঃ	থিৎ	তা	ধেন	তা
থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা

থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
থিৎ	—	তেন	তা	তাং	—	খ্ন	খ
তা	তেন	—	তঃ	থিৎ	তা	ধেন	তা
|	|	|	|	o	|	|	|
থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
থিৎ	—	তা	—	তেন	—	তা	ত্রা
[illegible]	—	তেন	তাঃ	তাং	—	খ্ন	খ
তা	তেন	—	তঃ	থিৎ	তা	ধেন	তা
ধিন	—	ধেন	—	ধিন	—	তেন	তাং
থিৎ	তত	ধিন	ধিন	—	ধেন	ধিন	তেস্তা
থিৎ	—	—	—	তা	—	ঘিনা	গ্রা
বেন	—	ঘিন্নাৎ	—	ঘিন	তা	থেন	—
ঘিন্নাৎ	—	ঘিন	তা	ধেন	—	ঘিনা	গ্রা
ধেন	—	ঘিন্নাৎ	—	ধিন	তা	ধেন	—
ঘিন্নাৎ	—	ঘিন	তা	ধেন	—	ঘিনা	গ্রা
ধেন	—	ঘিন্নাৎ	—	ঘিন	তা	ধেন	—
ঘিন্নাৎ	—	ঘিঁন	তা	ধেন	—	ঘিনা	গ্রা
ধেন	—	তাং	ধিন	তাৎ	তঃ	ধিন	তা
থেন	—	তাং	ধিন	তাৎ	তঃ	ধিন	তা
তাং	—	তাং	ধিৎ	ত	তঃ	ধিৎ	তা
ধিন	ত্রা	থিন	থেন	তা	তঃ	ধিন	তা
+	|	o	|	২	|	৩	|
থেন	তেন	—	তঃ	থিৎ	তা	ধেন	তা
”	”	”	”	”	”	”	”
”	”	”	”	”	”	”	”
”	”	”	”	”	”	”	”
তা	তেন	তেন	তা	গিন	খিনা	থেন	তা

	+	|	০	|	২	|	৩	|
	ধিন	খর	খর	তাং	খর	খর	তাং	খিৎ
	তা	গিনা	গর	ধেন	খিনা	খর	ধেন	তা

	+			২		৩	
২নং চালি	তা তেন	তেন তঃ		থিৎ	তা	ধেন	ত

চার বার করে তেহাই

	+				২		৩	
৩নং চালি	ধিন	তেন	খর	খর	তঃ	ধে	ধেন	ত

চার বার করে তেহাই

	+		২		৩	
২নং চালি	তা তেন	তেন তঃ	খিৎ তা		ধেন	তা

চার বার করে তেহাই তারপর

১নং চালি চার বার করে ভঙ্গি পারেং সমাপ্ত করতে হয়।

সংস্কৃতির ছন্দ

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের একশত বছর পরে আজ যদি নৃত্যকলার প্রসার ও বিকাশের হিসাব নিকাশ করা যায় তাহলে প্রথমেই একটি আপাত শুভলক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলকাতা ও মফস্বল শহরের অলিতে-গলিতে, পথে ঘাটে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে নৃত্যশিক্ষার স্কুলের প্রাদুর্ভাবে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে শহরে, গ্রামে অগণিত আসরে, জলসায়, সিনেমায়, থিয়েটারে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মণ্ডপে নৃত্যকলা নিত্য প্রদর্শিত হচ্ছে। বহু বিচিত্র ও বিকৃত পদ্ধতিতে নৃত্যকলার প্রদর্শনের প্রবণতা ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই সব বাহ্যিক লক্ষণগুলি নৃত্যকলার বিপুল জনপ্রিয়তা ও আবেদনের সমাদর হয়তো প্রমাণ করে, কিন্তু একটি গভীর আশংকাও মনে জাগে। নৃত্যকলার এই ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলন কি এই অমূল্য সংস্কৃতি সম্পদের প্রকৃত ও সুসঙ্গত প্রসার; অথবা কেবলমাত্র মনোবিনোদনের প্রকরণরূপে নৃত্যের সৌন্দর্যপ্রসবিনী রূপের নিছক প্রদর্শন বিলাসের সস্তা জনপ্রিয়তা।

একথা অনস্বীকার্য যে দেশের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে সাম্প্রতিককালে শিল্পরুচির নিম্নগামীতা ও সর্বগ্রাসী ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। নৃত্যকলা ও সংস্কৃতির এই নিম্নগামীতা সম্পর্কে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী বলেছেন:

"The concentration of cultural activities in the main cities tends to corrupt both the art and the artiste, by the imposed demands of fashion and frivolity, and the applause and adulation are all that matters'.

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী উল্লেখযোগ্য:

'সস্তা খেলো জিনিসকে কেউ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না, একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাঁহাদের সঙ্গতি তাহার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না—কিন্তু যখন সেই সকল লোকই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সরস্বতী সম্প্রদামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন।'

নৃত্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রেও শিল্পীরা অনেক সময়েই ভুলে যান যে, দৃশ্যমানতা ও দর্শন একবস্তু নয়; দেহচাঞ্চল্যের সৌন্দর্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদনে নৃত্যের সূচনা হলেও সমাপ্তি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে। দীর্ঘকাল ধরে ভারতের নৃত্যকলা ও তার চর্চা গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে। শিল্পী ও আচার্যেরা বিভিন্ন আঙ্গিকে দক্ষ হলেও নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তর রূপের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারা বা এর নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বরং অত্যন্ত কঠোর রক্ষণশীলতার সঙ্গে নিজ নিজ বংশানুক্রমিক শিল্পধারাটিকে সংরক্ষণ করেছেন, যার ফলে এর প্রসার অবরুদ্ধ হয়েছে। শিক্ষিত সমাজ থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ও সামগ্রিক চেতনার অভাবে নৃত্যশিল্পীরা অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন। নৃত্যচর্চা ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি

এগুলির সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার জন্যে বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে নৃত্যশিল্পীরা একাত্ম হতে পারেন নি। যেজন্য বিংশশতাব্দীর এই দশকেও শিক্ষিত সমাজের একটি বিরাট অংশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলার ঐতিহ্য, রূপপরিকল্পনা ও ভাবরসের ঐশ্বর্যের স্বীকৃতিদানে দোলাচল চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিচর্চার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। 'আমি ভারতীয় সংস্কৃতির যে রূপটি কল্পনা করি তার কেন্দ্রস্থলে সঙ্গীত এবং রূপকর্মকে সম্মানের বিশিষ্ট আসন দিতে হবে, কেবলমাত্র উপস্থিতিতে সম্মতির ইঙ্গিতমাত্র দিলে চলবে না'—রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে প্রয়াসের সূচনা করেছিলেন সেই ধারাটিকে বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতিতে রূপায়িত কবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই ঘটনায় শুধু মাত্র শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের যোগসূত্রই গ্রথিত হল না, শিল্পবোধ ও ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ প্রকৃত শিক্ষিত শিল্পীবৃন্দের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সূচিত হল।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে উপাচার্য মহাশয়ের ভাষণের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য ঃ

'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার জন্যে যে নূতন পাঠক্রম প্রবর্তিত হল তা রচিত হয়েছে এই ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক বিষয়-গুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। একটি শ্রেণীতে আছে মানবতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি, অপরটিতে আছে শিল্প সম্পর্কিত বিষয়গুলি, যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য। এখানে যে শিক্ষার্থী স্নাতক পাঠক্রম পড়তে আসবেন, তাঁকে দুই শ্রেণী হতেই বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং একটি ঐচ্ছিক বিষয় নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট্য—এই তিনটির একটি হতে হবে। অর্থাৎ এই পাঠক্রমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল, প্রতি শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা ছাড়া একটি হৃদয়বৃত্তির ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের পাঠক্রমের এইটি হল প্রধান বৈশিষ্ট্য।'

এই প্রচেষ্টার সঙ্গে শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতী সমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও সহ-যোগিতা যুক্ত হওয়া উচিত। কারণ সম্যকরূপে কর্ষণ বা চর্চার দ্বারা বুদ্ধি, রুচি, নীতি, শিল্প, কলাবিদ্যা প্রভৃতির যে উৎকর্ষ অর্জন করা যায় তাই হচ্ছে প্রকৃত সংস্কৃতি। এবং এই কর্ষণ বা চর্চার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় এই কর্ষণের যে পটভূমি রচিত হল তার ফলে আগামীকালের নৃত্যশিল্পীদের মনোভূমি সমৃদ্ধ হবে মানবমুখীনতা, ইতিহাসচেতনা, যুক্তিনিষ্ঠা ও চিন্তার স্বকীয় মূল্যবোধে। একথা বিশেষ করে নৃত্যশিল্পীদের সম্পর্কেই আমি উল্লেখ করছি। কারণ ব্যক্তিগত-ভাবে একজন নৃত্যশিল্পীরূপে আমি মনে করি আমাদের চিন্তার এই দৈন্য ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে কিছু কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়তো দেখা যাবে ; কিন্তু সামগ্রিক বিচারে শিল্পী ও আচার্য তালিকা অনুধাবন করলে বিংশশতাব্দীর এই দশকেও নৃত্যলোকের শিল্পীমানসে এই দৈন্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধিগত চর্চার এই দৈন্য সম্পর্কে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বারবার শিল্পীসমাজকে সতর্ক করেছেন।

এজন্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাবকে আমি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নবপর্যায়ের সূচনারূপে চিহ্নিত করতে চাই। কারণ আমি বিশ্বাস করি—এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি, শুধুমাত্র প্রাচীন আঙ্গিকসর্বস্ব গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াস, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও নৃত্যগুরুদের রক্ষণশীল অনুদার মনোবৃত্তি, নৃত্যকলা বিকাশের এই তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক নিঃসন্দেহে অপসারিত করবে। এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনের নৃত্যশিক্ষাপদ্ধতিকে যথাযথ পদ্ধতিতে পরিচালিত করবে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীকে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন হতে অনুরোধ জানাই।

এক। শিল্পপ্রকৃতির ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক—এই দুই ধারারই চর্চার দিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তা না হলে শিল্পের আবয়বিক ও আন্তররূপের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুই। শিল্পকলার অনুশীলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই হল শিল্পীর সৃজনী-শক্তিকে উদ্বোধিত করা ; সেজন্যে এদিকেও বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রয়োগরীতির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দেওয়া দরকার। তা না হলে ধ্রুপদী রীতির সঙ্গে আধুনিক শিল্পনির্মাণ পদ্ধতির যোজনায় নতুন শিল্প-রীতি গড়ে উঠবে না।

তিন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আঞ্চলিক নৃত্যধারা ও বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা সম্পর্কে উৎসাহিত ও বাধ্যতামূলক চর্চার প্রবর্তন করা দরকার। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময়ে অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রয়াস সংস্কৃতির অনেক লুপ্তপ্রায় ধারাকে উদ্ধার করতে পারে।

চার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির অনুষ্ঠান সাধারণের জন্যে পরিবেশিত হওয়া দরকার। এখানকার প্রযোজিত ও পরিবেশিত নাটক, নৃত্যনাট্য, সঙ্গীত যে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে, সেই রূপটি সাধারণের গোচরে এলে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সর্বসাধারণের যোগসূত্র রচিত হবে।

পাঁচ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিল্পকলা সম্পর্কে প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থগুলির বাংলা ভাষার রূপান্তর ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমান কালে নৃত্যকলা চর্চা ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে। উচ্চাঙ্গ নৃত্যের কিছু কৃতী শিল্পী তাঁদের একক অনুষ্ঠান করেন। আর নৃত্যনাট্য প্রযোজনা করা হয়ে থাকে। নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যে সব নাটক প্রযোজিত হচ্ছে, তাদের অধিকাংশের সঙ্গেই সমকালের যোগ আছে। কিন্তু গত দশবছরে যে ক'টি নৃত্যনাট্য প্রযোজিত হয়েছে, তার সঙ্গে সমকালের কোনো যোগসূত্র নেই। এমন কি 'ক্লাসিক' নাট্য-এর নৃত্যনাট্য রূপের পরিবেশনও বিরল। স্বভাবতই তার ফলে নৃত্যনাট্য-এর সঙ্গে নাট্য আন্দোলনের কোনো যোগসূত্র গড়ে ওঠে নি।

মাঝে মাঝে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি কিছু নৃত্যনাট্য রচনা না করতেন, তাহলে আজকের নৃত্যপরিকল্পক ও শিল্পীদের কি অবস্থা হত। উদয়শঙ্কর, সাধনা বসু-র পর

আমরা আর একটুও নৃত্যনাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারলাম না। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ধারাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ গানকে মাধ্যম করে কিছু নতুন নৃত্যনাট্য হয়েছে। যার মধ্যে অনাদিপ্রসাদ-এর পরিকল্পনায় 'ওমর খৈয়াম', অসিত চট্টোপাধ্যায় এর পরিকল্পনায় তারাশংকরের 'কবি' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলা নাটক প্রযোজনা একটি প্রচণ্ড গতিশীল ও প্রাণবন্ত সত্তা, কারো পরিশীলিত প্রখর সৌন্দর্য, কারো অভিনব পরীক্ষার প্রয়াস। সে তুলনায় নৃত্যনাট্য প্রযোজনা প্রায় আদিমস্তরে রয়েছে। এ বিষয়ে নৃত্য পরিকল্পক ও পরিচালকদের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে নাট্য-প্রযোজনায় নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট্য পরিচালকদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। নাটকে মাইম, নৃত্য, ব্যালেভিত্তিক খণ্ড ভাবনার কোরিওগ্রাফী—এ সবের মাধ্যমে একটি নতুন মাত্রা যোগ করার প্রয়াস গত কয়েক বছরের নাট্য প্রযোজনার একটি বিশেষ লক্ষণ। আশা করা যায় এই সব প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত নৃত্য পরিকল্পকরা এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন সৃষ্টি-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবেন।

নৃত্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পীদের একটি বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র জটিল আঙ্গিক কৌশলের নিপুণ অনুকৃতির প্রদর্শনই প্রকৃত অর্থে শৈল্পিক পরিবেশন হতে পারে না, তার সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল প্রকাশ-ভাবনা।

আশার কথা এই যে, সম্প্রতি কয়েকজন শিল্পীর প্রয়াসে এই অভাব পূরণের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার-এর ওয়ার্কশপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর এক শিল্পী শ্রীমতী অমিতা দত্ত—তাঁর পরিবেশনে একজন প্রকৃত অর্থে ইন্টেলেকচুয়াল শিল্পীর সফল ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছেন। শ্রীমতী মমতাশংকরের কাছেও আমাদের অনেক প্রত্যাশা, এ বিষয়ে একটু সচেতন হলে তিনিও নৃত্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষা ও বুদ্ধিগত চর্চার দীপ্তিতে, প্রাচীন ঐতিহ্য ও নব্যচিন্তার সমন্বয়ে নৃত্যকলার দার্শনিক সম্পদ আগামীকালের শিল্পকৃতিতে নতুন ঐশ্বর্য ও অমেয় মুক্তির প্রেরণায় সংস্কৃতির নবছন্দ রচনা করবে ও নিঃসন্দেহে ভারত-সংস্কৃতির অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনরূপে পরিচিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

* Manomohan Ghosh
  The Natyasastra
  Vol. I and Vol. II.
  The Abhinayadarpanam.
  Contributions to the
  history of Hindu Drama.
* A. K. Coomaraswamy
  The Mirror of Gesture.
  The Dance of Shiva.
* Faubian Bowers
  The Dance in India.
* John Martin
  Introduction to Dance.
* Beryl De Zoete
  The Other Mind.
* Guru Gopinath
  Abhinayankuram
  The Classical Dance
  Poses of India.
* Mulk Raj Anand
  The Dancing Foot.
* Rukmini Devi
  The Message of Beauty to
  Civilisation.
* Ragini Devi
  Dances of India.
* Ram Gopal
  Indian Dancing.
* R. Srinivasan
  Indian Classical Dance.
* Kay Ambrose
  Classical Dance and
  Costumes of India.
* G. R. S. Ayangar
  Indian Dance.
* K. B. Iyer
  Kathakali.
* E. Krishna Iyer
  Bharata Natya and other
  Dance of Tamilnad.
* Prem Kumar
  The Language of
  Kathakali.
* G. Venkatachalam
  Dance of India.
* A. B. Keith
  Sanskrit Drama.
* Stella Kremrisch
  The Art of India.
* Dr. R C. Majumder &
  Dr. A. D. Pusalkar
  The History of Culture
  of the Indian People.
* George Thomson
  Marxism & Poetry.
* W. B Yeats
  Four Plays for the
  Dancers.
* Edward J. Dent
  Opera.
* A. H. Franks (ED)
  Ballet—A Decade of
  Endeavour.
* Curt Sachs
  World History of Dance.
* Ruby Ginner
  The Revived Greek
  Dance.
* Balakrishna Menon
  Indian Classical Dances.
* Ilanger Adigal
  Silappodikaram.

* James R. Brandon
  Theatre in South East Asia
* D. N. Patnaik
  Odissi Dance
* D. S. Sarma
  A Book of Indian Calture
* Nilkanta Sastri
  A History of South India
* Edward Gordon Craig
  On the Art of the Theatre
* R. C. Majumder
  Advanced History of India
* Iswariprasad
  A short History of the Muslim Rule in India
* K. Bharata Iyer
  Kathakali
* Gurusaday Dutta
  The Folk Dance of Bengal
* Dr. Charles Fabri
  A History of Indian Dress
* Angela Bradshaw
  World Costumes
* V. A. Smith
  The Oxford Students History of India
* Ruby Ginner
  Gateway to the Dance
* Isadora Dancan
  My Life
* G. H. Tarlekar
  Studies in the Natyasastra
* H. H. Wilson
  The Theatre of the Hindus
* Beryl Zoete & Spies
  Dance and Drama in Bali
* V. Raghavan
  The Number of Rasas
* D. D. Kosambi
  The Culture & Civilisation of Ancient India
* John Main
  Religious Chastity
* Muthulaxmi Reddy
  Autobiography
* Kapila Vatsayan
  Classical Indian Dance in Literature and the Arts.
  Traditions of Indian Folk Dance
* K. H. Verma
  Natya, Nrtta & Nritya
* Mandakranta Bose
  Classical Indian Dance
* Karl Marx
  Notes on Indian History
* Amalendu Bagchi
  Indian Dance—a study from the aesthetic standpoint,—Rabindra Bharati Journal Vol. III—July '70
* Dr. Sunil Kothari
  Enactment of Gita Govinda in Neo-classical Dance Forms.—Journal of the Dept. of Dance, Rabindra Bharati—Vol. I—1982

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী
* বিনয় ঘোষ
  পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
* স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
  সঙ্গীত ও সংস্কৃতি
  রাগ ও রূপ
* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
  স ংস্কৃতিকী
* ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
  বাংলার লোকসাহিত্য
* ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
  এরিস্টটলের পোয়েটিকস
  ও সাহিত্যতত্ত্ব
  নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা
  সঙ্গীতে সুন্দর
* মনোমোহন ঘোষ
  প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা
* গোপাল হালদার
  সংস্কৃতির রূপান্তর
* ক্ষিতিমোহন সেন
  ভারতের সংস্কৃতি
* প্রতিমা দেবী
  নৃত্য
* শান্তিদেব ঘোষ
  রবীন্দ্রসঙ্গীত
  গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য
* অশোকনাথ শাস্ত্রী
  অভিনয় দর্পণ
* অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
  প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি
  ও সাহিত্য
* মণি বর্ধন
  বাংলার লোকনৃত্য ও
  গীতিবৈচিত্র্য
* নলিনীকুমার ভদ্র
  বিচিত্র মণিপুর
* সুরচান্দ শর্মা
  মৈতি জগোই (মণিপুরী)
* দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
  বাঘ ও অজন্তা
* সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
  শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীত
  রত্নাকর
* ঈশানচন্দ্র ঘোষ
  জাতকমালা
* হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
  পদাবলী পরিচয়
* সত্যচরণ শাস্ত্রী
  কালিদাস গ্রন্থাবলী
* প্রণয়কুমার কুণ্ডু
  রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও
  নৃত্যনাট্য
* হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
  রবীন্দ্রশিল্পতত্ত্ব
* উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  বাংলার বাউল ও
  বাউল গান
  রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা
* প্রবোধচন্দ্র সেন
  ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ
* সুকুমার সেন
  বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
* নীহাররঞ্জন রায়
  বাঙালীর ইতিহাস
* ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
  রবীন্দ্রস্মৃতি
* হেমেন্দ্রকুমার রায়
  সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ
* অবন্তীকুমার সান্যাল
  বিশ্বনাথ কৃত সাহিত্যদর্পণ
* শ্রী পান্থ
  দেবদাসী

* কালীপ্রসন্ন সিংহ
  মহাভারত
* সুধীরচন্দ্র কর
  শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা
* সরলা দেবী
  জীবনের ঝরাপাতা
* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
  রবীন্দ্রজীবনী
* কানাই সামন্ত
  চিত্রদর্শন
* প্রবোধচন্দ্র বাগচী
  ভারত ও ইন্দোচীন
* বসুমতী সাহিত্য মন্দির
  মনুসংহিতা
  যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা
* চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
  ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি
* সুধীর করণ
  সীমান্ত বাংলার লোকযান
* প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
  কবি কর্ণপুর কৃত
  আনন্দ-বৃন্দাবন
* সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা)
  নাট্যশাস্ত্র
* মহেশচন্দ্র পাল (সম্পাদনা)
  কামসূত্র
* পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদনা)
  পদ্মপুরাণ
  বিষ্ণুপুরাণ
  ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ
* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
  রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ
  ভারত সংস্কৃতি
* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
  বাংলার ইতিহাস
* মুকুন্দলাল চৌধুরী
  মণিপুরের ইতিহাস
* রজনীকান্ত চক্রবর্তী
  গৌড়ের ইতিহাস
* বিনয় ঘোষ
  পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
  বাদশাহী আমল
* শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
  দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা
* হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা)
  বৈষ্ণব পদাবলী
* জানকীনাথ বসাক
  মণিপুর প্রহেলিকা
* রমেশচন্দ্র মজুমদার
  বাংলাদেশের ইতিহাস
* সুকুমার সেন
  প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী
  মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
  নট-নাট্য-নাটক
* দেবেন্দ্রনাথ বসু
  শকুন্তলার নাট্যকলা



প্রথিতযশা শিল্পী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের গভীর শিল্পজ্ঞান ও শিল্পীজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই অনন্য গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নৃত্যকলা প্রসঙ্গে মূল্যবান সংযোজন। লেখিকার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনায় প্রশংশিত ও শিক্ষার্থী মহলে সমাদৃত।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্যবিভাগে অধ্যাপনা করেন। বাংলাসাহিত্যে এম. এ.। নৃত্যকলায় স্নাতকোত্তর উপাধি। নাট্যশাস্ত্রের করণ ও অঙ্গহার প্রসঙ্গে গবেষণার জন্যে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেছেন। নন্দিকেশ্বর কৃত 'অভিনয় দর্পণ'-এর ভারতীয় ভাষায় প্রথম প্রয়োগ-ভিত্তিক সংস্করণ তাঁর ভাষান্তর, ব্যাখ্যা ও সম্পাদনায় অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে।

'মন্দির স্থাপত্যে নৃত্যকলা', 'ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যকলা' এবং 'নৃত্যের মুক্তি : চৈতন্যদেব ও রবীন্দ্রনাথ' এই তিনটি গ্রন্থ রচনা তাঁর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।